সম্পাদক—শ্রীতারকনাথ হাজরা।

সূচী

১।	[illegible]রবতা (কবিতা)	...	কুমারী সুলেখা হালদার	১
২।	প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যে গদ্যের স্থান	...	শ্রীসমর পাল	২
৩।	ফিরে পাওয়া (গল্প)	...	শ্রীপ্রমোদকুমার পাল, কাব্যবিনোদ	৫
৪।	রাজগৃহের পথে (ভ্রমণকাহিনী)	...	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ	১৮
৫।	"পাপ শিশু" (কবিতা)	...	শ্রীরমেন্দ্রনাথ ঘোষ	২৫
৬।	বিশ্ব-প্রবাহ	...		২৭
৭।	সংবাদিকা	...		২৯
৮।	আমাদের কথা	...		৩০

অগ্রহায়ণ

সম্পাদক—শ্রীতারকনাথ হাজরা।

সূচী

১।	[illegible]রবতা (কবিতা)	কুমারী সুলেখা হালদার	১
২।	প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যে গদ্যের স্থান	শ্রীসমর পাল	২
৩।	ফিরে পাওয়া (গল্প)	শ্রীপ্রমোদকুমার পাল, কাব্যবিনোদ	৫
৪।	রাজগৃহের পথে (ভ্রমণকাহিনী)	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ	১৮
৫।	"দীপ শিখ" (কবিতা)	শ্রীরমেন্দ্রনাথ ঘোষ	২৫
৬।	বিশ্ব-প্রবাহ		২৭
৭।	সংবাদিকা		২৯
৮।	আমাদের কথা		৩০

৭ম বর্ষ] অগ্রহায়ণ, ১৩৪২ [১ম সংখ্যা

নীরবতা

[কুমারী সুলেখা হালদার]

হে প্রিয়তম ! তোমার দানে কথাটি নাহি কব,
যতই কেন দাওনা ব্যথা বেদন নব নব।
ঝঞ্ঝা ঝড়ের আক্রমণে,
চাইবো কেবল তোমার পানে ;
তোমার হাতের ব্যথার বোঝা
মাথায় পাতি লব,
হে প্রিয়তম ! তোমার দানে
কথাটি নাহি কব।

পুষ্প-হারে সাধ মিটেছে, চাইনা তাহা আর --
কণ্ঠ মাঝে কাঁটার পরশ পাই যে বারে বার ;
আমার মনের গহন তলে—
ব্যথার মাণিক উঠুক জ্বলে ;
তারই উজল আলোক ধারায়
পথ দেখিয়া লব ;
হে প্রিয়তম ! তোমার দানে
কথাটি নাহি কব।

প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যে গদ্যের স্থান

[শ্রীসমর পাল]

বাঙ্গলা ভাষা এখন এরূপ উন্নতিশীল যে, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ভাষাসমূহের মধ্যে ইহাকে অন্যতম বলিয়া গণ্য করা হয়।

যে কোন ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস পাঠ করিতে গেলেই আমরা দেখিতে পাই,—প্রথমতঃ গদ্যের এবং তৎপরে পদ্যের উৎপত্তি। আমাদের বঙ্গভাষার ক্ষেত্রেও এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। বাঙ্গলা গদ্য বাঙ্গলা পদ্যের অনেক পরে সৃষ্ট হইলেও, একেবারে নূতন নহে,—বহু প্রাচীন।

সঙ্গীতই মানবকণ্ঠের আদি ভাষা। সাহিত্য সৃষ্টি হইবার বহু পূর্ব্বেও সঙ্গীত জন্মলাভ করে। সমালোচক শশাঙ্কমোহনের ভাষায় বলিতে গেলে—"সরস্বতী মনুষ্যত্বের আদি দেবতা, সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার কয়েকটা নামের মধ্যের মনুষ্যের অতীত ইতিবৃত্ত-পথে এই দেবতার ক্রম-বিকাশ-পদ্ধতি সূচিত হইতেছে। গির্-বাক্-বাণী-বীণাপাণি। বাক্‌প্রকাশের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থার নাম গির্। বাক্যের রস ঋক্ এবং ঋকের রস উদ্‌গীথ। ইতরপ্রাণী জগৎ এখনও এই অবস্থার আছে, মনুষ্যও ছিল। ক্রমে বর্ণাত্মিকা বাগ্‌দেবী প্রকটিত হইয়া, মানুষের জ্ঞান, ভাব এবং ঈষার প্রবৃত্তিকে গর্ভে ধারণ করিয়া বাণীরূপে মানব-সভ্যতার আদি ধাত্রীরূপে দাঁড়াইয়াছিলেন। উহার পর হইতেই সঙ্গীত এবং কাব্য আত্মজাগরণ লাভ করিয়া আপন আপন বিশিষ্ট ধারায় ছুটিয়া গিয়াছে।"

বাঙ্গলা ভাষার সাহিত্য শুধু বাঙ্গলা দেশের কেন, সমগ্র ভারতবর্ষের একটী মূল্যবান সম্পদ্; জগতে নবীন ভারতের একটী শ্রেষ্ঠ দান। আমাদের এই বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যের অনুরাগী কোন এক ইংরেজ অধ্যাপক লিখিয়াছেন যে, সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে দুইটী মাত্র ভাষায় প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য মিলে; সে দুইটী ভাষা হইতেছে—ইংরাজী ও বাঙ্গলা। বাঙ্গলা সাহিত্যের এই যে গৌরব, তাহা মুখ্যতঃ তাহার নবীন সাহিত্য।

সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে, মানুষ কেবল ৪০০০ হাজার বৎসর কাল পদ্যের সাধনা করিয়াছে আর গদ্যের সাধনা করিয়াছে মাত্র ৫০০ শত বৎসর। প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যে গদ্যের কোন স্থান ছিল না বলিলেই হয়। সুনীতিবাবুর ভাষায় বলিতে গেলে, "প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যে আরও দুইটী বিষয় লক্ষ্য করিবার—প্রথম, গদ্য সাহিত্যের অভাব; এবং

দ্বিতীয়, সাহিত্যে অল্প কয়েকটী বিষয় লইয়াই কারবার। চিঠি-পত্র, দলিল-দস্তাবেজ ভিন্ন অন্যত্র গদ্যের ব্যবহার নাই বলিলেই হয়।........সমস্ত সাহিত্যটাই পদ্যে লেখা,........কাব্য ও গান ছাড়া, জীবন-চরিত, বংশাবলী, ভ্রমন-বৃত্তান্ত, দর্শন, চিকিৎসা—যাহা কিছুর উপর বই লেখা হইয়াছে, সবই পদ্যে।" তখনকার সাহিত্য ছিল কাব্যমূলক এবং তাহাও ছিল আবার সঙ্গীতমূলক, অর্থাৎ এখনকার মত সেকালে কাব্য পড়া হইত না—গাওয়া হইত।

নবম কি দশম শতাব্দীতে রমাই পণ্ডিত "শূন্যপুরাণ" লেখেন। কেহ কেহ বলেন সকল দিক দিয়া বিচার করিলে, "শূন্যপুরাণ" সপ্তদশ শতকে লিখিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। ইহার গদ্যাংশ ছড়া মাত্র,—ইহাকে গদ্য বলিলে ভুল করা হইবে। প্রাচীনতম গদ্যের একটু নমুনা এই শূন্যপুরাণে পাওয়া যায়। যথা:—"পচ্চিম দুআরে কে পণ্ডিত। সেতাই যে চারি সঅ গতি আনি লেখ্যা॥ চন্দ্র কোটাল যে বসুআ ঘটদাসী। দূত নাহি ডরাই তোম্মাক দেখিআ। চিত্রগুপ্ত পাঁজি পরিমান কর এ দূত জমের বিদ্যমানে॥" তাহার পর "দেবডামর" তন্ত্রের একটু নমুনা:—"গোঁসাই চালা সহস্র কামিনী চোমা, চাঁড়াল পাই মুই আকাটন বিষ হাতে এ গুয়া পান খাইয়া।" ভাষা দুর্ব্বোধ্য। তাহার পর রূপগোস্বামীর "কারিকা" ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের "রাগময়ী কণা" প্রভৃতি অসংখ্য সহজিয়া গ্রন্থে গদ্যের নমুনা মেলে।

তাহার পর ষোড়শ শতকের শেষ ভাগে পোর্টুগিজ পাদরীগণ বাঙ্গলা দেশে আসেন। ইহারা ভাল করিয়া বাঙ্গলা শিখিয়া খৃষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রন্থগুলি বাঙ্গলা ভাষায় রচনা বা অনুবাদ করিতে আরম্ভ করেন।

ভূষণার রাজপুত্র 'দোম আন্তোনিয়' প্রণীত "প্রশ্নত্তর মালা" বাঙ্গলা গদ্য সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন বলা যাইতে পারে। এই বইখানি এক খৃষ্টান পাদরী ও ব্রাহ্মণের মধ্যে স্ব স্ব ধর্ম্মের বিচার করিয়া রচিত (১৬৬৩ খ্রীঃ আঃ মগেরা ভূষণার রাজকুমারকে আরাকাণে বন্দী করিয়া লইয়া যায় এবং এক পাদরী টাকা দিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া 'রোম্যান ক্যাথলিক' ধর্ম্মে দিক্ষিত করেন।)

"কৃপার শাস্ত্রের অর্থবেদ" (Creaper Xastrar Orthbhed) পোর্টুগিজ প্রভাবান্বিত খৃষ্টানী বাঙ্গলার আর একখানি পুস্তক। ইহা বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত গদ্যময় প্রাচীনতম মুদ্রিত পুস্তক—রচয়িতা পাদরী 'মানুএলদা আসুঁম্পসাও' (Mannuelda Assumpesao)। বইটী ১৭৩৪ খ্রীঃ আঃ রচিত হইয়া লিসবন সহর হইতে ১৭৪৩ সালে রোম্যান অক্ষরে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। আসুঁম্পসাও ঢাকা অঞ্চলে থাকিতেন; সুতরাং ঐ অঞ্চলের ভাষার ছাপ যথেষ্ট আছে। ইহার গদ্য মন্দ নহে।

১৭০০ খ্রীঃ আঃ লিখিত "জ্ঞানাদি সাধনা" নামক গ্রন্থে তখনকার দিনের গদ্যের একটু নমুনা পাই। যথা :—"অতএব অজ্ঞানী জনেহ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে জ্ঞান করিতে পারে না এখন তুমি সত্য করিয়া কহ তুমার ঠাঞি শ্রীকৃষ্ণ সত্য কি মিথ্যা অজ্ঞানী জীবে কহেন আমি অজ্ঞানী কখন ঐ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের মুখের শব্দ আমার কর্ণে শুনি নাই এবং আমার চর্ম্মেতেহ তাঁহার স্পর্শ পাই নাই এবং আমার চক্ষেতেহ তাঁহার শরীরে রূপ দেখি নাই......।"

অষ্টাদশ শতকের লেখা গল্প বা রূপকথায় সেই সময়ের বাঙ্গলার কথ্য ভাষা মূলক একটী অবিকৃত রূপ পাওয়া যায়। অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'ব্রিটিশ মিউজিয়াম'এ বাঙ্গলা কাগজ পত্র ঘাঁটিয়া ইহা বাহির করেন।

অতএব আমরা দেখিতে পাই যে প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যে গদ্যের স্থান ছিল অতি অল্প পরিসর।

পোর্টুগিজগণের পরে ইংরেজ মিশনারীগণের প্রচেষ্টা আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে একটী কল্যাণকর ঘটনা। কেরী, মার্শম্যান, ওয়ার্ড প্রভৃতির আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে শ্রীরামপুর মিশনের প্রতিষ্ঠা। বাঙ্গলা ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করিয়া প্রচার করিবার ইচ্ছায় তিনি পরম আগ্রহে বঙ্গভাষা অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন। কেরীর বাইবেলের অনুবাদ ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন হইতে প্রকাশিত হয়। জন ক্লার্ক মার্শম্যান বঙ্গভাষায় সবিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত বাঙ্গালা গ্রন্থরাজি—(১) ভারতের ইতিহাস, (২) বাঙ্গলার ইতিহাস, (৩) পুরাবৃত্তের সংক্ষেপ বিবরণ, (৪) দেওয়ানী আইনের গ্রন্থ, প্রভৃতি শ্রীরামপুর মিশন হইতে প্রকাশিত হয়। এই সকল গ্রন্থরাজি তাঁহার বাঙ্গলা ভাষায় পাণ্ডিত্যের বিজয়কেতন।

মিশনারীগণের এই প্রচেষ্টা আমাদের বাঙ্গলা-গদ্যকে যথেষ্ট অগ্রগামী করিয়া তুলিয়াছে। ইংরাজদের এদেশের আগমনের সঙ্গে আমাদের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং পারিবারিক জীবনে এক নব চিন্তার ধারা প্রবাহিত হইয়াছে। নব নব আদর্শ, আকাঙ্ক্ষা ও উন্নতির ফলে সমগ্র জাতির অভ্যুথান আরম্ভ করিয়াছে। সাহিত্যে এই নব চিন্তাধারার ফলে আমাদের গদ্য-সাহিত্যের অপূর্ব্ব শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে। তাই দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁর বইএর এক স্থানে লিখিয়াছেন,—"বাঙ্গালী এখন বাঙ্গলা ভাষাকে মান্য করিতে শিখিতেছে, ইহা ভাবী শুভ যুগের পূর্ব্বলক্ষণ।" বিগত শতাব্দীতে বাঙ্গলা গদ্য যে কিরূপ বিকাশ লাভ করিয়াছিল পর প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করিব।

ফিরে পাওয়া

[শ্রীপ্রমোদকুমার পাল, কাব্যবিনোদ]

সমানভাবে যুঝেও অনিল তার ছোট সংসারখানিকে দুঃখের আক্রমণ থেকে রক্ষা কর্‌তে পার্‌ছিল না। একেত' ক্ষত বিক্ষত হলই—তার ওপর কয়দিনের কঠোর পরিশ্রমে তার দেহ ভেঙ্গে পড়ল। পনর টাকার চাক্‌রী বজায় রাখ্‌তে সে চারক্রোশ পথ ক্রমান্বয়ে হাঁটাহাঁটি ক'রে একদিন সন্ধ্যায় বাড়ী ফির্‌ল যখন,—তখন তার ১০২ ডিগ্রি জ্বর। বাড়ী এসেই অনিল বেহুঁসভাবে শয্যায় আশ্রয় নিলে। স্ত্রী শান্তিলতা স্বামীর এই অবস্থায় ভয়-ব্যাকুল-চিত্তে ব্যস্ত হ'য়ে স্বামীর গায়ে হাত দিয়েই চম্‌কে উঠল; ভাবলে—এ আবার কি বিপদ দিলে ঠাকুর!

হায়, সে ত' জানে না—কত সামান্য উপার্জ্জনের আশায়, কত কঠোর পরিশ্রমে—অনিল তার জীবনকে তুচ্ছ ক'রে বিপন্ন কর্‌তে বসেছে! সে ত' জানে না—এই দুঃখের আক্রমণে তার স্বামী কত বিপর্য্যস্ত হয়ে পড়েছে! সে ত' জানে না—তার মুখে একটু আনন্দের হাসি দেখ্‌বার জন্য অনিল গোপনে কত বিপদকে আলিঙ্গন করেছে! সে জানে এই মাত্র, কষ্টে দুঃখে তাদের দিন যায়; কিন্তু তবুও সে সুখী, তবুও তার প্রাণ থেকে শান্তি একেবারে মুছে যেতে পারেনি। সে যখন সমস্ত দিনের উত্তপ্ত শ্রম-কাতর স্বামীর মুখে একমুঠা অন্ন দিয়ে সুস্থ ক'রে তাঁর সেবায় আপনাকে উৎসর্গ করে, তখন তার সমস্ত দৈন্য, সমস্ত দুঃখ-অশান্তি এক নিমিষের মধ্যে কোথায় অন্তর্হিত হয়। তারপর যখন সে শয্যালগ্ন শ্রান্ত স্বামীর দেহে ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দেয় তখন তার মনে হয়, জগতের সমস্ত সুখ-শান্তি-তৃপ্তি এইখানে এক মুহূর্ত্তের মধ্যে নেমে এসেছে! এম্‌নি ভাবে যদি সে আমরণ কাটাতে পারে তা হ'লে সে সহস্র দীনতাকে অবহেলায় হাস্‌তে হাস্‌তে বরণ করে নিতে কুণ্ঠিত হবে না। শান্তিলতা জান্‌ত—রাজরাণী হ'য়ে যদি স্বামীর ভালবাসায় বঞ্চিত থাকা যায়—তা হ'লে সে নারী-জীবনের সার্থকতা কোথায়? সে জীবনের কোন মূল্য নাই। কিন্তু যদি দীনা ভিখারিণী হয়ে স্বামী-প্রেমের শান্ত-স্নিগ্ধ ছায়ায় থাক্‌তে পারার সৌভাগ্য নারী-জীবনে ঘটে—সে সৌভাগ্য বুঝি সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ-কাম্য!

অনিলও মনোমত পত্নী লাভ করে আপনাকে ধন্য জ্ঞান করেছিল। সেও শান্তিকে ভালবাস্‌ত, এবং পত্নীর ওপর স্বামীর যে পালনীয় কর্ত্তব্যগুলি ধারাবদ্ধ আছে অনিল পারতপক্ষে সেগুলি পালন ক'রে চলত'। কিন্তু যখন দুঃখের মলিন-ছায়া শান্তির কমনীয় সুন্দর মুখখানিকে

মলিন করে তুলত'—অনিল তখন সংসার অন্ধকার দেখত'। ভাবত',—এই ঘৃণ্য জীবনটা টুকরো টুকরো ক'রে ফেলা উচিত। এম্‌নি সে হতভাগ্য যে, জগতে এসে একটা মাত্র জীবনের ভার বহন করতে পারে না। অকাতর পরিশ্রমে প্রাণপাত করেও সে শান্তিকে আপনাদের মধ্যে চির-প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না। ঈশ্বরকে ধিক্কার দেয়—কপালে করাঘাত করে—অভাবের তাড়নায় মুহূর্ত্তে বাস্তব-জ্ঞান হারিয়ে ফেলে।

* * * *

সকল বিষয়ে সকল দিক দিয়ে সমস্ত অভাব থাক্‌লেও আশার অভাব মানুষের হয় না। প্রত্যেক বিষয়ে নিষ্ফল হয়ে কোন দিকে কোন উপায় না পেয়ে মানুষ যখন মুষ্‌ড়ে দুম্‌ড়ে জগতের চোখে নিজেকে লুকোতে চায় আশাই তখন তাকে সান্ত্বনা দিয়ে সতেজ করে তোলে! আলেয়ার আলোর মত আশাই তখন সব-হারা মানুষকে ক্ষীণ আলোকে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায়। যতদিন না মানুষ একেবারে আশাহত হয়, ততদিন সে যে কোন প্রকারেই হ'ক নিজেকে টেনে তুলে সোজা করে দাঁড় করাবার চেষ্টা করে। যদিও অক্ষম হয়, তবু মোহিনী আশা তাকে সাহায্য করে। অনিলও এই মোহিনী আশার কুহক থেকে নিস্তার পায় নাই। তাই সে নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে কঠোর শ্রম-ব্রত গ্রহণ করেছিল; কিন্তু সে বেশীদিন তা' সহ্য করতে পারলে না, - আলেয়ার আলোর মত পথের বিভ্রমতা অর্থাৎ আশা যে কুহক-জাল বিস্তার করে মরীচিকার সৃষ্টি করেছে তা' সে বুঝতে পারলে। দেহ তার ভেঙ্গে পড়ল'—দু'চার দিনের মত কিছু সঞ্চয় করে অনিল শয্যা গ্রহণ কর্‌লে।

(২)

মুমূর্ষু স্বামীর কাছে বসে শান্তি আকাশ পাতাল ভাব্‌ছিল। চারদিন যে কি ভাবে কেটেছে ভাব্‌তে গেলে জ্ঞান হারিয়ে ফেল্‌তে হয়। যা কিছু সম্বল ছিল সমস্তই শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু উপায় কিছুই হ'ল না। অনিলের রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধির দিকেই চলেছে। কি হবে,—কেমন করে এই বিপদ থেকে মুক্তি পাবে! হে ঠাকুর! এত পরীক্ষাতেও তোমার মনঃপূত হ'ল না? শেষে এমন পরীক্ষায় ফেল্‌লে দয়াময়—উত্তীর্ণ হবার কোন উপায় দেখ্‌ছি না। কেমন ক'রে নারীর শেষ-সম্বলটুকু রক্ষা পাবে ঠাকুর! এখনই যদি রুগ্ন স্বামী জেগে উঠে কিছু খেতে চান—কি দেবে সে। না-না—তার আগে তার একটা কিছু হ'ক .. ! আর সে সহ্য কর্‌তে পারে না। এমন রোগ—তার কোন প্রতিকার নেই—পথ্য নেই কি করে স্বামী আমার রক্ষা পাবেন? উঃ,—অসহ্য জ্বালা! কি নির্ম্মম বিধান তোমার ঠাকুর........! শান্তি ডুক্‌রে কেঁদে উঠল।

এ কয় দিন অনিল দু'একটী ছাড়া বেশী কথা বলে নাই। আজও তেমনি ক্ষীণ স্বরে কি বল্‌তে চাইল। শান্তি তাড়াতাড়ি মুখ চোখ মুছে স্বামীর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ল। অনিল একবার মাত্র চেয়েই চোখ বুজে ফেল্‌লে—তার দু'চোখের দু'কোণ বেয়ে দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। শান্তি সযত্নে আঁচল দিয়ে স্বামীর চোখ মুছে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে,—কেমন আছ এখন? অনিল অতি কষ্টে একটী নিশ্বাস ফেলে আস্তে আস্তে বল্‌লে,—যেমনই থাকি শান্তি তাতে দুঃখ নেই; ভাবছি যদি না বাঁচি—শান্তি তাড়াতাড়ি স্বামীর মুখে হাত চাপা দিয়ে কাতরভাবে বল্‌লে,—ওগো না—না—অমন কথা ব'ল না। আমার যে আর কেউ নেই . ..... !

অনিল হতাশভাবে বল্‌লে,—সব গেল শান্তি, সব গেল। যদি কোন গতিকে বেঁচে উঠি......তা হ'লে না খেতে পেয়ে মরব। এবারে একা নয়—তোমায় শুদ্ধ মরতে হবে। তার চেয়ে এই রোগে যদি তোমার কোলে মাথা রেখে—তোমার ঐ সুন্দর মুখখানি দেখ্‌তে দেখ্‌তে মরি .... তাতে বড় শান্তি! আমি অতি পাষণ্ড—অতি কাপুরুষ। সংসারে এসে শুধু আবর্জ্জনার স্বরূপ রয়ে গেলাম। জ্ঞানের কোন্ স্মৃতির বাইরে বাবাকে হারিয়েছিলাম .....জন্মদুঃখিনী মা আমার কত কষ্টে মানুষ করে—বুঝি স্বর্গ ওলট্ পালট্ করে স্বর্গের দেবী—তোমাকে আমার জীবন-সঙ্গিনী করে দিয়ে দু'দিনের আনন্দ নিয়ে আমাকে অনাথ করে চলে গেলেন। তারপর জানত' জ্ঞাতি-শত্রুর অত্যাচারে কি ভাবে আমরা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি। কত সহ্য হয় শান্তি! আর যে পারি না... ! তারপর .....একটু জল দাও শান্তি, বড় তেষ্টা!......

শান্তি একটু জল স্বামীর মুখে দিয়ে বল্‌লে,—এত কথা কেন বলছ?

—না—আমায় কথা বল্‌তে দাও। এই বুকখানার ভেতর কি যে হচ্ছে কিছু বুঝতে পার্‌ছি না। একটু কথা বল্‌লে বুঝি ভালই থাকি। হ্যাঁ, তারপর .....কত অভাব ভোগ ক'রে যেখানে চাক্‌রী হল সেখানের কর্ত্তা আমার সহপাঠী ছিল। কতদিন তার পড়ার ভুলের জন্য নিজের হাতে শাসন করেছি......! আর আজ কালের কুটীল চক্রে সে আমায় দেখে—আমার সমস্ত পরিচয় জেনেও অক্লেশে অস্বীকার করলে ...বোধ হয়, পূর্ব্ব-প্রতিশোধ নিলে। যাক্, তারজন্য তত দুঃখ হয় না, কর্ম্মফলই মানুষের চালক। শুধু এই দুঃখ হয়,—এমন পিশাচ সে,—তার লোহার কারখানায় আমার কাজ দিলে। মাইনে কত জান? পনর টাকা! তার ওপর কড়া হুকুম—একদিন কামাই হ'লে জবাব দেবে। তাই ভাব্‌ছি শান্তি, যদি বেঁচে উঠি খাব কি? তোমাকেই বা খাওয়াব কি? চাক্‌রী ত' আমার নেই—নেই—! অনিল ছেলে মানুষের মত 'হাউ হাউ' করে কেঁদে উঠল। শান্তি স্বামীর অবস্থা দেখে চুপ করে সহ্য করতে পারল না,—সে

আর যে শুনতে পারি না। তুমি ভাল হয়ে ওঠ। আমাদের কেউ না থাকুক ভগবান আছেন, তিনি দেখবেন।

অনিল মাথা নেড়ে অবিশ্বাসের সুরে বল্‌লে,—ভুল—ভুল শান্তি, ভগবান নেই। যদি থাক্‌তেন তবে তোমার এই সুন্দর মুখখানিকে কি এমন দুঃখ মলিন করে রাখ্‌তে পার্‌তেন।

অনেকক্ষণ অনেক কথা বলে অনিল হাঁপাতে লাগল। এবং আপনার রোগশীর্ণ ডান হাতখানি শান্তির মাথায় তুলে দিয়ে একটু জোর করে বুকের ওপর চেপে ধরলে। শান্তিও দু'হাতে অনিলকে আঁক্‌ড়ে ধরে, ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

(৩)

সেই দিন সন্ধ্যার কিছু আগে অনিলের রোগের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে বিকার আরম্ভ হল। সে অসংলগ্ন ভাবে প্রলাপ ব'কে শান্তিকে আত্মহারা করে তুল্‌লে। শান্তি মাঝে মাঝে স্বামীর মুখের ওপর ঝুঁকে কত অনুনয় স্বরে বল্‌তে লা'গল—ওগো, একটু চুপ কর,—আমার যে বড় ভয় করে। সে অনুনয়ের অভিযোগ অনিলের বোধের বাইরে। শান্তি তারস্বরে কাঁদতে লাগল। এমন সময়ে বাইরে কে ডাকলে,—অনিলবাবু আছেন? শান্তি যেন অকূল পাথারে কূল পেলে। তবে কি—তবে কি ঠাকুর তার কান্না শুনেছেন! সে তাড়াতাড়ি স্বামীর শয্যা ছেড়ে ঘরের দরজা ফাঁক ক'রে দেখলে দু'টী ভদ্রলোক তাদের ঘরের দরজা লক্ষ্য করে দাঁড়িয়ে আছেন। শান্তি লোক দু'টীকে সম্পূর্ণ অপরিচিত দেখলে,—সে দরজাটা একটু বেশী খুলে দিয়ে পাশে সরে দাঁড়াল। একটী ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন,—অনিলবাবু বাড়ীতে নেই বোধ হয়! শান্তি একটু ইতস্ততঃ করে আস্তে আস্তে বললে,—আছেন, তবে তাঁর বড় অসুখ। আজ চারদিন তিনি উত্থানশক্তি-রহিত হয়ে বিছানায় পড়ে আছেন। আজ দিনের বেলায় একটু ভাল ছিলেন; কিন্তু হঠাৎ খানিকক্ষণ বিকার আরম্ভ হয়ে বড় ভুল বক্‌ছেন। ভদ্রলোকটী সহানুভূতির স্বরে বললেন—আহা তাঁর এমন অসুখ আমাদের একবার জানাতে পারতেন। আপনি বোধ হয় তাঁর স্ত্রী?

শান্তি কোন উত্তর দিলে না। ভদ্রলোক বলতে লাগলেন,—দেখুন, আপনার স্বামী যাঁর কাছে চাকরী করেন, তিনিও এসেছেন। অনিলবাবুর কামাই হওয়ায় তাঁর কাজ-কর্ম্মের বড় ক্ষতি হচ্ছে; কাজেই আমরা এই পথ দিয়ে একটা কাজে যাচ্ছিলাম, মনে করলাম—একবার খবরটা নিয়ে দেখি। তা তিনি ত'—

শান্তি ভদ্রলোকের কথায় বাধা দিয়ে তিক্তস্বরে জবাব দিলে,—আপনাদের বাবুর কাজ-কর্ম্মের ক্ষতি হওয়ায় না হয় কিছু কম টাকা উপায় হল, কিন্তু আমার যে কি মহা ক্ষতি হতে

বসেছে—তাকি আপনারা ভাবছেন ? যদি ভাবতেন, তবে আমার কথা শুনে আপনারা কাজ-কর্ম্মের ক্ষতির কথা তুলতেন না। এতগুলি কথা বলে শান্তি কেমন লজ্জা বোধ করতে লাগল, সে খোলা দরজাটা একটু ঠেলে বন্ধ করলে। দ্বিতীয় ভদ্রলোকটী একটু মিষ্ট-ভৎর্সনার সুরে বল্‌লেন,—ছিঃ বিপিন, অনিলবাবুর অসুখে উনি কি রকম বিব্রত হ'য়ে পড়েছেন, এ-সময় কি কাজ-কর্ম্মের কথা বলে চলে ? তারপর ভদ্রলোকটী শান্তিকে উদ্দেশ ক'রে দরজার দিকে চেয়ে বল্‌লেন, —আপনি কিছু মনে করবেন না ; ও ঐরকম কর্ম্ম পাগল লোক। কাজ-কর্ম্মের গোলমাল ঘট্‌লে ওর জ্ঞান থাকে না। যাক্, আপনি আপনার স্বামীর সম্বন্ধে কি করবেন ভাবছেন ? শান্তি এই ভদ্রলোকটীর ভদ্র ব্যবহারে অত্যন্ত আশ্চর্য্য হল। সে ভাবতে লাগল,—স্বামী এঁর এত নিন্দা অখ্যাতি করেছেন, কিন্তু ইনি ত' খুব ভদ্র দেখছি। কথা-বার্ত্তাগুলি বড় সুন্দর। ওঁকে আমার বিপদের কথা জানালে নিশ্চয় কোন উপায় হ'তে পারে। সে স্থান-কাল-পাত্র কোন বিবেচনা না করে কেঁদে ফেললে ; বল্‌তে লাগল,—কি আর ভাবব বলুন। তাঁকে যে আবার সুস্থ শরীরে দেখব, এ আশা আমার নেই। এমন কোন উপায় নেই যে, এখনই যদি তিনি কিছু খেতে চান দিতে পারব। আপনার কাছে যা' সামান্য কিছু পেয়েছিলেন সমস্তই খরচ হয়ে গেছে। তাঁর কাছে শুনেছি আপনি নাকি তাঁর ছেলেবেলার বন্ধু, যদি দয়া করে এই বিপদে বন্ধুর মুখ চেয়ে কিছু সাহায্য করেন তবে আমার স্বামী রক্ষা পান। বিপদে সাহায্য করাই উপযুক্ত বন্ধুর লক্ষণ। যদিও আপনার এই দয়ার ঋণ শোধ দেবার নয় তবুও বলছি, স্বামী আমার সুস্থ হয়ে উঠে আপনার যা পাওনা হবে খেটে শোধ দেবেন।

ভদ্রলোকটী একমুখ হেসে বললেন,—সাহায্য করে ত' আর শোধ নেওয়া যায় না,—কখনও এ কাজ করিনি। তবে 'ধার' বলে দিয়ে শোধ নিতে রাজী আছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, উপস্থিত আমাদের কাছে কিছুই নেই। অবশ্য আপনি যদি কিছু মনে না করেন ত' বলি, আপনি যদি আমাদের সঙ্গে আমার বাড়ীতে যেতে পারেন, তবে আপনার বিপদের উপযুক্ত সাহায্য করতে পারি। এটা ঠিক যে, আপনাকে একলা ছেড়ে দেব না।

শান্তি মনে মনে শিউরে উঠল ;—তার মনের শিহরণ সমস্ত দেহে ব্যাপ্ত হয়ে কম্পন আরম্ভ হল। সে কাঁপতে কাঁপতে ঘরের মেঝের ওপর বসে পড়ল। স্বামী যে ভাবে তাঁর বন্ধুটীর চরিত্র তার কাছে অঙ্কিত করে রেখেছেন, তাতে তাঁর বন্ধুটী কত বড় ভয়ঙ্কর লোক তা' ধারণার অতীত। উপরন্তু এই রাত্রিতে রুগ্ন স্বামীকে একাকী ফেলে কোন্ স্ত্রী ঘরের বার হতে পারে ? না—না, তা' হতে পারে না। নিশ্চয় কোন দুরভিসন্ধি ওদের মনে আছে, তা না হ'লে আমার ফেরবার সময়ে যদি লোক আসে ওরা ফিরে গিয়ে ত' অক্লেশে সেই লোকের হাতে সাহায্য পাঠাতে পারে !

নিশ্চয়ই শয়তানী মতলব ওদের মধ্যে আশ্রয় করেছে। শান্তি মুহূর্ত্তে কঠোর হয়ে উঠল। ঠাকুর, তোমার এই সুন্দর পৃথিবীর মধ্যে এমন জঘন্য মানবীয় প্রবৃত্তি দিয়েছিলে কেন? তোমার সকল সুন্দরের মধ্যে এই অসুন্দর বৃত্তি কেমন করে শোভা পায় দয়াময়! সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বল্‌লে,—দেখুন, আমার যাওয়া কোন মতে সম্ভব নয়। একে ত' রাত্রি; তার ওপর রুগ্ন স্বামীকে ফেলে কোনও স্ত্রীলোক কি এ ভাবে ঘরের বাইরে যেতে পারে? তা ছাড়া শুনেছি 'অনেক পথ; এই রাত্রিতে ফের্‌বার সময় একজন অপরিচিত লোক সঙ্গে থাক্‌বে,—না—না তা কখনই সম্ভব নয়। আপনাদের বিবেচনায়, আপনাদের মনুষ্যত্বের দিক দিয়ে যা' ভাল বুঝ্‌বেন কর্‌বেন।

ভদ্রলোক বললেন,—আচ্ছা, আচ্ছা আপনি ভাব্‌বেন না। আমি এখনই গিয়ে লোক দিয়ে আপনাকে যথাসাধ্য সাহায্য পাঠাব। চলহে বিপিনচন্দ্র, রাত্রি অনেক হ'ল। শান্তি আনন্দে কাঁদ কাঁদ সুরে বললে,—ভগবান আপনার মঙ্গল করুন। আপনার পয়সা যেন এম্‌নি ভাবে দীন-দরিদ্রের উপকারে ব্যয় হয়। যদি এতটা অনুগ্রহ করবেন, তবে দয়া করে আপনার লোকের সঙ্গে একজন ডাক্তারও পাঠাবেন। যদিও স্বামী আমার এখন একটু সুস্থ বোধ ক'রে ঘুমোচ্ছেন তবুও আজ রাত্রিতে একবার ডাক্তার দেখ্‌লে ভাল হয়। আমার এই অনুরোধ আপনার ভগ্নির অনুরোধ বলেই জানবেন।

ভদ্রলোকটী ব্যস্তভাবে বললেন,—থাক্—থাক্ বেশী কিছু বল্‌তে হবে না। আমি ডাক্তার, পথ্য সমস্তই পাঠাব।

কৃতজ্ঞতায় শান্তির প্রাণ ভরে উঠল। সে বল্‌লে,—আপনাকে কি ব'লে কৃতজ্ঞতা জানাব! ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি আপনার মঙ্গল হ'ক।

(৪)

—দেখ বিপিন, চিঠিখানা যেন বেশ মোলায়েম হয়।

—ওহে ভায়া, এ সমস্ত আমায় কিছু শেখাতে হবে না। আমি এমন ভাবে কলমের মুখে বসন্তের হাওয়া বহাব, সত্যকারের তার চেয়ে কম মধুর বলে বোধ হবে। তবে ভাই, কাজে কতদুর হবে বল্‌তে পারি না; কারণ, যে রকম সংস্কার-বদ্ধ তাতে যে সহজে টোপ্ গিল্‌বে এমন ত' আশা করা যায় না। তবে 'উদ্যোগিন পুরুষ-সিংহ' সংস্কৃত বাক্যের ওপর নির্ভর ক'রে প্রেম-সে লেগে পড়া যাক্।

—কি বলছ হে, জগতে পয়সায় কি না হয়। যত টাকা খরচ হয় দ্বিধা বোধ করব না; শান্তিকে আমার চাই। তার মত রত্ন-হার কি অনিল হতভাগার গলায় শোভা পায়?

—আচ্ছা, তুমি ত' ডাক্তার বদ্যি পাঠাচ্ছ। অনিল যদি ভালই হল, তবে তোমার কি উপায়!

—ভায়া, আমি কি এত কাঁচা ছেলে। ডাক্তারকে জানিয়ে দিয়েছি, দু'একদিন সাধারণ ভাবে দেখে শুনে পরে ওষুধের সঙ্গে কিছু আর্সেনিক দিয়ে Poison করে দেবে। তারপর দেখ্‌বে দু'চারদিনের মধ্যে টেঁসে যাবে।

—তাই নাকি! বাঃ, বাঃ—তোফা ভায়া। কিন্তু দেখ' যেন সব ফেঁসে না যায়।

—ফাঁসবে কি হে! ডাক্তারকে কত টাকার লোভ দেখিয়েছি জান? পাঁচশ'। কন্‌কনে পঞ্চাশখানা দশ টাকার নোট! আর যায় কোথা;—ধরা-ছোঁয়া নেই, মেহনৎ নেই, অম্‌নি অম্‌নি যদি এতগুলো টাকা পাওয়া যায় তবে কে না রাজী হবে? আমরাই ও-কাজ করতে পারতাম;—তবে একজন ডাক্তার হাতে থাকার অনেক সুবিধে।

—হ্যাঁ তা বটে, তবে লোকে না সন্দেহ করে।

—সন্দেহ কি? আইন বাঁচিয়ে কাজ করব। তারপর অনিলটা টেঁসে গেলে শান্তিকে এনে বাগান বাড়ীতে কড়া পাহারায় রেখে দেব। ত্রি-সীমানায় কারর যাবার হুকুম থাকবে না। সকলকে জানিয়ে দেব—অনিল আমার ছেলেবেলার বন্ধু ছিল, কাজেই তার অবর্ত্তমানে তার বিধবা স্ত্রীকে আশ্রয় দেওয়া আমার কর্ত্তব্য। লোকের ক্ষমতা কি আমায় সন্দেহ করে?

—দেখ ভাই, তোমার কপাল আর আমার হাত যশ। কিন্তু পরে যেন শ্রীঘর-শ্বশুরবাড়ী না হয়।

—না—না তোমার কোন ভয় নেই। তুমি চিঠি আরম্ভ কর।

—হ্যাঁ!

অনিলের ছেলেবেলার বন্ধু বর্ত্তমান মনিব সৌরেনের সঙ্গে তার সহকারী বিপিনের পরামর্শ চলছিল। অনিলের বিবাহের পরেই শান্তির অপরূপ রূপ-লাবণ্য দেখে সৌরেনের মনে এক জঘন্য বৃত্তি জেগে ওঠে। আজীবন সুখে পালিত ধনীর সন্তান সৌরেন আপনার চরিত্রকে সংযত করতে শেখে নি। তার ওপর এই পথের পথিক বিপিনকে সহকারী পেয়ে সে তার প্রবৃত্তিতে বিশেষরূপে ইন্ধনের সন্ধান পেলে। শান্তিকে করায়ত্ত করতে প্রাণপণ চেষ্টা করেও কিছু সুবিধা করতে পারে নি; কারণ অনিলের শক্তি দেশের মধ্যে বিশেষভাবে খ্যাত ছিল। তা' ছাড়া অনিলের এমন একটা চোখের উজ্জ্বল দৃষ্টি ছিল যে, কোন দুরভিসন্ধি নিয়ে তার সঙ্গে দু'পাঁচ মিনিট কথা বলবার শক্তি কারর কুলাত না; হয় প্রকাশ হয়ে পড়ত, না হয় বহু কষ্টে মনোভাব গোপন করে তার সামনে থেকে সরে যেতে হত। কাজেই

সৌরেনের 'মনোসাধ' অনিলের ভয়ে ভেকের মত 'বিবরগত' রাখতে হয়েছিল। এতদিন পরে সে সুযোগ উপস্থিত দেখে সৌরেনের পূর্ব্ব মনোভাব দ্বিগুণ উৎসাহে প্রবল ভাব ধারণ করলে। সেই জন্যই সে চির-শত্রু অনিলকে হাতের মধ্যে আনতে চাকরী দিয়েছিল এবং এমনভাবে এমন চাকরীতে অনিল অন্ন-সমস্যা সমাধান করলে যে, তার অবনতি ছাড়া উন্নতি হবার কোন আশা ছিল না; তাই কঠোর পরিশ্রমে অনিল রোগ শয্যায় পড়ে বন্ধুর উৎসাহ বৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করে দিলে। সৌরেন সেই জন্য উদারতার মুখোস পরে মহৎ হৃদয়ের পরিচয় দিয়ে শান্তির মন জয় করে বিজয় গৌরবে বাড়ী ফিরেছিল। জগতে আর একটা নরকের সৃষ্টি করতে পরম উৎসাহে আয়োজন সুরু হল।

– শোন হে, কেমন হ'ল।

—বল।

বিপিন চিঠিখানা পড়তে আরম্ভ করলে। চিঠিখানা আমরা এই স্থানে প্রকাশ করলাম না। পাঠক সহজেই অনুমান করে নেবেন সৌরেন আর বিপিনের প্রবৃত্তি অনুযায়ী চিঠিখানা লেখা হয়েছিল।

বিপিনের পড়া শেষ হতে সৌরেন বললে,—মন্দ হয়নি হে, তবে একেবারে আসাটাই ভাল ছিল বোধ হয়।

—তুমি বোঝ না ভায়া, এই দেশেই সীতা, সাবিত্রীর জন্মস্থান। তাঁদের কিছু লক্ষ্য বাঙ্গলার মেয়েদের ওপর আছে। সহজে কেউ নূরজাহান হবে না।

—ভাল, ভাল। তোমার জানতে কিছু বাকি নেই দেখছি। যাহোক কাজটা উদ্ধার হলে বুঝতে পারি, তবে আর দেরী কোর না। সব ব্যবস্থা করে পাঠিয়ে দাও, রাত্রি বেড়ে যাচ্ছে।

—ব্যবস্থা সবই আছে, কেবল গোবিন্দকে সমস্ত বুঝিয়ে ছেড়ে দেব। টাকা কড়ি দাও দেখি!

—ঠিক।

সৌরেন উঠে লোহার সিন্ধুক খুলে দু'খানা দশ টাকার নোট বার করে দিলে। বললে—এই টাকাতেই যথেষ্ট হবে, কি বল? খরচের যা কিছু সবই সঙ্গে যাচ্ছে, বেশী টাকার কি দরকার আর?

– না, না এইতেই যথেষ্ট হবে। টাকা দেবার কোন দরকার ছিল না, তবে নগদ টাকাটা বড় লোভের জিনিষ। কিছু ব্যবস্থা না থেকেও যদি নগদ কিছু হাতে থাকে তবু বুকটা তাজা থাকে, দেখলেও শান্তি পাওয়া যায়।

—যাক্ আর বেশী ব’ক না, দেরী হয়ে যাচ্ছে। আর গোন্দিকে বলে দিও যা করবে যা বলবে যেন বেশ সাবধানে চারদিক নজর রেখে।

—আচ্ছা। বিপিন চলে গেল। সৌরেন গুন্‌গুন্ করে গান ভাঁজতে ভাঁজতে দেওয়ালে টাঙ্গান বড় আয়নাখানার সামনে দাঁড়িয়ে একবার হেসে নিলে। তারপর একটা বীভৎস মুখভঙ্গি করে বল্লে—অনিল এত দিন পরে আমার সাধ পূর্ণ হতে চলেছে। চিরদিন তুমি আমার শত্রুতাচরণ করে এসেছ, আজ কড়ায় গণ্ডায় তোমার শত্রুতার প্রতিশোধ দেব। সংসার থেকে চির-বিদায় নিয়ে শান্তিকে আমার বুকে ফেলে তোমার চরম পরিণতি হবে। হাঃ হাঃ হাঃ—— !

(৫)

—শান্তি !

ক্ষীণস্বরে অনিল ডাক্‌লে। শান্তি স্বামীর মুখের কাছে নিজের মুখখানি নিয়ে জিজ্ঞাসা করলে,—কেন ? কি বলছ ?

—একটু জল দাও।

শান্তি অতি সন্তর্পণে চামচে করে অনিলের মুখে জল দিলে।

– আঃ বড় তেষ্টা পেয়েছিল শান্তি। ভগবান......না, না—নাই......নাই......! তুমি কিছু খেয়েছ শান্তি ?

শান্তি অনিলের চুলগুলির ভেতর আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললে,—এত রাত্রে আবার খাব কি ? আমার খাবার জন্যে তোমার এত ভাবতে হবে না।

—নাঃ, ভেবে আর করব কি শান্তি। রাত্রি কি অনেক ? আমি কি ঘুমুচ্ছিলাম ?

—হ্যাঁ, তুমি এতক্ষণ ঘুমুচ্ছিলে। সন্ধ্যের কিছু আগে থেকে তোমার শরীরটা একটু বেশী খারাপ হয়েছিল ; আমি বড় ভয় পেয়েছিলাম। তারপর কিছু পরে তোমার সেই মনিব বন্ধুটী এসেছিলেন।

অনিল যথাসাধ্য চোখ দু’টীকে বিস্ফারিত করে বল্‌লে,—কে—কে এসেছিল শান্তি...... ? আমার মনিব বন্ধু—সেই হতভাগাটা...... !

—হ্যাঁগো ; তুমি যতটা তাঁর নিন্দে কর ততটা নিন্দের লোক তাঁকে দেখলাম্ না। তোমার কামাই দেখে খবর নিতে এসেছিলেন। আমি তোমার অসুখের কথা সমস্ত বল্‌লাম তিনি ডাক্তার, পথ্য, ওষুধ সমস্ত দিয়ে এখনই একজন লোক পাঠাবেন বলে গেছেন। অনিল শান্তির কথাগুলি

বড় বেশী মন দিয়ে শুন্‌ছিল না বলে বোধ হল ; সে চোখ বুজে ছিল। একটা আকস্মিক বিপদ-পাতের সম্ভাবনায় তার সারা রুগ্ন মুখখানি ভয়ে ব্যাকুলতায় আড়ষ্ট হয়ে উঠেছিল। শান্তির কথা শেষ হতে সে শান্তির মুখের দিকে চেয়ে ভয়-জড়িত স্বরে বল্‌লে,—সর্ব্বনাশ করেছ শান্তি ... মহা সর্ব্বনাশ করেছ। সে কি বিনা স্বার্থে তোমার স্বামীর রোগ মুক্তির চেষ্টায় হাত দিয়েছে? তাকে যে আমি আজীবন জানি। সেই হতভাগা নিজের কাজ গুছাবার জন্যে জগতে এমন কোন কাজ নেই করতে পারে না। সে একটা লম্পট নরপশু......! একটা বিভীষিকার মত এসে সে আমাদের মাঝে দাঁড়াতে চায়......একটা সর্ব্বনাশ করতে চায়! বলেছি ত' শান্তি তার সঙ্গে আমার কখনও কোন বিষয় মনের মিল ছিল না, আর হবে না। কি ক'রব শুধু পেটের জ্বালায় অন্য কোন উপায় না পেয়ে তার দাসত্ব স্বীকার করেছি! জানি তার মুখদর্শন করলেও পাপ। জানি না শান্তি, তার এই আত্মীয়তা, তার এই দরদ, কি মূর্ত্তিতে পরিবর্ত্তন নিয়ে তোমার আমার মধ্যে একটা ব্যবধান এনে দেবে......ওঃ, এত দুঃখও মানুষের হয়...... !

শান্তি অনিলের কথাগুলি মন দিয়ে শুনে ভাবতে লাগল—মানুষ কি এমন ভাবে মানুষের সর্ব্বনাশ করতে পারে? মানুষের পিশাচ-প্রবৃত্তি কি সাধু-ব্যবহারে গোপন থাকে?

তাও কি সম্ভব! তাঁর যদি সে উদ্দেশ্য থাকত', তবে ত' তিনি অক্লেশে আমার ওপর অত্যাচার করতে পারতেন—রক্ষা করবার মধ্যে আমার স্বামী,—কিন্তু তিনি ত' উত্থান-শক্তি-রহিত হয়ে আছেন। তাঁর কু-উদ্দেশ্য সাধনের এর চেয়ে আর কি সুযোগ আছে!......না, না—যদিও মানুষ একদিন তার স্খলনের জন্যে অবনতির পথে নেমে যায় নিশ্চয় সময় বিশেষে তার পরিবর্ত্তন আসে। সমভাবে কোন কিছুর গতি জগতের নিয়ম নয়। মুহূর্ত্তে জগতের কত পরিবর্ত্তন হচ্ছে,—মানুষ ত' এই জগতেরই সৃষ্টি, কাজেই তারও পরিবর্ত্তন আসবে। এমন একটা অনুতাপের সময় আসে যখন মানুষ তার ভুল বুঝতে পেরে নিজেকে সংযত করবার চেষ্টা করে—

—শান্তি—শান্তি—পালিয়ে এস—পালিয়ে এস! ওই সেই পিশাচ আমার কাছ থেকে তোমায় ছিনিয়ে নেবার জন্যে দলবল নিয়ে আসছে।........

বিসদৃশ চিন্তার উত্তেজনায় অনিল প্রলাপ বক্‌তে সুরু করলে। সে বিকারের ঝোঁকে এক একবার বিছানার ওপর উঠে বস্‌তে চাইল,—শান্তি জোর করে তাকে নিরস্ত রাখবার চেষ্টা করে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ছিল। সঙ্গে সঙ্গে অনিলের দেহের উত্তাপ বেড়ে উঠল। স্বামীর এই আকস্মিক পরিবর্ত্তন দেখে শান্তি চীৎকার করে কেঁদে উঠল। বল্‌লে,—ঠাকুর, রক্ষা কর। বিনা চিকিৎসায়, বিনা পথ্যে স্বামী আমার মৃত্যুর দ্বারে দাঁড়িয়েছেন—আর আমি পাপীয়সী তাই স্থির নিশ্চিন্ত ভাবে দেখছি,—কোন প্রতিকার করতে পারছি না।

—বাড়ীতে কে আছেন গো ? কইগো কে আছেন ? সাড়া দেন না কেন ?

শান্তি তাড়াতাড়ি এসে দরজা খুলে দাঁড়াল। এক ঝলক চাঁদের আলো ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে শান্তিকে বিব্রত করে তুললে,—সে মাথার কাপড়টা একটু টেনে নামিয়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। আগন্তুক দাওয়াটার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলে,—মা, আপনি কি অনিলবাবুর স্ত্রী ? শান্তি বুঝলে স্বামীর মনিববাবুর বাড়ী থেকেই লোকটীর আগমন। সে রুক্ষস্বরে তবু জিজ্ঞাসা করলে,—তুমি কোথা থেকে আসছ ? তোমার যাকে দরকার আমি সেই-ই।

লোকটী একখানি খাম শান্তির পায়ের কাছে হাত বাড়িয়ে রেখে বললে,—আমি মা, সৌরেনবাবুর বাড়ী থেকে আস্‌ছি। আমার নাম গোবিন্দ। এই চিঠিখানা বাবু দিলেন,—এর জবাবটা এখনই দিতে হবে। এর জবাব পেলে বাবুর লোকজন, ডাক্তার সবই রাস্তার মোড়ে গাড়ীতে আছেন,—তাঁরা এসে অনিলবাবুকে দেখবেন।

শান্তি খামখানা তুলে নিয়ে ভাবলে নিশ্চয় কোন দুরভিসন্ধি এই চিঠিতে প্রকাশ করা হয়েছে। তা না হ'লে এর উত্তরের অপেক্ষার দরকার কি ? সে দৃঢ়ভাবে খামখানা ছিঁড়ে মুহূর্ত্তে চিঠিখানা পড়ে নিলে। তারপর চিঠিখানা খামশুদ্ধ টুক্‌রো টুক্‌রো করে ছিঁড়ে পায়ের তলায় ফেলে মাড়াতে মাড়াতে দাঁতে দাঁত চেপে চোখ দুট'কে লাল করে বল্‌লে,—তোমার বাবুকে বোল, তুমি যেমন চিঠির অবস্থা দেখ্‌লে—এর জবাবে তোমার বাবুর মুখখানা সাম্‌নে পেলে এই রকম অবস্থা করতাম। নরপশু—পিশাচ সে,—তার প্রাণে কিছুমাত্র পরকালের ভয় নেই ? তাঁর মা বোন্ কি আমারই মত মেয়েছেলে ন'ন ! তুমি যাও, আমার সাম্‌নে থেকে দূর হও। আমি তোমাদের কোন সাহায্য চাইনা। আমার স্বামী বিনা চিকিৎসায় বিনা পথ্যে মরুন, আমি তাঁর মরা-দেহ আক্‌ড়ে ধরে না খেয়ে মরব। তারপর হন্তে কুকুরের মত তোমার বাবুকে আমার সেই মরা দেহ খুব সুখে চিবোতে বল,—তবু অনেকটা শান্তি পাবে সে।

গোবিন্দ হতভম্বের মত শান্তির মুখের দিকে চেয়ে কথাগুলি শুনছিল—কিছুই তার বোধগম্য হ'ল না। সে হাতযোড় করে বল্‌লে,—মা, আমি ত' কিছুই জানি না। বাবুর হুকুম মত আপনার কাছে এসেছি। এতে যদি কিছু দোষ হয়ে থাকে আমার—আপনি আমায় ক্ষমা করুন। আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

শান্তি প্রকৃতিস্থ হ'য়ে বুঝে দেখ্‌লে—সত্যই ত'—প্রভুর আদেশ বহনকারী-ভৃত্য সে, তার অপরাধ কি ? সে শান্তস্বরে বল্‌লে,—গোবিন্দ, তোমার বাবুকে কি রকমের লোক বলে মনে হয় বল দেখি ?

শান্তির শান্তমূর্ত্তি দেখে গোবিন্দ আশ্বস্ত হল। সে চারিদিকে চেয়ে আস্তে আস্তে বল্‌লে,—ভাল লোক নয় মা; বড় উপুর নজর আছে। একথা কেন জিজ্ঞেস করছেন মা?

—তোমার কোন ছেলে মেয়ে আছে গোবিন্দ?

গোবিন্দ একটা নিশ্বাস ফেলে বললে,—ছিল মা এক সময়ে। সে যদি আজও বেঁচে থাকত' তা হ'লে তোমার মতই বড় সড়টী হত। আর বোধ হয় ওম্‌নি সুন্দরও হ্‌ত'।

—আচ্ছা গোবিন্দ, ধর তোমার মেয়ে যদি আজও বেঁচে থাকত'—আর তোমার বাবু তার ওপর কু-নজর দিত, তুমি তা হ'লে কি করতে গোবিন্দ?

চোখ দুট'কে পাকিয়ে লাল ক'রে হাতের লাঠিটা দু'পাক্ ঘুরিয়ে গর্জ্জন করে গোবিন্দ বল্‌লে,—কি কর্ত্তুম মা? বাবুর বাবুগিরি এই লাঠির ঘায়ে ঠাণ্ডা করে দিতুম। এই লাঠি আজকের নয় মা। আমি চিরকাল এমন চাকরও ছিলুম না মা। বড় দুঃখে কষ্টে মরিয়া হ'য়ে আমি ডাকাতদের দলে ঢুকে নিজের বুদ্ধিতে সর্দ্দারি নিয়েছিলুম। তখন আমার মেয়েটা ডাগর ডোগর ছিল মা। দিনের পর দিন—যখন লোক মেরে, হাজার-হাজার লাক্-লাক্ টাকা, মণি-মুক্তো আনতুম্, মা আমার বড় কাঁদত'। আমায় কত বারণ করত, আমি কিন্তু শুন্‌তাম্ না মা। আহা, আমারি পাপে মা আমার চারদিনের ব্যায়রামে আমায় ছেড়ে চলে গেল। সেই থেকে মেয়ের দুঃখে—তার আত্মার শান্তির জন্যে, সব পাপ কাজ ছেড়ে দিয়ে আজ চার বছর বাবুদের চাকরগিরি করছি। যা' টাকাকড়ি পাই মা, সব রেখে দিই; যখন মরবার সময় হবে, টাকাগুলো মেয়ের নামে কোন অনাথশালায় দোব। যাক্ মা, অনেক কথা বলে ফেল্‌লুম, রাত্রিও হচ্ছে। আপনার কি ব্যাপার বলুন দেখি?

শান্তি হঠাৎ গোবিন্দের পায়ের ওপর আছড়ে পড়ল; বল্‌লে,—গোবিন্দ তুমি আমার ধর্ম্ম-বাপ—আমি তোমার মেয়ে। তোমার মেয়ের ইজ্জৎ বাঁচাও। গোবিন্দ লাফিয়ে সরে গেল—আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌লে,—কি করলেন মা! আপনি বামুনের মেয়ে, বামুনের বৌ—ছোটলোকের পায়ে পড়ে আমায় অপরাধী করলেন মা! কি হয়েছে আমায় ভাল করে বলুন।

শান্তি সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে বল্‌লে,—আমার স্বামীর অসুখের জন্যে তোমার বাবুর কাছে কাজ করতে যেতে পারেন নি। সন্ধ্যের সময় তোমার বাবু এসেছিলেন। আমি কান্নাকাটী করে সাহায্য চেয়েছিলাম। তিনি সাহায্য করবেন বলে স্বীকার হয়ে গিয়ে তোমায় দ্বারা চিঠি পাঠিয়ে জানিয়েছেন, যদি আমি তোমার বাবুর কাছে আমার ধর্ম্ম বিক্রী করি—তবে তোমাদের লোকজন আমার সাহায্যে আস্‌বে।

গোবিন্দ শান্তির কথাগুলি গিলে খাবার মত শুন্‌তে লাগল। শান্তির কথা শেষ হ'তে সে লাঠিখানা কাঁধের ওপর সজোরে রেখে গর্জ্জন করে বল্‌লে,—সব বুঝেছি মা, আর কিছু বল্‌তে হবে না। মা—এই ডাকাতে লাঠিটা অনেকদিন রক্ত না খেয়ে শুকিয়ে উঠেছে,—আবার আজ আপনার দয়ায় সে তাজা হবে। মা, আপনি আজ থেকে আমার সেই 'ফিরে পাওয়া' মেয়ে—আপনার কোন ভয় নেই। গোবিন্দ যতদিন বেঁচে থাক্‌বে, কার সাধ্যি আপনার মাথার একগাছি চুল নষ্ট করে!

শান্তি ব্যাকুলভাবে বল্‌লে,—আমার স্বামী কি করে বাঁচবেন গোবিন্দ?

—তার ভয় কি মা। আমার যা টাকা আছে, অনিলবাবুকে বাঁচাতে পারব।

শান্তি কেঁদে ফেল্‌লে। বল্‌লে,—গোবিন্দ তুমি মানুষ—না দেবতা?

গোবিন্দ দাওয়ার ওপর উঠে শান্তির পায়ের ওপর মাথাটা ঠেকিয়ে বল্‌লে,—আমি তোমার ছেলে, তুমি আমার মা! জগৎ-জোড়া 'ভুলুসর্দ্দার' এক মেয়ের জন্যে ডাকাতি ছেড়েছিল—আবার আজ সে তার সেই 'ফিরে পাওয়া' মেয়ের ইজ্জত রাখ্‌তে দেশের লম্পটদের সায়েস্তা করবে—তাতে যদি আবার ডাকাত সাজ্‌তে হয় তাও স্বীকার! কিন্তু এবারের ডাকাতি পয়সার জন্য নয় মা!—এবার ডাকাত সাজব, তোর মত মেয়েদের ওপর যারা কু-নজর দেবে—তাদের পাপ-বৃত্তি সুদে আসলে ফিরিয়ে দেবার জন্যে।

'ত্যাগাৎ শান্তিঃ'—ত্যাগেই শান্তি। তাহা বলিয়া শান্তি জড়ের প্রাপ্য নহে। যাহারা জড় তাহাদের শান্তিমার্গে অধিকার নাই; তাহাদের কর্ম্মমার্গে অধিকার।

—বিবেকানন্দ।

রাজগৃহের পথে

[শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বুদ্ধ মন্দির—অন্যান্য ধর্ম্মশালা বা গাঁ ও কুণ্ডের মধ্যবর্ত্তী; বেশ মনোরম, নিরিবিলি ও পরিষ্কার। এর বিশেষত্ব এটা খুব উঁচু ঢিপির ওপরে অবস্থিত এবং দেখতে বাগান বাড়ীর ন্যায়ই। সাম্নেই লোহার গেট। সেইখান থেকেই লাল কাঁকড় বিছানো রাস্তার আরম্ভ। রাস্তার আশে পাশে নানারূপ দেশী-বিদেশী ফুলের গাছ। তা'তে ভায়োলেট, সিপিয়া, ক্রীম্‌সন্ প্রভৃতি নানা রঙের ফুল ফুটে মন্দিরের শোভা অনেকগুণ বাড়িয়ে দিয়েচে। নাম শুনেই চট্ ক'রে ধরা যায় যে, এটা বুদ্ধদেবের ভক্তেরাই তৈরী ক'রেচেন। কারণ, সাধারণতঃ আমরা বুঝি—যে, যে সম্প্রদায়ের লোক, সে সেই সম্প্রদায়ের উন্নতি বা সুবিধার জন্যে তার যা কিছু সামর্থ্য দেয়; অন্য সম্প্রদায় কিম্বা অন্য ধর্ম্মের জন্যে ততোটা তার উৎসাহ বা আগ্রহ দেখা যায় না। কিন্তু আমাদের বেলায় এটা খাটে না। আমরা এখন সভ্য হয়েচি। নিজের জাতীয়তা, নিজের সত্ত্বা ভুলে গিয়ে পরের জাতীয়তা, পরের সত্ত্বাকে ভালো-বাস্‌তে শিখেচি। আমরা দার্শনিক-তত্ত্ব অনুধাবন কর্‌তে জানি। কারণ, ফরাসী দার্শনিক ল্যামেনেস্ (Lamennais) ব'লে গেছেন,—"Human Society is based upon mutual giving or upon the sacrifice of man for man, or of each man for all other men, and sacrifice is the very essence of all true society." অথচ হিন্দুর কত পুরাণো মন্দির ভেঙ্গে ধ্বসে যেতে বসেচে, আমরা সেদিকে তাকিয়েও তাকাই না। সে অবসর আমাদের কোথায়! কিন্তু যখনি অন্য সম্প্রদায়ের বা অন্য ধর্ম্মের উন্নতি বা সংস্কারের নিমিত্ত আহ্বান আসে, আমরা উঠে পড়ে লেগে যাই। উপেক্ষায় উড়িয়ে দিতে পারি না। জগৎ জান্‌তে পারলে আমরা দরদী। আমাদের জাতির প্রাণ আছে। বৌদ্ধেরা কিন্তু এ সব বিষয়ে আমাদের মতো নয়। তারা নিজেদের ধর্ম্মকে, নিজেদের দেবতাকে, নিজেদের দেশকে ভালোবেসে যেটুকু অবসর পায়, সেই সময়টা অন্য ধর্ম্ম, অন্য দেবতা বা অন্য দেশের উপকারের জন্যে ব্যয় করে। আমাদের মতো দু'টো উপাধি পাবার জন্যে বা নামের প্রত্যাশায় লালায়িত হ'য়ে পরের পেছনে পেছনে ঘুরে বেড়ায় না। সুতরাং এই মন্দিরের যা কিছু সব হ'য়েচে গেরুয়া পরিহিত, গোঁপ-দাড়ি-শূন্য ফুঙ্গি জাতির কল্যাণেই। এ মন্দিরের এখন যিনি পুরোহিত, তাঁর

নাম রেভারেণ্ড ইউ, কুণ্ডোনিয়া এবং তিনিই বুদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীদের জন্যে বাড়ীটার নির্ম্মাণ-কর্ত্তা। অপর বাড়ীটা—যেটা জনসাধারণের সুবিধার জন্যে তৈরী করা হ'য়েচে, সেইটার নির্ম্মাণ-কর্ত্তা রেঙ্গুনের বিখ্যাত ফুঙ্গি রেভারেণ্ড ইউ, জেটিলা।

সুতরাং বুদ্ধ-মন্দিরকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। একটি বাড়ী শুধু যাত্রীদের জন্যে; কোন প্রকার জাত-বিচার নেই। অপরটি বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীদের জন্যে। শেষেরটার পূর্ব্বদিকের ঘরে স্বয়ং বুদ্ধদেব নানারূপ সাজ-সজ্জায়-সমন্বিত, মূল্যবান্ মণি-মুক্তা খচিত, বিস্তর প্রসাধন দ্রব্যাদি মণ্ডিত পিতলাসনে বিদ্যমান। দেখে শুধু ক্ষোভ হয় এই যে, যে সিদ্ধার্থ রাজ্য সুখ পরিহার ক'রে, স্ত্রী-পুত্রের মায়া কাটিয়ে দীন ভিখারীর বেশে দেশে দেশে ঘুরে বেড়িয়ে, ধ্যান-মগ্ন হ'য়ে, উপদেশ ও বাণী প্রচার ক'রে নির্ব্বাণ লাভ ক'রেছিলেন—সেই সন্ন্যাসী-প্রবর সিদ্ধার্থকে এরা এত মণি-মুক্তার সিংহাসনে বসালো কেন? জীবিতাবস্থায় যিনি যে জিনিষটা পছন্দ করতেন না, নির্ব্বাণ লাভের পর তাঁকে সেই জিনিষে ভূষিত করা মানে তাঁর আত্মাকে চঞ্চল ও অস্থির ক'রে তোলা নয় কি? এতে সত্যই কি সেই পরলোকগত মহাত্মা সুখী হন? লোকে তর্পণ করে নিজের সুখের জন্যে নয়—আত্মার মঙ্গলের নিমিত্ত। জীবনে যিনি ধনরত্নের আদর বুঝলেন না, তাঁকে বিলাসিতায় ঢেকে রেখে পূজা করার হেতু হয় না। এতে সত্যিই কি ভক্তদের ভক্তি বাড়ে—না সেই পুণ্যাত্মা ব্যক্তির আত্মার কল্যাণ হয়?

বুদ্ধদেব বোধ হয় স্বয়ং খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ভালোবাস্‌তেন, সেই জন্যে এরা এখানে যাতে নোংরা না ঢুক্‌তে পারে, তার জন্যে নানারূপ আইন-কানুন তৈরী ক'রে, তাঁর সেই মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেচেন। মন্দিরের সাম্নে ইট দিয়ে বাঁধানো চত্বর। তারপর ফল-ফুলের বাগান। পূর্ব্ব কোণে একটা কুয়া। জল সকলেই নিতে পারে। এর উত্তর দিকে পাঁচিলের গা ঘেঁসে রান্নাঘরের সারি। তেমন পরিষ্কার না হ'লেও নিন্দা করা চলে না।

বুদ্ধ-মন্দিরে যে মূর্ত্তিটি আছে—সেটী একখণ্ড শ্বেত পাথরের ওপর খোদাই করা। সচরাচর আমরা যে সব বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি মিউজিয়ামে বা অন্য কোথাও দেখি, এটা মোটেই সে ধরণের নয়। কারণ এঁর মাথায় আছে খুব সৌখীন পাগ্‌ড়ী। সামান্য একটা স্বর্ণ-খচিত পাগ্‌ড়ীতে সৌন্দর্য্য যে যে কতখানি বাড়্‌তে পারে, তা সহজেই অনুমান করা যায়। গায়ে একটা গেরুয়া রঙের চাদর। বিংশ শতাব্দীর সহরে-থাকা আধুনিকেরা যেরূপ আল্‌তো ভাবে গায়ের ওপর চাপিয়ে রাখেন—সেইরূপ জড়ানো। পাড়ে নানাপ্রকার পাথর বসানো। মনে হয়, রাজার ছেলের উপযুক্ত পোষাকই বটে। পরণে একখানি গেরুয়া রঙের ধুতি, বেশ পরিপাটীরূপে। ঠোঁটের লাল রঙটীর ভেতর দিয়ে একটা আভা বেরোচ্ছে। চোখ দু'টো কি স্নিগ্ধ, মধুর, কমনীয়। যেন কি একটা

মোহিনী শক্তি এর দু'পাশে জড়িয়ে রয়েচে। প্রত্যেকেই মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাই অনিমেষ নয়নে তাকিয়ে থাকে। কারণ, শুধু দেখে আনন্দ পায় ব'লে।

কল্‌কাতা বা উপকণ্ঠের প্রাসাদে আমরা যে সব মর্ম্মর খোদিত গ্রীসের প্রাণ-হীন দেবতা দেখি, হোক্ সেগুলো ভারত-বিজয়ী ভাস্করের তৈরী, প্রাচীন হিন্দুদের অতুলনীয় শিল্পীর হাতে গড়া, কিম্বা হোক্ না সেগুলো পৃথিবীর মর্ম্ম-বেদনার গোটা ইতিহাস, হোক্ না সেগুলো ইতালী দেশীয় ভাস্করের গড়া অতি আধুনিক অনাবৃত-পরী বা প্রাচীন ভারতের দেবী প্রতিমা—এই যে, বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি, এর কাছে কেউ লাগে না। যে ভাস্কর এই মূর্ত্তিটি তৈরী ক'রেছিলেন, তাঁকে প্রশংসা না ক'রে থাকা যায় না। ভগবান বুদ্ধদেবের গালের টোল দু'টী, বুকের পাঁজ্‌রাগুলো, তাঁর সেই কোঁক্‌ড়ানো চুল, সেই ছোট্ট মসৃণ কপাল, সেই তুলির সূক্ষ্ম টানের মতো ভুরু, সেই ঢুলু ঢুলু শান্ত দু'টী ভাবালস চোখ, সেই সরল সুঠাম নাক, সেই দু'খানি পাপড়ির মতো হাসি মাখানো ঠোঁট—সবই মর্ম্মরের হৃদয় হ'তে এমন ভাবে ফুটে উঠেচে যে, তাঁর ঠাণ্ডা, শীতলতাপূর্ণ বুকে হাত দিলে অনুভব করতে পারা যায় যেন, এখনো রক্ত চলাচল করচে—এখনো বুকের ক্ষীণ স্পন্দন ধ্বনি যেন শোনা যাচ্চে। বুদ্ধদেবের সিংহাসনের নীচে দু'পাশে দু'জন পিতলের ওপর পালিস্ করা ফুঙ্গি তাঁর দিকে হাতজোড় করে' বসে আছেন। এ মূর্ত্তি দু'টী একেবারে নিছক ফুঙ্গির ছাঁচে ঢালা।

—যাত্রা সুরু—

রোদের ঝাঁজ্ কম্‌তে না কম্‌তে আমরা দু'বন্ধুতে বেরিয়ে পড়্‌লাম দুর্গ দেখতে। সেন্‌ট্রাল আর্‌কিওলজিষ্ট্‌দের মতে, এই দুর্গটি আনুমানিক খৃঃ পূঃ ৬০০ অব্দে রাজা বিম্বিসার নির্ম্মাণ করেছিলেন। এটি বুদ্ধ-মন্দিরের ঠিক সাম্নেই অবস্থিত। ইহা মাত্র কয়েক বছর হ'লো মাটীর ভেতর থেকে বের করা হ'য়েচে। এখনো কাজ চল্‌চে। কেবল মাত্র দু'টো দিক সংস্কার করা হ'য়েচে।

দুর্গের প্রাচীরটি দেখতে একেবারে আধুনিক কেল্লারই অনুরূপ। উঁচুতে কোথাও বা দশ হাত আবার কোথাও বা এর চেয়েও বেশী। দৈর্ঘ্যে আট হাতেরও কিছু অধিক। পাথরের ওপর পাথর সাজিয়ে এই প্রাচীরটি তৈরী ; এতে কোনওরূপ মাল মস্‌লা লাগানো নেই। সংস্কারের

দরুণ জায়গায় জায়গায় পাথরগুলো সরে গেছে। এক একদিকের প্রাচীর লম্বায় প্রায় তু'ফার্লঙ্। মাঝে মাঝে গেট ছিল, তার আভাস পাওয়া যায়।*

প্রাচীরের ওপর দিয়ে খানিকটা গিয়ে দেখি, কেল্লার ভেতরদিকে দশ ইঞ্চি চওড়া অর্দ্ধ গোলাকার ছাদ বিশিষ্ট এক ছোট্ট মন্দির। কোন মূর্ত্তি এখন নেই ; কিন্তু এক সময়ে এখানে এক দেবী-মূর্ত্তি ছিল। সেই মূর্ত্তিকে লোকে "গুপ্তি মহারাণী" বল্‌তো। তারা এ-কথাও বলে যে, পূর্ব্বে এখানে সোনার মূর্ত্তি ছিল, এখন তার পরিবর্ত্তে পাথরের বসানো হ'য়েচে। দেখতে অনেকটা গরুর গাড়ীর চাকার ন্যায়। বিয়ের সময় পাণ্ডারা এখনো এখানে এসে সিঁদুর দিয়ে যায়। উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, যাতে এই সিঁদুর অক্ষয় অমর হ'য়ে থাকে।

যেখানে সেখানে বাকস ফুলের গাছ। তার মাঝে পায়ে চলে চলে রাস্তা। ক্রমশঃ চলেচি উত্তর মুখো। একটুখানি গিয়ে মহাদেবের এক মন্দির পড়লো। মাটীর শিব। যে দেশে পাথরের ছড়াছড়ি, সে দেশে মাটীর শিব দেখে আশঙ্কা জাগ্‌লো। দেওয়ালে খোদাই করা গণেশ মূর্ত্তি। মন্দিরটা নেহাৎ ছোট নয় ; কিন্তু বিনা সংস্কারে ভেঙ্গে পড়ে যাবার উপক্রম। তারপর 'বৈতরণী নদী'র সাম্নে এসে পৌছুলাম। নদীটা কোথাও খুব চওড়া, আবার কোথাও লাফিয়ে পার হওয়া যায়। যেখানটায় সব চেয়ে বেশী জল, তার পাশেই পূব-মুখো এক মন্দির। মন্দিরটী বেণী-মাধবজীর। এর সাম্নেই সিঁড়ি—নদী পর্য্যন্ত নেমে গেছে। তু'পাশে খোদাই করা নানা মূর্ত্তি। প্রত্যেক মূর্ত্তিই খুব স্পষ্ট এবং সুন্দর। মাঝে মাঝে রীতিমত সারানো হয় ব'লে এখনো অস্তিত্ব বজায় রাখতে সমর্থ হ'য়েচে। তারপরই লম্বা চত্বর তু'পাশে। বোধহয় স্নানার্থীদের সুবিধার জন্যে এক সময়ে তৈরী হ'য়েছিল। আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলুম এই চত্বরের নাম "অশোক স্তম্ভ" শুনে। বেশীক্ষণ সেখানে দাঁড়ালুম না। পাশেই একটা ভাঙ্গা মন্দির আছে, সেখানে গেলুম। এর মধ্যে কোন মূর্ত্তি নেই। প্রত্যেক তিন বছর অন্তর সাধু-সন্ন্যাসীরা মহাদেবের মূর্ত্তি স্থাপনা ক'রে পূজা করেন। মল মাস কেটে গেলে, মূর্ত্তি তুলে নিয়ে যান। পাশেই "বিভাণ্ডার মন্দির"। ভেতরের মূর্ত্তিটি মহাদেবের। এই মন্দিরের ৫০ গজ আন্দাজ পেছনে আর একটা ঘাট চোখে পড়ে।

---

* প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের বিবরণীতে প্রকাশ যে, এই প্রাকারের স্থানে স্থানে ভেঙ্গে গেলেও অধিকাংশ এখনো বর্ত্তমান। শৈল শ্রেণীর ভেতরের দিকে নিম্নভূমি দিয়ে গিরিব্রজের মধ্যভাগ বেষ্টন ক'রে যে এক অন্তঃ-প্রাকার পুরাকালে ছিল, তার চিহ্ন এখনো বর্ত্তমান। এর ভেতরের প্রাচীরের বেষ্টন প্রায় ৫ মাইল ; বহিঃ-প্রাকারের পরিমাণ ২৫ মাইলের কম নয়। প্রাকার বেষ্টিত প্রাচীন গিরিব্রজের ধ্বংসাবশেষের কিছু কিছু চিহ্ন এখনো দক্ষিণ দিকে পাওয়া যায়। এর

নাম “শালিগ্রাম কুণ্ড”। মল-মাসে এখানে এদেশের অধিবাসীরা স্নান করে। আমাদের মতো যুবকেরা পাঁজি পুঁথি মেনে চলে না, কাজেই যখন তখন হুটোপাটী কর্‌তে আসে। গোটা কতক পাথর পাশাপাশি আঁকড়ে থেকে এখনো সিঁড়ির অস্তিত্ব বজায় রাখ্‌তে সক্ষম হ’য়েচে। কোন্ সময়ে এগুলো তৈরী হ’য়েছিল, তা’ জান্‌বার উপায় নেই।

এইটে পেরিয়ে আরো কুড়ি হাত পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণাকুণি গেলে একটা কূয়ো পাওয়া যায়। পরিধি প্রায় দশ হাত কিন্তু গভীরতা পরিধির তুলনায় কিছুই নয়। জল আন্‌বার জন্যে বাঁধানো সিঁড়ি ভেতর থেকে জল পর্য্যন্ত নেমে গেছে। দু’হাত সরু। ১২টা ধাপ জলের ওপর, বাকীগুলো ডুবে আছে। এখন ভাঙ্গনের দশা। গাঁথুনির ফাঁকে ফাঁকে ফাটল ধরেছে আর গাছ গজিয়েচে। এটার নাম “ভারত-কূপ-কুণ্ড।”

ক্রমশঃ সন্ধ্যা হ’য়ে আস্‌চে। পাশের রাস্তা দিয়ে সারি বেঁধে লোকে কুণ্ডে চলেচে। ওরা ফিরে এলে তবে খালি হবে। এই অবসরে আমরা শ্রীযুক্ত পুরাণচাঁদ নাহার মহাশয়ের বাড়ীখানা দেখ্‌তে গেলুম। এ বাড়ীর মধ্যে নাকি অনেক কিছু দেখ্‌বার জিনিষ আছে। গেটের মধ্যে দিয়ে সোজা ঢুকেই উত্তরদিকে খানিকটা উঁচু সমতল জমি। সমুদায় বিগ্রহে ছড়ানো এই স্থানটি। প্রাচীরের গায়ে একটি শ্বেত পাথরের ওপর খোদাই করা প্রশস্তি। তা’তে লেখা আছে ঃ—

“Rajgir Tirtha”

These dedicatory stones represent the Prashasti of Parshwanath temple on Vipula Hill. Dated V. S. 1412 (1355 A. D.) and were discovered and restored in 1910—1911 by Puran Chand Nahar, M.A. B.L. এর দক্ষিণ দিকে আর একটা প্রস্তর ফলক। লম্বায় দু’হাত ও দৈর্ঘ্যে একহাতেরও ওপর। তা’তে পালি ভাষায় লেখা বুদ্ধের উপদেশাবলী। পাশেই মহাবীর পার্শ্বনাথের মূর্ত্তি। এর চারপাশে গোল স্তম্ভের ওপর একটা করে’ শিবমূর্ত্তি বসানো রয়েচে। পাথরখানা নানা কারু-কার্য্য-খচিত ; যা দেখে বিস্মিত হ’য়ে যেতে হয়। এই মূর্ত্তি ব্যতীত আরো বড়ো বড়ো চার্‌টে মূর্ত্তি আছে। এগুলি পার্শ্বনাথের। কিন্তু দেখ্‌তে বুদ্ধদেবের ন্যায়। এ ছাড়াও যে আরো কত মূর্ত্তি আছে, তা’ হিসেবের বাইরে।

বাড়ীখানা হাল-ফ্যাসানের বাড়ীর মতোই। সংলগ্ন জমি মাপে আসে না। খুব পরিষ্কার

তুলনায় কিছুই নয়। যা-ও আছে, তা-ও অনাদরের। সুতরাং তারাও যে বেশীদিন থাকবে না—এ-কথা ধ্রুব সত্য। বাড়ীটার নাম "শান্তি-ভবন"।

পরের দিন ভোরেই আমরা আমাদের স্নান কর্‌বার কাপড় তোয়ালে জড়িয়ে "সপ্তপর্ণিগুহা" দেখ্‌তে বেরিয়ে পড়্‌লুম। কাজেই অতদূর গিয়ে আবার ফিরে এসে স্নান কর্‌তে যাওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব ঠাওরে নিয়েছিলুম ব'লেই ছোট একটী পুঁটুলি নিয়ে যেতে বাধ্য হ'য়েছিলুম।

সূর্য্য ওঠ্‌বার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা ঘুরে ঘুরে উঠ্‌তে লাগ্‌লাম। প্রায় খানিকটা উঠেচি। রোদ তখনো সাম্নের পাহাড়টা ডিঙিয়ে আমাদের গায়ে এসে পড়েনি। তখনো শীতের আমেজ বাতাসের সাথে মিশেছিল ব'লে ততোটা কষ্ট হয়নি, যতটা—আমরা ওঠ্‌বার আগে কল্পনা করে' নিয়েছিলুম। নব উদ্যমেই চলেচি। কি না কি দেখ্‌বো। হঠাৎ দেখি মন্দিরগুলো কাছাকাছি এসে পড়েচে। প্রথম যে মন্দিরটা, সেটা মহাদেবের। মহাদেব অঙ্গহীন হ'য়ে পড়ে রয়েচেন, তাঁর বাহনেরও ওই একই অবস্থা। মন্দিরের ছিরি দেখ্‌লে ফিরেও তাকাতে ইচ্ছে যায় না। বন্ধু বল্‌লে, 'হিন্দু ব'লেই বোধ হয় এই অবস্থা।' বন্ধুর কথার উত্তর না দিয়ে এগিয়ে গেলুম।

রাস্তায় এইবার শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের মন্দির পড়্‌লো। জৈনদের সাধারণতঃ দু'ভাগে ভাগ করা যায়। এক সম্প্রদায়ের নাম 'দিগম্বর', অপর সম্প্রদায়ের নাম 'শ্বেতাম্বর'। দিগম্বর অর্থাৎ যাঁরা মহাবীর পার্শ্বনাথ ও তাঁর পূর্ব্বতন তেইশ জন তীর্থঙ্করকে সাধুরূপে পূজা করেন। আর শ্বেতাম্বর অর্থাৎ যাঁরা এঁদের মহারাজ বেশে পূজা করেন। যদিও উপাস্য দেবতা এক, তবুও দু'সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য যথেষ্টই আছে।

মন্দিরটি শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের; কিন্তু ভেতরের মূর্ত্তিটী বুদ্ধদেবের। তা'ও আবার একটা নয়, পাঁচ-পাঁচটা। বন্ধু সহসা প্রশ্ন কর্‌লে—'মহাবীর পার্শ্বনাথ ও গৌতম বুদ্ধ সমসাময়িক ছিলেন। সুতরাং পূর্ব্বে এই মন্দিরটি কোন্ সম্প্রদায়ের ছিল, তা জানা বড় কঠিন। কিন্তু মূর্ত্তিগুলো দেখে মনে হয়, এটা বুদ্ধদেবেরই ছিল। শ্বেতাম্বর সম্প্রদায় এটা আবিষ্কার করেই হোক্, আর জোর করে'ই হোক্—নিজেদের বলে চালিয়ে নিয়েচেন।'......"এক সময়ে ভারতবর্ষে সকল সম্প্রদায়ই কি বুদ্ধদেবকে উপাস্য দেবতা ব'লে মেনে নিতেন না! অশোকের রাজত্বকালে, বৌদ্ধধর্ম্ম শুধু ভারতে নয়, সুদূর পশ্চিম এশিয়া সিংহল, আফ্রিকা ও য়ুরোপ পর্য্যন্ত ছেয়ে ফেলেছিলো। হিন্দুদের মধ্যে অনেকে এই ধর্ম্ম গ্রহণ কর্‌লেন। হিন্দুত্ব লোপ পাবার যোগাড়, এমন সময়ে শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব ও হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান। সুতরাং এক সময়ে জৈন ধর্ম্মেরও হিন্দুর মত অবস্থা না হ'য়েছিল

রাজগৃহের বিষয় যা জান্‌তে পারি, তা'তে বোঝা যায় বুদ্ধদেবের প্রাধান্য এখানে অধিক পরিমাণে বিস্তার লাভ ক'রেছিল। অথচ তিনি জৈনদের নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ করেন নি। সুতরাং বুঝ্‌তেই পা'চ্চ"—ব'লে বন্ধুকে তাড়া দিলুম তাড়াতাড়ি ওঠ্‌বার জন্যে।

এর পর যে মন্দিরটায় আমরা গেলাম, সেটা দিগম্বর সম্প্রদায়ের। মন্দিরটি যদিও নতুন নয়, কিন্তু দেখায় নতুনের মতোই। সাম্নে লোহার দরজা। তাতে যেটুকু বাতাস আসে, সে কেবল ঐ একটি মহাপুরুষেরই চলে। দু'জনে থাক্‌লে বোধ হয় শ্বাস রোধ হ'য়ে বিহার গিরি ত্যাগ করে' হিমালয়ের কোনো এক উচ্চতম শিখরে গিয়ে ঠেল্ মার্‌তেন।

এতটা উঠে আমরা প্রায় অবসন্ন। মন্দিরের ছায়ায় ক্ষণেকের জন্যে বিশ্রাম লাভ করে আবার উঠ্‌তে লাগ্‌লাম। দু'টো সাদা—ধব্‌ধবে মন্দিরের চূড়ো আমাদের দৃষ্টির মধ্যে এসে পড়্‌লো। একমনেই উঠ্‌চি—সহসা চেঁচামেচি শুনে থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়্‌লাম। যেদিক থেকে আওয়াজটা আস্‌ছিলো, সেই দিকে তাকিয়ে রইলাম। বুক দুর্‌দুর্ করে' উঠ্‌লো অজানিত আশঙ্কায়। বাঘ-টাঘ বেরুলো না তো! বন্ধু বল্‌লে,—"আর বেরোলেই বা কি কর্ব্বে।" ভয় আরও বেড়ে গেলেও মুখে তা' প্রকাশ না করে' এদিক-ওদিক নিরীক্ষণ কর্‌তে লাগ্‌লাম। দেখি আমাদের দিকে তিনখানা ডুলি আস্‌চে আর তাদের পেছন পেছন ছোট, বড়, মাঝারী নানা আকারের জন্তু কিচির-মিচির কর্‌তে কর্‌তে আস্‌চে। যাক্, হাঁপ ছেড়ে বাঁচা গেলো। যে সময়টা নষ্ট হ'য়ে গেলো, সেটা 'মেকাপ' কর্‌বার জন্যে লম্বা লম্বা পা ফেলে গন্তব্য স্থানের দিকে অগ্রসর হ'লুম।

(ক্রমশঃ)

কে বলে সব ফেলে যাবি
মরণ হাতে ধরবে যবে—
জীবনে তুই যা নিয়েছিস্
মরণে সব নিতে হবে।

—রবীন্দ্রনাথ।

"দীপ-শিখা"

[শ্রীরমেন্দ্রনাথ ঘোষ]

সব চেয়ে যে ছোট তার কেউ রাখে না খোঁজ
বড়'র তরে বিশ্ব পাগল এই তো দেখি রোজ।
যত্ন করে তোলে না কেউ ছোট কাপড়খানি—
ছোট কিছু সাম্‌নে সবার কেউ দেয় না আনি'।
ছোট আসে সবার শেষে—থাকে অনেক দিন
বড়'র এবার যাবার পালা শোধ হ'য়েছে ঋণ।
তাই কি মোরা তাকাই না কো ছোট কিছু 'পরে
জানি সে তো থাক্‌বে আরো আমাদের এই ঘরে।

এ সব কথা কোথায় পেলে ও-গো পথিক তুমি
বলতে পারো ও-গো পথিক সাক্ষী ক'রে ভূমি ?
তোমার কথা চল্‌বে না-কো তোমার কাছে ছাড়া
বিশ্বটাকে ঘা দিয়ে ভাই দাওনা যত নাড়া।
শুন্‌বে তবে চল্‌চি কেন ?—তোমার কথা ভুয়ো
কথার শেষে একটী বার বুকটা তুমি ছুঁয়ো।
শুন্‌তে পাবে ছুটির গান নূতন সুরে বাঁধা
যে সুর তুমি শোনোনিকো—হয়নি আজো সাধা।

মিত্তিরদের ছোট্ট মেয়ে—দুষ্টু শিরমণি,
আড়ি দিয়ে সে পালিয়ে গেলো স্নেহ-ভরা খনি।
'লেখা' আজিকে জন্ম নিল সে কুঁড়িটির তরে,
তোমার আমার হাস্য-গীতি পাতায় রবে ভ'রে।

'লেখা'র আজি জন্ম দিনে জ্বালাও দীপ সবে—
সবার ভালে জয়ের টিকা তাহে-গো যেন শোভে।
তাই তো আজি সবাই মিলে গাহি মিলন্তিকা
নিভ্‌তে মোরা দেবো না-কো অস্ত-রবির শিখা।

ওরে অবুঝ ওরে সবুজ নূতন মালা গাঁথো
সবার সুরে সুর মিলিয়ে সেতারখানি বাঁধো।
পর পারের পাগল করা ঐ যে বাঁশীর সুর
ওরই সুরে যাত্রা মোদের হোক না যতই দূর।
মালা গেঁথে কালের গলায় পরিয়ে তুমি দিও
বিনিময়ে প্রীতির কণা আদায় করে নিও।
যে দিন তুমি সময় পাবে শেষ গানটী গেয়ো
বজ্র যবে আস্‌বে নিতে নয়ন মেলে চেয়ো।

অমর বাণী মুখর হ'বে শেষ রাগিনী গানে
প্রদীপ তব উঠ্‌বে নেচে ঊর্দ্ধ নভঃ পানে।
সেতারখানি রইবে পড়ে, তুমি গো যাবে চলে—
তারার মালা আড়্‌-নয়নে ডাক্‌বে দলে দলে।
বাড়িয়ে দিও একটি তারা সেথায় তুমি গিয়ে
আঁধার রাতে দেখিও পথ আলোর পরশ দিয়ে।
যতই কেন আড়াল রাখো তব প্রদীপখানি
নীল আকাশে উঠবে ফুটে ঘুচিয়ে সকল গ্লানি। *

* 'লেখা' নামক হস্ত-লিখিত পত্রিকার জন্মদিনে রচিত।

বিশ্ব-প্রবাহ

জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিকগণ কমলালেবুর খোসা হইতে আঠা প্রস্তুত করিতেছেন, এই আঠা আবিষ্কার করেন ডক্টর বার্জ্জমান্। আঠার নাম হইতেছে পেক্‌টিন্।

'ব্যাঙ্ক'কে আমরা বর্ত্তমান সভ্যতার যুগের প্রতিষ্ঠান বলিয়া মনে করি। কিন্তু বহু প্রাচীনকালে পৃথিবীতে যে ইহার অধিষ্ঠান ছিল তাহার নিদর্শন আমরা এখন পাইতেছি। বৃটিশ মিউজিয়মে একখানি প্রাচীন ব্যাঙ্কনোট সংগৃহিত আছে। খৃষ্টজন্মের প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে চীনদেশে উহার প্রচলন ছিল।

জাপানে বাড়ী হইতে ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে লইয়া যাইবার জন্য যে গাড়ীর ব্যবস্থা আছে, সেই গাড়ী গাধায় টানিয়া লইয়া যায়।

পরিধি হিসাবে পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ নগর হইতেছে জার্ম্মাণির হাঙ্গেরী প্রদেশের ডেব্রীশীন নগর, ইহার পরিধি ৬০০ বর্গ মাইল।

পাশ্চাত্যদেশে কোন কোন স্থানে পুত্রকন্যা বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার দিবার প্রথা আছে। নিউইয়র্কের এক ভদ্রলোক ছেলে বন্ধক দিয়া টাকা ধার লইয়াছিলেন। ছেলেটি মহাজনের গৃহে নির্দ্দিষ্টকাল শারীরিক পরিশ্রম করিরা পিতার ঋণ পরিশোধ করে। অবশ্য আহার ও বাসস্থান মহাজনই জোগাইতেন।

রুমানিয়ার এক ভদ্রলোক ইন্‌কম্ ট্যাক্স দিতে পারেন নাই বলিয়া ক্রোক পরোয়ানা বাহির হয় এবং সেই পরোয়ানা বলে তাঁহার সতের বৎসর বয়স্কা কন্যাকে গ্রেফ্‌তার করিয়া লইয়া যাওয়া হয়। কারণ, সেখানে ঐরূপভাবে ছেলেমেয়ে ক্রোক করিয়া তাহাদিগকে নিলামে বেচিয়া অনাদায় ট্যাক্স আদায় করিবার ব্যবস্থা আছে। যাহা হউক উক্ত ভদ্রলোক ইন্‌কম্‌ট্যাক্স দিয়া মেয়েটিকে ছাড়াইয়া আনিয়াছিলেন।

গত আগষ্ট মাসে এক সপ্তাহে লণ্ডন সহরের বাস, ট্রাম ও টিউব ট্রেণের মধ্যে ১১৫৮টি ছাতা বেওয়ারিশ ভাবে পাওয়া গিয়াছে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে ছাতা হারাইবার স্বভাব সর্ব্বত্রই অল্পবিস্তর বিদ্যমান।

বিলাতের অনাথ বালকবালিকাদের থাকিবার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ আশ্রম হইতেছে 'ডক্টর বার্ণাডোজ হোম' (Dr. Barnardo's Home)। গত বৎসর এই আশ্রমের অনাথ বালক-বালিকাদের সংখ্যা ছিল ১৬৯২৫। এ পর্য্যন্ত আশ্রম কর্তৃপক্ষ ১৭৫৪ জন পালিত লোককে চাকরী ব্যবসায়াদিতে নিয়োগ করিয়া দিয়াছেন।

সতের বৎসর পূর্ব্বে লণ্ডন নগরের বাড়ীর সংখ্যা ছিল আশী লক্ষ। এখন সেই সংখ্যা বাড়িয়া এক কোটি ছয় লক্ষ ছাপান্ন হাজার হইয়াছে।

মটর গাড়ী বর্ত্তমানে ভূমি সংলগ্ন হইয়া চলে। ইহা যাহাতে আকাশ পথেও উড্ডীয়মান্ হইতে পারে পাশ্চাত্য দেশে এখন তাহার প্রচেষ্টা চলিতেছে। মটর গাড়ীর দুই দিকে পক্ষ সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হইবে। গাড়ী যখন স্থলপথে চলিবে তখন পক্ষগুলি মুড়িয়া রাখা হইবে এবং শূন্যপথে উড়িবার সময় উহাদিগকে বিস্তৃত করা হইবে। এই মটরগাড়ী উড়িবার সময় যাহাতে বর্ত্তমান ব্যোমযানের ন্যায় দ্রুতগতিসম্পন্ন হইতে পারে তাহারও চেষ্টা করা হইতেছে। জার্ম্মান, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ইটালী প্রভৃতি দেশের অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ারগণ এইরূপ মটরগাড়ী প্রস্তুত করিবার পরীক্ষামূলক কার্য্যে প্রায় সফলকাম হইয়াছেন।

জার্ম্মানীর গ্রীফেনবার্গ নামক একটি গ্রামের লোকেরা গীর্জ্জার ঘড়ি শুনিয়া শয্যাত্যাগ করিতে অভ্যস্ত। একদিন উক্ত গ্রামের লোকেরা শয্যাত্যাগ করিল বেলা নয়টার সময়। কারণ অনুসন্ধান করিয়া জানা গেল যে, রাত্রে চোরে ঘড়িটির পেণ্ডুলাম্ চুরি করিয়া লইয়া যাওয়ায় সেদিন [illegible]

সংবাদিকা

সদ্গোপ পত্রিকার লেখক-লেখিকাগণের প্রতিযোগিতা :— গত বৎসর আমরা ঘোষণা করিয়াছিলাম যে, আমাদের স্বজাতীয় লেখক-লেখিকাগণের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থে ষষ্ঠ-বর্ষের সদ্গোপ পত্রিকায় প্রকাশিত যাঁহাদের গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতা শীর্ষস্থানাধিকার করিবে, তাঁহাদিগকে পদক পুরস্কার দেওয়া হইবে। তদনুসারে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয়ের উপর গল্প ও প্রবীণ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের উপর প্রবন্ধ ও কবিতাগুলির বিচারের ভার অর্পিত হইয়াছে। বিচারের ফল ও পুরস্কারের দিন পরে জ্ঞাত করা হইবে।

পরীক্ষায় মহিলার সাফল্য :— আমরা সংবাদ পাইয়া সুখী হইলাম যে, চব্বিশপরগণার অন্তর্গত বারাকপুর নিবাসী ডাঃ শ্রীযুক্ত নিতাইচাঁদ হালদার মহাশয়ের পত্নী ও কলিকাতার ইণ্টালী নিবাসী শ্রীযুক্ত হীরালাল ঘোষ মহাশয়ের কন্যা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এজন্য আমরা তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা যে, শিক্ষা বিষয়ে তিনি অধিকতর অগ্রসর হইবেন।

নিবেদন :— গতবর্ষের সকল গ্রাহককে আমরা পুনরায় সপ্তম-বর্ষের গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করিলাম। আশা করি, সকলেই ইহা অনুমোদন করিবেন। ইহাতে যদি কাহারও আপত্তি থাকে, অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা যথাসম্ভব সত্বর পরিজ্ঞাত করিলে বাধিত হইব।

বিশেষ সংখ্যা :— গত বৎসরের ন্যায় এই বৎসরেও আমাদের পত্রিকার বিশেষ সংখ্যাগুলি প্রকাশ করা হইবে। 'স্বাস্থ্য-সংখ্যা'র জন্য যাঁহারা স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রবন্ধ প্রেরণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের নিকট আমাদের অনুরোধ যে তাঁহারা যেন আগামী মাঘ মাসের মধ্যে উহা আমাদের কার্য্যালয়ে প্রেরণ করেন। এই সঙ্গে আমাদের মহিলা লেখিকাবৃন্দকেও অনুরোধ জানাইতেছি যে, 'মহিলা সংখ্যা'র জন্য তাঁহারা যেন তাঁহাদের প্রবন্ধাদি আগামী ফাল্গুন মাসের মধ্যে আমাদের নিকট পাঠাইয়া দেন। অধিকন্তু এ বৎসর 'কৃষি ও বাণিজ্য' সংখ্যা প্রকাশ করিবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হইতেছে। লেখকগণ কৃষি ও বাণিজ্য বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠাইলে, তাহা সাদরে গৃহীত হইবে।

আমাদের কথা

শুভ অগ্রহায়ণ হইতে সদ্গোপ পত্রিকার সপ্তম বর্ষের সূত্রপাত হইল। এই পত্রিকাখানি সদ্গোপ জাতির একমাত্র মুখপত্র। সদ্গোপ যুবক সঙ্ঘের প্রচেষ্টায় ইহা পরিচালিত। ইহার মূল উদ্দেশ্য কেবলমাত্র স্বজাতীয় লেখক-লেখিকা সৃষ্টি করা নহে, অধিকন্তু স্বজাতির সকলের অভাব-অভিযোগ ও দুঃখ-কষ্ট পরিজ্ঞাত হইয়া সেগুলির প্রতিবিধানের পন্থা, সামাজিক জীবনকে যুগোপযুক্তভাবে সমুন্নত করিবার উপায় প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের আলোচনা এবং সুসঙ্গত হইলে সেগুলির প্রচলনের প্রচার কার্য্য করা। এই উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সদ্গোপ যুবক বৃন্দ দেশ-দেশান্তরের দূর-দূরান্তরের স্বজাতির সকলের সহিত পরিচিত হইবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিয়া, প্রতিমাসে এই পত্রিকা মারফৎ তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইতেছেন। হইতে পারে, যুবকগণ এ পর্য্যন্ত তাঁহাদের লক্ষ্যপথে বিশেষভাবে অগ্রসর হইতে পারেন নাই; তথাপি তাঁহাদের আশা আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দেশ্য যে, সাধু ও মহৎ এবং তাঁহাদের সাফল্য যে স্বজাতির প্রত্যেক হিতকামী ব্যক্তির সহযোগিতার উপর নির্ভর করে—এ কথা বোধ হয়, সকলে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। আশা করি, পত্রিকার এই নববর্ষে সকল স্বজাতীয় ব্যক্তি যুবকগণকে তাঁহাদের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির নিমিত্ত পত্রিকা-পরিচালনা কার্য্যে সহযোগিতা ও সহানুভূতির দ্বারা উৎসাহিত ও বাধিত করিবেন।

* * * *

স্বর্গীয় নবকুমার বিশ্বাস:—গত ৯ই অগ্রহায়ণ সোমবার রাত্রি দুই ঘটিকার সময়ে নবকুমার বিশ্বাস মহাশয় ৮৪ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার বিধবা পত্নী, চারিপুত্র—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিশ্বাস, এ্যাটর্ণি-এ্যাট্‌-ল, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শরৎলাল বিশ্বাস এম্-এস্-সি, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ও শ্রীযুক্ত সুধীররঞ্জন বিশ্বাস, তিন কন্যা, বহু পৌত্র, পৌত্রী, দৌহিত্র, দৌহিত্রী এবং শেষোক্ত পৌত্রাদিগণের কাহারও কাহারও পুত্র পৌত্র প্রভৃতি রাখিয়া গিয়াছেন। অতি দরিদ্র অবস্থা হইতে তিনি স্বীয় পরিশ্রম, মেধা ও স্বাবলম্বন বলে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। গভর্ণমেণ্ট স্কুল অব্ আর্টস্‌এর তিনি একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন। তাঁহার কৃতিত্বের জন্য তিনি বহু পুরস্কার লাভ ও সারা ছাত্রজীবন বৃত্তি ভোগ করেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে তিনি উক্ত স্কুলের শেষ পরীক্ষায় শীর্ষ স্থানাধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হন। তৎপরে তিনি কলিকাতায়

বহুবাজারে ক্যালকাটা আর্টস্ ষ্টুডিও স্থাপন করেন। তিনিই প্রথমে এদেশে লিথো প্রিন্টিংএর কার্য্য প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশে শাস্ত্রসম্মত পৌরাণিক দেবদেবীর চিত্র অঙ্কনের প্রথম প্রবর্ত্তক তিনিই ছিলেন। তাঁহায় ব্যবহার অতি মধুর ও অমায়িক ছিল। বিলাসিতা তাঁহার জীবনে কখনও প্রবেশ করে নাই। স্বোপার্জ্জিত বহুবিত্তের অধিকারী হইয়াও, তিনি অতি সামান্যভাবে জীবন যাপন করিতেন। আজীবন তিনি কোনও প্রকার মাদক-দ্রব্য স্পর্শ করেন নাই। তাঁহার স্বাস্থ্য চিরদিনই অটুট ছিল। কেবলমাত্র দুই একদিন সামান্য দুর্ব্বলতা অনুভব করিবার পর হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়াতে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি কথা কহিয়াছিলেন। বর্ত্তমান কালে এরূপ মৃত্যু দৃষ্টিগোচর হওয়া বড়ই বিরল। আমরা তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

স্বর্গীয়া যোগীন্দ্রমোহিনী নিয়োগী:—সুবিখ্যাত বংশীবাদক ও পাশ্চাত্য যন্ত্রযোগে ভারতীয় ঐক্যতান বাদনের প্রবর্ত্তক স্বর্গীয় সঙ্গীতাচার্য্য ননীলাল নিয়োগী মহাশয়ের বিধবা পত্নী যোগীন্দ্রমোহিনী নিয়োগী ৭২ বৎসর বয়সে সম্প্রতি পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি হাটখোলার জমীদার স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ সুর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা ছিলেন। এখন তাঁহার দুই পুত্র, তিন কন্যা ও বহু পৌত্র দৌহিত্রাদি বর্ত্তমান। আমরা তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবার বর্গকে আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

স্বর্গীয় বিজয়লাল খাঁ:—আমরা শুনিয়া মর্ম্মাহত হইলাম যে, নাড়াজোলের স্বর্গীয় রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁর কনিষ্ঠ পুত্র কুমার বিজয়লাল খাঁ গত ২৯শে অগ্রহায়ণ রবিবার নিউমনিয়া রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র বত্রিশ বৎসর হইয়াছিল। তিনি তাঁহার বিধবা পত্নী ও একটি নাবালক পুত্র ও একটি নাবালিকা কন্যা ও বহু আত্মীয় স্বজন রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি প্রিয়দর্শন ও মধুর-ভাষী ছিলেন; সকলেই তাঁহার ব্যবহারে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইত। তিনি দাতব্য-চিকিৎসালয়, বিদ্যালয় প্রভৃতি জনহিতকর কার্য্যে ও দরিদ্র ব্যক্তিগণকে সাহায্যদানে মুক্তহস্ত ছিলেন। সঙ্গীতের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। ভগবানের নিকট প্রার্থনা তিনি যেন তাঁহার শোকাতুর পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা দান করেন।

* * * *

প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত ভূতনাথ কোলে মহাশয় বাঁকুড়া জিলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুরে স্বগ্রামে একটি দাতব্য ঔষধালয় ও বিশ্রামাগার নির্ম্মাণ ও পরিচালনার ব্যয়ের জন্য দশ হাজার টাকা এবং

তাহাদের আসবাব পত্রাদির জন্য পাঁচ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। তিনি তাঁহার পিতার স্মৃতি রক্ষার্থে বাঁকুড়া হাসপাতালে একটি নূতন গৃহ নির্ম্মাণের জন্যও ১৮০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। এইরূপ লোক-হিতকর কার্য্যের জন্য আমরা তাঁহাকে আমাদের সশ্রদ্ধ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আশা করি তিনি দেশের ও দশের এইরূপ মঙ্গলজনক কার্য্যে রত থাকিয়া তাঁহার নিজের ও স্বজাতির গৌরব বৃদ্ধি করিবেন।

* * * * *

এই পত্রিকাতে সদ্গোপ পাত্র-পাত্রীর সংবাদ প্রদানের ব্যবস্থা করা সদ্গোপ যুবক সঙ্ঘের একটি অভিনব প্রচেষ্টা। আশা করা যায়, ইহাতে স্বজাতির কিছু প্রত্যক্ষ কল্যাণ-সাধন হইবে। পাত্র-পাত্রীর সংবাদ অত্যাবশ্যক, অথচ উহা প্রাপ্ত হইবার সহজ উপায়ের অভাব সকলেই বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতেছিলেন। বর্ত্তমান ব্যবস্থার দ্বারা উক্ত অভাবের যে অনেকাংশে অপনোদন হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই ব্যবস্থা কার্য্যকারী হইলে ইহার সুফল কেবল ব্যক্তিগতভাবেই পর্য্যবসিত হইবে না, জাতিগতভাবেও ইহা প্রভূত কল্যাণ-সাধন করিবে। ইহার দ্বারা দেশ-দেশান্তরের স্বজাতিকে জানিবার, বুঝিবার ও তাঁহাদের সহিত সম্মিলিত হইবার দ্বার সকলেরই নিকট উন্মুক্ত হইবে। বিরাটভাবে স্বজাতিকে সংবদ্ধ ও সংগঠিত করিতে ইহা বিশেষ সহায়তা করিবে।

সদ্গোপ পাত্র-পাত্রী

বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী

(১) সদ্গোপ পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপন বিনামূল্যে প্রকাশ করা হইবে। কেবলমাত্র পত্রিকার গ্রাহক-গ্রাহিকাগণই এই সুবিধা পাইবেন। কিন্তু স্থানাভাব বা অন্য কোন কারণ বশতঃ এই বিষয়ে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশ না করিবার ক্ষমতা সদ্গোপ যুবক সঙ্ঘের কর্ত্তৃত্বাধীন। (২) বিজ্ঞাপনগুলি স্পষ্টাক্ষরে ও সংক্ষিপ্ত হওয়া আবশ্যক। উহা যেন এই পত্রিকার ৩ লাইনের অধিক না হয়। (৩) বিজ্ঞাপনে বিবৃত বিবরণের জন্য আমরা দায়ী নহি। পাত্র-পাত্রীর সম্বন্ধ নির্ণয়কারিগণ সমস্ত বিষয় তাঁহারা নিজেদের দায়িত্বে করিবেন। (৪) যাঁহারা নিজেদের নাম প্রকাশ না করিয়া বক্স নম্বর দিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা যদি আমাদের কার্য্যালয় হইতে পত্রাদি লইয়া না যান, তবে উহা প্রেরণের জন্য তাঁহাদিগকে আমাদের নিকট উপযুক্ত (অন্ততঃ আট আনার) ডাকটিকেট রাখিতে হইবে।

পাত্র চাই—মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত কাঁদীর দুইটী সুন্দরী সুশিক্ষিতা সদ্গুণ-সম্পন্না স্বাস্থ্যবতী পাত্রীর জন্য সুশিক্ষিত অবস্থাপন্ন দুইটি পাত্র আবশ্যক। গুণবিশেষে যৌতুকাদি দেওয়া হইবে। কুল সম্বন্ধে কোন বাধ্য-বাধকতা নাই। বক্স নং ১ সদ্গোপ পত্রিকা।

পাত্রী চাই—মাসিক ২০০৲ টাকা উপার্জ্জনশীল ৩০।৩৫ বৎসর বয়স্ক বিপত্নিক পাত্রের জন্য একটী সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী বয়স্থা পাত্রী চাই। পাত্রের পূর্ব্ব-পত্নীর গর্ভজাত যথাক্রমে ৮ বৎসর ও ৫ বৎসর বয়স্কের দুইটী পুত্রকন্যা আছে। যৌতুকাদি নাই। বক্স নং ২ সদ্গোপ পত্রিকা।

পাত্র চাই—একটী চতুর্দ্দশবর্ষীয়া স্বাস্থ্যবতী শ্যামবর্ণা বাঙ্গলা লেখাপড়ায় অভিজ্ঞা গৃহকর্ম্মে নিপুণা পূর্ব্বকুল মৌদ্গোল্য গোত্র পাত্রীর জন্য একটী শিক্ষিত ব্যবসায়ী স্বাস্থ্যবান্ পাত্র চাই। যৌতুক ২০০০৲ টাকা। বক্স নং ৩ সদ্গোপ পত্রিকা।

পাত্র চাই—একটী ১৪।১৫ বৎসর বয়স্কা সুন্দরী শিক্ষিতা স্বাস্থ্যবতী পাত্রীর জন্য একটী সুশিক্ষিত সুদর্শন অর্থবান্ পশ্চিমকুল কুলীন পাত্র চাই। পাত্রী মৌদ্গোল্য গোত্র—একমাত্র কন্যা। বক্স নং ৪ সদ্গোপ পত্রিকা।

সদ্গোপ পাত্র-পাত্রী

পাত্র চাই—একটী সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী ১৪।১৫ বয়স্কা পাত্রীর জন্য একটী সুদর্শন সুশিক্ষিত ও সম্পত্তিশালী পাত্র চাই। যৌতুক ৪০০০৲ হাজার হইতে ৫০০০৲ হাজার টাকা। বক্স নং ৫ সদ্গোপ পত্রিকা।

পাত্রী চাই—একটী ২৩।২৪ বৎসর বয়স্ক শিক্ষিত পশ্চিমকুল বিশ্বাস ব্যবসায়ী সম্পত্তিশালী মৌদ্‌গোল্য গোত্র পাত্রের জন্য সুন্দরী পাত্রী চাই। যৌতুক সম্ভবমত হইলে চলিবে। বক্স নং ৬ সদ্গোপ পত্রিকা।

পাত্র চাই—একটী ১৪।১৫ বৎসর বয়স্কা সুশিক্ষিতা সুন্দরী মৌদ্‌গোল্য গোত্র পাত্রীর জন্য একটী সুদর্শন শিক্ষিত ব্যবসায়ী কলিকাতাবাসী পশ্চিমকুল পাত্র চাই। যৌতুক ২০০০৲ টাকা। বক্স নং ৭ সদ্গোপ পত্রিকা।

পাত্রী চাই—একটী গ্রাজুয়েট শিলং প্রদেশের ব্যবসায়ী সুদর্শন ভালকো কুলীন বংশের পাত্রের জন্য একটী ১৭।১৮ বৎসর বয়স্কা সুন্দরী শিক্ষিতা ভাল্‌কো ঘর ব্যতীত পাত্রী চাই। কুলীন না হইলেও চলিবে। যৌতুকাদি কিছুই নাই। বক্স নং ৮ সদ্গোপ পত্রিকা।

পাত্রী চাই—একটী ২২।২৩ বৎসর বয়স্ক সুদর্শন স্বাস্থ্যবান শিক্ষিত পাত্রের জন্য একটী সুন্দরী দরিদ্র গৃহের পাত্রী চাই। পাত্র সাঁওতাল পরগণায় একটী পাথর কাটাই ফার্ম্মের ম্যানেজার। কন্যাটী সেই স্থানেই থাকিবে। পাত্রী মেদিনীপুর, বাঁকুড়া বা বীরভূম স্থানীয়া হওয়া চাই। যৌতুক নাই। বক্স নং ৯ সদ্গোপ পত্রিকা।

পাত্রী চাই—ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারীং স্কুলের শেষ পরীক্ষোত্তীর্ণ মেদিনীপুর ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের অধীনস্থ কর্ম্মচারী একটী স্বাস্থ্যবান্ সুদর্শন যুবকের জন্য একটী সুন্দরী গৃহকর্ম্মে নিপুণা পাত্রী আবশ্যক। বক্স নং ১০ সদ্গোপ পত্রিকা।

পাত্রী চাই—একটি স্বাস্থ্যবান্ সুশ্রী শিক্ষিত, বিশিষ্ট ইঞ্জিনীয়ারের পুত্র, রেডিও ব্যবসায়ী ২২।২৩ বৎসরের যুবকের জন্য একটি স্বাস্থ্যবতী সুন্দরী শিক্ষিতা পাত্রী আবশ্যক। বক্স নং ১১ সদ্গোপ পত্রিকা।

নিয়মাবলী

১। সমস্ত টাকা কড়ি যুবকসঙ্ঘের ধনাধ্যক্ষের নামে ১৩/১, স্যাম্বস্তু লেন, কলিকাতা এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

২। রাজনৈতিক কোন প্রবন্ধ পত্রিকাতে আলোচিত হয় না।

৩। লেখক-লেখিকাগণের মতামত পত্রিকা সম্পাদক বা সদ্গোপ যুবকসঙ্ঘের মতামত নহে।

৪। লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।

৫। প্রবন্ধ কাগজের একপৃষ্ঠে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া পত্রিকা-সম্পাদকের নামে ৩৪ নং ইণ্ডিয়ান মিরার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। ডাকমাশুল না পাঠাইলে অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরত দেওয়া হয় না। প্রবন্ধ পাঠাইবার সময় আপত্তি না জানাইলে পত্রিকা পরিচালক মণ্ডলী প্রবন্ধের যে কোন অংশ পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন করিতে পারিবেন।

৬। যুবক-সঙ্ঘ ও তাহার পত্রিকা সম্বন্ধীয় যাবতীয় সংবাদ যুবক-সঙ্ঘ অফিস ৩৪ নং ইণ্ডিয়ান মিরার ষ্ট্রীটে জ্ঞাতব্য। সন্ধ্যা ৮টা হইতে ৯॥০টা পর্য্যন্ত অফিস খোলা থাকে।

৭। বিজ্ঞাপনের হার সাধারণ এক পৃষ্ঠা মাসিক ৮৲, আধ পৃষ্ঠা ৪॥০, সিকি পৃষ্ঠা ২॥০, সূচীর নীম্নে আধ পৃষ্ঠা ৬৲, সিকি পৃষ্ঠা ৩॥০। বিশেষ বিশেষ স্থানে বিজ্ঞাপনের মূল্য প্রকাশকের নিকট জ্ঞাতব্য।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ নিয়োগী কর্ত্তৃক দি নিউ ইণ্ডিয়ান প্রেস—৬, ডাফ ষ্ট্রীট হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সম্পাদক—শ্রীতারকনাথ হাজরা।

সূচী

১।	ভারতের জাতিভেদ (প্রবন্ধ)	...	শ্রীহেমন্তকুমার ঘোষ	৩৩
২।	পথিক (কবিতা)	...	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন ঘোষ	৪১
৩।	অবজ্ঞাত (গল্প)	...	শ্রীপ্রমোদকুমার পাল, কাব্যবিনোদ	৪২
৪।	রাজগৃহের পথে (ভ্রমণ বৃত্তান্ত)	...	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ	৪৯
৫।	উদাসী হিয়া (কবিতা)	...	শ্রীসলিলকুমার হাজরা	৫৬
৬।	বিশ্ব-প্রবাহ	...		৫৭
৭।	সংবাদিকা	...		৫৮
৮।	আমাদের কথা	...		৫৯

৭ম বর্ষ] পৌষ, ১৩৪২ [২য় সংখ্যা

ভারতের জাতিভেদ

[শ্রীহেমন্তকুমার ঘোষ]

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম রক্ষার জন্য সম্প্রতি অনেকে বদ্ধপরিকর। তাঁহারা বলেন—বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মই হিন্দুর বিশেষত্ব। উহার লোপ হইলে হিন্দুর ধর্ম্মজীবন অন্তঃসারশূন্য হইবে,—হিন্দুজাতির আধ্যাত্মিক মৃত্যু সংঘটিত হইবে। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম সনাতন ধর্ম্মের অঙ্গ।

শাশ্বতস্যাস্য ধর্ম্মস্য ত্বঙ্গভূতঃ স্মৃতঃ খলু,
এষ বর্ণাশ্রমোধর্ম্মো ন স্বাতন্ত্র্যমতোঽর্হতি।

বর্ণবিভাগ ও আশ্রমবিভাগ অনুসারে যে আচার অনুষ্ঠানের স্বাতন্ত্র্য, সংক্ষেপে তাহারই নাম বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম।

বর্ণ অর্থ রঙ। গায়ের রঙের ভিন্নতা হেতু যে আচার, ব্যবহার, বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন ও উপাসনা পদ্ধতি প্রভৃতির পার্থক্য ঘটিত তাহাই বর্ণ ভেদের রহস্য। গায়ের রঙ অনুসারে আচার ব্যবহারের গণ্ডী প্রথমে ছিল না। প্রাচীন কালে যখন শ্বেতবর্ণ যজ্ঞকারী মানবগণ অন্য বর্ণ মনুষ্যের সংশ্রবে আসেন নাই, তখন তাঁহাদের মধ্যে একই বর্ণ ছিল, বর্ণ ভেদ ছিল না। ঐ অবস্থার বর্ণনা শ্রীমদ্ভাগবতে পাই—

এক এব পুরাবেদঃ প্রণবঃ সর্ব্ববাঙ্ময়ঃ।
দেবোনারায়ণশ্চৈক একোঽগ্নির্বর্ণ এব চ॥

পুরাকালে 'সর্ব্ববাঙময় প্রণব' একমাত্র বেদ ছিল। এক দেব ছিলেন—'নারায়ণ'। একটি মাত্র বর্ণ ছিল। এই এক বর্ণই—'শ্বেতকায় আর্য্যবর্ণ'। বেদে আমরা 'আর্য্যবর্ণ' কথা পাই ;—প্রার্য্যং বর্ণমাবৎ ইত্যাদি।

যখন শ্বেতকায় আর্য্যগণ, কৃষ্ণকায় অনার্য্যগণের সংসর্গে আসিলেন, তখন বর্ণ বিভাগের সূচনা হইল। শ্বেতকায়গণের বিবাহাদি প্রথা ও যজ্ঞাদি প্রথা একরূপ, কৃষ্ণকায় অনার্য্যগণের অন্যরূপ। এই শ্বেত কৃষ্ণ ভেদই ভারতে প্রথম বর্ণভেদ। বর্ণিগণের স্বাতন্ত্র্য আচারাদিই আদিম বর্ণধর্ম্ম। আর্য্যেতরগণের সংস্পর্শে দীর্ঘকাল বাসের পর যখন আর্য্যেতর জাতিরা আর্য্য-সভ্যতা গ্রহণ করিল এবং উভয়ের মধ্যে যৌনসম্বন্ধ আরব্ধ হইল, তখন অনেক রঙের লোক জন্মিল। তখন কেহ কালা, কেহ ধলা, কেহ মিশ্রিত বর্ণ হইল। তখন আর বর্ণানুসারে ধর্ম্ম চলিল না। তখন সকল বর্ণের একরূপ ধর্ম্ম হইল। তখন গায়ের রঙ ছাড়িয়া ব্যক্তিগত গুণানুসারে ধর্ম্মের ও কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান বিভিন্ন হইল। আমরা শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে ত্রয়োদশ শ্লোকে দেখিতে পাই—শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ। একই পিতামাতার সন্তানেরা উপযোগিতা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মকার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। ঐ সময় গায়ের শ্বেতবর্ণ ছাড়িয়া আন্তরিক গুণ শ্বেতবর্ণের স্থলে গৃহীত হইল। শাস্ত্রে যে কর্ম্মানুসারে বর্ণভেদের কথা আছে, তাহা গুণের ভেদে। ধর্ম্ম তখন গায়ের রঙের জ্ঞাপক না হইয়া, আন্তরিক গুণ ও তদনুযায়ী কর্ম্মের জ্ঞাপক হইল। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে প্রাপ্ত হওয়া যায়—

ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্ব্বর্ণতাং গতম্ ॥

বর্ণের ভেদ নাই। সমস্তই ব্রহ্মময়। ব্রহ্মা কর্ত্তৃক একরূপে সৃষ্ট হইয়া, পরে কর্ম্মানুসারে ভিন্ন বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে। ফলে কর্ম্মগুণে বহু কৃষ্ণকায় ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হইলেন। কর্ম্মদোষে বহু শ্বেতকায় ব্যক্তিও শূদ্র হইলেন।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারি জাতির উৎপত্তির মূলে গুণকর্ম্ম। আর্য্য অনার্য্যের মিশ্রিত সমাজে সুবিধার জন্য কর্ম্মভেদ বা ব্যবসায় ভেদ প্রবর্ত্তিত হয়। পূর্ব্বে এ ভাব ছিল না। একই পরিবারস্থ লোকেরা তখন নানা কার্য্য করিতেন। পিতা হয়ত যজ্ঞে পৌরহিত্য করিতেন, পুত্র চিকিৎসা করিতেন, মাতা ময়দা পিষিতেন। এরূপে সকলে মিলিয়া প্রয়োজনমত ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য করিতেন। দীর্ঘকাল পরে সমাজের পুষ্টি হইল। শ্রমবিভাগের প্রবর্ত্তন প্রয়োজন হইল। তখন ব্যবসায় বিভিন্ন বিভিন্ন গণ্ডী সৃষ্টির সূচনা হইল।

সমাজ প্রথমে চার শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। এক সম্প্রদায় বিদ্বান ও পূত চরিত্র লোক ব্রাহ্মণ নাম পাইলেন। তাঁহারা ধর্ম্মকর্ম্ম, আধ্যাত্মিক ব্যাপারাদির ভার পাইলেন। আর একদল সাহসী, রণ-নিপুণ, দেশপ্রাণলোক ক্ষত্রিয় হইলেন। কৃষি, বাণিজ্য, বৈশ্য নামক একদল সহিষ্ণু, ব্যবসায়বুদ্ধিসম্পন্ন লোকের মস্তকে ন্যস্ত হইল। শ্রমিকগণ শূদ্র নাম পাইলেন। যাঁহারা জ্ঞানে গুণে, বিদ্যায়, পরহিতৈষণায় শীর্ষস্থানীয় সাত্ত্বিক মানব তাঁহারাই ব্রাহ্মণ। শৌর্য্যে, সাহসে যাঁহারা সিংহ সদৃশ তাঁহারা ক্ষত্রিয়। সমাজের ধনবলের যাঁহারা রক্ষক তাঁহারা বৈশ্য ও শ্রমিকেরা শূদ্র। কিরূপ গুণবান্ লোক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ইত্যাদি হইলেন তাহার বর্ণনা এস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে—শ্রীমদ্ভাগবতে আছে :—

শমোদমস্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ ক্ষান্তিরার্জ্জবম্।
জ্ঞানং দয়াত্মুতাত্মত্বং সত্যঞ্চ ব্রহ্মলক্ষণম্॥

শম, দম, শৌচ, তপস্যা, সন্তোস, ক্ষান্তি, সরলতা, জ্ঞান, দয়া, ঈশ্বরপরতা ও সত্য ব্রাহ্মণের লক্ষণ। ইহা শুধু পুঁথিগত ছিল না, তাহার প্রমাণ সত্যসন্ধ দাসীপুত্র জবালের উপাখ্যানে দেখিতে পাওয়া যায়।

ক্ষত্রিয় সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে আছে :—

শৌর্য্যং বীর্য্যং ধৃতিস্তেজস্ত্যাগশ্চাত্মজয়ঃ ক্ষমা।
ব্রহ্মণ্যতা প্রসাদশ্চ সত্যং চ ক্ষাত্রলক্ষণম্॥

অর্থাৎ শৌর্য্য, বীর্য্য, ধৃতি, তেজ, ত্যাগ, আত্মজয়, ক্ষমা, ব্রহ্মণ্যতা, প্রসাদ ও সত্য, ক্ষত্রিয়ের লক্ষণ।

বৈশ্য সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে আছে :—

দেবগুর্ব্বচ্যুতে ভক্তিস্ত্রিবর্গ পরিপোষণম্।
আস্তিক্যমুদ্যমোনিত্যং নৈপুণ্যং বৈশ্যলক্ষণম্॥

অর্থাৎ দেবতা, গুরু ও ঈশ্বরে ভক্তি, ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের পরিপোষণ অথবা বর্ণত্রয়ের প্রতিপালন, আস্তিকতা ও নিত্য উদ্যম বৈশ্যের লক্ষণ।

শূদ্র সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে আছে :—

শূদ্রস্য সন্নতিঃ শৌচং সেবা স্বামিন্য মায়য়া।
অমন্ত্রে যজ্ঞোঽস্তেয়ং সত্যং গো-বিপ্ররক্ষণম্॥

অর্থাৎ শূদ্রের লক্ষণ সরতি, শৌচ, অকপটে প্রভুসেবা, অমন্ত্রক, যজ্ঞ, অস্তেয়, সত্য ও গো ব্রাহ্মণ রক্ষা। মহাভারতীয় শান্তিপর্ব্বে ভৃগুভরদ্বাজ সংবাদে লিখিত আছে :—

জাতকর্ম্মাদিভির্যস্ত সংস্কারেঃ সংস্কৃতঃ শুচিঃ।
বেদাধ্যায়নসম্পন্নঃ ষট্‌সু কর্ম্মস্ববস্থিতঃ।
শৌচাচারস্থিতঃ সম্যগ্ বিঘসাশী গুরুপ্রিয়।
নিত্যব্রতঃ সত্যপরঃ যবে ব্রাহ্মণউচ্যতে।
সত্যং দানমথাদ্রোহঃ আনৃশংস্যং ত্রপাঘৃণা।
তপশ্চ দৃশ্যতে যত্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ।
ক্ষত্রজং সেবতে কর্ম্ম বেদাধ্যয়ন সঙ্গতঃ।
দানাদানরতির্যস্ত সর্ব্বেঃ ক্ষত্রিয়উচ্যতে।
বিশত্যাশু পশুভ্যশ্চ কৃষ্যাদানরতঃ শুচিঃ।
বেদাধ্যায়নসম্পন্নঃ স বৈশ্য ইতি সংস্থিতঃ।
সর্ব্বভক্ষ্যরতির্নিত্যং সর্ব্বকর্ম্মকরোঽশুচিঃ
ত্যক্তবেদস্বনাচারঃ সর্ব্বে শূদ্র ইতি স্মৃতঃ।

মানবের সমষ্টিই সমাজ। সমাজ ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। ধর্ম্মশাস্ত্রের দিকে তাকাইলে দেখিতে পাই—

চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ হরিভক্তিপরায়ণঃ।
হরিভক্তিবিহীনস্ত ব্রাহ্মণোঽপি শ্বপচাধমঃ॥

অর্থাৎ ব্যক্তিবিশেষের গুণের উপরই তাহার শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে—তা ব্রাহ্মণই হউক, আর শূদ্রই হউক। তাই মহামুনি ব্যাসদেব শূদ্রাণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াও শাস্ত্রে ও সমাজে শ্রেষ্ঠ আসন পাইয়াছিলেন। উগ্রতপা বিশ্বামিত্র সাধন-সমরে অবতীর্ণ হইয়া বিশ্বত্রাণ উৎপাদন করিয়াছিলেন এবং সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিলেন। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যিনি শাস্ত্রে পূর্ণব্রহ্মরূপে পরিকীর্ত্তিত ও পূজা পাইতেছেন, তিনি গোপের গৃহে লালিত পালিত। হিন্দুর ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ও অবতারগণের দিকে লক্ষ্য করিলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, জন্মগত-জাতিভেদের কোন সার্থকতা নাই। বাংলার প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যদেব অবতীর্ণ হইয়া জগাই মাধাইকে উদ্ধার করিলেন; যবন হরিদাসকে কোল দিলেন। শাস্ত্র আলোচনা করিলে এই প্রকার ভূরি ভূরি উদাহরণ পাওয়া যায়। হিন্দু-ধর্ম্মের এই মহান্ উদারতা জন্মগত-জাতিভেদের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে।

প্রকৃতপক্ষে জন্মগত-জাতিভেদ কাল্পনিক। অবস্থাভেদে সমাজের আবশ্যকতা ও অনাবশ্যকতাবশে ইহা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নরূপে দেখা দেয়। বস্তুতঃপক্ষে সমাজে জন্মগত-জাতিভেদের কোন সত্তা বা সার্থকতা নাই। জন্মগত-জাতিভেদ সমাজকে পঙ্গু করিয়া ফেলে, মানবসমাজকে দুর্ব্বল করিয়া তোলে। জাতির অগ্রগতির পথে দুর্ভেদ্য প্রাচীরের ন্যায় মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়। তাই কবি বলিতেছেন ঃ—

"এবার তোরা শেষ করে দে
অত্যাচার আর মিথ্যাচার।
বামুন শূদ্রে নাই ভেদাভেদ
জোর করে কর একাকার॥
বড় হয়ে জন্মেনি কেউ
করতে শাসন দুর্ব্বলেরে।
শাসন নামে পীড়ন শুধু
করছে কেবল গায়ের জোরে॥
ঐ যে মেথর সবার ছোট
বলতে পার কোন্ কারণে।
ময়লা যত সাফ করে দেয়
ময়লা নেই ত তাদের মনে॥
ওই যে বামুন সবার বড় ;
কিসের জোরে বলতে পার ?
পৈতে পরেই উন্নতিলাভ
এই কথাটি বড়ই মজার"॥

তথাকথিত অবনত জাতি অজ্ঞতাবশতঃ মনে করিতেছে আমি 'ছোট', আমার 'অদৃষ্ট' আমাকে ছোট বংশে জন্মগ্রহণ করাইয়াছে, আমার আর বড় হইবার উপায় নাই **"so far and no farther"**—তাহার মনোগতিই তাহার উন্নতির অন্তরায়। তাহার হৃদয়ে উচ্চ আশা আকাঙ্ক্ষা স্থান পায় না—যেহেতু সে মনে করে, আমি 'ছোট', জাতি ছোট থাকাই আমার অদৃষ্ট। ফলে গোলামসুলভ মনোগতিবশতঃ তাহাকে বড় হইতে উপদেশ দিলেও, তাহার মনের বাঁধ ভাঙ্গে না, তাহার চৈতন্য হয় না। সে জানে তথাকথিত 'উচ্চ-জাতিকে' সেলাম ঠুকিতে, আর

হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছি, আমি ত বড়ই আছি, আমি আবার বড় হইব কি? আমার পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি ফলে আমি 'উচ্চ-বংশে' জন্মগ্রহণ করিয়াছি। এইরূপে কত বঙ্গসন্তান 'অমানুষ' 'কুমানুষ' হইতেছে চিন্তাশীল ব্যক্তি তাহা ভাবিয়া দেখিবেন। তথাকথিত উচ্চজাতি মনে করে নিম্নজাতির সেবা পাওয়া তাহার অধিকার। কিন্তু তিনি ঐ প্রকার সেবা পাইবার উপযুক্ত মহত্ত্ব বা মনুষ্যত্বের অধিকারী কি না তাহা ভাবিবার অবসর হয় না। পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির কথা মনে করিয়া তথাকথিত উচ্চজাতি জাত্যাভিমান বশতঃ ইহজীবনে সুকৃতি বা সুকর্ম্ম দ্বারা মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করিতে অবহেলা করেন অপরদিকে তথাকথিত নিম্নজাতি পূর্ব্বজন্মের দুষ্কৃতির বা দুরদৃষ্টের কথা মনে করিয়া নিজেকে এমন পঙ্গু মনে করে যে, সে ইহজীবনে পুরুষকারের দ্বারা মনুষত্ব বা দেবত্ব অর্জ্জন করতঃ তাহার পূর্ব্বজন্মের দুষ্কৃতির বা দুরদৃষ্টের খণ্ডন করিতে পারে তাহাও সে ভুলিয়া যায়।

হিন্দুধর্ম্মের মহাপ্রাণতার মধ্যে, সার্ব্বজনীনতার মধ্যে জন্মগত-জাতিভেদের ন্যায় অনুদারতার স্থান কোথা হইতে আসিল—ইহা সত্য সত্যই ভাবিবার বিষয়। পুরাণে, ইতিহাসে যাহা পাওয়া যায়, তাহাতে মনে হয় বর্ত্তমানে ইংরাজ ও ভারতবাসীর যে সম্বন্ধ অর্থাৎ প্রভু-ভৃত্য, পূর্ব্বকালে মধ্য-এশিয়া হইতে আর্য্যগণ ভারতে আসিলে, ভারতে আর্য্যের সহিত আদিম অধিবাসী অনার্য্য সংঘর্ষেও সেই অবস্থা হইয়াছিল। অর্থাৎ আর্য্যগণ ভারতে আসিয়া অনার্য্যগণকে ভৃত্যবৎ জ্ঞান করিতেন! সেই অবধি শূদ্রের সৃষ্টি। এদিকে সমাজের কল্যাণ কামনায় কর্ম্মের বিভাগ (Division of Labour) আবশ্যক হইল। তদনুযায়ী একই আর্য্যবংশ-সম্ভূত বিভিন্ন ব্যক্তি স্বীয় স্বীয় ক্ষমতানুসারে (Capacity) সমাজের বিভিন্ন কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। প্রতিভাবান ও মেধাবী ব্যক্তিগণ শাস্ত্রাদি উপনয়নে, উগ্রবীর্য্যে শারীরিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ দেশরক্ষায় এবং অপর শ্রেণী দেশের আর্থিক উন্নতির চেষ্টায় নিযুক্ত হইলেন। এইরূপে গুণকর্ম্ম-বিভাগশঃ একই আর্য্যজাতি চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেন। এই যে শ্রেণীবিভাগ, ইহাতে উচ্চ নীচের ভেদাভেদ ছিল না। জন্মগত শ্রেণী বিভাগও এই সময়ে সৃষ্টি হয় নাই। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারি বিভাগকে মানব-সমাজের অত্যাবশ্যকীয় চারিটী অঙ্গ বলা হয়। এক অঙ্গের অভাবে অপর অঙ্গের অস্তিত্বের কোন সম্ভব নাই। এই অঙ্গ সমাজ রক্ষার্থ যেমন আবশ্যক অপরটিও ঠিক তদ্রূপ। একটি অঙ্গকে অবহেলা করিবার অপর অঙ্গের কোন কারণ নাই বা অধিকার নাই। পরে নানা অবস্থা বিপর্য্যয়ে সমাজবিপ্লব, রাষ্ট্রবিপ্লব, ও ধর্ম্মবিপ্লবের মধ্য দিয়া হিন্দুসমাজ অতিক্রম করিয়াছে। এই সময়ে হিন্দুসমাজের জাতিভেদের ঐতিহাসিক ধারা পাওয়া কঠিন। ক্রমে ক্রমে চারি জাতির স্থলে ৩৬ জাতি, ৩৬ জাতি স্থলে ৩৬ শত জাতির সৃষ্টি হইল।

হিন্দুর রাজত্বকালে গুণকর্ম্মবিভাগশঃ যে শ্রেণীবিভাগ সমাজে শৃঙ্খলা ও মঙ্গলের কারণ হইয়াছিল, আজ আর সে অবস্থায় হিন্দুসমাজ নাই। একদিন হিন্দুসমাজে যে শ্রেণীবিভাগ অশেষ মঙ্গলকর ছিল আজ আর তাহার কোন আবশ্যকতা নাই।

বাংলার হিন্দুসমাজে বর্ত্তমান শ্রেণী বিভাগের যে প্রবল আন্দোলন চলিতেছে, তাহাতে মনে হয় সকলেই ব্রাহ্মণত্বের দিকে ঝুকিতেছেন। হিন্দুর ছত্রিশ শত জাতি ভাঙ্গিয়া আবার পূর্ব্বতন চতুর্ব্বর্ণ গড়িবার প্রয়াস চলিয়াছে। কিন্তু অধুনা বিশেষত্ব এই যে, কেহই শূদ্র শ্রেণীভুক্ত হইতে চাহেন না। বর্ত্তমানে কেহবা ব্রাহ্মণ, কেহবা ক্ষত্রিয়, কেহবা বৈশ্য নামে পরিচিত হইতেছেন। অবশ্য ইহা সকলের নিকটই সুবিদিত যে কর্ম্মের একাধিপত্য বর্ত্তমান যুগে কোন সমাজেই নাই। প্রত্যেকেই স্বীয় প্রতিভা (Merit) ক্ষমতা (Capacity) অনুযায়ী কর্ম্ম করিতেছেন। কাহারও বাধা দিবার অধিকার নাই। কাজেই জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে পরস্পর পরস্পরের ব্যবসায় অবলম্বন করতঃ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। কিন্তু সমাজে বহু দিনকার প্রচলিত সংস্কার-বশে যে জন্মগত-জাতিভেদের ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান আছে, তাহারই ফলে এখনও বিভিন্ন জাতির মধ্যে পরস্পর নির্য্যাতন এবং ঘৃণার ভাব পরিলক্ষিত হয়। ফলে ধ্বংসোন্মুখ হিন্দুসমাজে আশানুরূপ এবং আবশ্যকমত মত সংগঠন হইতেছে না। মনে হয় ইহারই প্রতিকার কল্পে এবং সমাজে ঐক্যতানের সুর সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে সেবার কলিকাতায় হিন্দুমিশনের অধিবেশনে হিন্দু নামধারী "সকল জাতিই ব্রাহ্মণ" (All Hindus are Bramhin) এই প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। বর্ত্তমান জগতের শ্রেষ্ঠ মানব মহাত্মা গান্ধী হরিজনের অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ এবং তাহাদের মন্দির প্রবেশের অধিকার দাবী করিয়া যে আন্দোলন চালাইতেছেন তাহারও মূলে ঐ একই কথা—মানবের মনুষ্যত্বের দাবী। তাই মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও ব্যবস্থা দিয়াছেন যে, যাহারা অস্পৃশ্য তাহারা যথাবিধি দীক্ষিত হইলে দ্বিজত্ব লাভ করে এবং দেবমন্দিরে প্রবেশপূর্ব্বক প্রতিষ্ঠিত দেবতার পূজাদিতে প্রকৃত অধিকারী হইতে পারে। মহাত্মা গান্ধীর নিকট মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ কর্ত্তৃক যে "মন্দিরপ্রবেশ ব্যবস্থা" প্রেরিত হইয়াছিল, তাহা সকলেরই অনুধ্যানযোগ্য।

মানব সমাজে মনুষ্যত্বের দাবী সর্ব্বাগ্রে। হিন্দুর ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—চতুর্ব্বর্ণ এই মনুষ্যত্বেরও সাধনা। 'হিন্দুর ব্রাহ্মণ' এই মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ। ব্রহ্মকে যিনি জানেন তিনিই 'ব্রাহ্মণ'। ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিলেই ব্রাহ্মণ হয় না বা তথাকথিত নিম্নবংশে জন্মগ্রহণ করিলেই ব্রাহ্মণত্ব লাভে অনধিকারী বলা যায় না। "[illegible]

মানুষের পুরুষকার তার নিজের আয়ত্তে। সে তাহার পুরুষকার বলে সাধনা দ্বারা তাহার মনুষ্যত্বের পূর্ণবিকাশ করিতে অধিকারী। অর্থাৎ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে অধিকারী। সমাজের কৃত্রিম শ্রেণীবিভাগ বা জাতিভেদ মানবের মনুষ্যত্বের পথে বাধা দিতে পারে না। 'শাস্ত্র' এবং 'ন্যায়' কখনই জন্মগত-জাতিভেদ দ্বারা মানবের ঐহিক বা পারলৌকিক উন্নতির অন্তরায় হইতে পারে না। মানবসমাজে তাহার সাধনাবলে আধ্যাত্মিক সাধনার চরমে উঠিবে, ইহাই তাহার স্বাভাবিক প্রবণতা বা গতি। ইহাপেক্ষা সহজ সত্য আর কিছুই হইতে পারে না। উদ্যানের প্রত্যেক তরুটি আবশ্যকমত জল-বায়ু এবং আলোক পাইয়া সুষমাবিশিষ্ট হইয়া বর্দ্ধিত হইবে, ইহাতেই মালীর আনন্দ। সমাজকর্ত্তা দেখিবেন যেন মানবসমাজে অমানুষ বা কুমানুস না থাকে। সমাজের প্রত্যেক মানুষটি যেন মনুষ্যত্বের চরমে আরোহণ করিতে পারে। প্রত্যেক মানবই নিজের ক্ষমতাবলে সমাজে শীর্ষস্থান লাভ করিতে পারেন। আর যিনি শিক্ষা-দীক্ষায়, অর্থ-সম্পদে, মনুষ্যত্বে পশ্চাৎপদ, তিনি এক স্থানে স্থির থাকিবেন, তাহা কখনও হইতে পারে না। স্বাভাবিক অগ্রগতিতে মানব চিরদিনই আগাইতে চায়।

সংস্কারের এমনই শক্তি যে, আমাদের শিক্ষিত ব্যক্তিগণও জাতিভেদের মিথ্যামোহ কাটাইতে পারিতেছেন না। 'Delhi'তে নিখিল বঙ্গীয় কায়স্থ সভার যে অধিবেশন হইয়া গিয়াছে, তাহার সুযোগ্য সভাপতি শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ সিংহ মহাশয় জাতিভেদের সমর্থন করিয়া বলিয়াছিলেন,—'প্রত্যেক জাতি আপন আপন বৈশিষ্ট্যের পূর্ণ বিকাশ করিলেই ভারতীয় জাতি পূর্ণভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে'। কিন্তু হিন্দুদের মধ্যে কোন্ জাতি আছে যে বৈশিষ্ট্যের বিকাশ করিবার জন্য জাতিভেদ বজায় রাখিতে হইবে? আজ ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থের মধ্যে তফাৎ কি? তাহাদের মধ্যে বিবাহের আদান প্রদান কেন চলিবে না? এই মিথ্যা বৈশিষ্ট্যের দোহাই দিয়া যে ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি ভেদ করা হইয়াছে তাহা নহে, আরও নানা খণ্ডজাতির সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু এই মিথ্যা ভেদ বৈষম্য কখনই সমাজের পক্ষে কল্যাণকর হইতে পারে না। জাতির পবিত্রতা ও বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিবার যে চেষ্টা তাহার কতকটা তখনই থাকে, যখন জাতির মধ্যে জীবনী শক্তি থাকে।

মনুষ্যত্বের দাবীর উপর সকলের নির্ভর করিতে হইবে। এর চেয়ে বড় কথা দুনিয়ায় নাই। চাই মানবতা। আসুন আমরা সকলে মানবতার বেদিমূলে সমবেত হইয়া এক মহান্ জাতি সৃষ্টির সাহায্যকারী হই। এই জাতি ব্রাহ্মণ জানে না, ক্ষত্রিয় জানে না, বৈশ্য জানে না, শূদ্র জানে না। জানে শুধু মানুষ কেউ কারো চেয়ে ছোট নয়, সবাই সমান। সমগ্র জাতির দেবতা যে একত্বের বাণী ছড়াইয়া এই সাম্যভাবের বন্যা আনিয়াছেন, তাহার প্রকোপ

রোধ করে কার সাধ্য? প্রকৃতপক্ষে বলিতে গেলে ভারত আজ মোহাচ্ছন্ন। এই মোহ কাটাইতে হইলে আমাদের সর্ব্বদাই গীতার নিম্নলিখিত মহাবাক্যগুলি সদৈব স্মর্ত্তব্য।

(১) চাতুর্ব্বর্ণং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।

(২) বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥

(৩) আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞান বিমোহিতাঃ॥
অনেকচিত্ত বিভ্রান্তা মোহজাল সমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কাম ভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ॥

পথিক

[শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন ঘোষ]

নিত্য নূতন গন্ধ এবে পূর্ণ করে ধরা—
জীর্ণ দেহে চলে পথিক হ'য়ে পথ হারা।
নাহি জানে বেদন্ কোথা—কোথা শান্তি ধারা—
পথে ঘোরে উদাস প্রাণে হ'য়ে গৃহ হারা।
গৃহে ছিল সাঁজের মণি নিভেছে অকালে;
অশ্রুঝরা নয়ন খোঁজে—কোথা বা হারালে!
হয়ত দিতে পারেনি সে পূর্ণ-প্রেম-প্রীতি
তাহ'লে রেখে চলে গেছে ব্যথা-ভরা-স্মৃতি!
পথিক কত চলে আজ এই পথ বেয়ে,—
ফির্‌ছে দিকে দিকে যেন কার পথ চেয়ে;
পথিক আজ পথ হারা—গৃহ হারা হায়!—
চল্‌ছে তবু নব ভাবে আনন্দ দোলায়।
অতীত অন্ধকার ভেদি' পাবে কি আলোক?
মানসে জাগিবে কি তার স্মৃতিপূর্ণ শোক?
মনে রাখি কথা তারই যদি ক্ষণ তরে—
পাও সুখ;—মিলনেরই পথ পরপারে।

অবজ্ঞাত

[শ্রীপ্রমোদকুমার পাল, কাব্যবিনোদ।]

—আমাদের লতা—লতে—লতাঃ কোথায় মাসীমা ?

লতিকার বন্ধু নীলিমা লতিকাদের রান্নাঘরের সাম্‌নে আসিয়া কথাগুলি বলিল। লতিকার জননী নীলিমার হাসিমুখখানার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—ওপরে পড়ার ঘরেই আছে মা।

নীলিমা ব্যগ্রস্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—ভাল কথা মনে পড়ল'। অজিতদার কোন খবর পাওয়া গ্যাছে কি মাসীমা ?

লতিকা-জননী মুখ বাঁকাইয়া ভ্রূ-কুঁচকাইয়া তাচ্ছিল্যস্বরে বলিলেন,—কে আর খবর নিয়েছে মা! তা ছাড়া ও একরকম ভালই হয়েছে। বৌ-ঝির বাড়ী, একটা পর-বেটা ছেলে যে, সর্ব্বক্ষণ ঘোরা ফেরা করবে—এটাও ভাল দেখায় না। জানিস্ ত' মা,—কালটী কেমন ? একে পায় ত' আরে চায়। এতদিন সব ছোট ছিল মানাত, এখন কি আর ভাল দেখায়! আমার ছেলেরা, জামাইরা মোটেই ভাল বাসত' না। কেবল তোমার মেসোমশায়ের জন্তেই কিছু বল্‌তে পারত' না। আপনা আপনি সে যে গ্যাছে—ভালই হয়েছে মা।

নীলিমা যে আনন্দের চাপল্য লইয়া আসিয়াছিল, ঠিক তাহার বিপরীত আঘাত পাইল। সে মুখ নীচু করিয়া পায়ের নখে মাটী খুঁটিতে খুঁটিতে বলিল,—কিন্তু যাই বলুন মাসীমা, তাঁর মত চরিত্রের লোক পাঁচজনের হিংসের জিনিষ। তিনি গ্যাছেন,—যেখানেই থাকুন না কেন, তাঁর জীবন আরো উন্নত হ'ক। কিন্তু একটা মনস্তাপ বুঝি আমাদের সকলকেই পেতে হবে।

সে আর দাঁড়াইল না,—পাশের সিঁড়ি দিয়া দ্রুতপদে উপরে উঠিয়া গেল। লতিকার ঘরের দরজা বন্ধ ছিল। সে আস্তে আস্তে ঠেলিয়া দেখিল,—লতিকা মেঝের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে। সে ভিতরে গিয়া পূর্ব্বের মতই দরজা বন্ধ করিয়া ডাকিল,—লতি—

লতিকা মুখ তুলিয়া নীলিমাকে দেখিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল। বলিল,—বস্ ভাই।

লতিকা যে কিছু পূর্ব্বে কাঁদিয়াছিল, তাহা তাহার মুখ চোখের অবস্থা দেখিলেই বুঝা যায়। নীলিমা সে কথা গোপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—তোর কি অসুখ করেছে লতি ?

লতিকা মুখে ম্লান হাসি টানিয়া বলিল,—অসুখ! না,—তেমন কিছু নয়।

—তবে ?·········অজিতদার জন্তে মনটা খারাপ হয়েছে না রে!

—বুঝি তাই হবে নীলি। কিন্তু, এতদিন ধরে তাঁর ওপর যে অবিচার করে এসেছি, সে অবিচারের অনুতাপ আজ বেশ ভোগ কর্‌ছি। সেই দেবতাকে হতশ্রদ্ধায় যে পূজা থেকে বঞ্চিত করেছি, তার শাস্তি দেখ্ ভাই—

এই বলিয়া লতিকা একগোছা মোড়া কাগজ নীলিমার কোলের উপর ফেলিয়া দিল। নীলিমা গভীর আগ্রহে খুলিয়া দেখিল, একখানি দীর্ঘ পত্র। সে আনন্দে বিস্ময়সুরে বলিয়া উঠিল,—এ যে অজিতদার লেখা রে। কবে এল ?

—আসেনি ভাই। তাঁরই দেওয়া একখানা বইয়ের মধ্যে ছিল। তাঁর অভাবটাকে একটু ভুল্‌তে চেয়ে বইখানা খুলে দেখি,—চিঠিখানা রয়েছে। ভাই নীলি, অভাব ভুল্‌তে গিয়ে মহা অভাবের সৃষ্টি হ'ল। একটা 'মানুষ'—যিনি নাকি জীবনের একভাগ পরকে আপনার করে নিতে সকল কিছুই উৎসর্গ করেছেন,—তিনি আজ তার প্রতিদানে নিয়ে গ্যালেন—অবজ্ঞার হাহাকার। যাক্, ভালই হয়েছে। তিনি যে আজ এই সঙ্কীর্ণতা ছেড়ে বিস্তারের পথে নিজেকে বিস্তৃত করে দিলেন সেই তাঁর উপযুক্ত। চিঠিখানা পড়্ তুই।

নীলিমা সাশ্চর্য্যে বলিল,—আমি পড়ব' !

—আশ্চর্য্য হচ্ছিস্ যে ? পড়ে দেখ্, বুঝ্‌বি—শুধু তুই কেন ; সকলেই এই চিঠি পড়বার অধিকারী। অনেক কিছু শেখবার আছে ওতে। তবে একটু চেঁচিয়ে পড়্, আমি শুনব। নীলিমা একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া অনুচ্চস্বরে চিঠিখানি পড়িতে লাগিল।

ওগো মানস-প্রতিমা !

আজ জীবনের একটী বিশেষ অধ্যায়ের কথা তোমায় জানাব। জানিনা, সে অধ্যায়ের তীব্র স্পর্শ তুমি অনুভব করবে কি না। যদিও আমি আজ সকল দিক থেকে তোমাদের কাছে উপেক্ষিত, তবুও জেন' এই জীবনটা তোমাদের চেয়ে কম মূল্য-হীন নয় ! আমার মধ্যেও একটা মানব-প্রকৃতি বলে অদৃশ্য জিনিষ, এই বিশাল পৃথিবীর একটা অতি ক্ষুদ্র অংশে চির-জাগ্রত হ'য়ে আছে। সেই প্রকৃতির যে আদান-প্রদান তোমাদের মধ্যে চল্‌ছে আমার মধ্যেও তার কম কিছু নয় ! তবে আমার দুর্ব্বলতার মধ্যে এই যে, তার আদানের ভাগ অতি কম। প্রদানের হিসাব—মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়ে আমাকে মহাশূন্য করেছে। যাক্,—আজ তোমায় বা তোমাদের যা' জানাতে

......আচ্ছা, কতদিন তোমাদের আশ্রয়ে কাটিয়েছি ভাব দেখি! তা' অনেকদিন হবে--না? বোধ করি আট বৎসর। যখন তোমাদের ওখানে প্রথমে গিয়ে নিজের সত্বা হারালাম—তখন তোমার কি মনে পড়ে তুমি কতটুকু? খুব ছোট। বছর ৭।৮ বয়স হবে!........ একটী সুন্দর, চঞ্চল, মনভোলা প্রজাপতির মত তুমি আমার চারিদিক অধিকার করে নিলে। কিন্তু আজ?... ..আজ আমি তোমাদের কাছে এক বোঝা আবর্জ্জনার মত পরিত্যক্ত, ঘৃণিত ও নিন্দিত। খুব ছেলেবেলা থেকে বুঝতে শিখেছি, আমি সহায়হীন—সম্বলহীন। তাই সেই সূত্রে—দিনের পর দিন 'লোকচরিত্র' বোঝবার অভিজ্ঞতা ভালভাবেই অর্জ্জন করেছি। ফলে কি বুঝেছি জান? বিশেষ আবার তোমাদের সঙ্গে আট বছর জীবন উজাড়-করা সত্বা হারান'তে বুঝেছি,—মানুষ মানুষের যা' সৎ তা' বোঝে না, দোষ অপরাধও বোঝে না! যা' সৎ যা' গুণ, তার নিন্দা করা, তাকে ঘৃণা করা,— যা' দোষ তার আদর করা, সংসারের চিরন্তন বৈচিত্র্য। যদিও 'লোকচরিত্র' জ্ঞানের অতীত অথবা দুর্জ্ঞেয়, মীমাংসা-শূন্য অথবা জটিলতাপূর্ণ, অসীম, অলেখ্য, তবুও যখন 'না' শব্দটীর সৃষ্টি হয়েছে, তখন তার পিছনে নিশ্চয়ই 'হাঁ' অপেক্ষা করছে। 'না'—'হাঁ' এদের দ্বন্দ্ব চিরকাল। এবং তাদের দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে 'মানুষ' ক্ষতবিক্ষত হচ্ছেও চিরকাল। ব্যূহ ভেদ ক'রে পালাবার শক্তি নেই—তিলে তিলে নিঃশেষ হয়ে আসছে আঘাতের পর আঘাত পেয়ে। কাজেই সংসারে সুখ-শান্তি কোথায়? চারিদিকে যখন কেবল স্বার্থ বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে,—অবিশ্বাস যখন বড় যত্নে গড়া কত আশার জিনিষ নিমিষে ভূমিসাৎ ক'রে দিচ্ছে, তখন মানুষ কেন সুখ-শান্তি খোঁজে? শুনি মানুষ 'সব-জান্তা'! সে নাকি বিশ্ব-স্রষ্টার এই বিশাল সৃষ্টি খানাকে ভেঙ্গেচুরে গড়তে চায়, কিংবা ভাবে নাকি, তার সংস্কারের সময় এসেছে। আচ্ছা, বলতে পার! যাদের এত জ্ঞান, এত শিক্ষা, তারা কেন জানে না যে, তাদের স্বার্থসাধনের যে বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা তার মধ্যে কোন সুখ নাই—কেবল ক্ষুধার মাত্রা বৃদ্ধি করে। তাদের মধ্যে যে অবিশ্বাস-দৈত্য মাথা উঁচু করে গর্জ্জন করছে,—তার মধ্যে কোন প্রকৃত শান্তি নাই, শুধু মানব-ঘৃণারূপ অসংযত অন্তর্দাহ আছে। তারা কি জানে না—এই মহা স্বার্থজড়িত, অশান্তিপূর্ণ, অবিশ্বাসপীড়াগ্রস্ত-সংসারে সুখের অন্বেষণ করা বৃথা! কিসের আশায় তারা বেঁচে থাকে? কিন্তু বুঝি বেঁচে থাকাই দরকার; কারণ সংগ্রামই জয় পরাজয়ের নিদর্শন জানিয়ে দেবে।

তোমাদের কাছে দীর্ঘ আট বৎসর ধরে যে উপকার পেয়েছি—তার প্রতিদান দেওয়া যাবে কিনা জানি না। তবে এতদিন ধরে তার কিছু 'সুদ' বোধ হয় দিয়ে এসেছি। আমার মধ্যের মনুষ্যত্বকে সর্ব্বদা জাগ্রত রেখে তোমাদের মঙ্গলের জন্য প্রাণকে উপযুক্তভাবে উৎসর্গ করে এসেছি। কিন্তু কেন জানিনা, তার বিনিময়ে বোধ হয় অনুগ্রহপ্রার্থী মনে করেই মর্ম্মান্তিক ঘৃণায় তোমরা

আমায় ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছ। অবশ্য সকলের ঘৃণাকে আমি হাসি মুখেই বরণ করে নিয়ে চল্‌তাম ; কিন্তু যেদিন জান্‌লাম এই ঘৃণাকরা ব্যাধি তোমার মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছে, সেদিন আমি উদ্‌ভ্রান্ত হলাম। অত্যাচার, অবিচার আমাকে বিপর্য্যস্ত করে দিলে। আমার ধারণা কি ছিল জান ? ধারণা ছিল,—আমি আমার সচ্চরিত্রের জন্য সকল দিক্‌ জয় করে যাব। কিন্তু সংসারে চরিত্রের আদর কোথায় ? এখানে পাপের পূজা, অমানুষের আদর, অসত্যের উচ্চস্থান চিরপ্রসিদ্ধ। এই দীর্ঘ দিনের একটীর পর একটী ভেবে দেখ’ তুমি, কোন্‌ জায়গায় আমি আমার মনুষ্যত্বকে হারিয়েছি ! তোমাদের উপকারের কৃতজ্ঞতায় আমি আমার বুকের শেষ রক্তবিন্দুটী পর্য্যন্ত দিয়েছি। কিন্তু তার বিনিময়ে আমি ঘৃণার পাত্র হ’য়ে দূরে সরে দাঁড়ালাম। তোমাদের বিশেষ তোমার কাছে অনেক আশা করেছিলাম, এবং সে আশাকে আমি চলে আসবার দিনটী পর্য্যন্ত আঁকড়ে ধরে এসেছি ও এখনও তার হাত থেকে নিস্তার পাইনি ! ভয় হয় বুঝি হারিয়ে ফেল্‌লাম। যদি প্রকৃত হারাই, জানব—ঈশ্বরের সৃষ্টির মধ্যে যদি কোন কদর্য্যতা থাকে, তবে সে এই ‘মানুষ’ !—কথাটা খুব রূঢ় শোনাচ্ছে না ? তুমি হয়ত ভাব্‌বে আমি আমার স্বার্থ হারিয়ে এত বড় একটা অসত্য কথা বলে ফেল্‌লাম। কিন্তু তুমিই ভাব, মানুষ মানুষের কাছে মানুষের মতই ব্যবহার আশা করে কি না ? তা’ থেকে যদি বিপরীত ভাব ঘটে তাকে কদর্য্য ছাড়া আর কি বল্‌ব।

... .আমি যেমন সহজ, সরল ভাবে, স্বর্গীয় দীপ্তিতে তোমাদের মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে একটা সমতার আশা করেছিলাম, ঠিক তার বিপরীত ঘটনা ঘটে গেল ! কুটীলতা, জটিলতার আবহাওয়া আমার সারা আত্মা-মন-জীবন বিষাক্ত দুর্গন্ধে পূর্ণ করে দিলে। অনেক স্মৃতি তোমাদের কাছে ফেলে এসেছি। আমাকে যা’ কিছু ভাবনা’ কেন, তবুও স্মৃতিগুলি মনে করে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানিও, আমি যেন চরিত্রকে সম্বল ক’রে সংসারে থাক্‌তে পারি। সংসারে আমি সমাজ, আদর-যত্ন, অভ্যর্থনা, অভিবাদন, কামনা, বাসনা, অর্থ, সম্পদ, যশ-মান কিছুই চাইনা ; চাই শুধু যা’ মানুষকে ‘প্রকৃত মানুষ’ করে সেই সহজ-সরল-অনাবিল-তৃপ্তিদায়ক-অসীম শান্তির প্রস্রবণ চরিত্র-রত্ন ! ভগবানকে জানিও আমার ‘আমিত্ব’ যেন বিশ্ব-মানব-প্রেমে লয় পায়। সত্যই জগতে আমি একা ! একা হয়েও তোমাদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে বহুত্বে পরিণত হয়েছিলাম ; আবার একা হ’য়ে পথে বেরিয়ে পড়লাম বহুমুখী-অভিজ্ঞতা নিয়ে। এই সংসারে দেখলাম শিখলাম অনেক কিছু ! শিখলাম—মানুষ যে মানুষকে প্রতারণা করে শুধু তাকে সতর্কজ্ঞান শেখাবার জন্য—বন্ধুর যে বিশ্বাসঘাতকতা তা’ দুর্দ্দিনে বন্ধুকে চেনাবার জন্য,—মানুষ যে রোগগ্রস্ত হয়, সে

দুষ্টপ্রবৃত্তি মাথা চাড়া দেয়,—তা' শুধু মানুষকে ধর্ম্মের পথে অটল অচল করবার জন্য,—মৃত্যুকে মানুষ আলিঙ্গন দেয় অনন্ত-জীবন লাভের জন্য,-- অন্ধকার আসে মহাজ্যোতিকে দর্শন করাবার জন্য। সংসারে এই যে বৈচিত্র্য, এই যে বৈষম্য, তা' শুধু মানুষকে শিক্ষা দেবার জন্য জান্‌বে। মানুষকে উন্নত থেকে আরো উন্নত করতে, সৎ থেকে আরো সৎ পথে চালিত করতে তার এত আয়োজন। আমরা যে, মাঝে মাঝে আমাদের চলার পথে বাধা পেয়ে থম্‌কে দাঁড়াই তা' শুধু আমাদের ভ্রম। এই ভ্রমকে সরিয়ে অগ্রসরের ইঙ্গিত মতই এই সমস্ত অবস্থা বৈচিত্র্য-ঘটনা। যারা তোমার আমার মত নির্ব্বোধ, যারা এই ইঙ্গিত লক্ষ্য করে না, বোঝে না, যারা এই ঘটনা-বৈচিত্র্য-পূর্ণ সংসারে প্রতিকূল-অনুকূল-নিরপেক্ষ হয়ে সেই মহামানবের ডাকার ইঙ্গিত না বুঝে, সংসারের সেই সার, সেই সত্ত্বগুণীকে আপনার সত্ত্বায় না মেলাতে পারে, তারাই এই সংসারে মিথ্যার বেদনায় হাহাকার করে। এই ভাবে দিনের পর দিন তাদের হাহাকার বৃদ্ধি পায়,—অবিশ্বাসের বিষাক্ত বাষ্পে তাদের অণুপরমাণু পর্য্যন্ত পূর্ণ থাকে! ক্রমে ক্রমে তারা এক বোঝা আবর্জ্জনার মত সর্ব্বাঙ্গে কীট-দগ্ধ ক্ষত নিয়ে বিষম অনুতাপে সংসারের লীলা শেষ করে।

চিঠিখানা যতই পড়ছ ততই খুব বিরক্ত হচ্ছ না? ভাবছ সমস্ত দোষ তোমাদের ওপরই চাপাচ্ছি; আমি বুঝি খুব নির্দ্দোষ। কিন্তু জেন' দোষ গুণ বিচার করতে আমি প্রস্তুত হইনি। আমি শুধু এইটুকু জানাতে চাই—অর্থহীন বলে কি আমি এতই অবহেলার পাত্র? এতদিন ধরে আমার চরিত্র বিকাশের যে সুযোগ দিয়ে এসেছি তার কি কোন' মূল্য নেই। এ কথা খুবই সত্য যে, আমি তোমাদের অনুগ্রহপ্রার্থী হয়ে ছিলাম; কিন্তু সে অনুগ্রহ কি মূল্যে ক্রয় করেছিলাম জান? মানবপ্রেম! কিন্তু আমার সেই মানবপ্রেম তোমাদের পদাহত হ'য়ে ফিরে এল একটা দারুণ অবজ্ঞা নিয়ে। আমার যে একটা আত্মসম্ভ্রম বলে জিনিষ থাক্‌তে পারে তা' তোমরা একদিনও স্বীকার করনি। স্বীকার করনি যে, আমিও একটা মানুষ,—আমিও একটা সৃষ্টি,—আমিও একটা যুগ! এই বিশ্বের বুকে আমিও একটা প্রেরণা!! 'সোঽহং'কে কখন প্রকাশ করান' যায় জান? যখন 'অহং' জ্ঞানকে বলি দেওয়া যায়। কিন্তু এই 'অহং,কে বলি দিতে পেরেছেন জগতে ক'জন? ভগবানও এই 'অহং' থেকে নিস্তার পাননি মানুষ ত' কোন্ ছার!

হঠাৎ আমার এই চাঞ্চল্য তোমাদের সকলকে খুব আশ্চর্য্য করে দিয়েছে—না? ঠিক কারণ কিছু খুঁজে পাচ্ছ না। আচ্ছা,—ঠিক্ সত্যের দিক্ দিয়ে ভেবে দেখ দেখি, কত দিন থেকে আমার ওপর তীব্র অবহেলা পোষণ করে এসেছ! আমার উপস্থিতি, আমার ছোট বড় কর্তৃত্ব তোমাদের আর ভাল লাগছিল না। তোমাদের কথায়, কাজে, ইঙ্গিতে সর্ব্বদা প্রকাশ

অর্থের প্রচুরতা আছে—অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা তাঁদের চেয়ে হীনবস্থ লোকদের ভাবেন,—বড় নির্ব্বোধ ; তাদের বোধশক্তি কিছু কম। কিন্তু তা' নয়! সংসারে যাদের যত বেশী অভাব তাদের তত বেশী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। কারণ, তারা আঘাত পায় প্রত্যেক বিষয়ে। আমিও খুব বড় আঘাত পেয়েছি ; আঘাতের পর আঘাতে আমার মধ্যে একটা জ্বালামুখীর স্বষ্টি হয়েছে। সেই জ্বালার আগুন নিয়ে জ্বলে পুড়ে যাচ্ছি। সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বর ছাড়া তা' অনুভব করবার শক্তি কারর নেই। কক্ষচ্যুত গ্রহের মত অভিশাপের দারুণ পরিহাস নিয়ে দিনের পর দিন কোথায় ছুটে চলেছি জানিনা। আশ্চর্য্য! আমি এখনও পাগল হইনি কেন? তোমরা খুব সহজেই সব ভুল্‌তে পারবে এবং পেরেছ,—কিন্তু আমি যে কিছুতেই ভুল্‌তে পারছি না। কেন জান? আমি উপেক্ষিত—নিগৃহীত! যে উপেক্ষিত,—নিগৃহীত, সে তার চারিদিকে সকল সময় উপেক্ষা-নিগ্রহের অত্যাচার হাহাকারের স্বষ্টি জাগিয়ে রাখে। সে হাহাকার কে অনুভব করবে? আচ্ছা বল্‌তে পার ভোলা যায় কি করে? তোমরা যেমন ভুল্‌তে পেরেছ তেম্‌নি সেই ভুলে যাওয়া মন্ত্রটা শিখিয়ে দিতে পার। তবে ঘৃণায় আমি ভুল্‌তে পারব না। ঘৃণা করতে জানিনা—! ভালবাসার দাস আমি—ভালবাসায় ভুল্‌তে চাই। একটা হাসির কথা বটে! 'ভালবাসায় ভোলা'—সোণার পাথর বাটীর মতই আশ্চর্য্য! কিন্তু আশ্চর্য্য হলেও সম্ভব করা শক্ত নয়। ভালবাসায় ভুলব তোমাদের ঘৃণা করা অন্তরকে,—কিন্তু জাগিয়ে রাখব আমার মনশ্চক্ষে তোমাদের মূর্ত্তি—; ভালবাসায় ভুলব তোমাদের ক্রটী অপরাধ, মনে রাখব তোমাদের উপকার—; ভালবাসায় ভুলব আমার ওপর অবিচারের প্রতিশোধ,—সেখানে মনে জাগিয়ে রাখব, আমার নির্ব্বিকার আত্মাকে সান্ত্বনা দিয়ে।

ওগো মনোময়ি! আর কিছু জানাতে চাইনা। আমায় বিদায় দাও! এই হতভাগ্য যদি কখনও তোমাদের উপযুক্ত হ'তে পারে, কখনও যদি সে জানাতে পারে, সকল দিক্ দিয়ে সে তোমাদের কাছে কোন' অংশে নিকৃষ্ট নয়—সেদিন তোমাদের সাম্‌নে উপস্থিত হবে। কিন্তু আমাকে তখন অন্য একভাবে দেখ্‌বে ;—দেখ্‌বে আমি সকলহারা-অবসাদগ্রস্ত। তখন যদি আমাকে অন্তর দিয়ে জান্‌তে চাও—পারবে না ; প্রত্যাহত হ'য়ে ফিরে যাবে। তখন শুধু চোখের জলে আমায় প্রাণ-পোড়া-অভিমান নিভিয়ে দিয়ে চিরবিদায় দিও। ইতি—

তোমাদের অবজ্ঞাত অজিত।

চিঠিখানি পড়া শেষ হইলে নীলিমা মুখ তুলিয়া দেখিল, লতিকার চোখমুখ জলে ভাসিয়া যাইতেছে। নীলিমাও প্রকৃতিস্থ ছিল না,—সে চোখমুখ মুছিয়া বলিল,—আশ্চর্য্য মানুষ ভাই

—শুধু আশ্চর্য্য মানুষ ন'ন ভাই। তিনি ভগবানের একটী আশ্চর্য্য সৃষ্টি,—যার মধ্যে কোন' খুঁৎ নেই।

—সবই ত' হল ; কিন্তু তোর জীবনটা কাট্‌বে কেমন লতি ?

—সুন্দরভাবে কাট্‌বে ভাই। এখন থেকে জীবনের ধারাটা বদ্‌লে শুধু তাঁর মঙ্গল কামনায় দিন কাটাব। যখন যেখানে যেমন অবস্থায় থাকিনা কেন, সর্ব্বদা ভগবানকে জানাব, তিনি যেমন এই অন্ধকার গণ্ডী কেটে বেরিয়ে পড়েছেন—তেম্‌নি যেন তাঁর জীবন আলোয় ভরপূর হয়। তাঁর অবজ্ঞাত জীবন যেন সান্ত্বনা পেয়ে উপযুক্ত পথে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাঁকে কাছে পেয়ে ধন্য হওয়ার চেয়ে দূর থেকে তাঁকে পূজা করে ধন্য হওয়াটী আমার সত্য কামনা।

—এটা কি তোর মনের কথা লতি ?

—সম্পূর্ণ মনের কথা ভাই! এর মধ্যে ছলনা নেই। তিনি আজ আমাদের সাম্‌নে নেই বটে, কিন্তু তাঁর স্মৃতি তাঁকে শত সহস্র মূর্ত্তিতে মূর্ত্ত ক'রে রেখেছে আমাদের চারিদিকে।

এমন সময় পাশের বাড়ীর একটী মেয়ে হারমোনিয়মে গলা মিলাইয়া গাহিতে আরম্ভ করিল—

ডাক ওগো ডাক—লহ তব পাশে
দূরে দূরে, আরো দূরে তব পথে।
আঁধার-পূরিত জীবন আমার—
মিলাও তোমার আলোক সাথে॥
হৃদয়ে পরতে কত দুঃখ রাশি,
অকালে ডুবিয়া গেছে সুখ-শশী ;
কাঁদি দিশাহারা আঁখি-নীরে ভাসি !
মুছায়ে দেহগো তব প্রেম হাতে।
দাও সাড়া দাও,—কও কথা কও !—
হাতছানি দিয়া মোরে ডাকি' লও ;
বাঞ্ছিত-সাথে মিলাও আমারে—
আলো ধর ওগো আঁধার বিপথে॥

রাজগৃহের পথে

[শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

যেতে আমাদের যতটা সময় লাগ্‌বে ভেবেছিলুম, ততোটা লাগেনি। তার ঢের পূর্ব্বেই আমরা পৌঁছেছিলুম। তাড়াতাড়ি চলার দরুণ কষ্ট বোধ হ'চ্ছিলো। মন্দিরের ভেতরে ব'সে সেটা লাঘব ক'রে নিলুম। এত সুন্দর মন্দির এখানে নেই। দূর থেকে এটাকে কিন্তু মস্‌জিদই মনে হয়। মাথাটা একেবারে মস্‌জিদের ছাদের ছাঁদে ঢালা—গম্বুজে গম্বুজে ভর্ত্তি। সামনে লম্বা সিঁড়ি। তেরোটা ধাপ্‌ এখনো রয়েচে। আরো ছিলো কি না, তা ঠিক বোঝা যায় না। ভেঙ্গে যাওয়াতে আর সিঁড়ি দিয়ে ওঠা যায় না। উঁচুতে সকলকে হারিয়ে দিয়েচে। মূর্ত্তি একটাও নেই। কেবলমাত্র একটা শ্বেত পাথরের বেদী—সেইটাই পূজা করা হয়। বেদীটি তৎকালীন শ্রেষ্ঠ শিল্পী দিয়ে যে তৈরী হ'য়েছিলো, তা প্রথম সাক্ষাতেই বলা যায়। এর পাশে অপেক্ষাকৃত আর একটা ছোট মন্দির। এ'টা শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের। পাণ্ডাদের মতে, এই মন্দির জগৎ শেঠ তৈরী করেছিলেন। সেও প্রায় হাজার বছর আগেকার কথা। কিন্তু এতো নতুন দেখায় যে, কেউই একথা প্রথমটা বিশ্বাস করে না। কিন্তু সাড়ে পাঁচ হাত চওড়া দেওয়াল দেখে একথাটা অবিশ্বাস করা যায় না যে,—এটা জগৎ শেঠ তৈরী না করতে পারেন, তবে সেই সময়ে যে হ'য়েছিলো, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মন্দিরগুলো পূবমুখো। জানি না, এইটে তখনকার রেওয়াজ ছিল কি না! যাতে বৃষ্টিতে না ভিজে কিম্বা রোদে না পুড়ে মন্দির প্রদক্ষিণ করা যায়, তার ব্যবস্থা আছে। আট্‌টা একখণ্ড, চৌকা পাথরের ওপর সমস্ত ছাদটা শোয়ানো। ঢুক্‌তে হয় মাথা নীচু ক'রে, কিন্তু ভেতরে গেলে আর নত হ'য়ে থাক্‌তে হয় না।

বাহিরের দরজা খোলাই ছিল। ঐ একটুখানি দরজা দিয়ে যেটুকু বাতাস আস্‌ছিলো, সেটুকু আমরা উন্মুক্ত প্রান্তরেও পাই না। উঠ্‌তে ইচ্ছে যায় না। একটা থামে ভর দিয়ে বসে রইলাম। দরজার দু'পাশে আরো দু'টো বেদী। একটাতে এক জোড়া চরণের ছাপ—অপরটিতে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি মর্ম্মরস্ফটিকের বুক চিরে কুঁদে রাখা হ'য়েচে।

বেলা বেড়ে যাচ্চে, সেদিকে আমাদের ভ্রুক্ষেপ নেই। বসেই আছি। রামু সব দেখিয়ে শুনিয়ে আমাদের পাশে—একটুখানি ব্যবধান রেখে বস্‌লো। আমরা এই অবসরে তার নিকটে

বস্‌লো। উঠে দাঁড়ালো, আমাদের নিয়ে যাবার জন্যে। বেশীদূর নয়, এই মন্দিরের নীচেই—ঢালু জায়গাটিতে—তার কথায় জান্‌তে পার্‌লুম। এইখানেই বুদ্ধদেবের প্রথম সভা হয়। হুয়েন্ সাঙ্ দেখে গেছেন, বেণুবনের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে এবং বিহার গিরির উত্তর দিকে একটা প্রকাণ্ড বাঁশ বন; যার মাঝখানে একটা পাথরের অট্টালিকা ছিল। এই অট্টালিকার সাম্নেই পুরাণো ভিত্তিমূল প্রাচীর, সম্ভবতঃ এইটেই মহামণ্ডপের ভিত্তি। সম্মিলিত ভিক্ষুদের থাক্‌বার জন্যে রাজা অজাতশত্রু এই মহামণ্ডপ নির্ম্মাণ করেছিলেন। এই স্থানের উত্তর পশ্চিমে একটা স্তূপের চিহ্ন আছে, যেখানে "আনন্দ ভিক্ষু" নির্ব্বাণ লাভের উদ্দেশ্যে সাধনা করেছিলেন।

"সপ্তপর্ণি" বল্‌তে পূর্ব্বে সাতটি গুহাকে বোঝাতো। আজ পর্য্যন্ত মাত্র দু'টি গুহা আবিষ্কার হ'য়েচে। বাকীগুলো এখনো লোকচক্ষুর অন্তরালে। মেগাস্থিনিস্ তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে সাতটি গুহারই উল্লেখ ক'রে গেছেন। পালী ভাষার বইএও উল্লেখ আছে যে, এগুলি পাশাপাশি ও সন্নিকটে। এই সব বর্ণনা প'ড়ে স্যার্ জন্ মার্সেল সাহেব অনুমান করেন যে, সপ্তপর্ণিগুহার উত্তর-পশ্চিমে ঘন গাছ দিয়ে ঢাকা যে সমতল ভূমি ছিল, সেইখানেই প্রথম সভা হয়। মেগাস্থিনিস্ তা' পরিদর্শন ক'রে যান। হুয়েন্ সাঙের মতে, প্রথম সভা সপ্তপর্ণিগুহায় হয়নি। প্রথম সভা হ'য়ে যাবার পর এক মাসের মধ্যে খুব তাড়াতাড়ি ক'রে একটা সাধারণ গৃহ (hall) নীচের সমতল ভূমির ওপর নির্ম্মাণ করা হয়। তিনি আরো বলেন যে, যে সব ভিক্ষু প্রথম সভায় যোগদান করেছিলেন, তাঁদের সংখ্যা পাঁচ শো নয়; ন'শো নিরানব্বই।

সপ্তপর্ণিগুহা এবং সাধারণ গৃহ বা মহামণ্ডপ একই স্থান নয়—দু'টী পৃথক স্থান। সাধারণ গৃহকেই পরে মহামণ্ডপ বল্‌তো ও সেইখানেই সভা হ'তো। এই মহামণ্ডপেই প্রথম "মহা-সংগীতি" হ'য়েছিল। কোনো কিছু আলোচনা, আবৃত্তি পাঠ করা বা ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা কর্‌বার জন্যে রাজা অজাতশত্রু এই মহামণ্ডপ তৈরী ক'রে দিয়েচেন। এ ছাড়াও ভিক্ষুরা যখন ওপর থেকে নীচে নেমে আস্‌তেন, তখন তাঁরা এখানে পথকষ্ট লাঘব করতেন। পালী ভাষায় লেখা Maha-Vastu পুস্তকে মহামণ্ডপের বিষয়ে যে সব কথা লেখা আছে, সবগুলোই এ ক্ষেত্রে মিলে যায়। তারপর যখন রাজগৃহের মঠ বা আশ্রম সংস্কারের প্রয়োজন হ'তো তখন ভিক্ষুরা প্রথম মাস এই সব কাজে কাটিয়ে দিতেন; দ্বিতীয় মাস তাঁদের ধর্ম্ম ও Vinaya বা ধর্ম্মপুস্তক আবৃত্তি ক'রে কাট্‌তো। সুতরাং যাতে ভিক্ষুগণ মহামণ্ডপ সর্ব্বদাই সজ্জিত অবস্থায় পায়, তার জন্যে অজাতশত্রু যথাসাধ্য চেষ্টা কর্‌তেন এবং বিশেষ যত্নবান থাক্‌তেন। এই মহা-সংগীতি কাশ্যপ ঋষির তত্ত্বাবধানে বা সভাপতিত্বে হ'তো। "উপালি" আর "আনন্দ" উভয়ে ধর্ম্মপুস্তক আবৃত্তি ক'রে সকলকে শোনাতেন।

রামুর পিছু পিছু আমরা চল্‌লুম সপ্তপর্ণিগুহার পথ ধরে। যাবার রাস্তাটা যে কতদূর ভয়সঙ্কুল, তা প্রতি পদে পদে টের পাওয়া যায়। যদি একবার পা পিছ্‌লে যায় আর খুঁজে পাওয়া যাবে না—এম্নিতরো অবস্থা। তবুও চলেচি। খানিকটা এসে আর পূর্ব্বেকার মত আসা গেলো না। ব্যবধানের মাপ বেড়ে উঠলো। পাশেই খড্‌। নীচের দিকে তাকালে সত্যিই আতঙ্ক হয়। আস্তে আস্তে চল্‌লেও মাথা যেন ঘোরে। গোটাকতক বটগাছ পাহাড়টাকে আঁক্‌ড়ে রয়েচে, পাছে প'ড়ে যায়। পাহাড়টা উঁচু কতটা, আন্দাজে বলা শক্ত। তবে নীচের মানুষকে মানুষ ব'লে চেনা যায় না। আল-দেওয়া মাঠগুলো বাল্যের গ্রাম্য খেলার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যতদূর সম্ভব, পাহাড়ের দিকে হেলে ক্ষণকালের জন্যে স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। বঙ্কিম বাবুর সুরের সাথে সুর মিলিয়ে বল্‌তে ইচ্ছে করে,—"যাহা দেখিলাম যেন আর কখনও দেখিব না।" উদ্বেগের চিহ্ন মুখে চোখে হয়তো তখন ফুটে উঠেছিলো তা লক্ষ্য কর্‌বার অবসর তখন মোটেই ছিল না। কেবলি মনে হ'চ্ছিলো ;—"কি দেখিলাম !"

অতি সন্তর্পণে যখন আমরা গুহার সাম্নে গিয়ে পৌঁছিলাম, তখন আত্মহারা হ'য়ে গেলুম। পাশাপাশি দু'টো গুহা। এদের পরিসমাপ্তি কোথায় তা' আজ পর্য্যন্ত অজ্ঞাত। ঢোক্‌বার মুখে মাথার চেয়েও উঁচু। আশা করেছিলুম, শেষ পর্য্যন্ত বোধ হয় এই প্রকারই থাক্‌বে। খানিকটা গিয়েই কিন্তু এ আশা আমাদের ছাড়্‌তে হ'লো। ব'সে ব'সে কায়ক্লেশে যাওয়া চলে। ঘুরঘুটি অন্ধকার—মাত্র একটি বাতির আলো। "বাতির ওপর নির্ভর ক'রে বেশীদূর যাওয়াটা" রামু কিছু না বল্লেও আমি বল্লুম, "কাজের কথা নয়।" অন্যটি উঁচুতে কিছু বেশী। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত প্রথমার সহিত দ্বিতীয়ার কোনো প্রভেদ থাকে না। আজ শুধু বাহ্য আবরণটি দেখে ক্ষান্ত দিলুম—আর একদিন আলোর যথারীতি বন্দোবস্ত ক'রে। বেশ নিরিবিলি মনোরম—ধ্যান কর্‌বার উপযুক্তই বটে।

এই সপ্তপর্ণিগুহা—যার এত খ্যাতি। একদিন এই গুহাতেই কত কি যে হ'য়ে গেছে, যা আমরা কল্পনাতেও আন্‌তে পারি না। গৌতমবুদ্ধের চরণধূলি হয়তো এখনো এখানকার ধূলিকণার সঙ্গে মিশে আছে। চিনে নিতে পারে কিম্বা জগৎকে চিনিয়ে দিতে পারে, এমন লোক এ সংসারে এখন বোধ হয় আর নেই। তাই এখন এর এ অবস্থা। একদিন এ'ও ছিল বুদ্ধদেবের ন্যায় রাজপুত্র। তখন এর কিছুরই অভাব হয়নি। যেদিন বুদ্ধদেব সন্ন্যাসীর বেশে বেরিয়ে পড়লেন, সেইদিন হ'তে প্রতি পদক্ষেপে, প্রতি মুহূর্ত্তে একটা রহস্যময় জিনিষের অভাব উপলব্ধি কর্‌লেন। আবার যেদিন তিনি বোধিদ্রুম মূলে উপবেশন কর্‌লেন, সেদিন যেমন সে অভাব তাঁর

সারা খণ্ড-ভারত প্রজ্জ্বলিত হ'য়ে উঠবে। ভারতের নব অভ্যুদয় দেখে দিক্-বিদিক্ হ'তে মানুষ এসে হুম্ড়ি খেয়ে পড়্বে।

যখন আমরা স্বশরীরে আবার মন্দিরের সাম্নে এসে দাঁড়ালাম, তখন রোদ বেশ ফুটে উঠেচে। এখন পড়ে গেলে খুঁজে না পাবার কোনোরূপ সম্ভাবনা না থাক্লেও, মনে হ'চ্চে যেন আছে। "এত দুর্ব্বলতা নিয়ে এখানে না আসাই ভালো।" চল্‌তে চল্‌তে সাহসী বন্ধু আমায় জানালে। পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখি, মন্দির অনেক দূরে ফেলে রেখে এসেচি। কড়া রোদ বেশ জ্বালিয়ে তুলেচে। অথচ ঘড়িতে মোটে সাড়ে ৯'টা। আরো আধঘণ্টায় যতদূর যাওয়া যায়—যাবো। আপন খেয়ালেই চলেচি। আচম্‌কা এক শব্দ হ'লো। গা ছম্ ছম্ কর্‌তে লাগ্‌লো। আতঙ্কে চার্‌পাশ তাকালাম। কাণের পাশ দিয়ে এক ঝাঁক বুনো পাখী উড়ে গেলো আমাদের সচকিত ক'রে দিয়ে। আবার উঠ্‌তে লাগ্‌লাম। বুনো গাছে হল্‌দে ফুল ফুটে পাহাড়ের শ্রী ফিরিয়ে দিয়েচে। আমাদের মনেও এক করুণ ও ক্ষীণ আনন্দের প্রবাহ জাগিয়ে তুলেচে। ফির্‌বো কিম্বা আরো অগ্রসর হ'বো, তাই চল্‌তে চল্‌তে ভাব্‌ছিলুম। এমন সময়ে বাঁ দিকে এক ভাঙা বাড়ীর অস্তিত্ব দেখ্‌তে পেলুম। শীঘ্রই এখানে খোঁড়াখুঁড়ি আরম্ভ হ'বে ব'লে আশা করা যায়। কিছু না বেরুক্, নিদেন্ ডজন খানেক যে মূর্ত্তি বেরুবে, তা' আমরা নিঃসন্দেহে বল্‌তে পারি। শেষ পর্য্যন্ত ওঠ্‌বার রাস্তা বেশ ভালোই। অতি শিশু থেকে অতি বৃদ্ধও উঠ্‌তে সক্ষম হ'বেন। বড্ড মাছি। কাণের কাছে অনবরতই ভোঁ ভোঁ করে। চোখের পাতায়, নাকের ডগায়, মুখের পাশে এসে এতো জ্বালাতন করে যে, বোধ হয় রুগ্ন শিশু খাবার জন্যে তার মা'কে এর চেয়ে ঢের কম করে। চারিদিকে যদ্দূর নজর চলে, খালি মাঠ আর মাঠ। তারপর আলিঙ্গন—সবুজ ধরিত্রী আর বিষের ন্যায় নীল আকাশের।

যেখানে দাঁড়িয়ে আমরা মাঠের শোভা নিরীক্ষণ কর্‌ছিলাম, তার ডানদিকে সপ্তাহখানেক পূর্ব্বে যে নতুন মন্দিরটি মাটীর গহ্বর থেকে বেরিয়েচে, তা' দেখে এলুম। মস্ত মন্দির। চারপাশে ২৫টি ঘর। প্রত্যেক ঘরে একটি ক'রে যে মূর্ত্তি ছিল, তার প্রমাণ এখনো বর্ত্তমান। মোটে ৬টি মূর্ত্তি পাওয়া গেছে এবং সবগুলোই বুদ্ধদেবের। মাঝের একটি অতি প্রকাণ্ড। বাকীগুলো পায়ের ধূলোর সাথে মিশে গিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেচে। এ সব ছাড়াও অসংখ্য থাম ও মূর্ত্তি ভাঙা অবস্থায় পড়ে রয়েচে। কিন্তু আশ্চর্য্য হ'তে হয়, মন্দিরের আর্চটা (arch) অবিকৃত অবস্থায় রইলো কি করে?

পালী ভাষায় লেখা আছে, "এখানে অর্থাৎ বিহার গিরির দক্ষিণ পশ্চিম কোণে পূর্ব্বে ৫২টা কক্ষ সমেত একটা মন্দিরে ৫২টি মূর্ত্তি ছিল। রাজা বিম্বিসার এই মন্দিরের নির্ম্মাণ-কর্ত্তা।" এখন

পাটনা ও বিহার অঞ্চলের প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ও প্রাচীন সাহিত্যাদি গবেষক কলাবিদ্‌দের মতে, এটা সেই মন্দির।

সন্ধ্যাবেলায় নিত্যকার অভ্যাস মতো বিপ্লাচলের ভাঙা মন্দিরের চত্বরে ব'সে সূর্য্যাস্তের অপরূপ লাবণ্য উপভোগ করছিলাম। এমন সময়ে এক বাঙালী যুবকের আবির্ভাব হ'লো সহসা কক্ষচ্যুত উপগ্রহের মতো। পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেও আশা করিনি যে, এম্নিধারা অযাচিতভাবে এক সমবয়সী বন্ধু জুটবে। সঙ্গে সঙ্গে বেশ জমে উঠ্‌লো। কথায়-বার্ত্তায় আমাদের ভেতর তেমন আর অসঙ্কোচের ভাব রইলো না। নতুন জড় ভাবের লক্ষণ প্রথমটায় যা-ও একটু আধটু ছিল, তোয়ের শিশিরের মতো তা'ও উধাও হ'য়ে গেলো নিমেষে। মনে হ'লো যেন কত পরিচিত—কতদিনের চেনা।

পরদিন প্রত্যূষেই—তিনজনে পাহাড়ের আঁকা-বাঁকা উঁচু-নীচু ধূসর রঙের পাথরের ওপর সাদা রঙের তীর আঁকা পথ ধ'রে চলেচি বিজয়ী-বীরের ন্যায় মদগর্ব্বে। এবার যেদিন আস্‌বো আলো আন্‌তে ভুল হ'বে না, পাণ্ডা ঠাকুরকে ব'লে এসেছিলুম। আমাদের কথা শুনে সে তো মহাখুসী। আবোল-তাবোল কত কি বকে গেলো। যেন রাজগৃহের ইতিহাস তার মুখস্থ। সেদিনের মতো তাকে না চটিয়ে আমরা বিদায় নিয়েছিলুম। পরের দিনই যে আস্‌বো এবং এতো সকালে—এটা যেন তার কল্পনার বাইরে। তাই বোধ হয় এত সকাল-সকাল আস্‌বার কোনো প্রয়োজন সে বোধ করেনি। আমরা তিনজনে গুহার ভেতরে ঢুক্‌তে রাজী হ'লেও, বেশীদূর যাওয়া যাবে না; কাজেই তার অপেক্ষায় মন্দিরের সাম্নে বসে রইলাম। তখনো সূর্য্যদেব বিপ্লাচল ডিঙিয়ে উঠ্‌তে পারেননি। আমাদের আর তর সইচে না; মাঝে মাঝে নীচের দিকে তাকাচ্চি। তিনটী বিদেশী যুবক একাকী পাহাড়ের বুকের ওপর ব'সে কি কর্‌চে; তাই দেখ্‌বার জন্যে লুকিয়ে লুকিয়ে সূর্য্যদেব যেন ডিঙ্গি মেরে পাহাড়টার ফাঁক থেকে দেখ্‌তে এলো। প্রথমটা আমরা তা' টের পাইনি। কিন্তু যখন পেলুম তখন তিনি নিজেই আমাদের কাছে ধরা দিলেম। এলো-মেলো অনেক কথাই ভাব্‌চি, সহসা আরব্য উপন্যাসের দৈত্যের ন্যায় তার দেখা মিল্‌লো। তারপর...কাপড় গুটিয়ে, মাথা সাম্‌লে, আস্তে আস্তে গুহায় ঢুক্‌লাম। হাত কুড়ি যাবার পর নিশ্বাস বন্ধ হ'য়ে যাবার জোগাড়, এত অন্ধকার। যদিও দু'দুটো টর্চ জ্বল্‌চে। ব্যাটারীর আর কতটুকু প্রাণ! নিভে গেলেই হ'লো। যদি নিভে যায়, অবস্থা যা দাঁড়াবে, তা ভাব্‌লেও শিউরে উঠ্‌তে হয়।

ক্রমশঃই ছোট হ'য়ে আস্‌চে। ব'সে ব'সে তারপর একরূপ প্রায় শুয়ে শুয়েই চলেচি। পাণ্ডাকে ঢোক্‌বার পূর্ব্বেই জন্তু-টন্তুর কথা জিগ্‌গেস্ করা হ'য়েছিল এবং তার যথাযথ ভালো

উত্তর পেয়ে তবে আমরা এতটা সাহসী হ'য়েচি। আরো খানিকটা গেছি, এমন সময়ে বন্ধু আলোটা আমাদের দিকে ফেরালে। ব্যাপার কি? "বাঘ-টাঘ এসেচে বোধ হয়; বড্ড গন্ধ আস্‌চে।" আর কথা নয়! তাড়াতাড়ি ফের্‌বার ইচ্ছে থাক্‌লেও পার্‌লুম না। আমরা যেন পাতাল পুরীতে বন্দী। সামান্য একটুখানি আলো দেখ্‌তে পেয়ে নেচে উঠ্‌লাম। তাড়াতাড়ি আসার দরুণই হোক্ কিম্বা ভয়েই হোক্, হাঁপিয়ে পড়েছিলুম। আর না এগিয়ে গুহার মুখেই ব'সে পড়্‌লাম। আমাদের নতুন বন্ধুর মতে, এখানে আর না থাকাই শ্রেয়ঃ। মানুষের গন্ধ পেয়ে যদি—কিন্তু কে কার্ কথা শোনে! রামুর সঙ্গে ভাঙা-হিন্দিতে গল্প সুরু ক'রে দিয়েচি। হঠাৎ বিভুদা চেঁচিয়ে উঠ্‌লো,—"এই দেখ, থাবার দাগ।" নতুন বন্ধু হুমড়ি খেয়ে পড়্‌লো। সত্যিই পাঁচটা আঙ্গুলের স্পষ্ট দাগ। এরপর—আর কিছু কথা হ'তে পারে না।

নেমে আস্‌বার পথে সপ্তর্ষিকুণ্ড থেকে যে চার্‌টে গুহা দেখ্‌তে পাওয়া যায়, সেগুলো দেখে নিলুম। পূবদিকে দু'টো আর উত্তর ও দক্ষিণ দিকে একটা করে'। গুহাগুলো আকারে ছোট; একজন মাত্র তপস্যা কর্‌তে পারেন। পাথর সাজিয়ে সাজিয়ে তৈরী করা হ'য়েচে কিন্তু মাথাটা সিমেণ্ট করা। তার ওপর মুসলমানদের কবর। বৌদ্ধদের তীর্থস্থানে কবর যে কিরূপে এলো, তা' বলা কঠিন। তবে মনে হয় যে, একসময়ে মুসলমানদের প্রাধান্য এখানে খুবই ছিল, তাই অসম্ভবও সম্ভব হ'য়েছিল। এই গুহাগুলোকে সাধারণতঃ পিপুলাগুহা বলে। তবে কেউ কেউ পিপালি গুহা (Pippali-Guha) এবং অনেকে পিপ্পল গুহাও (Pippale-Guha) বলে থাকেন।

মেগাস্থিনিস্ বলে গেছেন, পিপালি গুহা পুরাণো সহরের উত্তরে। পূর্ব্বকালে কাশ্যপ ঋষি এখানে ধ্যান কর্‌তেন। কখনো কখনো তিনি এই গুহায় পুরো এক সপ্তাহ হর্ষজনক ধ্যানে বিভোর হ'য়ে থাক্‌তেন। এই গুহার সাম্নেই একটা বিহার ছিল। সেখানে তিনি দু'জন সহচর ভিক্ষুর সহিত বাস কর্‌তেন।"

ফা হিয়ান বলেন, "কাশ্যপের গুহা খুব ছোটই এবং এইটে তিনি কেবল নিজের ধ্যান কর্‌বার জন্যে ব্যবহার কর্‌তেন। এই গুহা বল্‌তে আমরা ছোট ছোট অনেকগুলো গুহাকেই বুঝি। উষ্ণধারার পশ্চিম দিকে অতি নিকটেই এগুলো অবস্থিত। এর সাম্নে একটি পর্ণশালায় তিনি দু'জন ভিক্ষুর সঙ্গে থাক্‌তেন। এখানে অনেকগুলি ঘর ছিল।"

তিনি আরো বলে গেছেন যে, বিহারগিরির প্রান্তভাগে বা তিন শো পা পশ্চিমে গেলে পিপ্পলগুহায় যাওয়া যায়। এইস্থানে বুদ্ধদেব দুপুরের খাওয়া দাওয়ার পর বিশ্রাম নিতেন। তাঁর বিশ্বাস,—এই বন্য, অসুন্দর পাহাড়গুলো যাদুমন্ত্র জানে; নইলে তিনি কুঞ্জবন ছেড়েও সঙ্ঘের

ভাইদের মাঝে এসে থাকতেন কেন? পাহাড়ের উত্তর পাশে আরো দেড় মাইল পশ্চিমে আর একটি প্রস্তর গুহা আছে। এখানে বুদ্ধ নির্ব্বাণের পরে পাঁচশো অর্হৎ মিলিত হ'য়ে বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্র সঙ্কলন করেছিলেন। এই স্থানে পূর্ব্বে এক স্তূপ নির্ম্মিত হ'য়েছিলো, তা' এখনো আছে। এই পাহাড়ের পাশে অনেক গুহা রয়েচে। পুরাণো নগর ছেড়ে উত্তর-পূর্ব্ব এক মাইলের কিছু কম গেলে দেবদত্তের প্রস্তর নির্ম্মিত গুহা দেখা যায়, তার ৫০ পা দূরে এক কৃষ্ণ প্রস্তর আছে, এই পাথরের ওপর আত্মহত্যা করে' এক অর্হৎ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন।

পালী বই থেকে আমরা এই গুহা সম্বন্ধে যা কিছু জান্‌তে পেরেচি। তা দেখে মনে হয়, এই গুহা কাশ্যপের বিহারের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল এবং তিনি যখন মরণাপন্ন হ'য়েছিলেন, সেই সময়ে বুদ্ধদেব একবার মাত্র তাঁকে দেখ্‌তে গিয়েছিলেন।

আরো খানিকটা অগ্রসর হ'য়ে ফা হিয়ান পাহাড়ের উত্তর দিকের ছায়ায় একটা গুহা দেখেছিলেন। (সম্ভবতঃ এইটেই অসুর গুহা) তিনি এই স্থানটি প্রথম বৌদ্ধদের সভার স্থান বলে' উল্লেখ করে গেছেন। হুয়েন্‌সাঙ্‌ বর্ণনা করে' গেছেন, পিপুলাগুহার পশ্চাতে অসুর গুহা ছিল। যে স্থানে প্রথম সভা হ'য়েছিলো, তা' প্রথম গুহা হ'তে পশ্চিম মুখো এক মাইল সোজা গেলে পাওয়া যায়। ফা হিয়ানের বর্ণিত সভাস্থল এটা নয়। কারণ তিনি উষ্ণধারার পশ্চিমে মাত্র কয়েক গজ উঠেই দেখ্‌তে পেয়েছিলেন। আর যে স্থানে প্রথম সভা হয়, সে স্থান হ'তে এটা মোটেই সোজা নয়!

অনেক ক্ষেত্রে মেগাস্থিনিসের সঙ্গে ফা হিয়ানের মতের সাদৃশ্য দেখা যায়। যেহেতু তাঁরা যখন এসেছিলেন তখন বৌদ্ধধর্ম্মের বিজয় নিশান সারা ভারতের সর্ব্বত্র বিরাজমান। তাঁরা যে সব জিনিষ দেখে গেছেন, কালের বিচিত্র গতিতে তা' হয়তো পরে অপসারিত হ'য়ে যেতে পারে কিম্বা বদ্‌লে যেতে পারে। তাই যখন হুয়েন্‌সাঙ্‌ ভারতে আসেন, (ফা হিয়ানেও স'দুশো বছর পরে) তখন তিনি যে সব জিনিষ দেখে গেছেন, সেগুলি হয়তো তদানীন্তন কালের সুবিধা অনুযায়ী সরিয়ে নিয়ে আসা হ'য়েছিলো। কিম্বা এমনও হ'তে পারে যে, নানা বিপর্য্যয়ে সেগুলো ধ্বংস হ'য়ে যাওয়ার পরে অন্যত্র সেগুলি নির্ম্মাণ করা হ'য়েছিলো। সেই জন্যই হুয়েন্‌সাঙের বর্ণনার চেয়েও ফা হিয়ানের বর্ণনা আমাদের কাছে বেশী সমীচীন ঠেকে।

(ক্রমশঃ)

উদাসী হিয়া

[শ্রীসলিলকুমার হাজরা]

(১)

আজ প্রভাতে মন বেঁধেছি আমি
ওগো, জীবন-স্বামী!
নিত্যকালের-চলার-পথের
হব না অনুগামী—
চলব আমি আপন খুসী-মতো
সারা দিবস-যামী।
হাতের যত কাজ
থাক্‌না পড়ে আজ
থাক্‌না খাওয়া, থাকনা ঘুম,
থাক্‌না গান শোনা
ভজন-পূজন থাক্‌না পড়ে
থাক্‌না আরাধনা;
থাক্‌না আজ, চোখের জলে
পায়ের ধ্বনি গোনা।

(২)

নিত্যকালের চাওয়ার দাবী
আজকে হ'ল শেষ;
নূতন ঢঙে বাঁধিনি কবরী,
পরিনি নব বেশ।
নিতি নিতি নিয়ম-বাঁধা-চলা,
আজ হয়েছে শেষ।
উদাসী এই হিয়া
যাচ্ছে বাহিরিয়া
সুরের আগুন ওই যে যেথায়
ভাস্‌ছে বাতাসে,
সাঁঝ সকালে চাঁদ ও রবি
নিত্য যেথায় হাসে।
মনকে তাই, দিলেম ছেড়ে
ওই অসীম আকাশে।

বিশ্ব-প্রবাহ

সম্প্রতি বৈজ্ঞানিক উপায়ে সামুদ্রিক লতাগুল্ম হইতে নকল চামড়া নির্ম্মিত হইতেছে। পশুচর্ম্মের ন্যায় সকল কাজ ইহার দ্বারা সম্পাদিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। এই চর্ম্মের ব্যাপক প্রচলন হইলে পশুচর্ম্মের চাহিদা বিশেষ কম হইবে।

ক্রীষ্টমাস আইল্যাণ্ড দ্বীপটী জনহীন; কিন্তু উহা ফস্‌ফেটে অতিশয় সমৃদ্ধ। ভারত-মহাসাগরে যবদ্বীপ হইতে ১৯০ মাইল দূরে অবস্থিত। দ্বীপটী বৃটিশের অধিকারে।

শ্রীমতী বাটনের বয়স ৮৬ বৎসর। তাঁহার বাস ক্রফ্‌টনে। তিনি এখনও দুইবেলা অনায়াসে দুইচারি ক্রোশ পথ বাইসাইকেলে চড়িয়া—ঘুরিয়া বেড়াইতে পারেন।

হালিম কোর্টে একটা ব্যাঙের ছাতা পাওয়া গিয়াছে। তাহার বেড় ৩০ ইঞ্চি এবং ওজনে প্রায় এক সেরের উপর।

হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, গত এপ্রিল হইতে জুন মাস পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যত মানব-শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কন্যা সন্তানের চেয়ে পুত্র সন্তান জন্মিয়াছে অনেক বেশী। পুত্রের সংখ্যা ৮০১৫২ এবং কন্যা ৭৫৮১০।

সম্প্রতি মিশরের ধ্বংসস্তূপ হইতে একটী প্রাচীন নগরের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে। নগরটী খৃষ্টজন্মের ১৩৯০ বৎসর পূর্ব্বে ফারাও আখেজাতেন নির্ম্মাণ করেন। নগরটীতে মাত্র ১০ বৎসর বসতি ছিল—প্রত্নতাত্ত্বিকগণ ইহারও প্রমাণ পাইয়াছেন।

মিষ্টার রবার্টলয়েড্ বাস করেন মিড্‌ল্‌স্‌বরোর সাউথ ব্রাঙ্ক মহল্লায়। তাঁর একটী পোষা কুমীর আছে। সেই কুমীরটী নরঘাতক। কিন্তু কুমীরটী এমন পোষ মানিয়াছে যে, সে আর মানুষ খায় না। গৃহমধ্যে দিনরাত চলাফেরা করে এবং মধ্যে মধ্যে প্রভুর পায়ের কাছে মড়ার মত পড়িয়া থাকে। কুমীরটীর নাম রাখা হইয়াছে 'আলি'।

সংবাদিকা

নিখিল-বঙ্গ-সদ্গোপ-সম্মিলনী—বঙ্গীয় সদ্গোপ সভার উদ্‌যোগে আগামী ৩রা ফাল্গুন (ইং ১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৬) রবিবার বেলা ১১ ঘটিকার সময়ে হুগলী জেলাস্থ চণ্ডিতলা গ্রামে সমগ্র সদ্গোপ জাতির সম্মিলনীর চতুর্থ অধিবেশন হইবে। সদ্গোপ জাতির সামাজিক, আর্থিক প্রভৃতি বিবিধ উন্নতির বিষয় আলোচনা ও তৎসম্বন্ধে উপায় নির্দ্ধারণ করা সম্মিলনীর উদ্দেশ্য। কলিকাতা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকিল এবং প্রবীণ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্-এ, বি-এল, মহাশয় এই সম্মিলনীর পৌরহিত্য করিবেন। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র কুমার মহাশয়ের সভাপতিত্বে অভ্যর্থনা সমিতি ঘঠিত হইয়াছে। সদ্গোপ জনসাধারণকে এতদ্বারা অনুরোধ করা হইতেছে যে, তাঁহারা যেন নিজ নিজ জেলা হইতে তাঁহাদের প্রতিনিধিবর্গ পাঠাইয়া এই সম্মিলনীকে সাফল্যমণ্ডিত করেন। অভ্যর্থনা সমিতির সদস্য হইবার চাঁদা অন্যূন ১৲ একটাকা এবং প্রত্যেক প্রতিনিধির চাঁদা অন্যূন ॥০ আট আনা ধার্য্য করা হইয়াছে। বিস্তারিত বিবরণ ৯।৭এ, প্যারীমোহন সুর লেনে সম্মিলনীর সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎলাল বিশ্বাস এম্, এস্-সি মহাশয়ের নিকট পাওয়া যাইবে।

পরীক্ষায় সাফল্য—আমরা আনন্দের সহিত জ্ঞাপন করিতেছি যে বগুড়া জেলার আক্কেলপুর নিবাসী শ্রীহরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ভারতীয় আয়ুর্বিজ্ঞান পরিষদের গত শেষ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং ভিষগাচার্য্য উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি এল-এম্-এফ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। চিকিৎসাক্ষেত্রে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া তিনি যেন সুখ্যাতি অর্জ্জন করিতে পারেন ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।

বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা—সদ্গোপ যুবক সঙ্ঘের উদ্‌যোগে এ বৎসর বাৎসরিক ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা শীঘ্রই অনুষ্ঠিত হইবে। শ্রীযামিনী প্রসন্ন সরকার ও শ্রীসুশীলকুমার সুর ক্রীড়াপ্রতিযোগিতার যুগ্ম-সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। প্রতিযোগিতার দিন ও স্থান পরে জ্ঞাত করা হইবে। সদ্গোপ বালক বালিকাগণকে ইহার জন্য প্রস্তুত হইতে অনুরোধ করা হইতেছে।

দ্রষ্টব্য—আমাদের গ্রাহক গ্রাহিকাগণকে সবিনয় অনুরোধ করা হইতেছে যে, যাঁহারা পত্রিকার সপ্তম বর্ষের চাঁদা এখনও দেন নাই, তাঁহারা যেন উক্ত চাঁদা আমাদের কার্য্যালয়ে যথাসম্ভব শীঘ্র প্রেরণ করিয়া আমাদিগকে বাধিত করেন; নতুবা আগামী সংখ্যা আমরা ভিঃ পিঃ পিঃ যোগে প্রেরণ করিতে বাধ্য হইব।

আমাদের কথা

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র কুমার প্রমুখ হুগলী জেলার চণ্ডিতলা গ্রাম নিবাসী স্বজাতি ভদ্রমহোদয়গণের আমন্ত্রণে আগামী ৩রা ফাল্গুন রবিবারে নিখিল-বঙ্গ-সদ্গোপ সম্মিলনীর চতুর্থ অধিবেশন উক্ত গ্রামে অনুষ্ঠিত হইবে। সমগ্র সম্প্রদায়ের উন্নয়নের জন্য সদ্গোপ জাতির সাধারণকে একত্র সম্মিলিত করিয়া, পরস্পরের আলাপ আলোচনার দ্বারা সামাজিক, আর্থিক, শিক্ষাবিষয়ক বিবিধপ্রকার উন্নতিসাধনের উপযুক্ত পন্থাসমূহের পরিকল্পনা এবং তাহাদের প্রচলনের ব্যবস্থানির্ণয় প্রভৃতি হিতকর কার্য্যসাধনের মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া এই সম্মিলনীর অধিবেশন হইয়া থাকে। ইহার দ্বারা প্রত্যক্ষ উন্নতি ত হয়ই; তদ্ব্যতীত পরোক্ষভাবে ইহা জাতির জাগরণ, স্বজাতি-প্রীতি, হিতকর কর্ম্মানুষ্ঠানের অনুপ্রেরণা, জনমত সংগঠন প্রভৃতি নানা মঙ্গলসাধন করিয়া থাকে। এই প্রকার সম্মিলনীর অধিবেশন সহর অপেক্ষা পল্লীগ্রামেই হওয়া বাঞ্ছনীয়; কারণ স্বজাতির অল্পসংখ্যক লোক ব্যতীত প্রায় সকলেই পল্লীগ্রামে থাকেন,—পল্লীগ্রামেই ইহার প্রয়োজনীয়তা ও কার্য্যকারিতা অত্যধিক। এবার সদ্গোপবহুল চণ্ডিতলা গ্রামে সম্মিলনীর অধিবেশন স্থিরীকৃত হওয়ায় উপযুক্ত কার্য্যই হইয়াছে। সম্মিলনীর কার্য্যভার বঙ্গীয় সদ্গোপ সভার উপর অর্পিত। নানা কারণে গত কয়েক বৎসর ইহার অধিবেশন বন্ধ ছিল। যাহা হউক এ বৎসর পুনরায় ইহার অধিবেশনের আয়োজন করাতে বঙ্গীয় সদ্গোপ সভা এবং স্বজাতিবৎসল শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র কুমার মহাশয়কে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আশা করি এইবার হইতে এরূপ ব্যবস্থা করা হইবে যাহাতে এই অপরিহার্য্য ও অত্যাবশ্যক সম্মিলনীর অধিবেশন প্রতি বৎসর নিয়মিতরূপে অনুষ্ঠিত হয়। আমরা সম্মিলনীর সম্পূর্ণ সাফল্য কামনা করি।

*　　*　　*　　*

স্বর্গীয় সুশীলচন্দ্র নিয়োগী—আমরা শুনিয়া মর্ম্মাহত হইলাম যে, গত ১৭ই পৌষ বাগবাজারের জমিদার স্বর্গীয় হরিশচন্দ্র নিয়োগীর জ্যেষ্ঠ পুত্র, কলিকাতা হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ এটর্ণী সুশীলচন্দ্র নিয়োগী এম-এ, বি-এল, মহাশয় মাত্র ৫৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি হাজারীবাগে বড়দিনের ছুটীতে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। কিন্তু সেখানে ৫ দিন নিউমোনিয়া রোগে ভুগিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। সুশীল বাবু বাল্যকাল হইতেই অতিশয় মেধাবী ছিলেন। দ্বাদশ বৎসর বয়সেই তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎপরে প্রেসীডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ, উপাধি লাভ করেন।

হাইকোর্টে প্রবেশ করেন। নাড়াজোলের স্বর্গীয় রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁয়ের একমাত্র কন্যা স্বর্গীয়া প্রমদাসুন্দরীকে তিনি বিবাহ করেন। প্রায় ১৩ বৎসর হইল প্রমদাসুন্দরী স্বর্গগতা হইয়াছেন। পুণ্যশীলা স্বর্গীয়া পত্নীর স্মৃতিরক্ষার নিমিত্ত সুশীল বাবু বহু অর্থ ব্যয় করিয়া বাগবাজারে ভাগিরথীর তীরে ইঁহাদের পৈতৃক স্নানঘাট 'রসিক নিয়োগী ঘাটের' পার্শ্বে স্ত্রীলোকদের জন্য—'প্রমদাসুন্দরী' স্নানঘাট নির্ম্মাণ করয়িা দেন। তিনি অতিশয় ভ্রমণপ্রিয় ছিলেন—প্রায় তিনি ভারতের নানা-স্থানে বেড়াইতে যাইতেন এবং দুইবার ইউরোপ ভ্রমণ করেন। তিনি একমাত্র পুত্র শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র নিয়োগী বি-এ এবং একমাত্র কন্যা কুমারী প্রতিভা নিয়োগী বি-এ. পাঁচ ভ্রাতা, এক ভগিনী ও বহু আত্মীয়স্বজন রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আমরা সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

স্বর্গীয় ক্ষিতীশচন্দ্র বিশ্বাস—আমরা শোক-সন্তপ্ত-চিত্তে জ্ঞাপন করিতেছি যে, রাজসাহী জেলার রাধানগর নিবাসী হাজারীবাগ অভ্রখনির সুযোগ্য ম্যানেজার ক্ষিতীশচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় সম্প্রতি মাত্র ৩৮ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। এই অল্প বয়সেই তিনি তথাকার ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট্ হইয়াছিলেন। তিনি স্বগ্রামের উন্নতির জন্য কূপ ও পুষ্করিণী খনন, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বিবিধ মঙ্গলজনক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার একটী নাবালক পুত্র ও একটী নাবালিকা কন্যা আছে। তাঁহার এই অকাল প্রয়াণ যে বিশেষ ক্ষতিকর সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমরা ক্ষিতীশ বাবুর শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জানাইতেছি।

* * * *

আমরা জানিয়া আনন্দিত হইলাম যে, দার্জ্জিলিংএর ইলেক্‌ট্রিক্ ইঞ্জিনিয়ার শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মণ্ডল মহাশয় এবার ইংরাজী নববর্ষে 'রায় সাহেব' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। স্বকর্ম্মে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় প্রদান করবার জন্যই রাজসরকার হইতে তাঁহার এই উপাধি লাভ হইয়াছে। তিনি কেবলমাত্র স্বকর্ম্মে সুদক্ষ পুরুষ নহেন—তিনি পরোপকারী, মধুরভাষী এবং স্বজাতিবৎসল। তাঁহার মধুর আলাপে ও অমায়িক ব্যবহারে সকলকেই তিনি তাঁহার প্রতি সহজে আকৃষ্ট করেন এবং সকলের শ্রদ্ধার পাত্র হন। আমরা তাঁহার এই উপাধিলাভে তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

সদ্গোপ পাত্র-পাত্রী

বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী

(১) সদ্গোপ পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপন বিনামূল্যে প্রকাশ করা হইবে। কেবলমাত্র পত্রিকার গ্রাহক-গ্রাহিকাগণই এই সুবিধা পাইবেন। কিন্তু স্থানাভাব বা অন্য কোন কারণ বশতঃ এই বিষয়ে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশ না করিবার ক্ষমতা সদ্গোপ যুবক সঙ্ঘের কর্ত্তৃত্বাধীন। (২) বিজ্ঞাপন-গুলি স্পষ্টাক্ষরে ও সংক্ষিপ্ত হওয়া আবশ্যক। উহা যেন এই পত্রিকার ৩ লাইনের অধিক না হয়। (৩) বিজ্ঞাপনে বিবৃত বিবরণের জন্য আমরা দায়ী নহি। পাত্র-পাত্রীর সম্বন্ধ নির্ণয়কারিগণ সমস্ত বিষয় তাঁহারা নিজেদের দায়িত্বে করিবেন। (৪) যাঁহারা নিজেদের নাম প্রকাশ না করিয়া বক্স নম্বর দিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা যদি আমাদের কার্য্যালয় হইতে পত্রাদি লইয়া না যান, তবে উহা প্রেরণের জন্য তাঁহাদিগকে আমাদের নিকট উপযুক্ত (অন্ততঃ আট আনার) ডাকটিকেট রাখিতে হইবে।

পাত্র চাই—মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত কাঁদীর দুইটী সুন্দরী সুশিক্ষিতা সদ্‌গুণ-সম্পন্না স্বাস্থ্যবতী পাত্রীর জন্য সুশিক্ষিত অবস্থাপন্ন দুইটি পাত্র আবশ্যক। গুণবিশেষে যৌতুকাদি দেওয়া হইবে। কুল সম্বন্ধে কোন বাধ্য-বাধকতা নাই। বক্স নং ১ সদ্গোপ পত্রিকা।

পাত্রী চাই-- মাসিক ২০০৲ টাকা উপার্জ্জনশীল ৩০।৩৫ বৎসর বয়স্ক বিপত্নিক পাত্রের জন্য একটী সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী বয়স্থা পাত্রী চাই। পাত্রের পূর্ব্ব-পত্নীর গর্ভজাত যথাক্রমে ৮ বৎসর ও ৫ বৎসর বয়স্কের দুইটী পুত্রকন্যা আছে। যৌতুকাদি নাই। বক্স নং ২ সদ্গোপ পত্রিকা।

পাত্র চাই—একটী চতুর্দ্দশবর্ষীয়া স্বাস্থ্যবতী শ্যামবর্ণা বাঙ্গলা লেখাপড়ায় অভিজ্ঞা গৃহকর্ম্মে নিপুণা পূর্ব্বকুল মৌদ্‌গোল্য গোত্র পাত্রীর জন্য একটী শিক্ষিত ব্যবসায়ী স্বাস্থ্যবান্ পাত্র চাই। যৌতুক ২০০০৲ টাকা। বক্স নং ৩ সদ্গোপ পত্রিকা।

পাত্র চাই—একটী ১৪।১৫ বৎসর বয়স্কা সুন্দরী শিক্ষিতা স্বাস্থ্যবতী পাত্রীর জন্য একটী সুশিক্ষিত সুদর্শন অর্থবান্ পশ্চিমকুল কুলীন পাত্র চাই। পাত্রী মৌদ্‌গোল্য গোত্র—

সদ্গোপ পাত্র-পাত্রী

পাত্র চাই—একটী সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী ১৪।১৫ বয়স্কা পাত্রীর জন্য একটী সুদর্শন সুশিক্ষিত ও সম্পত্তিশালী পাত্র চাই। যৌতুক ৪০০০৲ হাজার হইতে ৫০০০৲ হাজার টাকা। বক্স নং ৫ সদ্গোপ পত্রিকা।

পাত্রী চাই—একটী ২৩।২৪ বৎসর বয়স্ক শিক্ষিত পশ্চিমকুল বিশ্বাস ব্যবসায়ী সম্পত্তিশালী মৌদ্‌গোল্য গোত্র পাত্রের জন্য সুন্দরী পাত্রী চাই। যৌতুক সম্ভবমত হইলে চলিবে। বক্স নং ৬ সদ্গোপ পত্রিকা।

পাত্র চাই—একটী ১৪।১৫ বৎসর বয়স্কা সুশিক্ষিতা সুন্দরী মৌদ্‌গোল্য গোত্র পাত্রীর জন্য একটী সুদর্শন শিক্ষিত ব্যবসায়ী কলিকাতাবাসী পশ্চিমকুল পাত্র চাই। যৌতুক ২০০০৲ টাকা। বক্স নং ৭ সদ্গোপ পত্রিকা।

পাত্রী চাই—একটী গ্রাজুয়েট শিলং প্রদেশের ব্যবসায়ী সুদর্শন ভাল্‌কো কুলীন বংশের পাত্রের জন্য একটী ১৭।১৮ বৎসর বয়স্কা সুন্দরী শিক্ষিতা ভাল্‌কো ঘর ব্যতীত পাত্রী চাই। কুলীন না হইলেও চলিবে। যৌতুকাদি কিছুই নাই! বক্স নং ৮ সদ্গোপ পত্রিকা!

পাত্রী চাই—একটী ২২।২৩ বৎসর বয়স্ক সুদর্শন স্বাস্থ্যবান শিক্ষিত পাত্রের জন্য একটী সুন্দরী দরিদ্র গৃহের পাত্রী চাই। পাত্র সাঁওতাল পরগণায় একটী পাথর কাটাই ফার্ম্মের ম্যানেজার। কন্যাটী সেই স্থানেই থাকিবে। পাত্রী মেদিনীপুর, বাঁকুড়া বা বীরভূম স্থানীয়া হওয়া চাই। যৌতুক নাই। বক্স নং ৯ সদ্গোপ পত্রিকা।

পাত্রী চাই—ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারীং স্কুলের শেষ পরীক্ষোত্তীর্ণ মেদিনীপুর ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের অধীনস্থ কর্ম্মচারী একটী স্বাস্থ্যবান্ সুদর্শন যুবকের জন্য একটী সুন্দরী গৃহকর্ম্মে নিপুণা পাত্রী আবশ্যক। বক্স নং ১০ সদ্গোপ পত্রিকা।

পাত্রী চাই—একটি স্বাস্থ্যবান্ সুশ্রী শিক্ষিত, বিশিষ্ট ইঞ্জিনীয়ারের পুত্র, রেডিও ব্যবসায়ী ২২।২৩ বৎসরের যুবকের জন্য একটি স্বাস্থ্যবতী সুন্দরী শিক্ষিতা পাত্রী আবশ্যক। বক্স নং ১১ সদ্গোপ পত্রিকা।

নিয়মাবলী

১। সমস্ত টাকা কড়ি যুবকসঙ্ঘের ধনাধ্যক্ষের নামে ১৩/১, হ্যাংরজ্ঞ লেন, কলিকাতা এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

২। রাজনৈতিক কোন প্রবন্ধ পত্রিকাতে আলোচিত হয় না।

৩। লেখক-লেখিকাগণের মতামত পত্রিকা সম্পাদক বা সদেগাপ যুবকসঙ্ঘের মতামত নহে।

৪। লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।

৫। প্রবন্ধ কাগজের একপৃষ্ঠে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া পত্রিকা-সম্পাদকের নামে ৩৪ নং ইণ্ডিয়ান মিরার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। ডাকমাশুল না পাঠাইলে অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরত দেওয়া হয় না। প্রবন্ধ পাঠাইবার সময় আপত্তি না জানাইলে পত্রিকা পরিচালক মণ্ডলী প্রবন্ধের যে কোন অংশ পরিবর্তন ও পরিবর্জ্জন করিতে পারিবেন।

৬। যুবক-সঙ্ঘ ও তাহার পত্রিকা সম্বন্ধীয় যাবতীয় সংবাদ যুবক-সঙ্ঘ অফিস ৩৪ নং ইণ্ডিয়ান মিরার ষ্ট্রীটে জ্ঞাতব্য। সন্ধ্যা ৮টা হইতে ৯৷৷০টা পর্য্যন্ত অফিস খোলা থাকে।

৭। বিজ্ঞাপনের হার সাধারণ এক পৃষ্ঠা মাসিক ৮৲, আধ পৃষ্ঠা ৪৷৷০, সিকি পৃষ্ঠা ২৷৷০, সূচীর নীম্নে আধ পৃষ্ঠা ৬৲, সিকি পৃষ্ঠা ৩৷৷০। বিশেষ বিশেষ স্থানে বিজ্ঞাপনের মূল্য প্রকাশকের নিকট জ্ঞাতব্য।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ নিয়োগী কর্ত্তৃক দি নিউ ইণ্ডিয়ান প্রেস—৬, ডাফ ষ্ট্রীট হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সম্পাদক—শ্রীতারকনাথ হাজরা।

সূচী

১।	হিন্দু সমাজ ও অস্পৃশ্যতা (প্রবন্ধ)	...	শ্রীভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ, বি-এ	৬১
২।	পথ চাওয়া দু'টি চোখ (গল্প)	...	শ্রীমতী অপরাজিতা ঘোষ	৬৭
৩।	সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ (জীবনী)	...	শ্রীঅনাথনাথ হাজরা	৭৪
৪।	কোথায়—কত সে দূর (কবিতা)	...	শ্রীকৃষ্ণদাস রায়	৭৮
৫।	রাজগৃহের পথে (ভ্রমণ বৃত্তান্ত)	...	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ	৭৯
৬।	বিশ্ব-প্রবাহ	...		৮৮
৭।	সমালোচনা	...		৮৯
৮।	সংবাদিকা	...		৮৯
৯।	আমাদের কথা	...		৯০

৭ম বর্ষ] মাঘ, ১৩৪২ [৩য় সংখ্যা

হিন্দু সমাজ ও অস্পৃশ্যতা

[শ্রীভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ, বি-এ]

কবি বলিয়াছিলেন—

"যা'রে তুমি নীচে ফেল, সে তোমারে টানিবে যে নীচে,
পশ্চাতে রেখেছ যা'রে, সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে,
অ-জ্ঞানের অন্ধকারে
আড়ালে ঢাকিছ যা'রে
তোমার মঙ্গল ঢাকি' গড়িছে সে ঘোর ব্যবধান,
অপমানে হ'তে হবে তাহাদের সবার সমান।"

কিন্তু এমনি দুর্ভাগা দেশ যে, কথাটা কাব্যের খাতিরে কাণে তুলিয়াই সে বাহবা দিল, ভিতরকার সত্যবস্তুটার দিকে ফিরিয়াও চাহিল না। এমনি করিয়াই দুর্ভাগ্যকে সে বরণ করিয়া লইয়াছে। বেশ দেখিতে পাই, খাঁটি জিনিষ আমাদের ধাতে সহে না। স্বাভাবিক গো-দুগ্ধ আমাদের হজম হয় না, তাহার পরিবর্ত্তে মাখন তোলা দুধে জল মিশাইয়া আমরা মনের সুখে দেহের পুষ্টিসাধন করি; স্রোতের টাট্‌কা জলে আমাদের ম্যালেরিয়া হয়, সুতরাং স্নান সম্বন্ধে আমাদেরকে অভিনব বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করিতে হইয়াছে; চা আমরা খাই, কারণ উহা দেহে "এনার্জ্জী" আনে। এমনি, সব কিছুরই স্বাভাবিকতার পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া আমরা বাস্তবিকই এক অভিনব সৃষ্টিতে পরিণত হইয়াছি। সুতরাং আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চলার পথটাকেও অনেকখানি অন্যরকম করিয়া লইতে হইয়াছে। 'ধর্ম্ম' কথাটার জন্য

আদিম যুগের মানুষের চলার পথের সঙ্গে এ যুগের মানুষের চলার পথের যে একটা সামঞ্জস্য থাকিতেই হইবে, শাস্ত্রকার অবশ্য এমন কিছু একটা মাথার দিব্য দিয়া মানুষের হাত-পা বাঁধিয়া দেন নাই। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, সভ্যতার নজীর দেখাইয়া আমরা যাহা কিছুই ভাঙ্গিয়া গড়িতেছি, সেই সবই নকল হইয়া দাঁড়াইতেছে; আসল বস্তুর বিকৃত রূপটাতে খুব খানিকটা রং মাখাইয়া দ্রষ্টব্য হিসাবে ব্যবহার করার নেশায় যেন আমাদেরকে পাইয়া বসিয়াছে। মানুষের ইতিহাস পড়িতে যাইয়া দেখি, এমন অদ্ভুত জীব দুনিয়ায় আর দু'টী নাই। অর্থহীন খেয়ালের বশে এক এক সময় নিজকে সে এমনি 'কিম্ভূত-কিমাকার' করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে যে, ভয়ে, বিরক্তিতে, লজ্জায় তাহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া বলিতে ইচ্ছা হয়,—"আর কেন, জীবজগতের ইতিকথাটা তো একরকম অপাঠ্য করিয়াই তুলিয়াছ, এবার পাত্‌তাড়ি গুটাইলেই ভাল হয় না কি?" আবার দেখি, কেমন করিয়া কোন সুযোগে সে আপনার গৌরবখানি এমন করিয়া সুস্পষ্ট করিয়া দিয়াছে যে, কোনখানে তাহার এতটুকু সঙ্কোচ চোখে পড়ে না; যেন একেবারে দিনের আলোর মতই সর্ব্বব্যাপী। সুতরাং এই অত্যন্ত খেয়ালী প্রকৃতির মানুষের ধর্ম্ম সেই প্রথম সমাজ সৃষ্টির দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত একটানা-স্রোতের মতই অবিচলিত থাকিতে পারে নাই, বিভিন্ন অঙ্কে আসিয়া তাহাকে বিভিন্ন প্রকারের সাজ-পোষাক আপনার দেহে তুলিয়া লইতে হইয়াছে এবং প্রয়োজন ফুরাইলে আবার খুলিয়া রাখিতেও হইয়াছে। মানুষের এই নির্ম্মম ভাঙ্গা-গড়া খেলার খেয়ালের ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া কত নিয়ম কানুনই যে রূপান্তরিত হইয়াছে, এমন কি একেবারে লোপই পাইয়াছে এবং ভবিষ্যতে পাইবেও, তাহার হিসাব-নিকাশ চলে না। সে চেষ্টাও করিব না। কিন্তু ভাল-মন্দর বিচার বোধ করি চলে। এবং মানুষের বিচার করিতে বসিয়া যদি কিছু তাহার স্বপক্ষে অথবা বিপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহার করিতেই হয় তো তাহা তাহার এই নিজহাতে গড়া 'ভাল' এবং 'মন্দ'। একটা জাতিকে বোঝা যায় তাহার ধর্ম্ম বুঝিয়া। ধর্ম্ম মানে আমি বুঝি—চলার পথের শৃঙ্খলতা। সেই শৃঙ্খলতাটা বজায় রাখিয়া পরিপূর্ণতার দিকে যে মানুষ অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, বেদ-বেদান্ত, দর্শন-উপনিষদের কঠিন কঠিন সূত্রগুলা যদি সে নাও জানে, আমি বলি তবু সে লোকটা ধার্ম্মিক। কারণ, মানুষের সঙ্গে সে যে-সত্যের রক্ত-সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছে, তাহার স্থিতিকাল কোন বিশেষ একটা যুগ নয়, সে সম্বন্ধ চিরন্তনের। মানুষের সঙ্গে মানুষের এই সম্বন্ধ-বন্ধনের দৃঢ়তা, ইহাই তো ধর্ম্মের বনিয়াদ। ইহাকে আশ্রয় করিয়াই তো গৃহীর গার্হস্থ্য রীতি, ত্যাগীর ত্যাগ, সঙ্ঘের সেবা-ধর্ম্ম। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে, এই অতিবড় সত্য কথাটার ভিতরে আমরা প্রবেশ করিতে পারিলাম না, কবির উক্তির প্রকাশ ভঙ্গিমা উপলব্ধি করিয়া ভাবে বিভোর হইয়া পড়িলাম।

'তুমি জাত্যাংশে হীন, তোমার দেবপূজায় কোন অধিকার নাই; তুমি আমাকে স্পর্শ করিও না, তাহা হইলে আমার মহাপাপ হইবে, আমি অশুচি হইব'—এমনি কতকগুলি কথা বহু পুরাতন যুগ হইতেই সমাজে চলিয়া আসিতেছে; এবং ইহাও শুনিয়াছি যে, এই অতি নিষ্করুণ প্রথা আছে বলিয়াই হিন্দু সমাজ আজ পর্য্যন্ত সগৌরবে মাথা তুলিয়া আছে। হিন্দু সমাজের রহস্য এতদিনে কতক বুঝিয়াছি। অনেকদিন আগে যখন ইস্কুলের নীচের শ্রেণীতে ইতিহাসের পাতায় হঠাৎ 'জাতি-বিভাগের' সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়া গেল, তখন পরীক্ষার আতঙ্কে পাতা কয়টাকে কেবলমাত্র প্রাণপণে কণ্ঠস্থ করিয়াই ক্ষান্ত হই নাই—কেহ কেহ আবার অতিরিক্ত নিশ্চিত করিয়া লিখিবার জন্য ঠিক দিনটীতে গোপনে পাতাকয়খানি সঙ্গে লইয়াছিল। তখন বুঝি নাই যে, এই 'জাতি বিভাগ' ব্যাপারটী পরীক্ষার খাতায় মুখস্থ লেখা যতটা সহজ, মানুষের সঙ্গে ব্যবহার করিবার সময়—যখন অনেক কিছুই বুঝিতে শিখিয়াছি, অনেক কিছুই পরিষ্কার করিয়া দেখিতে শিখিয়াছি, তখন আর তত সোজা বলিয়া মনে হয় না। তখন মনে হয়, মানুষের উপর মানুষের এতখানি বিদ্বেষ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিল কি করিয়া! কি অধিকার আছে আমার মানুষকে এমন করিয়া ঘৃণা করিবার? এক এবং অন্যের মাঝখানে এই যে পদে পদে প্রাচীর তুলিয়া দিয়া বিচ্ছেদের সাধনায় সমাজকে দমবন্ধ করিয়া মারিবার চেষ্টা, ইহার কোনখানেই বা ইহকালের গৌরব, কোনখানেই বা পরকালের শান্তি! অথচ এই অতিবড় মিথ্যাটার উপর এতবড় একটা ধর্ম্ম বেশ নিশ্চিন্তে নির্ব্বিবাদে বিশ্রাম করিতেছে তো! আমি শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতে পারিব না; কারণ, শাস্ত্র লইয়া লড়াই করিতে হইলে যে পরিমাণ জ্ঞানবুদ্ধির প্রয়োজন, আমার তাহা নাই। আমি কেবল এই সাদা কথাটাই বুঝিয়া দেখিতে বলি, যে, আমি যেখান হইতে অহরহ আমার প্রাণশক্তি আহরণ করিতেছি, যাহার ভালমন্দর সঙ্গে আমি চির-জীবনের জন্য জড়িত, সেই মনুষ্য-সমাজের কি ইহাতে কিছুই আসিয়া যাইবে না? আমি হিন্দু;—হিন্দুধর্ম্ম আমি বিশ্বাস করি, যাহা হিন্দুর বলিয়া পরিচিত তাহা কেবল ভারতেরই নয়,—তাহা বিশ্বের। 'বিশ্ব' কথাটা মস্ত, 'মানুষ' আরও মস্ত। সুতরাং বিশ্বের যদি সীমারেখা না থাকে, মানুষ তো অচিন্ত্য। কিন্তু মূর্খ আমরা এই অচিন্ত্যকে গণ্ডীবদ্ধ করিয়া কেবল আত্মপ্রবঞ্চনার পাপ বাড়াইয়াই চলিয়াছি। স্বীকার করি,—পথের শৃঙ্খলতা বজায় রাখিতে হইলে কেহ আগে, কেহ পরে তো থাকিবেই; তাহা না হইলে একেবারে মারামারি কাটাকাটি হইবে যে। বেশ কথা। কিন্তু প্রত্যেককেই অগ্রসর হইতে হইবে তো! অথচ সেই দিকটাতেই আমাদের দৃষ্টি নাই। কেনই বা থাকিবে! আধুনিক সভ্যতার জুড়ি-গাড়ী হাঁকাইয়া আমরা বিশ্বের দরবারে ছুটিয়া চলিয়াছি, পথের ধূলায় কোথায়

আমরা গর্ব্ব করিতে ছাড়িব না যে, আমরা হিন্দু, আমরা শ্রেষ্ঠ। হিন্দুর হিন্দুত্ব সত্যে,—প্রেমে—পবিত্রতায়। সেই প্রেমের দেবতা আমাদের অন্তর হইতে আজ যান্ত্রব সভ্যতার খোঁচা খাইয়া অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন। আমি কেবল হিন্দুর কথা বলিতেছি না, আমি বলিতেছি মানুষের কথা। মনুষ্যত্বের মৃত্যু হিন্দুকে যে আজ এমন করিয়া দিনের পর দিন ধ্বংসের পথে লইয়া চলিয়াছে, ইহার জন্য দায়ী শাস্ত্র নয়,—মানুষ। শাস্ত্রের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া নিজের দুর্ব্বলতাখানি ঢাকিবার ব্যর্থ চেষ্টা আর নাই বা করিলাম! পৃথিবীর কোন শাস্ত্রের মূলেই ব্যক্তিগত বা সম্প্রদায়গত স্বার্থ নাই, হিন্দুর শাস্ত্র তো সে ভাবে গড়া নয়ই। বাঁচিয়া থাকিবার দিন কয়টা সত্য সত্যই যাহাতে সুখে স্বচ্ছন্দে কাটে, সেই উদ্দেশ্যে সমগ্র জাতীকে ভাগ ভাগ করিয়া এক এক ভাগকে এক একটী বিশেষ দায়িত্ব দিয়া, শাস্ত্র সর্ব্বাঙ্গীন সামাজিক উন্নতির একটা 'প্ল্যান্' স্থির করিয়াছিল—এই মাত্র। শাস্ত্রকার তখন ভাবিতেও পারেন নাই যে, এক অনাগত যুগের মানুষ একদিন এমনি করিয়াই তাঁহার বিধি-বিধান গুলির বিকৃতি ঘটাইয়া নিজের ফাঁদে নিজেই ধরা দিবে। শিব গড়িতে জন্তবিশেষ গড়িয়া উঠিবার একটা প্রবাদ এদেশে শোনা যায়। কিন্তু হিন্দু সমাজে সে প্রবাদ আজ প্রত্যক্ষ সত্য হইয়াই দেখা দিয়াছে। 'অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন' মানে আমি এমন মনে করিনা যে, এ যুগের নীচ জাতীকে মাথায় করিয়া লইয়া নাচিতে হইবে, অথবা মস্ত একটা সভা করিয়া স্ব-ইচ্ছায় তাহাদের ছোঁয়া জল খাইয়াই শাস্ত্রের যথাযথ ব্যাখ্যা করা হইল বলিয়া আনন্দে দিশাহারা হইতে হইবে। এমন করিয়া পাপ বিদায় হয় না, বরং আরও চাপিয়া বসে! আমি হাঁটিতেই শিখিলাম না, অথচ হঠাৎ একদিন ধরিয়া বাঁধিয়া আমাকে দৌড়ের প্রতিযোগিতায় মাঠে দাঁড় করাইয়া দেওয়া হইল;—ফল হইল এই যে, উৎসাহের আতিশয্যে আর সকলের মত করিয়া দৌড়াইতে যাইয়া আমি আমার পা-খানা তো খোঁড়া করিলামই, পথের মাঝখানে চিৎপাৎ হইয়া অন্য আর সকলেরও গতি ভঙ্গ করিলাম। ইহাকে উন্নতি বলে না, বলে বাড়াবাড়ি। আমি বাড়াবাড়ি করিতে বলি না। আমি বলি—তাহাদের দুর্ব্বলতাটুকু তাহাদের নিজের চোখেই ধরাইয়া দিতে। আমরা ঘরের ছাদে মাদুর পাতিয়া, ডাবা হুঁকো হাতে, সবার সাথে দেশের উপকার করিতে শিখিয়াছি; শিখি নাই কেবল তেত্রিশ কোটী নর-দেবতার যে অক্ষমতার জ্বালা বেদনার বিষে জমাট বাঁধিয়া চলার গতিকে প্রতিহত করিয়া দিয়াছে, সেই দুঃসহকে সমস্ত মন-প্রাণ দিয়া অনুভব করিতে। আজ আমরা চীৎকার করিয়া মরিতেছি,—'কেন দেশ জাগেনা' বলিয়া। কেন যে জাগে না, তাহার উত্তর পাইব তখনই, যখন বুঝিতে শিখিব—কত বড় অনুতাপের জতুগৃহ আমরা নির্ম্মাণ করিয়াছি, ওই হতভাগ্যদের দীর্ঘশ্বাসের বেড়া বাঁধিয়া।

দাবী শোধ করিতে আজ এই সাম্যের যুগেও যদি তাহাদেরকে একেবারে রাহুগ্রস্ত করিয়া রাখি, তবে আর যাহাই হউক, শান্তি আসিবে না। বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার প্রত্যেকেরই আছে। সে পথে যাহারা অন্তরায়, অমানুষের অপবাদ তাহাদেরকে লাগিবে না কি ?

তবে, একেবারে খাঁটি সোণা যেমন দ্রব্য হিসাবে বিশুদ্ধ হইলেও ব্যবহারের পক্ষে অচল, তেমনি একেবারে নিছক সত্য লইয়াও কিছু কাদামাটির দুনিয়া—যেখানে জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত কেবল 'খাটিয়া বহিয়াই' আনিতে হইবে, সে দুনিয়া—চলে না। অপলাপ হইলেও সত্যকে সেখানে 'প্রয়োজন'কে সমীহ করিয়া চলিতেই হইবে। হয়ত ইহারই জন্য আজ ওই হতভাগ্যদের এমনি শোচনীয় অধঃপতনের কারাকক্ষে মানুষ হইয়াও মানুষের বন্দী হইয়া থাকিতে হইতেছে। অতি দুঃখেই কবি বলিয়াছিলেন,—"What has made of man !" কিন্তু এ কথাও ঠিক যে, প্রয়োজন যতই কেন বড় হউক, সত্যের সীমা লঙ্ঘন করিয়া অমঙ্গলকে যদি সে চাহিয়াই বসে, তো সে তাহার অসঙ্গত দাবী। হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, খৃষ্ট, বৌদ্ধ, জৈন, যে কেহই হউক, যাহা সত্য—যাহা শিব—যাহা সুন্দর, তাহারই দিকে পিছন ফিরিয়া যদি সে কেবল মিথ্যা দাম্ভিকতার আসনে বসিয়াই সাধনা সুরু করিয়া দেয়, তো সে সাধনা তাহার সার্থক হইবে না। যে মানুষকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতে পারিয়াছে, স্বর্গরাজ্যের দাবী করিতে পারে সেই। হউক সে মনু-সংহিতার শুদ্র, কিন্তু বিশ্বসংহিতার ছত্রে ছত্রে সেই মনুষ্যত্বের ব্রাহ্মণ। যদি কোন দিন সেই ব্রাহ্মণত্বের দাবী আমরা করিতে পারি তবেই জানিব, কাব্যকে আমরা আপন করিয়া লইতে পারিয়াছি।

কিন্তু এ সম্ভব হইবে কেমন করিয়া ! 'অস্পৃশ্যতা নিবারণ' লইয়া বিস্তর কথা কাটাকাটি হইয়া গিয়াছে,—সভা-সমিতি করিয়া, প্রবন্ধ লিখিয়া, প্রচারকার্য্যে যোগদান করাও এই প্রথম নহে। কিন্তু শতাব্দীর দুঃসহ চাপে যে হতভাগ্যরা চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে রসাতলের গর্ভে প্রবেশ করিয়াছে, আজ কয়জনে মিলিয়া উপর হইতে 'উঠ, উঠ' বলিয়া চীৎকার করিলে, ওঠা কি তাহাদের পক্ষে এতই সহজ হইবে ? পিছন হইতে 'অক্টোপাশের' মত যে অন্ধ কু-সংস্কারের সহস্রবাহু তাহাদেরকে জড়াইয়া ধরিয়া রাখিয়াছে, যদি না সেই দুশ্ছেদ্য বন্ধনগুলিই ছিন্ন হইল, কি করিয়া ওঠা সম্ভব হয় ? শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার দুইটা জোরালো কথায় তাহাদের কি হইবে ? আজ চোখে আঙুল দিয়া তাহাদেরকে দেখাইতে হইবে, কোথায় তাহাদের গলদ, যাহার জন্য সমগ্র জাতির প্রাণশক্তি আজ এমন হাঁপাইয়া উঠিয়াছে। এমন অবস্থা তো তাহাদের ছিল না। অথচ তখনও শাস্ত্র ছিল, মানুষ ছিল। কিন্তু আরও যাহা ছিল—তাহা অত্যন্ত কঠোর সূক্ষ্ম দৃষ্টি।

অধিকার বা অনধিকারের সঙ্গে কোন সম্বন্ধই তাহার ছিল না। কিন্তু এমনি দুর্ভাগ্য যে, সেই ব্যক্তিগত গুণটাই আমরা একরকম নেশার ঝোঁকেই জন্মের ভিতর দিয়া, বংশের ভিতর দিয়া, অবশেষে জাতির ভিতর দিয়া—কেহ বা নিজেদের দোষে, কেহ বা জোর করিয়াই একচেটিয়া করিয়া লইলাম। সে যুগের ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিত; ব্রাহ্মণ শূদ্রত্বে পতিত হইত। কিন্তু এ যুগে যখন একদিকে ব্রাহ্মণ কেবলমাত্র একগাছি সূতার জোরে সমস্ত বাংলাদেশটাকে অশাস্ত্রীয় হাওয়ায় উড়াইয়া দিয়া মহানন্দে বসিয়া আছেন, তখন অন্যদিকে সারা দেহে সম্মানের ছাপ লইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দালানবাড়ী হইতে আপনার জন্মমুহূর্ত্তটীর উপর অভিশাপ বর্ষণ করিতে করিতে বাহির হইয়া আসিতেছে—এ যুগের শূদ্র। এই হীন অধঃপতনের জন্য দায়ী শূদ্র নিজে, ব্রাহ্মণ নয়। সর্ব্বস্ব বিলাইয়া দিয়া যেখানে আসিয়া আজ সে দাঁড়াইয়াছে, সেখান হইতে উঠিতে হইবে তাহাকে নিজে চেষ্টা করিয়া। তাহা না হইলে, আর পাঁচজনে মিলিয়া, উঠাইয়া হয়ত তাহাকে দিতে পারিবে, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই আবার তাহার পতন অনিবার্য্য। নিজে ইচ্ছা করিয়াই এতদিন যে জঞ্জাল সে তাহার নিজের চারিপার্শ্বে স্তুপীকৃত করিয়া তুলিয়াছে, আজ নিজ হাতে সেই জঞ্জাল পরিষ্কার করিয়াই তাহাকে দ্বিজত্ব লাভ করিতে হইবে। ইহারই শিক্ষা, এই সাহচর্য্যই আমাদের নিকট তাহার অবশ্য প্রাপ্য। সেই শিক্ষা না দিয়া, আজও যদি কেবল সভা-সমিতি করিয়া নিজকে প্রতারণা করিতে চাই, তবে—

"হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যা'দের করেছ অপমান,
অপমানে হ'তে হবে তাহাদের সবার সমান॥"

পথ চাওয়া দু'টি চোখ

[শ্রীমতী অপরাজিতা ঘোষ]

রত্নাকে আজি এখুনি ষ্টেশনে বেরুতে হবে।......

চাটুর্য্যেদের বউ আস্‌চেন, তাঁকে নিয়ে আস্‌তে হবে। ষ্টেশন থেকে নিয়ে আস্‌বার ভার পড়ে তা'র ওপরই। তাকে সবাই চেনে; গ্রামের মুরুব্বিরা তাকে বিশ্বাসও করেন।

রাত প্রায় ন'টা হ'তে চল্লো। এখন না বেরুলে ভোরের দিকে পৌছুনো যাবে না কিছুতেই; তা সে জানে। এই তো সেদিন মিত্তিরদের মেয়েকে আন্‌তে যেতে হ'য়েছিল তাকে। যতই হাঁকিয়ে চলুক না কেন, কিছুতেই এই ছ' ক্রোশ পথ আট ঘণ্টার কমে যাওয়া চলে না। রত্না ছাড়াও যায় অনেকে; কিন্তু তার মতন অমন আরামে কেউ নিয়ে আস্‌তে পারে না। জীবনের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ তার এই গাড়ী খানা—আর ঐ বলদ দুটো। প্রাণী দু'টোকে বেশী খাটালে তার মায়া হয়—তার চোখ দিয়ে জল আসে। প্রভুত্ব কর্‌বার সে কে? তাই সে এক রকম ছেড়ে-ছুড়ে দিয়েচে পাঁচ সাত খানা দূরের গ্রামে যাওয়া। ষ্টেশনে তাকে কখনো-কখনো যেতে হয়। অবহেলা কর্‌তে পারে না সকলের আজ্ঞা। যাঁদের সমবায়ে তা'র অতগুলো দিন কাটিল, শেষের দিকে তাঁদের বিমুখ কর্‌তে সে নারাজ। নইলে আজ সে যেত না। কোন দিন যেত না হয়তো। যে পথে গেলে তার ফেরা হয় না, সে পথে সে চল্‌বে না। কাজ ভাঙানোর সুর সে শুন্‌তে পায় যে পথে, সে পথে যাওয়া তার নিষেধ। বলদ দু'টোকে খামকা বেঁধে রাখতে তার মন চায় না! এবার সে তাদের মুক্তি দিয়ে নিজেও নেবে ছুটি। ছুটির আনন্দে সে মেতে উঠেচে। এ গ্রামের মায়া তাকে এবার ছাড়তে হবে। এতদিন পরে সে সন্ধান পেয়েচে তার দেবীকে; আনবেই—যে কোন উপায়ে ধ'রে আনবেই। কারুর কথা সে শুন্‌বে না; দেবতার ভ্রূকুটি সে মানবে না। হয় সে তাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আস্‌বে এই গ্রামে; না হয় চলে যাবে চিরতরে—একা সে আর ফিরবে না। হোক্ না তার লোকসান্, তবু সে লাভের আশায় গেল না—এইটেই তার কাছে বড়। আজ একবার শেষ চেষ্টা কর্‌বে। যার কসুর এতটুকুও হবে না। উল্লাসে আজ সে মরিয়া।

বলদ দু'টোকে বাবলা গাছ থেকে খুলে এনে গাড়ীতে জুড়লে। আজ আর সে আফিম ছোঁবে না। সেদিন মাত্রাটা একটু বেশী হ'য়েছিল। তা খেয়াল না থাকবারই কথা। একে রাত্রি গাঢ়, তার ওপর সারাদিন তার খাটুনি গেছে। সারা দেহ-মন ভরেছিল অবসাদে। একটু পা ছড়িয়ে ঘুমতে পারলে বাঁচে। যতদিন না ঘুম আসে, ততদিন তার রেহাই মিল্‌বে

সোজা পথ—তার অতি পরিচিত পথ ; এ পথের ভুল তার কখনো হয়নি। কতদিন সে ঘুমিয়ে পড়েছে এম্নিভাবে ঝিমতে ঝিমতে, তার ইয়ত্তা নেই ; কিন্তু এমন ধারা বেপথে গাড়ী কোন দিন যায়নি। এমন হয়তো এক একদিন হ'য়েছে যে, গাড়ী রাস্তা ছেড়ে মাঠে গিয়ে পড়েচে, আলে আটকে গিয়ে যেতে না পেরে থেমে গেছে। সে আবার মাঠ থেকে সরিয়ে এনেছে। মাঠের বুক চিরেই লোকাল বোর্ডের রাস্তা। রাস্তা আর মাঠ এক বল্লেই হয়। না আছে রাস্তার কোন সীমানা, না আছে কোন চিহ্ন। কোন্ মান্ধাতার আমলে মাটি কেটে উঁচু ক'রে দেওয়া হ'য়েছিল, তা এখন নেমে গিয়ে মাটির সঙ্গে সমতল হ'য়ে গেছে। এখন আর কোন পার্থক্য নেই উঁচু-নীচুর। গাড়ী চ'লে চ'লে যে লিক্ পড়েচে, রাস্তা বল্‌তে এখন সেইটেই বুঝায়। সুতরাং রত্নাকে আর সাবধানে থাকতে হয় না। সে জানে, গাড়ী হয়তো বড় জোর ক্ষেতের মধ্যিখানে গিয়ে পড়্‌বে। এর বেশী আর কিছু হবার সম্ভাবনা নেই। তাই সে-ও বেপরোয়া। যেদিনই তার ষ্টেশনে যাবার ডাক আসে ; আফিমের মাত্রাটা সে চড়িয়ে দেয়। সারারাত তাকেও তো জাগ্‌তে হবে।

* * * *

সেদিন ছিল আমাবস্যার কোটাল ; ফিকে একটুখানি আলো বেরিয়েছিল আকাশ চিরে। বাগ্দীপাড়াকে পেরিয়ে এসেচে অনেকক্ষণ ; ন'পুরের সাঁকো সে সবেমাত্র ডিঙ্গিয়ে এসেচে—তার বেশ মনে আছে। তার পরই ধর্‌ল আফিমের নেশা। ঢুলুনি এলো ; তবুও সে ঘুমবে না। তাকে যে জেগে থাক্‌তেই হ'বে। আর ক'ঘণ্টা সময়ই বা আছে ; এরি মধ্যে তাকে ষ্টেশনে পৌছিতে হবে। এখনো পাক্কা একটা ক্রোশ। এখনো মাঝের গ্রাম, পানপুর তাকে পার হ'তে হবে। সে তাড়া দিতে লাগ্‌ল বলদ দু'টোকে প্রাণপণে। গাড়ী যথা সম্ভব জোরেই ছুট্‌ল। তার অন্তর ভরে উঠ্‌ল খুসীতে। সে নাকি সময়ে যেতে পার্‌বে না! গ্রাম শুদ্ধ সবাই তাকে বাহবা দেবে। সে কি যে-সে লোক। বার বছর বয়েস থেকে সে এই কাজ করে আস্‌চে। চক্‌মকিতে ঠুকে আগুনের ঝল্‌কা বার করে সে বিড়ি ধরিয়ে নিলে। এ রকম আরামে সে অনেক দিন টানেনি। গাড়ী হু-হু করে' চলেচে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে মাঝের গ্রামের মাঝামাঝি এসে পড়্‌ল। ভোরের স্পর্শে সে তাজা হ'য়ে উঠ্‌ল। আবেগের সুরে তার সেই জানা গানটি ধর্‌লে :—

এবার তুমি পার ক'রে দাও হরি।
ভবের খেলা খেল্‌তে এসে,—
জীবন আমার গেল ভেসে —

এ সমস্তই তার চোখে জল্ জল্ করে' ভাস্‌ছে। তার কি এতটাই ভুল হবে। প্রত্যেক খুঁটি-নাটি কথা তো তার মনে আছে; বিস্মরণ এখনো তার আসেনি। নেশা তো আজ নতুন নয়। তার স্ত্রীর সঙ্গে এই নিয়ে কতদিন ঝগড়া-ঝাঁটি পর্য্যন্ত হয়ে গেছে। পরাজিত হয়ে সে শুধু মাত্রা কমিয়ে দিয়েছিল, একেবারে ছাড়্‌তে পার্‌লে কৈ? আজ তার স্ত্রী নেই; সুতরাং বাধা তাকে কেউ দেয় না। সংসারে দুর্গাই তার একমাত্র আকর্ষণ। এই দুর্গাকে তিন বছরের রেখে তার মা মারা যায়। সে-ই বুকে পিঠে করে' তাকে বড় করেচে। সে যে তার বড় আদরের। একদণ্ডও চোখের আড়ালে রাখ্‌তো না। প্রথম প্রথম যেখানেই সে যেত, দুর্গাকে তার সাথী করে নিয়ে ঘুরে বেড়াত। সেই দুর্গাও তাকে ফাঁকি দিলে অবশেষে একদিন। তারপর থেকে রত্না বদলে গেছে। আফিম হ'লো তার একমাত্র সঙ্গী। চুকলো তার আবাদের পাট। একটা পেট—তার জন্যে সে ভাবে না। সংসারে তার মমতা নেই। বাঁচ্‌তে তার আর সাধ হয় না। সব সে ত্যাগ করেচে, পারেনি শুধু এই প্রাণী দু'টোকে ছাড়্‌তে।

ঢেঁকির মাঠ পেরিয়ে এসে তার চেতনা হ'লো যেন নেশা একেবারে কেটে গেছে। সঙ্গেই ছিল আফিমের কৌটা। একটি মাত্রা পুরে দিয়ে সে নতুন বল পেলে। এবার সে আর কিছু ভাবচে না; আর তাকে ছোটাতে হবে না। ধীর, মন্থর গতিতে গেলেও সে ভোরের সঙ্গে সঙ্গে হাজির হ'তে পার্‌বে। অল্পক্ষণ পরেই তাকে আমেজে জড়িয়ে ধর্‌ল। নেশায় তাকে কাবু ক'রে ফেল্‌লে। এতটা মস্‌গুল্ সে অনেকদিন হয়নি। গাড়ী চলেচে কি না চলেচে, সে খেয়াল তার ছিল না। সারা রাতটা তার তন্দ্রায় কেটেচে, ভোরের অলস হাওয়ায় তাকে গেড়ে ফেলেচে একেবারে। হঠাৎ তার মনে হ'ল যেন দুর্গা সাম্নে এসে পথরোধ করে' দাঁড়িয়েচে। কিছুতেই যেতে দেবে না। দশটা বছরেও তার চেহারার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয়নি। পরণে সেই ডুরে শাড়ীখানা তেম্নি অগোছালো ভাবে জড়ানো।

রত্না আঁৎকে উঠে বল্লে,—"তুই এতদিন কোথায় ছিলি রে দুর্গা!"

দুর্গা একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো।

—"তোকে যে অনেকদিন দেখিনি। এতদিন পরে যখন তোর বুড়ো বাপ্‌কে মনে পড়েচে, তখন আর চোখের বাইরে যেতে দেবো না।"

দুর্গা হেসে উঠ্‌ল, তার কথাকে অবজ্ঞা করে'।

—"আমার সঙ্গে বাড়ী চ'। মিত্তিরদের মেয়ে উমা আজ আস্‌চে—তার সঙ্গে তোর কত ভাব। তোকে দেখে সে কত আনন্দ কর্‌বে। ছইএর ভেতরে উঠে বস্। তোকে তো কোন দিন কিছু বলিনি, তবে কেন এ অভিমান!"

দুর্গা নিজেও যাবে না, গাড়ীকেও যেতে দেবে না। রত্না তাকে ঠেলে দিয়ে কি ক'রে গাড়ী হাঁকায়। সে যে তা'হলে থেঁৎলে যাবে।

—"যাবি না ? কেন ? তোর বুড়ো বাপ্—তার যে কেউ নেই। তুই ছিলি তার একান্ত আপনার ; যার ওপর আমার দাবী চল্‌ত, যাকে কেন্দ্র ক'রে আমি ঘুর্‌তুম বেড়াতুম। রাগের মাথায় কবে একদিন কাণ মূলে দিয়েছিলুম ব'লে কি এতটা অভিমান কর্‌তে আছে ! বুড়ো বাপের দিকে ফিরেও তাকালি না, তার যে কেউ নেই এই দুনিয়াতে।"

দুর্গার চোখ দু'টো সজল হ'য়ে উঠলো।......

—"কাঁদিস্ নি মা, ওঠ্। এদিকে আমার সময় বয়ে যাচ্চে। ঐ দেখ্, চাষারা বেরিয়েচে লাঙল ঘাড়ে নিয়ে। ঐ শোন্, পাখীদের প্রভাতী গান। এখনো যে আমাকে পোয়াটাক পথ যেতে হ'বে রে। নে আর দেরী করাস্‌নি। উঠে পড়্—"

দুর্গা হো—হো ক'রে হেসে উঠ্‌লো।......

"—এতদিন কোথায় লুকিয়ে ছিলি রে দুর্গা ! কত যে তোকে খুঁজেছি তা' আর কি বল্‌বো। তোর সেই প্রিয় বোঁচ্-বল উপ্‌ড়ে ফেলে দিয়েচি, তবু তোর দেখা পায়নি। কতদিন সেই বুড়ো জাম গাছটার নীচে তোর অপেক্ষায় সারারাত কাটিয়ে দিয়েচি, তবু তুই দেখা দিস্‌নি। 'সাগর' দিঘীর পাড়ে যখন-তখন গাড়ী নিয়ে হাজির হ'য়েচি, তোর দেখা তবুও পায়নি। আজ আমি কিছুতেই ছাড়্‌বো না। এত কাছে যখন পেয়েছি তোকে—ঘরে নিয়ে যাবোই। আজ আর কিছুতেই ছাড়্‌বো না। লাল তাঁতের সাড়ীখানা এখনো আমি যত্ন ক'রে রেখে দিয়েচি, তোর যেখানা খুব সাধের ছিল।...যাবি না ? এত করে বল্‌লুম, তবুও যাবি না ? কেন, কিসের জন্যে এ অভিমান ? তোর বুড়ো বাপের দিকে চেয়ে দেখ্ এই ক'টা বছরে সে কতখানি মুছ্‌ড়ে পড়েচে, কতখানি ভেঙ্গে পড়েচে।"

দুর্গা দৌড়ে পালিয়ে গেল। রত্না ছুট্‌লে তার পিছু পিছু। খানিকটা গিয়ে দুর্গা আচমকা হারিয়ে গেল। রত্না এত কাছে পেয়েও তাকে ধর্‌তে পার্‌লে না। এ আপ্‌সোষ্ তার কখনো যাবে না ! নাম ধ'রে সে কত ডাক্‌লে। "আয়—আয়, ওরে ফিরে আয়"—ব'লে সে কত চেঁচালে। 'নেই—নেই, সে নেই'—প্রতিধ্বনি বার বার প্রতিহত হ'য়ে ফিরে এল তার কাণে। সে তাকে কথায় ভুলিয়ে আন্‌তে পার্‌চে না। কথায় ভোল্‌বার মেয়ে সে নয়।...একদিনের কথা তার মনে পড়্‌লো। তখন দারুণ শীত। লোকের হাত-পা যেন অবশ হ'য়ে আস্‌ছে। পথে

রত্না হাট থেকে ফির্‌ছিল হি-হি করে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে। আগেও সে কতবার গেছে, কিন্তু ফিরে এসেছে ঠিক সন্ধ্যের মধ্যে। সেদিন তার ফির্‌তে রাত হ'য়েছিল সত্যি।

অন্ধকার রাত্রি। কোথাও জন-মানবের সাড়া-শব্দ নেই। মাঝে মাঝে পল্লী কুটীরের ক্ষীণ আলোর চিহ্ন দেখা যাচ্চে, কিন্তু তাদের যেন শক্তি নেই এই বিরাট অন্ধকার ঠেলে বেরিয়ে আস্‌বার। জোনাকির ন্যায় চিক্ চিক্ ক'রে—জ্বল্‌ছে আর নিভ্‌ছে। সে দুল্‌তে দুল্‌তে চলেচে মাঠের আঁকা-বাঁকা পথ ধ'রে। থেকে থেকে তার বুক কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছে, না জানি আজ দুর্গার কত অভিমান হবে। ঘুমন্ত বিশ্বের বুকে সে শুধু একলা জেগে। মনের অসংখ্য ভাবনাকে নিয়ে একলাটি সে চুপ করে চলেচে। দুর্গা হয়তো এতক্ষণ কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েচে। হয়তো তার চোখ দু'টো ফুলে উঠেচে দারুণ অভিমানে। রাগে হয়তো বা সে তার আদরের ময়নাকে ছেড়ে দিয়েচে। রত্না ভারী বিচলিত হ'য়ে উঠ্‌ল। তার চোখ বেয়ে টস্ টস্ ক'রে জল গড়িয়ে পড়্‌ল। মুখে ফুটে উঠ্‌ল ব্যথার স্পষ্ট রেখা। আর সে কখনো হাটে যাবে না। এই হ'ল তার পণ—প্রথম সঙ্কল্প।

বলদ দু'টোকে খুলে দিয়েই সে তাড়াতাড়ি বাড়ীমুখো ছুট্‌ল। প্রকাণ্ড উঠান পেরিয়ে তার কুঁড়ে। তার আনন্দ হ'লো আলো জ্বল্‌তে দেখে। দুর্গা এখনো তা'হলে ঘুমোয়নি। দূর থেকেই সে নাম ধরে হাঁক দিলে। দুর্গা ডাক শুনে ডিবেটা হাতে ক'রে দাওয়ায় এসে দাঁড়াল।

—"হ্যাঁ বাবা, আজ এত দেরী হ'ল তোমার? কোথায় গিস্‌লে?"

—"সে কি এখানে? করিমপুরের হাট এখান থেকে পাকা পাঁচ ক্রোশ। তা তুই এখনো জেগে রয়েচিস্। ঘুম আসেনি বুঝি? কি খেলি আজ?" এক নিঃশ্বাসে এতগুলো কথা ব'লে রত্না হাঁপিয়ে উঠ্‌ল।

দুর্গা অম্লান কণ্ঠে বল্‌লে,—"কিছু খায়নি বাবা।"

রত্নার কাণে মেয়ের কথাটি শেলের মতো বিঁধ্‌ল।

—"মুড়ি ছিল না ঘরে?"

দুর্গা ঘাড় নাড়্‌লে।"......

—"বামুন পিসির কাছে চেয়ে আন্‌লি না কেন দু'টো।"

—"খিদে যে তখন ছিল না বাবা।"

রত্না মেয়েকে কোলে নিয়ে আদর কর্‌তে লাগ্‌ল।

—"এবার থেকে আর কোথায় যাবো না তোকে একলা ফেলে। সারা রাস্তাটা কেবল তোর কথা ভাবতে ভাবতে এসেছি।"

—"এত রাত্তির হয় যেখান থেকে ফির্‌তে, সেখানে আর যেও না বাবা কখনো—"

—"ভয় কর্‌ছিল বুঝি রে ?"

—"ভয় কিসের ? তোমার লাঠি ছিল না। মাথায় মার্‌তুম জোরে এক ঘা।"

রত্না হেসে উঠ্‌ল। আনন্দের আতিশয্যে দুর্গাকে আরো নিবিড় ভাবে আঁক্‌ড়ে ধর্‌লে।...

সেই দুর্গা তখন মোটে সাত বছরের। এখন থেকেই সে বাপের দুঃখ বুঝ্‌তো—আর বুঝ্‌তো তাদের নিজেদের সংসারের অবস্থা। একটা দিনও সে মুখ ফুটে কোন অভিযোগ জানায় নি। আর আজ কি না সেই দুর্গাকে এত সাধাসাধি করেও ফেরানো গেল না! দুর্জ্জয় অভিমানিনীকে রত্না আজ নিজের চোখে দেখেচে! সে সরেনি এখনো তা'হলে!

মেয়েকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে রত্না বল্‌লে,—"আমি রাঁধি-গে, দেখ্‌বি চ—"

দুর্গা রাজী হ'ল।

মা-হারা মেয়েটিকে নিয়ে রত্নাকে কত ভাব্‌তেই না হ'য়েছিল। কি ক'রে সে তাকে মানুষ কর্‌বে। সংসারে তার নিজের বল্‌তে কেউ নেই—যার কাছে এই কচি মেয়েটিকে সে দু'দিনের জন্যে দিয়ে আস্‌বে। এখন ভাবে—অকারণে সে কত ভেবেচে।

রত্না ভাত চড়িয়ে দিয়ে পুনরায় মেয়েকে কোলে টেনে নিলে। আজ সারাদিন সে তাকে কোলে নিতে পারেনি।

—"হ্যাঁরে দুর্গা। তোর মাকে মনে পড়ে ?

দুর্গা অপলক নেত্রে কেবল তাকিয়ে রইল, কিছু বল্‌লো না।

—"তা' তো না থাক্‌বারই কথা। তখন তুই মোটে দু'বছরের।"

—"এখন আমার কত বয়েস, বাবা!"

—"সাত পেরিয়ে আটে পড়েচিস্‌ এই আষাঢ়ে—"

দুর্গা মনে মনে হিসেব করে, ক' বছর তার মা মারা গেছে।

রান্না আজ তাকে সংক্ষেপে সার্‌তে হবে। তা রাত প্রায় ন'টা হতে চল্লো। সেই কোন্‌ সকালে দু'মুঠো ও খেয়েচে—তারপর সারাদিনের মধ্যে কিছু খেতে পায়নি। কালই সে কামাইএর মা'কে দিয়ে মুড়ি ভাজিয়ে রাখ্‌চে। ভাত উথ্‌লে উঠ্‌লো ব'লে। মেয়েকে তাড়াতাড়ি কোল থেকে নামিয়ে রত্না উনানের দিকে এগিয়ে গেল।

* * * *

রত্না অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সেইখানে, যেখানে গিয়ে সে না পেলে তার কাছে যাবার অধিকার, না পেলে সেখান থেকে চলে আসবার অনুমতি। দৃষ্টি তার চতুর্দ্দিকে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে

লাগ্‌ল। কিন্তু আর পেলে না তার দেখা, কিম্বা শুন্‌লে না তার পদধ্বনি। যুদ্ধে-হেরে-যাওয়া সৈনিকের ন্যায় সে মুছ্‌ড়ে পড়্‌ল; সোজা হ'য়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা যেন তার নেই। সে নুয়ে পড়েচে—যেমন নুয়ে পড়ে রক্ত-করবীর ডাল অকারণে। নতুন-চল্‌তে-শেখা শিশুর ন্যায় আস্তে আস্তে পা ফেলে সে বন থেকে বেরিয়ে এলো।

তার পর থেকে রত্না আর ওদিকে যায়নি। সেদিনের কথা জ্বল্ জ্বল্ করে চোখের সাম্নে ভাস্‌ছে। সেই রাস্তার পাশে বাঁশ-ঝাড়, সেই কাতর অভিমান মাখান' মুখ, সেই পথ চাওয়া ছু'টি চোখ। আজো তার সন্দেহ হয়, হয়তো ভুল দেখেছিল। নেশার খেয়ালে সে তো কখনো এমন বিদ্‌কুটে স্বপ্ন দেখেনি। আজ আবার সেই পথ দিয়েই তাকে যেতে হবে। যদি রত্না আজ তাকে পায়, ছাড়্‌বে না কিছুতেই। ছুটবে প্রাণপণে ছুটবে তার পিছু পিছু। দেখ্‌বে না এতটুকু লাভ-লোকসান্; কর্‌বে না একটুও বিচার।

*   *   *   *

আজ একটু সকাল সকাল সে বেরুবে। দুর্গাকে আজ সে নিয়ে আস্‌বেই। সে আস্‌বে ব'লে কুঁড়েখানা সে 'জন' লাগিয়ে মেরামত ক'রে রেখেচে। কানাইএর মা'র কাছ থেকে এক ঘড়া মুড়ি ভাজিয়ে রেখেচে। হাট থেকে এক আনার বাতাসা কিনে রেখে দিয়েচে,—এবার যেন তার কোন কষ্ট না হয়।

বলদ ছু'টোকে জুড়ে সে চেপে বস্‌লো তার নিজের জায়গাটিতে।.....

সে তখন বাগ্দীপাড়া পেরিয়ে এসেচে।

বনমালী হেঁকে বল্‌লে,—"কি ভায়া, আজ এত সকাল-সকাল বেরিয়ে পড়্‌লে যে।"

রত্না চেচিয়ে বল্‌লে,—"মা'কে আজ যে নিয়ে আস্‌তে হবে দাদা।"

গাড়ী তখন দিঘীর মোড় ঘুরে সোজা রাস্তা ধরেচে ....

সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ

[শ্রীঅনাথনাথ হাজরা]

সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ তাঁহার রাজত্বকালের রজত-জয়ন্তী উৎসব সুসমাধা করিয়া যে, সামান্য কয়েক মাসের মধ্যে লোকান্তরিত হইবেন ইহা প্রকৃতই অপ্রত্যাশিত ও মর্ম্মান্তিক। সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ আপন চরিত্রবলে সর্ব্বজন সমাদৃত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে সকলেই দুঃখিত।

বিশাল বৃটীশ সাম্রাজ্যের অধিপতি পঞ্চম জর্জ্জ সম্রাট সপ্তম এড্‌ওয়ার্ডের পুত্র ছিলেন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুন তিনি বিলাতে মার্লবরো প্রাসাদে জন্মগ্রহণ করেন। সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া তাঁহার নামকরণ করেন—জর্জ্জ ফ্রেডারিক আর্ণেষ্ট এলবার্ট। পঞ্চম জর্জ্জ যখন ছয় বৎসরের বালক, তখন রেভারেণ্ড জন্ নীল ডাল্টনের হস্তে তাঁহার শিক্ষার ভার অর্পিত হয়। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে যখন তাঁহার বয়স বার বৎসর মাত্র, তখন তাঁহার অগ্রজ প্রিন্স এলবার্ট ভিক্টরের সহিত তিনি নৌ বিভাগে শিক্ষালাভ করিবার নিমিত্ত প্রেরিত হন। ইহার দুই

বৎসর পরে দেশ ভ্রমণের দ্বারা দুই ভ্রাতাকে সম্যকরূপে বিদ্যালাভের সুযোগ প্রদান করিবার নিমিত্ত জাহাজে করিয়া পৃথিবী ভ্রমণের ব্যবস্থা করা হয়। সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া ও তাঁহার পুত্রবধূ প্রিন্সেস্ আলেকজান্দ্রা ইহাতে আপত্তি প্রকাশ করেন। কিন্তু পরিশেষে সপ্তম এডওয়ার্ড ও রেভারেণ্ড ডাল্টনের প্রচেষ্টায় দুই ভ্রাতাকে ব্যাকান্টি নামক জাহাজে করিয়া পৃথিবী ভ্রমণে প্রেরণ করা হয়। দেশ-দেশান্তর ঘুরিয়া, নানা বিস্ময়জনক বিষয় দেখিয়া প্রত্যক্ষভাবে বিবিধ জ্ঞান লাভ করিয়া দুই ভ্রাতা ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিলেন।

দেশে ফিরিয়া প্রিন্স জর্জ্জ পুনরায় নৌ-বিভাগের কার্য্যে যোগদান করিলেন। প্রিন্স এলবার্ট ভিক্টর ভাবী সম্রাট বলিয়া তাঁহাকে আর নৌ-বিভাগের কার্য্যে যোগদান করিতে দেওয়া হইল না। যাহা হউক, প্রিন্স জর্জ্জ নৌ-বিভাগে আপন চেষ্টা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান করিয়া ক্রমশঃ উন্নততর পদে অধিষ্ঠিত হইতে লাগিলেন। যখন তাঁহার বয়স ২৪ বৎসর, তখন তিনি জাহাজের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন এবং ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের অর্থাৎ ছাব্বিশ বৎসর বয়সে তিনি জাহাজের কমাণ্ডারের পদপ্রাপ্ত হন। এই সময়ে তাঁহার অগ্রজের সহিত প্রিন্সেস্ ভিক্টোরিয়া মেরীর বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইতে থাকে। কিন্তু হঠাৎ প্রিন্স এলবার্ট ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে প্রাণত্যাগ করিলেন। অগ্রজের মৃত্যুতে প্রিন্স জর্জ্জ ব্রিটিশ সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী হন।

প্রিন্স এলবার্ট জীবিত থাকিলে তাঁহার সহিত বিবাহের দ্বারা প্রিন্সেস্ ভিক্টোরিয়া মেরীর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভাবী সাম্রাজ্ঞী হইতেন;—প্রিন্স জর্জ্জ তাঁহাকে এ অধিকার হইতে বঞ্চিত করিলেন না। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ৬ই জুলাই তিনি তাঁহার সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। এই বিবাহের ফলে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ২৩ জুন প্রিন্স অব ওয়েলস্ এলবার্ট এডওয়ার্ড (বর্ত্তমান সম্রাট এডওয়ার্ড) জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পর ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ১৪ই ডিসেম্বর প্রিন্স জর্জ্জ (ডিউক অব ইয়র্ক), ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ২৫শে এপ্রিল প্রিন্সেস্ ভিক্টোরিয়া, ১৯০০ খৃষ্টাব্দে ৩১শে মার্চ্চ প্রিন্স হেনরী উইলিয়ম এলবার্ট (ডিউক অব্ গ্লষ্টার), ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ২০শে ডিসেম্বর প্রিন্স জর্জ্জ এডমণ্ড (ডিউক অব কেণ্ট) এবং ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ১২ই জুলাই প্রিন্স জন জন্মগ্রহণ করেন। কনিষ্ঠ সন্তান প্রিন্স জন ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ১৮ই জানুয়ারী তারিখে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

১৯০১ খৃষ্টাব্দে ২১শে জানুয়ারী মহারাণী ভিক্টোরিয়া স্বর্গারোহণ করিলে পর সপ্তম এডওয়ার্ড সিংহাসন লাভ করেন। ঐ বৎসর নভেম্বর মাসে পঞ্চম জর্জ্জ প্রিন্স অব্ ওয়েলস্

ভারতবর্ষের স্থাপতিকার্য্য, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও বিভিন্ন প্রকারের বৈচিত্র্য দর্শনে এদেশের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। ইংলণ্ডে গিয়া রয়েল একাডেমীতে ঐ সকল বিষয়ের বিশেষ প্রশংসা করিয়া একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন।

১৯১০ খৃষ্টাব্দে ৬ই মে সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, পঞ্চম জর্জ্জ সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময়ে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৪৬ বৎসর। ভারতবর্ষের কথা তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরূক ছিল। সিংহাসনে আরোহণ করিবার পর তিনি ভারতবর্ষে সস্ত্রীক আসিয়া দরবার করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ কবিলেন। ইহার পূর্ব্বে ইংলণ্ডের কোন রাজা ভারতবর্ষে আগমন করেন নাই। সেই কারণে ইংলণ্ডের অনেকে রাজার অভিপ্রায়ে ঘোরতর আপত্তি তুলিলেন। কিন্তু তিনি কাহারও বাধা না মানিয়া, 'মেডিনা' নামক জাহাজে চড়িয়া ভারতে আসেন এবং ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ১২ই ডিসেম্বর দিল্লীতে দরবার করেন। এই দরবারে কলিকাতার পরিবর্ত্তে দিল্লী ভারতবর্ষের রাজধানী ঘোষিত হইল। তিনি ভারতে অতি অল্প কালই অবস্থান করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই অল্পকাল মধ্যেই কঠোর পরিশ্রম করিয়া তিনি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ পরিভ্রমণ করিয়া, নানা প্রকার লোকের সহিত দেখাসাক্ষাৎ করিয়া ও কথা-বার্ত্তা কহিয়া, ভারতের প্রকৃত অবস্থা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার বিষয় প্রত্যক্ষভাবে পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন। ভারতের যাহাতে প্রকৃত উন্নতি সাধন হয়, তাহার জন্য শিক্ষার প্রসার ও সমবায় নীতি পরিচালনায় বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। ভারতের সর্ব্বত্র সর্ব্বসাধারণের নিকট বিপুল সম্বর্দ্ধনা লাভ কয়িয়া ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ১০ই জানুয়ারী তিনি ইংলণ্ডের দিকে রওনা হইলেন।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা আগষ্ট ইউরোপের মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই সময় চারি বৎসর ব্যাপী তিনি যে কঠোর পরিশ্রম ও স্থির অথচ বীরত্বপূর্ণ কর্ত্তব্যজ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিয়া-ছিলেন তাহা বাস্তবিক অতুলনীয়। তিনি দেশের সকলের নিকট স্বয়ং উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতেন। হাসপাতালে গিয়া আহত সৈনিকগণের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতেন এবং নানাভাবে তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিতেন। কাহারও কোন বাধা না মানিয়া তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া উপস্থিত হইতেন এবং সৈনিকগণকে উৎসাহিত করিতেন, কখনও বা বীরত্বের পুরস্কার-স্বরূপ পদক উপহার দিতেন। এই সময়ে অনেকবার নানাভাবে তাঁহার উত্তেজিত হইবার কারণ ঘটিয়াছিল, কিন্তু কোন দিনই তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ধীরতা ও স্থিরতা হইতে বিচলিত হন নাই ; প্রতি কার্য্যে আসাধারণ বিচক্ষণতার পরিচয় দিতেন।

সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ সর্ব্বজনপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার উদারতা ও চরিত্রের মাধুর্য্যে তিনি সকলকেই আপন করিয়া লইতে পারিতেন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতের পার্লামেণ্টের নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বে

জয়ী হইয়া শ্রমিকদল মন্ত্রিমণ্ডল গঠনের অধিকারী হয়। শ্রমিকদল সমাজতন্ত্রী,—কিন্তু শ্রমিক মন্ত্রিমণ্ডলী সহিত তাঁহার সদ্ভাব কোনপ্রকারে ক্ষুণ্ণ হয় নাই বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছিল। শ্রমিক সদস্যগণের অনেকের অবস্থা তেমন ভাল ছিল না, কাহারও কাহারও দরবারী পোষাক পর্য্যন্ত ক্রয় করিবার সামর্থ্য ছিল না। রাজা উহা জানিতে পারিলে নিজের ধনভাণ্ডার হইতে তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতেন।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি কঠিন রোগে আক্রান্ত হন এবং তাঁহার জীবন সংশয়াপন্ন হইয়াছিল। কিন্তু ভগবৎকৃপায় তিনি তাহা হইতে রক্ষা পান। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ৬ই মে তারিখে সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্যে তাঁহার রাজত্বকালের পঞ্চবিংশতি বৎসর উত্তীর্ণ হওয়াতে রজত-জয়ন্তী উৎসব সুসম্পন্ন হয়। সেই সময় তাঁহার স্বাস্থ্য অটুট ছিল। উৎসবের সময় তিনি তাঁহার সকল প্রজাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া বেতার বার্ত্তাযোগে এক বাণী প্রেরণ করিয়াছিলেন—"আমি আর যে কয় বৎসর জীবনধারণ করিব, সেই কয় বৎসর আমি আমাকে আপনাদের কার্য্যে উৎসর্গ করিলাম।" ভগবান তাঁহার সে আকাঙ্ক্ষা আর পূর্ণ করিলেন না।

সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের রাজত্বকালে তাঁহার রাজ্যের নানাদেশ বহুল পরিমাণে রাজনৈতিক অধিকার লাভ করিয়াছে। ভারতবর্ষও ইহা হইতে বঞ্চিত হয় নাই। মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ডের শাসনসংস্কার প্রবর্ত্তন এবং ভারতীয় শিল্পসংরক্ষণের নিমিত্ত আমদানি পণ্যের উপর শুল্ক নির্দ্ধারণ প্রভৃতি বিষয়ে ভারতবর্ষকে অর্থনৈতিক-স্বাধীনতা দান ইহার প্রত্যক্ষ নিদর্শন। ভারতবাসীর যে স্বরাজে অধিকার আছে তাহা মুক্তভাবে তাঁহারই রাজত্বকালে স্বীকৃত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত তাঁহারই সময়ে ভারতবাসী সহকারী সচীবের পদ, গভর্ণরের পদ প্রভৃতি নানা দায়িত্বপূর্ণ ও সম্মানজনক পদলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

প্রজানুরঞ্জক বিরাটপুরুষ পঞ্চমজর্জ্জ ৭১ বৎসর বয়সে গত ২০শে জানুয়ারী রাত্রি ১১টা ৫৫ মিনিটের সময় সাণ্ডিংহাম প্রাসাদে দেহত্যাগ করিলেন। সমগ্র সভ্যজগৎ তাঁহার মৃত্যুতে শোকাকুল হইল। ২৮শে জানুয়ারী বেলা ৯।৪৫ মিনিটের সময় তাঁহার মৃতদেহ সমাধিস্থ করা হয়। পঞ্চম জর্জ্জের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অষ্টম এডওয়ার্ড সিংহাসন লাভ করিলেন। আমরা নূতন সম্রাটের দীর্ঘজীবন কামনা করি।

কোথায়—কত সে দূর!

[শ্রীকৃষ্ণদাস রায়]

এই পথ দিয়া
গেছে মোর প্রিয়া,
না জানি কোথায়—কত সে দূর!
নয়নের জল
মুছিল কাজল,
বুকেতে বাজিল বেদনার সুর!
চলিতে চলিতে
আপনার গীতে
জনহীন পথ করিয়া মধুর
সবার আড়ালে
আপনারি তালে,—
রুণু ঝুণু পায়ে বাজিল নুপুর।

আমার কণ্ঠে
তাহার গান
গাহিয়া করি
পথ সন্ধান।
ফিরি একাকী
পথ যে বাকী
আমি অতি দীন
কেন দিলে ফাঁকি।
করি যে তাহার নাম
বুঝেছি জীবনে বিদায়ের ক্ষণে
কি ছিল তাহার দাম।

রাজগৃহের পথে

[শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বিপুলা গুহাকে উত্তরে রেখে আমরা সোজা চল্লুম। তখন দশটা হ'বে কিন্তু বোধ হচ্ছে যেন দুপুর উৎরে গেছে। খানিকটা গিয়ে দু'টো মন্দির পড়লো। "রাজগীর-মাহাত্ম্য" অনুযায়ী শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে প্রথমটিতে উপস্থিত হয়েছিলেন। অভিপ্রায়—রাজা জরাসন্ধকে যুদ্ধে পরাস্ত করা। তখনকার দিনে অভিপ্রায় সিদ্ধ কর্‌বার একমাত্র উপায় অতিথির বেশে এসে ভিক্ষা চাওয়া। তিনিও তাই কর্‌লেন। তারপর যা-যা হ'য়েছিলো, সে কথার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। জরাসন্ধ ও ভীমসেনের মধ্যে যে যুদ্ধ হ'য়েছিলো, সেটা এর পাশেই। সে জায়গাটা এখনো রয়েচে এবং 'বালগঙ্গা' যাবার রাস্তায় পড়ে। চারিদিকে পাহাড় দিয়ে ঘেরা। যতদিন জরাসন্ধকে ভীমসেন যুদ্ধে পরাস্ত কর্‌তে পারেন নি, ততোদিন শ্রীকৃষ্ণ এখানে ছিলেন—এইরূপই প্রবাদ। এর নীচে যে মন্দিরটা সেটা জরা রাক্ষসীর।

এইবার ধারার রাস্তায় পড়লুম। আমরা ক্লান্ত ও অবসন্ন হ'য়ে পড়েছিলুম। পা দু'টোকে এইবার রেহাই দিতে হ'বে। এমন সময়ে রাস্তার পাশে ছোট্ট একটা মন্দির দেখ্‌তে পাওয়া গেলো। বোধ হয় যেন আজই রঙ্‌ করা হ'য়েচে—এত ধব্‌ধবে। এটি সন্ধ্যাদেবীর কোন্ দেশের দেবীমূর্ত্তি তা' কল্পনায় আন্‌তে পারা গেলো না।

রাজগৃহের কথা বল্‌তে গিয়ে কবি গেয়েচেন,—"যেথা নৃপতি বিম্বিসার নমিয়া বুদ্ধে মাগিয়া লইলা চরণ ধূলিটি তাঁর।" মহাপরি নির্ব্বাণ সূত্রে লেখা আছে যে, বুদ্ধদেব স্বয়ং বলেছিলেন,—"ওহে আনন্দ, রাজগৃহ কি রমণীয় স্থান; সেখানে গৃধ্রকূট, গোতম নিগ্রোধ, শের পর্ব্বত, বেভার গিরির পার্শ্ববর্ত্তী সপ্তপর্ণি গুহা, ইষিগিরির পার্শ্ববর্ত্তী সীতবন, তপোদারাম বেণু বনে কালন্দক নিবাপ, জীবকাম্ব বন, মধ্য কুচ্ছীতে মৃগারণ্য—এ সমস্তই মনোরম, অতীব সুন্দর।"

সকালের দিকটা ঘোরাঘুরির দরুণ শরীর আমাদের বেশ নেতিয়ে পড়েছিলো। কাজেই সন্ধ্যায় কোথাও না ঘুরে বাড়ীওয়ালার সঙ্গে গল্প ক'রে কাটিয়ে দেবার মানসে তাঁর ডেরায় গিয়ে উপস্থিত হ'লুম।

কুলাভাগ্গা তাঁর ওল্ডেন্‌বার্গ সংস্করণে লিখে গেছেন, দেবদত্ত হাতীশালে ঢুকে প্রধান রক্ষককে বল্লেন,—'যখন গৌতম এই রাস্তায় আস্‌বেন নলগিরি হাতীকে খুলে রাস্তায় ছেড়ে দিয়ো।' সত্যসত্যিই নলগিরি হাতীকে রাজার আস্তাবল হ'তে ছেড়ে দেওয়া হ'লো সেই রাস্তায়, যে রাস্তায় বুদ্ধদেব অনেক ভিক্ষু সমভিব্যাহারে নিত্যকার মতো ভিক্ষার ঝুলি হাতে নিয়ে নগরময় ভিক্ষা ক'রে বেড়াতেন। গৌতম এ সব কথা জান্‌তেন না। তিনি প্রতিদিনকার মতো আজো এলেন। নলগিরিকে গৌতমের সাম্নে ছেড়ে দেওয়া হ'বে, কথাটা নগরে রাষ্ট্র হ'য়ে গিয়েছিলো। সেই জন্যে সকাল হ'তে না হ'তেই বড় বড় অট্টালিকার ছাদ ও জীর্ণ কুটীরের মট্‌কা লোকে ভরে গিয়েছিলো। একদলের মতে, গৌতম নিশ্চয়ই পাগ্‌লা হাতীর পায়ের নীচে পড়ে পিষে মর্‌বে ; অন্যদলের মতে, তিনি অশরীরি ক্ষমতার দ্বারা হাতীকে পরাজিত কর্‌বেন। শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু নগরবাসীরা দেখ্‌তে পেলে যে, গৌতম এই দুর্দ্দান্ত হাতীকে প্রেমের জোরে পরাজিত ক'র্‌লেন। হাতীটা খোলা পেয়েই গৌতমের দিকে শুঁড় তুলে বেগে ছুট্‌লো ; কিন্তু তাঁর শান্ত স্বর শুনে একেবারে তাঁর পাশটিতে ভৃত্যের ন্যায় এসে দাঁড়ালো। এই দেখে চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়ে গেলো। আমাদের দেশে হ'লে, হয়তো পুষ্প বৃষ্টিও হ'তো।

'শ্রীগুপ্ত' রাজগৃহের একজন গৃহপতি। 'নীরগ্রন্থ' ছিলেন তার গুরু। একদিন উভয়ে গৌতমকে হত্যা কর্‌বার একটা কৌশল ঠিক কর্‌লেন। গৌতম তখন গৃধ্রকূট পর্ব্বতে থাক্‌তেন। বাড়ীর মধ্যে তাঁরা প্রকাণ্ড এক গর্ত্ত খুঁড়ে জ্বলন্ত এক কয়লা দিয়ে সেটা ভর্ত্তি ক'রে রেখে দিলেন। তাছাড়া সে গৌতমকে প্রাতঃকালীন নিমন্ত্রণ ক'রে খাবারের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে রাখ্‌লেন। শ্রীগুপ্তের পত্নী বুদ্ধের ভক্ত। সে যদি কোনো উপায়ে এই কথা টের পায়, সব পণ্ড হ'য়ে যাবে। সেইজন্যে তাকে একটা ঘরের মধ্যে আট্‌কে রাখা হ'লো। গৌতমকে তাঁরা উভয়ে নিমন্ত্রণ ক'র্‌তে গেলেন। গৌতম তাঁদের নিমন্ত্রণ রক্ষা কর্‌লেন। তাঁরা মহাখুসী। গৌতম পূর্ব্বেই সতর্ক বাণী শুন্‌তে পেয়েছিলেন। 'অভাদনা কল্পলতায়' আমরা পাই যে, যে মুহূর্ত্তে ভগবান বুদ্ধদেব শ্রীগুপ্তের বাড়ীতে প্রবেশ ক'রেছিলেন ও লুকানো গর্ত্তটীর ওপর ডান পা রেখেছিলেন, সেই মুহূর্ত্তেই গর্ত্তটী কালো ভোম্‌রার মিষ্টি স্বরযুক্ত একটা পদ্মফুলের পুকুর হ'য়ে গেলো। *

---

* এই সব গল্পের সঙ্গে মস্ত বড় পৌরাণিক উপাখ্যান জড়ানো আছে। অনেকের বিশ্বাস যে, হুয়েনসাঙ্‌ এই সব গল্প শুনেই তাঁর ভ্রমণ-কাহিনীর উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন এবং এটাও

এখন মেঘের সময় নয়, তবুও আকাশটাকে ঘিরে মেঘ রয়েচে। এ অবস্থায় ঘর থেকে বেরুতে মন চায় না বিশেষতঃ যখন কাজের তাড়া থাকে না। বসে আছি অলসভাবে। অকস্মাৎ দেখি, আকাশের চেহারা বদ্‌লে গেলো। চন্‌চনে রোদ ফুটলো। কুণ্ডে যাবার রাস্তা লোক চলাচলে শব্দ-মুখর হলো। আমরা সেই শব্দ বাড়িয়ে দিলুম।

কুণ্ডকে বাঁ পাশে রেখে চলেছি সমান। রামুর আস্‌বার কথা ছিলো, কিন্তু সে আসেনি। বোধ হয় অন্য কোনো যাত্রী পেয়েচে। আমাদের দু'জনকে নিয়ে থাক্‌লে তো আর তার চলবে না। একেবারে ঠিক পূবের পাহাড়টা বিপ্লাচল। ছোট কাঁকড়ের রাস্তাটা পাহাড়টার বুক চিরে ঘুরে ঘুরে উঠেচে ক্রমশঃই আকাশের দিকে। জৈনরা এই রাস্তাটা তৈরী করে' দিচ্ছেন—শেষ পর্য্যন্তই হ'বে; এখনও হয়নি। অন্য পাহাড় থেকে দেখ্‌লে মনে হয়—কে যেন খেয়ালের বশে এই পাহাড়টার আষ্টে পৃষ্টে লাল সূতায় জড়িয়ে রেখেচে। খানিকটা উঠে শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের একটা ভাঙা মন্দির দেখ্‌তে পাওয়া গেলো। মানুষ এর এ দশা করেনি। অদৃশ্যশক্তি অবলীলা-ক্রমে এর ওপর নিজের অত্যাচারী হাত বুলিয়ে দিয়েচেন। অনাচার এ মন্দিরের সঙ্গে না মিশে থাক্‌লে এর এরূপ অবস্থা কখনোই হ'তো না। এই মন্দিরের চত্বরই ছিলো আমাদের বস্‌বার স্থান। বেশ নিরিবিলি ও নির্জ্জন। কেবল মাত্র মাঝে মাঝে আকাশের স্বাধীন পাখীদের ডানা মেলে উড়ে যাবার একটা ক্ষীণ অস্পষ্ট আওয়াজ আর কুণ্ডের একটানা জল পড়ার শব্দ সেই নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে দেয়। ক্বচিৎ কখনো স্নানার্থীদের কর্কশ স্বর বাতাসের সাথে মিশে গিয়ে পাহাড়ে আট্‌কে গিয়ে থেমে যায়। যখন এই সব নীরব হ'য়ে যায়, সন্ধ্যায় পাৎলা অন্ধকার ঘন হ'য়ে আসে, আমরা নাম্‌তে সুরু করি।

এই ভাঙা মন্দিরটা ছেড়ে আরো ওপরে উঠ্‌তে লাগলুম। অনেকখানি ওঠ্‌বার পর আর আর একটা মন্দির পড়্‌লো। নীচের যে ভাঙ্গা মন্দিরের কথা এখুনি বল্লুম, তার মূর্ত্তিটা এখানে আনা হ'য়েছে। নাম—'হেমন্ত সাধু মুনি মহারাজ।' একেবারে চূড়োয় আরো চারটে মন্দির—সবগুলোই দিগম্বরদিগের। একটার নাম 'মুনি সোব্‌রা স্বামীজী', অপরটার 'চন্দ্রপ্রভূ'; বাকী দুটোর কোনো মূর্ত্তি নেই, কেবল চরণের ছাপ। মূর্ত্তিগুলো রোজ ধোওয়া পোঁছা হয় ব'লে বেশ ঝক্‌ঝকে দেখায়। রাস্তা এই পর্য্যন্তই হ'বে। নকল যতই সুন্দর হোক্ না কেন, আসলের ন্যায় হ'তে পারে না। এটাও তাই। পাথরের পর পাথর পড়ে' যে রাস্তা এখানকার অধিবাসীরা একটু আধ্‌টু নড়িয়ে চড়িয়ে সুখ সুবিধার জন্যে তৈরী করেচে, তার কাছে মানুষের পয়সা-খরচ-করা রাস্তা কিছুই নয়। তীর্থ পিপাসুদের [illegible]

আসৃতুম, কিন্তু কোনোদিন রাস্তা ধরে' উঠিনি। তবে কোনো কোনোদিন নেমেচি—তা' গোপন কর্‌বো না। ভৈরীলাল বাবুর (জয়পুরী এক ভদ্রলোক) সঙ্গে এখানে আলাপ হয়। কথায় কথায় একদিন আমাদের বল্লেন,—রাস্তা দিয়ে উঠ্‌তে কষ্ট একেবারেই হয় না, তা সত্যি, কিন্তু প্রতি পদক্ষেপে পা মচ্‌কে পড়ে' যাবার সম্ভাবনা আর তার জন্যে যতোক্ষণ না চলা শেষ হয়, ততোক্ষণ পর্য্যন্ত একটা আতঙ্ক, একটা ভয় অহরহ হয়ই। পাথরের রাস্তা দিয়ে চল্‌লে এটা মোটেই ভোগ কর্‌তে হয় না। তার ওপর আরাম করে' যে নেমে যাবো তারও উপায় নেই। বুকের স্পন্দন-ধ্বনি নামবার সময় যেন কিছু বাড়ে। সুতরাং কষ্ট বা শ্রমের লাঘব কিছুই হয় না।

যখন আমরা নীচে নেমে এলুম, তখন খুব বেশী বেলা হয়নি। কাজেই এই ফাঁকে বিপ্লাচলের পশ্চিম অঞ্চলের বনটি দেখে আসৃবার লোভ ছাড়্‌তে পার্‌লুম না। এর নাম 'বেণুবন'। বেণুবন নামেও যা, কাজেও তাই। একখানা গাঁ জুড়ে মস্ত এক বাগান। আমাদের দেশের ন্যায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাঁশ ওদেশে নেই। পূর্ব্বে এই বেণুবন ৬ হাত উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিলো। প্রাচীন গিরিব্রজের স্থানে স্থানে রক্ষিগণের থাকার জন্যে পাথরের ছোট ঘর ছিলো। দু'পাশের পাহাড়ের গায়ে এই রকম রক্ষিনিবাস (Watch tower) এখনো আছে। তবে সীমানা না থাকায় জোর করে' বলা চলে না যে, কোন্‌খানটায় এবং কতটা জায়গা নিয়ে বেণুবন ছিলো। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌রা এই বাঁশবনটাকেই বেণুবন আখ্যা দিয়া থাকেন। অনেকে কিন্তু লাঠিবনকে বেণুবন বলেন। তাঁরা বলেন,—পূর্ব্বে লাঠি মানেই যে কোনো ছোট গাছকে বোঝাতো। 'মহাবাস্তু' বলে গেছেন,—'রাজগৃহের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে লাঠি-বন অবস্থিত ছিলো।' হুয়েনসাঙ্‌ এই লাঠিবনের মানে বুঝ্‌তে ভুল করেছিলেন। লাঠিবনকে কেউ কেউ আবার খেজুর বন বলে' থাকে। সুতরাং লাঠিবন আর বেণুবন যে এক তা'তে সন্দেহ নেই। মোটের ওপর, বেণুবন নূতন সহরের দক্ষিণে ও পুরাতনের উত্তরে সরস্বতী নদীর উত্তর-পূর্ব্ব কোণে ছিলো এবং এখনো রয়েচে। এই বনে একপ্রকার কালো পাখী (Kalandaka) দূরদেশ হ'তে প্রায়ই আসৃতো। এইজন্যেই এ'কে 'কালন্দক-নিবাস' বলা হয়। কেন নাম হ'লো তার একটা ইতিহাস আছে।

অতি পুরাকালে এক রাজা শিকারের সন্ধানে এই বনে আসেন। সোমরস পান করা তখনকার দিনে মোটেই দোষের বা নিন্দের ছিলো না। বরং কোনো কোনো অনুষ্ঠানে এ'কে বাদ দেওয়া চল্‌তো না। রাজাও সোমরস নেশায় বশীভূত হ'য়ে দিনমানে ঘুমিয়ে পড়্‌লেন, যদিও তখন দিবা-নিদ্রা একেবারে স্বভাব-বিরুদ্ধ ও অপ্রাকৃতিক। তখন পাপ এ'কে ব'লেই ধরা হ'তো। গাছতলায় রাজা ঘুমিয়ে পড়্‌লেন। চাকর-বাকরেরা ফুলের গন্ধে ও ফলের স্বাদে মোহিত হ'য়ে

কোটর হ'তে বেরিয়ে এসে অগ্রসর হ'লো। এই দেখে বনদেবী রাজার প্রাণ বাঁচাতে অত্যন্ত উৎসুখ হ'লেন। এই দেবীর নাম 'কালাকা'। তিনি পাখীর বেশে এসে রাজার কাণের কাছে চেঁচামেচি সুরু করে' দিলেন। রাজা শয্যাশায়ী ধড়্মড়্ করে' উঠে পড়্লেন। কালো সাপটা সুড়্সুড়্ করে' নিজের কোটরে ঢুকে গেলো। রাজা এই সব দেখে ঘেব্ড়ে গেলেন। ব্যাপার-খানা বুঝ্তে তাঁর আর বাকী রইলো না। সেই দিন হ'তে তিনি এইখানে পাখীদের খাবার ব্যবস্থা কর্লেন এবং এই কথাটিও প্রচার ক'রে দিলেন।

এই বনের মধ্যে বৌদ্ধদের একটা বিহার ছিলো,—আর এইটেই ছিলো তাদের কাছে সবচেয়ে পবিত্র। বনের নামানুসারে বিহারের নাম হ'য়েচে 'বেণু-বন বিহার'। পুরাতন নগরের ৩০০ পা উত্তরে রাস্তার পশ্চিম দিকে কালন্দ বেণু-বন বিহার,—এ এখনো আছে। সাধুগণ এই স্থান পরিষ্কার রাখেন এবং গাছপালায় জল দেন। এর আধ মাইল উত্তরে শ্মশান। পূর্ব্ব গৌরব অক্ষুণ্ণ রেখে এই বিহার এখনো বিরাজমান। বুদ্ধদেব এইটি তাঁর সঙ্ঘের সভ্যদিগের প্রথম স্থায়ী থাক্বার স্থান নির্দ্দেশ করে যান। এখানে রাত্রিতে আশ্রয়ের জন্যে এ দিনে বিশ্রামের জন্যে বহু সাধু-সন্ন্যাসী জমা হ'তেন। এর সঙ্গে প্রকাণ্ড এক মঠ লাগানো ছিলো। ইহা রাজা বিম্বিসারের দান। তিনি প্রথম মগধে এসে এইটে তৈরী করান। এর পূর্ব্বে ভিক্ষুগণ গুহার মধ্যে, গাছতলায়, পোড়ো বাড়ীতে কাটিয়ে দিতেন। বুদ্ধঘোষ তাঁর টীকাতে এই প্রকার বর্ণনা লিখে গেছেন।* এর কাছাকাছি কোনো নদীর কথা লেখা নেই কিন্তু সরস্বতী নদী, যাকে তখন 'টৌ পোডা' বলা হতো—এখান থেকে মোটেই বেশীদূর নয়। এই নদীর কিনারে একটা বিহারের কথা লেখা আছে, সেইটেই যে এইটে, তা' নিয়ে মতভেদ নেই। রাজা বিম্বিসার একদিন টৌ পোডা নদীতে স্নান কর্তে এসে, ফের্বার পথে দেখ্লেন নগর-তোরণ বন্ধ। কাজেই তাঁকে এই বিহারে অপেক্ষা কর্তে হ'য়েছিলো। স্যার্ জন স্যার সেলকে আমরা এত শ্রদ্ধা করি শুধু এই জন্যেই যে, প্রকৃত পক্ষে তিনিই প্রথম আমাদের এই স্থানটা দেখিয়ে দেন।

পড়ন্ত রোদের ঝাঁঝকে একটুখানি মাত্র কম্বার অবসর দিয়ে, আমরা দু'জনে তাড়াতাড়ি রামুকে নিয়ে বেরিয়ে পড়্লুম। কুণ্ডকে বাঁ দিকে রেখে প্রথমেই আমরা 'নির্ম্মল কুমার' দেখ্বার জন্যে সোজা পথ ধ'রে চল্লুম। 'নির্ম্মল কুমার' একটা মঠ। লোকদের বিশ্বাস এতে পূর্ব্বকালে রাজারা ধন-সম্পত্তি জমা রাখ্তেন এবং এটি গুপ্ত রাজত্বে নির্ম্মিত হ'য়েছিলো।

* **Sutta-Nipata (P.355, Colombo Ed.)**

কিন্তু মার্শেল সাহেব বলেন, এটা হয়তো বৌদ্ধ স্তূপ ছিলো, লোকে ধন-রত্ন বার কর্‌বার আশায় এইরূপ ক'রে ফেলেচে। এর সবই গেছে, কেবল টেঁকে আছে একটা গোল গম্বুজ। পরিধি প্রায় ৩৩ ফিট। মাটী ঢাকা ছিলো ব'লেই হোক্, কিম্বা সেকালের মিস্ত্রিদের কেরামতির দরুণই হোক্ এর বালী এখনো খসেনি। চার পদক বুদ্ধের মূর্ত্তি আজ পর্য্যন্ত বেশ নিখুঁত-ভাবেই আছে। দেওয়ালের ফাঁকে ফাঁকে নানা কারুকার্য্য, যা দেখ্‌লে বিস্ময়ের সীমা থাকে না। তাজমহলের কারুকার্য্য আমাদের অবাক করে; কিন্তু এই অনাদৃত মঠের কারুকার্য্য আমাদের ভুলিয়ে দেয় যে, এগুলো মানুষের হাতে-গড়া। এখন গভর্ণমেণ্ট এর চারিদিকে লোহার রেলিং দিয়ে ঘিরে রাখ্‌বার ব্যবস্থা করচেন্ যাতে না নষ্ট হ'য়ে যায়। বৃষ্টি যাতে না পড়ে তার জন্যে ওপরে টিনের 'সেড' দেওয়া আছে। এর চার পাশে উঁচু বেদী। লম্বায় অনেকখানি—৪০ হাত তো বটেই।

নির্ম্মলকুমারের পাশেই একটা কূয়া। বুদ্ধদেব স্বয়ং এবং তাঁর শিষ্যাদি এই কূয়ার জল ব্যবহার কর্‌তেন। এইটে এখনো পর্য্যন্ত নিজের গর্ব্ব বজায় রেখে দিয়েচে। কূয়াটাকে পূবমুখো ক'রে যে রাস্তাটা সোজা বিহার গিরির দিকে চলে গেছে, সেইটে ধ'রে বরাবর গেলে 'জরাসন্ধের ট্রেজারি' বা 'সোণ-ভাণ্ডার গুহা' পড়ে। লোকে বলে, এখানে সোণা থাক্‌তো। এখনো অবিকৃত অবস্থায় রয়েচে। মূর্ত্তি ও লিপি বৌদ্ধ যুগের। ১২ হাত চওড়া, লম্বায় তার দ্বিগুণ। এত বড় গুহা এ অঞ্চলে আর নেই। ভেতরটা এলামাটীর ন্যায় দেখতে। মেঝে একেবারে সমতল। পাথর কুঁদে এতটা যে সমতল হ'তে পারে, তা' ধারণাতীত। ঢোকবার একটা মাত্র দরজা—বেশ আধুনিক। এ-ও পাথর খোদাই ক'রে বসানো হ'য়েচে। দরজার সাম্নেই একখণ্ড পাথরে খোদিত বৌদ্ধ মূর্ত্তি—চার্‌দিকেই। জানালাও যে ছিলো, তার আভাস এখনো দেখ্‌তে পাওয়া যায়। ছাদটা অনেকটা ট্রেণের ছাদের ন্যায়ই। মাঝখানটা দু'পাশের চেয়ে সামান্য একটুখানি উঁচু। দেওয়ালে অনেক কথাই লেখা আছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত নানাদেশের ভাষা-ভাষীরা পড়তে সমর্থ হয়নি। পশ্চিম মুখো আর একটা দরজার চিহ্ন আছে। সেটা বন্ধ। সেটা নাকি 'চিচিং ফাঁক' না বল্লে খুল্‌চে না। অনেকের মতে, দেওয়ালে যে লেখাটা আছে, সেটেই দরজা খোল্‌বার ইতিহাস। হ'তেও পারে। কুণ্ড থেকে দেড় মাইল পথ সোণ ভাণ্ডার। পথটা একটা উপত্যকার বুক চিরে তৈরী করা হ'য়েচে। গুহার সাম্নেই প্রকাণ্ড এক চত্বর, প্রায় ৪০ বর্গ হাত। আবিষ্কার কর্‌বার সময় নষ্ট হ'য়ে গেছে তা' স্পষ্ট বোঝা যায়। যে গুহাটা এখনো বর্ত্তমান—তারই পূবমুখো বাইরের দেওয়ালে, উপর দিকে ১২টা গর্ত্ত, যা দেখলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, এইরূপ আর একটা গুহা এইখানে ছিলো—খোঁড়া-খুঁড়ির অসাবধানতায় নষ্ট হ'য়ে

গেছে। এই ১২টা গর্ত্তের দূরত্ব সমান। কেবল মাঝের একটি গর্ত্তের কোনোরূপ চিহ্ন নেই। সেটা যে ছিলো এবং বুজে গেছে তা' বোধ হয় না লিখ্‌লেও চল্‌তো। এগুলো ঠেক্‌নোর কাজ কর্‌তো, কড়ির ন্যায়।

রোদ ক্রমশঃ কমে আস্‌চে; এইবার আমাদের ফির্‌তে হ'বে। আশেপাশে বন্য জন্তুর অভাব নেই, তা' আমরা গোড়া থেকেই জান্‌তুম। সোণ ভাণ্ডার পেছনে রেখে সরু পায়ে-চলা পথ ধ'রে আমরা যখন জরাসন্ধের আখড়ায় এসে পৌঁছিলাম, তখন রোদের তেজ একেবারেই ঝিমিয়ে এসেচে। চারিপাশে বন—মাঝখানে পথ। মাঝে মাঝে লতা-পাতা পথ রোধ ক'রে দাঁড়িয়ে পথের শুক্‌নো বুকটা ঢেকে রেখেচে। আখড়া যেমন হওয়া উচিত—তেম্নিই। এখনো বেশ সমতল আছে। মাটীর রঙটা গঙ্গামাটীর ন্যায় ঘোলাটে। বাস্তবিক এই অসমতল দেশে এতটা সমতল জমি দেখে সকলেই অনুমান করেন যে, কোন্ অতীত শতাব্দীতে রাজা জরাসন্ধ এখানে ভীমসেনের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করেছিলেন—হয়তো কথাটা সত্যি। এই ঘোলাটে রঙের মাটীর পাশেই লালমাটী—তার পাশে গেরুয়া রঙের। এইখানে তেমন বন-জঙ্গল নেই। বোধ হয় গাছ-পালা এ মাটীতে হয় না। যে স্থানে 'জরাসন্ধের আখড়া' সেইটার আস্‌-পাশকে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌রা পুরাতন রাজগৃহ বলে থাকেন। সত্যি; যদি আমরা পাহাড়ের ওপর হ'তে এই উপত্যকার দিকে তাকাই, খুব সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় একটা অতি জীর্ণ-শীর্ণ সহরের কঙ্কালের অস্তিত্ব।

সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমশঃই পাহাড়ের কোলে ছোট ছোট নাম-না-জানা গাছের পাতায় পাতায় ডালে ডালে, মিশতে আস্‌চে। ভয়ে ও আতঙ্কে সোজা পথ ধ'রে আমরাও এগোলুম। যখন আমরা কুণ্ডে এসে পৌঁছুলাম তখন সেখানে তেমন কোলাহল ছিলো না, কেবল ছিল অবিরত জল পড়ার একঘেয়ে শব্দ।

১৯শে মার্চ্চ আমরা 'গৃধ্রকূট' দেখ্‌তে যাবো বলে অন্যদিনের চেয়েও প্রত্যূষে বেরিয়ে পড়লুম। সেই মামুলি পথ। চলেচি—তো চলেইচি। অস্পষ্ট অথচ পরিষ্কার। তখনো পথে লোক চলাচল আরম্ভ হয়নি। অজানা, অচেনা স্থানে নবাগত আমরা দু'জনেই—তাই এই দেশের এক বাবুকে সাথীরূপে নিয়েছিলুম। তাঁর নাম নারায়ণ বাবু। (ইনি বিহার ন্যাশনাল কলেজের সংস্কৃত ও হিন্দির অধ্যাপক। আমাদের সঙ্গেই, মানে আমাদের মন্দিরেই থাক্‌তেন) তাঁর সহায়তা ভিন্ন আমাদের দু'জনের যাওয়া হ'তো না কোনোদিন—হয়তো।

যে রাস্তাটা কুণ্ডকে ডানদিকে ফেলে সোজা দক্ষিণ মুখো চলে গেছে, সেইটে দিয়েই 'গৃধ্রকূটে' যেতে হয়। গভর্ণমেণ্ট অধুনা গয়া পর্য্যন্ত এই রাস্তাটাকে টেনে বাড়াবার চেষ্টায় আছেন। কাজ আরম্ভ হ'য়েচে—যেরকম স্পীডে কাজ চলেচে, তাতে বেশীদিন লাগ্‌বে না।

এই উঁচু-নীচু আঁকা-বাঁকা রাস্তায় মাইলখানেক চল্‌বার পর অন্য একটি রাস্তা এর সঙ্গে মিশে গিয়ে সোজা পূবমুখো চলে গেছে, দেখতে পাওয়া যায়। প্রথম রাস্তাটা ধ'রে তিনজনে পাশাপাশি চল্‌লুম। রাস্তার দু'পাশে খালি মাঠ আর তারি মাঝে মাঝে অল্পবিস্তর কাঁটা আগাছা। এই রাস্তা দিয়েও প্রায় দেড় মাইল যাবার পর আর পথ খুঁজে পাওয়া যায় না। মনে হয় যেন, এই রাস্তাটা এই পাহাড়ের সান্নিধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেচে। বাকী পথটা পাহাড়ের ওপরে। সেও প্রায় এক মাইল। পাহাড়ী পথ দিয়ে গেলে গৃধ্রকূটে পৌছানো যায়। পায়ে চলে চলে এটা রাস্তার মতোই হ'য়ে গেছে। যতই ওপরে উঠ্‌চি, নীচের আবৃত সমতল ভূমি আমাদের কাছে বেশী আকর্ষণীয় হ'তে লাগ্‌লো। এই সব সমতল ক্ষেত্রে নানা প্রকার জন্তু থাকে। তার মধ্যে নীলগাভী, বন্য বরাহ, ভাল্লুক, নেক্‌ড়ে বাঘ ও বানর যথেষ্ট। এ সব ছাড়াও মাঝে মাঝে কাছাকাছি জঙ্গল হ'তে এসে প্রায়ই জ্বালাতন করে যায়। যে সব কুলী মজুরেরা এই অঞ্চলে কাজ করে, তাদের নজরে প্রায়ই এই সব জন্তু পড়ে, আর যাঁরা আমাদের ন্যায় শুধু গৃধ্রকূট দেখ্‌তে আসেন—যদিও মুখোমুখি এই সব জন্তুর সাক্ষাৎ পান না, তবু তাদের থাকা সম্বন্ধে প্রমাণ পান প্রতি পদক্ষেপে, প্রতি মুহূর্ত্তে। পথে যেতে যেতে আমরা একটা মরা গরুকে দেখ্‌তে পেলুম। গরুটার টুঁটির কাছ থেকে মাংস কাটা অবস্থায় পড়ে রয়েচে। বাঘ ছাড়া অন্য জন্তু নাকি এ রকম ভাবে খায় না। কখনো বাঘে-ধরা জন্তুকে দেখ্‌বার সুযোগ পাইনি। আজ প্রথম দেখ্‌লুম। বেশ ভালো করে' মরা দেহটা দেখ্‌লুম—মনে হ'লো কে যেন এর দেহের শেষ রক্ত বিন্দুটি পর্য্যন্ত চুষে নিয়েচে। পাথরের ওপর জায়গায় জায়গায় রক্তের দাগ; এখন সে সব জমাট আর খুব গাঢ় লাল। বাঘেরা দিনের বেলায় বেরোয় কি না জানি না; তবে অস্পষ্ট অন্ধকারে যে তাদের দেখ্‌তে পাওয়া যায়, তা জানি। মরা গরুটা দেখে বন্ধু বল্লে,—"এই মরা গরুটার ন্যায় আমরাও নিঃসহায়। এই গরুটার যা শক্তি ছিলো, আমাদের তাও নেই। একটা বাঘের কবল থেকে নিজেদের বাঁচানো দূরের কথা, একটা পাহাড়ীর কবল থেকে নিজেরা কিরূপে বাঁচ্‌বো, তারও উপায় জানা নেই। একটা যে অস্ত্রশস্ত্র রাখ্‌বো, মানে নিজেদের সাহস বাড়াবো তা'ও নেই।"

আবার চলার সুরু। সেই একটানা-একঘেয়ে। চল্‌তে বিশেষ কিছু বেগ পেতে হয় না কিন্তু উঠ্‌তে কষ্ট হয়। তাই গৃধ্রকূটে গিয়ে ঢলে পড়্‌তে হয়। তখন মনে হয় যেন এখানকার ফুর্‌ফুরে হাওয়ায় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাটিয়ে দি'। এই এক মাইল, কিম্বা পুরা এক মাইলও নয় পথটুকু ক্রমাগত সমান খাড়াইয়ে উঠ্‌তে হয়। বুঝ্‌তাম যদি সমভাবেই পাথরগুলো সাজানো থাক্‌তো,

সিঁড়ি বয়ে উঠ্‌চি। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তা নয়। পাথরগুলো এমন বিশ্রী ভাবে সাজানো, একটুখানি চল্‌বার পরই চট করে' মনে পড়ে, যেন কোনো অদৃশ্য শক্তি শত্রুতা কর্‌বার জন্যেই এম্নিভাবেই সিঁড়ির ধাপগুলো ভেঙ্গে তচ্‌নচ্‌ করে' দিয়ে চলে গেছে। বেশ সাবধানে পা ফেলে ফেলে কোনো প্রকারে শিখর-প্রদেশে উঠেচি। আনন্দও হচ্ছে ; এই ভাব যে, এই বিদ্‌কুটে রাস্তার এইবার অবসান হ'লো। এইবার আমাদের একটা খাদে নাম্‌তে হ'বে। বন্ধু জানালে,—"নাম্‌বার আগে একটু করে' চা খেয়ে নেওয়া যাক্‌, আর সেই সঙ্গে একটু জিরিয়ে নেওয়াও হবে। আমরা তার কথার দ্বিরুক্তি না করে' প্রস্ফুটিত রোদে দাঁড়িয়ে ফ্লেক্সটা খালি করে দেবার আয়োজন সুরু কর্‌লাম, যখন আমরা খাদ পেরিয়ে উদয়গিরির পায়ের কাছে দাঁড়ালাম তখন রোদ বেশ ফুটে উঠেচে। আবার উঠ্‌তে হবে। এ রাস্তাটা দুর থেকে দেখ্‌তে অনেকটা বিয়ের বরণডালার ন্যায়। যেখানে এই বাঁকা রাস্তার শেষ, সেইখানেই গৃধ্রকূট। এ রাস্তাটাও নেহাৎ কম নয়। ওঠা-নামার জন্যে লম্বায় অনেকখানি হয় ; কিন্তু আসলে একটুখানি। গরমের দিনে এসব জায়গায় আসা আর আকাশের চাঁদের নাগাল পাওয়া, দুই-ই সমান। পালিয়ে-যাওয়া শীতের দিনেও যতটা পরিমাণে পরিশ্রান্ত হ'তে হয়, তা' গরম কালে অসম্ভাবিত।

এই রাস্তার শেষে আর একটা লাল সুরকি-দেওয়া রাস্তা পড়ে। সেটা একটুখানিই। তারই শেষে একটা গুহা—নাম 'আনাদগুহা'। বুদ্ধদেবের প্রধান শিষ্যের নামানুযায়ী এর নাম হ'য়েচে। গুহাটা বড় বড় পাথরের চাওড়্‌ দিয়ে তৈরী। এর ওপর দুটো ঘরের কঙ্কাল পড়ে রয়েচে।

আনন্দগুহার গায়ে লাগানো যে গুহাটা সেটী বুদ্ধ ভগবানের 'কেশবগুহা'। তাঁর সবচেয়ে প্রিয় গুহা এইটেই। এইখানেই তিনি বেশীর ভাগ সময় কাটাতেন এবং তাঁর যত কিছু ধর্ম্ম-বক্তৃতা, সবগুলোই এইখানে প্রথম উচ্চারিত হ'য়েছিলো। রাজা বিম্বিসারের সময়ে এইখানেই 'উপশত ক্রিয়া' প্রথম হ'য়েছিলো। এই গুহার সম্মুখে বহু ভিক্ষু তাঁদের অপরাধ ও পাপ বুদ্ধের নিকটে স্বীকার করেছিলেন। এই সবের জন্যে এই স্থানটি এখনো বৌদ্ধদের নিকটে এত পবিত্র।

হুয়েন্‌সাঙের মতে,—"বিম্বিসার নীচ থেকে গৃধ্রকূট পর্য্যন্ত এক পথ তৈরী করান। এই পাহাড়ের ওপর এক প্রকাণ্ড প্রাসাদতুল্য সৌধ ছিলো, সেখানে বুদ্ধদেব ধর্ম্ম উপদেশ দিতেন। সম্ভবতঃ ফাহিয়ানের সময়ের পরে কোন ধনী বৌদ্ধ এই সৌধ নির্ম্মাণ করেছিলেন ; সেখানে তখন বুদ্ধদেবের উপদেষ্টা ভাবের এক মূর্ত্তি ছিলো। ক্যানিংহামের মতে, শৈলগিরিই গৃধ্রকূট অথচ এখানে গুহা নেই। কিন্তু দক্ষিণের পাহাড়ে অনেক গুহা আছে এবং প্রাচীনকালে মুনি-ঋষির তপস্যার ক্ষেত্র ছিলো। অজাতশত্রু বৃদ্ধ পিতাকে 'তপন গেহে' বন্দী রাখেন আবার সেই স্থান থেকে বিম্বিসার গৃধ্রকূটে বুদ্ধদেবের বালগৃহ দেখ্‌তে পেতেন—একথা বৌদ্ধগ্রন্থে লেখা আছে।

বিশ্ব-প্রবাহ

নানা লোকের নানা প্রকার বিষয়ে ঝোঁক থাকে। মিলোরাড রাইচেভিচ্ নামক এক সার্ব্বিয়ান্ যুবকের ঝোঁক—তাঁহার খাতায় বরেণ্য ব্যক্তিগণের স্বাক্ষর সংগ্রহ করা। স্বাক্ষর সংগ্রহের জন্য তিনি কাহাকেও পত্র লিখেন না, স্বয়ং সকলের সহিত দেখা করিয়া স্বাক্ষর সংগ্রহ করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি পৃথিবীর নানা দেশ ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়াছেন। এ পর্য্যন্ত তিনি মুসেলিনী, প্রেসিডেন্ট হিন্ডেনবার্গ, প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট, কামালপাশা, মহাত্মা গান্ধী, লর্ড উইলিংডন, অনেক রাজা, মহারাজা, সম্রাট প্রভৃতির প্রায় ত্রিশ হাজার স্বাক্ষর আদায় করিয়াছেন। বলা বাহুল্য তাঁহার কার্য্য এখনও শেষ হয় নাই—এখনও তাঁহার পৃথিবী ভ্রমণ চলিতেছে।

শীত প্রধান দেশে শীতের সময়ে অনেক প্রকার কীট পতঙ্গ ও ছোট ছোট জীবকে দেখিতে পাওয়া যায় না। মাছ ও ব্যাঙ কাদার মধ্যে গর্ত্ত করিয়া বাস করে; অনেক জাতীয় প্রজাপতি ঘুমাইতে থাকে; বড় মাকড়শা লুকাইয়া পড়ে, কেঁচোকে মাটির উপরে দেখিতে পাওয়া যায় না, শামুক চারি মাস ধরিয়া ঘুমায়।

বিলাতের নারীগণ মাথার চুল ছাঁটিতে ছাঁটিতে এতদিনে প্রায় পুরুষেরই মতন চুল ছোট করিয়া আনিতেছিল। এ বৎসর সৌখীন নারীমহলে আবার পরচুল ধারণ করিবার রীতি দেখা দিতেছে।

যমজ সন্তানদের কেবল যে আকৃতির সাদৃশ্য থাকে তাহাই নহে, উহাদের স্বভাব ও প্রকৃতেও অনেক সময়ে সাদৃশ্য দেখা যায়। এমন কি, কোনও কারণে যদি একের পীড়া হয়, অন্যের মধ্যে ঠিক সেই পীড়া বিনা কারণেই দেখা দেয়। লণ্ডনে একদিন পিঠা খাইয়া এক যমজ ভ্রাতার উদরাময় হইল, ঠিক তাহার দুই ঘণ্টা পরে, অপর ভ্রাতাটি পিঠা না খাইলেও উদরাময় রোগে আক্রান্ত হইল। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, যমজ সন্তানগণের দেহ ভিন্ন হইলেও তাহাদের প্রাণের ধারা এক থাকে।

সুবিখ্যাত আমেরিকান বৈজ্ঞানিক ডাঃ ক্রাইল মনুষ্য-মস্তিষ্ক লইয়া গবেষণা করিয়া বলিতেছেন যে, বর্ত্তমান সভ্যতার ফলে মানুষের স্নায়ুমণ্ডলীর ক্রিয়া ও উত্তেজনা এত বৃদ্ধি পাইতেছে যে, এইভাবে বৃদ্ধি পাইলে মানুষ বুদ্ধিহীন বা বিকৃতমস্তিষ্ক হইয়া যাইবে বলিয়া আশঙ্কা হয়। সভ্যতার ফলে আচারে-ব্যবহারে যে প্রকার কৃত্রিমতা প্রতিদিন প্রবেশ করিতেছে, তাহা মনুষ্য জাতির প্রাণঘাতী হইবে।

সমালোচনা

নাগিনী:—একখানি ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস; শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। প্রাপ্তিস্থান - সিদ্ধেশ্বর প্রেস ডিপজিটরী, ২০।১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য বার আনা মাত্র।

কর্ম্মক্লান্ত মনকে প্রফুল্ল করিবার জন্য যাঁহারা রোমাঞ্চকর অথচ সহজ-সরল ঘটনাবলী পড়িতে ভালবাসেন, তাঁহারা এই উপন্যাসখানি পড়িয়া তৃপ্তিলাভ করিবেন। ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে—প্রকৃত তথ্য সুকৌশলে রহস্যাবৃত রাখিয়া ঘটনাকে বৈচিত্র্যময় ও কৌতূহলপূর্ণ করা। লেখক তাঁহার উপন্যাসখানির আরম্ভ হইতে তাহাই করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন এবং তাহাতে তাঁহার কৃতিত্বও প্রদর্শন করিয়াছেন। লেখকের ভাষা প্রাঞ্জল এবং বর্ণনাভঙ্গি অনবদ্য।

সংবাদিকা

ভারতের আদি ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এনামেল শিল্পের প্রতিষ্ঠান 'সুর এনামেল এণ্ড ষ্ট্যাম্পিং ওয়ার্কস্ লিমিটেড'এর শ্রীযুক্ত মৃগাঙ্কমোহন শূর মহাশয় সম্প্রতি জাপানে গমন করিয়াছেন। এনামেল শিল্প ও ব্যবসায়ের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিসাধন করিবার উদ্দেশ্যেই তাঁহার এই জাপানভ্রমণ। ইতিপূর্ব্বে এই উদ্দেশ্যেই তিনি কয়েকবার ইউরোপের নানাদেশে এবং একবার আমেরিকায় পরিভ্রমণ করেন এবং স্বদেশে আসিয়া পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক প্রণালীর দ্বারা ভারতে এনামেল কার্য্যের প্রভূত উন্নতিসাধন করেন। তাঁহার সাধু উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত হউক ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।

সন্দেশ পত্রিকার ষষ্ঠ বর্ষের যে সকল লেখকলেখিকাদিগের প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতা পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে যাঁহারা শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন তাঁহাদের নাম নিম্নে প্রকাশিত হইল—

প্রবন্ধ	...	প্রথম—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ
		দ্বিতীয়—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সুর
গল্প	...	প্রথম—শ্রীঅমরেশ বিশ্বাস
		দ্বিতীয়—শ্রীমতী রমা নিয়োগী
কবিতা	...	প্রথম—শ্রীপ্রমথনাথ কুণ্ডার
		দ্বিতীয়—কুমারী সুলেখা হালদার, কুমারী ক্ষণিকা সুর।

পুরস্কারের দিন পরে জানান হইবে।

আমাদের কথা

সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের মৃত্যুতে আমরা আন্তরিক দুঃখিত। তিনি সকলেরই ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর বলিয়াই যে তিনি সকলের সম্মানিত ছিলেন কেবলমাত্র তাহাই নহে, তাঁহার চরিত্রে এমন অনুপম মাধুর্য্য ছিল যে, তাঁহার সম্মুখে যে কেহ আসিত, বা তাঁহার কথা যে কেহ শুনিত, তাহারই মস্তক তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধায় অবনত হইত। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার আত্মার মঙ্গল কামনা করিতেছি।

*　　*　　*　　*

সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের স্বর্গারোহণের পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অষ্টম এডওয়ার্ড ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধিপতি হইলেন। তিনিও নানা মহৎ গুণে বিভূষিত। তাঁহার রাজত্বকালে প্রজাবর্গের সকল উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়া সর্ব্বত্র যেন সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায় এবং শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজিত হয় ইহাই আমাদের একান্ত অভিলাষ। শ্রীভগবানের কৃপায় তিনি যেন শারীরিক ও মানসিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য প্রাপ্ত হইয়া দীর্ঘজীবন লাভ করেন।

*　　*　　*　　*

সদ্গোপ যুবক সঙ্ঘের উদ্যোগে এবারও স্বজাতীয় বালকবালিকাগণের বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হইয়াছে। ইহা সদ্গোপ যুবক সঙ্ঘের অন্যতম প্রশংসনীয় কার্য্য। কেহ কেহ বলেন যে, এইরূপ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানের দ্বারা স্বজাতির কোন প্রত্যক্ষ উন্নতি সাধিত হয় না। বিশেষতঃ বর্ত্তমানে এইরূপ প্রতিযোগিতা যখন অন্য বহুস্থানে অনুষ্ঠিত হইতেছে, তখন এইরূপ আয়োজন দ্বারা সময়, উদ্যম ও অর্থ অপচয় করা ভিন্ন বিশেষ কোন কার্য্য হয় না। ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, প্রত্যক্ষভাবে ইহার দ্বারা শরীর-চর্চ্চা বিষয়ে স্বজাতীয় বালকবালিকাগণকে যেমন উৎসাহ দান করা হইতেছে, অন্তর্নিহিত-ভাবে আমাদের আরও একটি মহান্ উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে;—সেই উদ্দেশ্য হইতেছে বাল্যাবস্থা হইতে মধ্যে মধ্যে তাহাদিগকে পরস্পরের সহিত মিলিত হইবার সুযোগ দান করিয়া তাহাদের মধ্যে সৌহার্দ্দ্য স্থাপন করা। এ কথা বোধ হয় সকলেই অকুণ্ঠিতভাবে স্বীকার করিবেন যে, যে-সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণের মধ্যে যত অধিক সৌহার্দ্দ্য থাকে, সেই সম্প্রদায়

বাল্যাবস্থায় যেমন সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপিত হয়, পরিণত বয়সে সেরূপ হয় না। বাল্যকালে খেলাধূলার মধ্য দিয়া যে আলাপ পরিচয় হয় তাহা বড়ই প্রীতিপূর্ণ এবং তখনকার বন্ধুত্ব দীর্ঘস্থায়ী। খেলা-ধূলার মধ্যদিয়া স্বজাতীয় বালকবালিকাগণ বড় হইয়া, ভবিষ্যতে যখন সমাজের দায়িত্ব গ্রহণ করিবে, তখন তাহাদের এই বাল্যকাল হইতে আরব্ধ পরিচয় বা বন্ধুত্ব পরিণত বয়সের বন্ধুত্ব অপেক্ষা যে অধিকতর সুফল প্রদান করিবে, তাহা সুনিশ্চিত। সমাজের বর্ত্তমান অভাব-অভিযোগ অপনোদন করা যেরূপ হিতকর কার্য্য, ভবিষ্যতেও সমাজের শৃঙ্খলা ও শক্তি যাহাতে বৃদ্ধি পায় তাহার প্রয়াস তদপেক্ষা কম মঙ্গলকর নয়। সুতরাং ক্রীড়া প্রতিযোগিতা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত করিয়া সদ্গোপ যুবকসঙ্ঘ যে প্রকৃত সমাজের উন্নতিকর কার্য্যে লিপ্ত নহে, এরূপ অভিমত বা সন্দেহ প্রকাশের কোন যুক্তি-সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না।

* * * *

অতি অল্পদিন হইল, স্বজাতির সুবিধার জন্য আমরা বিবাহের পাত্র-পাত্রীর সন্ধান দিবার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। কিন্তু ইহারই মধ্যে আমাদের নিকট কন্যাপক্ষীয়গণের নানা অনুযোগ আসিতেছে। পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যাইতেছে যে, প্রায় সকল অনুযোগেরই মূলে রহিয়াছে পণপ্রথা। পণপ্রথা সম্বন্ধে আমাদের মতামত পূর্ব্বে এই পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছে। পণপ্রথা সামাজিক জীবনকে অতিশয় কলুষিত করিয়া অত্যন্ত দুর্ব্বিসহ করিয়া তুলিয়াছে, সুতরাং ইহার মূলোচ্ছেদ সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজন—এ বিষয়ে কাহারও মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না। কিন্তু এই পণপ্রথার অপ্রতিহত প্রভাবের জন্য যে, কেবলমাত্র পাত্রপক্ষীয়গণ দায়ী এবং পাত্রীপক্ষীয়গণের যে, ইহাতে কোনও প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি নাই এরূপ বলা চলে না। আমরা বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিতেছি যে, প্রায় সকল অবস্থার কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তিগণ এরূপ পাত্র চাহেন যে, তাহার কলিকাতায় বাড়ী থাকিবে, তাহার পিতার আর্থিক সংস্থান থাকিবে—অন্ততঃ পল্লীগ্রামে বিশেষ প্রকার জমি-জমা থাকিবে, সে নিজে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী হইবে এবং অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত একটি ভালরকম কার্য্য করিতে থাকিবে। বলা বাহুল্য, এরূপ পাত্রের সংখ্যা কেবলমাত্র সদ্গোপ জাতির মধ্যে নয়, অন্যান্য জাতির মধ্যেও অতি অল্প। এরূপ পাত্র সাধারণতঃ বিনাপণে বা অল্পপণে পাওয়া দুষ্কর; কারণ পাত্রীপক্ষীয়গণ যদি ধনসম্পত্তি এবং উচ্চশিক্ষার উপর নির্ভর করিয়া পাত্র নির্ব্বাচন করিতে চাহেন, তাহা হইলে যে অপর পক্ষ হইতেও পাত্রীর রূপ ও তাহার অভিভাবকগণের অর্থব্যয়ের ক্ষমতার উপর দৃষ্টিনিপতিত হইবে—তাহা অস্বাভাবিক নয়। এ স্থলে হয়ত কেহ দৃষ্টান্ত দিতে পারেন যে, কোন কোন ধনী সদাশয় ব্যক্তি বিনাপণে উপার্জ্জনক্ষম

দিয়াছেন। সামান্য বিবেচনা করিলেই বুঝা যায় যে, ইহা তাঁহাদের মহত্ব প্রকাশ। নীতির দিক দিয়া এই প্রকার মহত্ব প্রকাশ করা সকলেরই উচিত; কিন্তু এই মহত্ব প্রকাশকে যদি আমরা সাধারণের স্বাভাবিক নিয়ম বলিয়া দাবী করি, তাহা হইলে আমাদের মস্ত ভুল করা হইবে। আমাদের মনে হয়, সকলে এইরূপ অল্প সংখ্যক পাত্রগুলির প্রতি আকৃষ্ট হইতেছেন বলিয়া তাহাদের অভিভাবকগণের পণের অঙ্ক বৃদ্ধি পাইতেছে এবং পণপ্রথাও জটিলতর হইয়া উঠিতেছে।

অবস্থা যখন এইপ্রকার, তখন সাধারণ কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তিগণের উচিত এমন পন্থা অবলম্বন করা—যাহাতে পণপ্রথা জটিলতর না হইয়া উঠে এবং তাঁহাদেরও কষ্ট অনেক পরিমাণে লাঘব হয়। আমাদের মনে হয়, এই কার্য্য সমাধান হইতে পারে, যদি তাঁহারা ধনসম্পত্তি ও উচ্চশিক্ষার প্রতি অত্যন্ত প্রলুব্ধ না হইয়া পাত্রের মনুষ্যোচিত গুণের প্রতি অধিকতর মনোনিবেশ করেন,—অর্থাৎ যদি স্বাস্থ্যবান্ সদ্বংশসম্ভূত, সাধারণভাবে শিক্ষিত, সচ্চরিত্র, কর্ম্মরত, কর্ত্তব্যপরায়ণ, কষ্টসহিষ্ণু প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট পাত্র নির্ব্বাচনে প্রবৃত্ত হন। এইপ্রকার পাত্রসকলের তথাকথিত বিদ্যা বা ধনগৌরব না থাকিলেও, ইহারাই প্রকৃত সৎপাত্র। ভোগবিলাসের আশা ইহাদের নিকট না থাকিলেও, সাধারণ গৃহস্থের সুখ-শান্তি-দান এইপ্রকার পাত্রগণই করিয়া থাকে। অথচ পণের অঙ্ক লইয়া ইহাদের অভিভাবকগণকে অধিক অনুনয় করিতে হয় না। এইরূপ পাত্রের সন্ধান পাওয়াও বিশেষ দুষ্কর নহে। আমাদের বিশ্বাস, প্রত্যেকে চেষ্টা করিলে আপন আপন প্রতিবেশী ও পরিচিতগণের মধ্যেই এইপ্রকার পাত্রের সন্ধান পাইতে পারেন। কিন্তু অনেকে বৃথা মান-অভিমানের জন্য, কেহ বা চাক্ষুষ নিকটস্থ বিষয় অপেক্ষা সময়ে সময়ে চক্ষুর অগোচর দূরস্থ বিষয়কে উজ্জ্বলতর মনে করেন বলিয়া, প্রতিবেশী ও পরিচিতগণের নিকট এই কার্য্যে অগ্রসর হইতে চাহেন না এবং নিজেদের কষ্টবৃদ্ধির জন্য এবং পণপ্রথাকে তীব্রতর করিবার জন্য অন্য নানাস্থানে পাত্রের অনুসন্ধান করিতে থাকেন। মানুষের কার্য্যের প্রতিবন্ধক অধিকাংশক্ষেত্রে মানুষের নিজেই সৃষ্টি। পাত্রনির্ব্বাচনে পণপ্রথা আজ যে প্রতিবন্ধকস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা আমাদের নিজেদের এইপ্রকার নানা কারণেরই জন্য হইয়াছে।

কর্ম্মখালি

চারিজন ম্যাট্রিকুলেশন পাশ, কর্ম্মঠ, বুদ্ধিমান, সচ্চরিত্র সদ্গোপ যুবক আবশ্যক। বেতন যোগ্যতানুসারে ২৫৲ হইতে ৩৫৲ পর্য্যন্ত। মনোনীত কর্ম্মপ্রার্থীকে নগদ ২০০৲ জমা রাখিতে হইবে। সদ্গোপ যুবক সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক শ্রীললিতমোহন কুমারের নিকট ৩৪ নং ইণ্ডিয়ান মিরার ষ্ট্রীটে পরিচয় পত্র সহ আগামী ১২ই মে তারিখের মধ্যে আবেদন করুন। কিন্তু এই বিষয় লইয়া তাঁহার সহিত কেহ দেখা-সাক্ষাৎ করিবেন না।

সদ্গোপ পাত্র-পাত্রী

পাত্র চাই—মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত কাঁদীর দুইটী সুন্দরী সুশিক্ষিতা সদ্‌গুণ-সম্পন্না স্বাস্থ্যবতী পাত্রীর জন্য সুশিক্ষিত অবস্থাপন্ন দুইটি পাত্র আবশ্যক। গুণবিশেষে যৌতুকাদি দেওয়া হইবে। কুল সম্বন্ধে কোন বাধ্য-বাধকতা নাই। বক্স নং ১ সদ্গোপ পত্রিকা।

পাত্রী চাই—মাসিক ২০০৲ টাকা উপার্জ্জনশীল ৩০।৩৫ বৎসর বয়স্ক বিপত্নিক পাত্রের জন্য একটী সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী বয়স্থা পাত্রী চাই। পাত্রের পূর্ব্ব-পত্নীর গর্ভজাত যথাক্রমে ৮ বৎসর ও ৫ বৎসর বয়স্কের দুইটী পুত্রকন্যা আছে। যৌতুকাদি নাই। বক্স নং ২ সদ্গোপ পত্রিকা।

পাত্র চাই—একটী চতুর্দ্দশবর্ষীয়া স্বাস্থ্যবতী শ্যামবর্ণা বাঙ্গলা লেখাপড়ায় অভিজ্ঞা গৃহকর্ম্মে নিপুণা পূর্ব্বকুল মৌদ্‌গোল্য গোত্র পাত্রীর জন্য একটী শিক্ষিত ব্যবসায়ী স্বাস্থ্যবান্ পাত্র চাই। যৌতুক ২০০০৲ টাকা। বক্স নং ৩ সদ্গোপ পত্রিকা।

পাত্র চাই—একটী ১৪।১৫ বৎসর বয়স্কা সুন্দরী শিক্ষিতা স্বাস্থ্যবতী পাত্রীর জন্য একটী সুশিক্ষিত সুদর্শন অর্থবান্ পশ্চিমকুল কুলীন পাত্র চাই। পাত্রী মৌদ্‌গোল্য গোত্র—একমাত্র কন্যা। বক্স নং ৪ সদ্গোপ পত্রিকা।

পাত্র চাই—একটী সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী ১৪।১৫ বয়স্কা পাত্রীর জন্য একটী সুদর্শন সুশিক্ষিত ও সম্পত্তিশালী পাত্র চাই। যৌতুক ৪০০০৲ হাজার হইতে ৫০০০৲ হাজার টাকা।

সদ্গোপ পাত্র-পাত্রী

পাত্রী চাই—একটী ২৩।২৪ বৎসর বয়স্ক শিক্ষিত পশ্চিমকুল বিশ্বাস ব্যবসায়ী সম্পত্তিশালী মৌদ্‌গোল্য গোত্র পাঁত্রের জন্য সুন্দরী পাত্রী চাই। যৌতুক সম্ভবমত হইলে চলিবে। বক্স নং ৬ সদ্গোপ পত্রিকা।

পাত্র চাই—একটী ১৪।১৫ বৎসর বয়স্কা সুশিক্ষিতা সুন্দরী মৌদ্‌গোল্য গোত্র পাত্রীর জন্য একটী সুদর্শন শিক্ষিত ব্যবসায়ী কলিকাতাবাসী পশ্চিমকুল পাত্র চাই। যৌতুক ২০০০৲ টাকা। বক্স নং ৭ সদ্গোপ পত্রিকা।

পাত্রী চাই—একটী গ্রাজুয়েট শিলং প্রদেশের ব্যবসায়ী সুদর্শন ভালকো কুলীন বংশের পাত্রের জন্য একটী ১৭।১৮ বৎসর বয়স্কা সুন্দরী শিক্ষিতা ভাল্‌কো ঘর ব্যতীত পাত্রী চাই। কুলীন না হইলেও চলিবে। যৌতুকাদি কিছুই নাই। বক্স নং ৮ সদ্গোপ পত্রিকা।

পাত্রী চাই—একটী ২২।২৩ বৎসর বয়স্ক সুদর্শন স্বাস্থ্যবান শিক্ষিত পাত্রের জন্য একটী সুন্দরী দরিদ্র গৃহের পাত্রী চাই। পাত্র সাঁওতাল পরগণায় একটী পাথর কাটাই ফার্ম্মের ম্যানেজার। কন্যাটী সেই স্থানেই থাকিবে। পাত্রী মেদিনীপুর, বাঁকুড়া বা বীরভূম স্থানীয়া হওয়া চাই। যৌতুক নাই। বক্স নং ৯ সদ্গোপ পত্রিকা।

পাত্রী চাই—ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারীং স্কুলের শেষ পরীক্ষোত্তীর্ণ মেদিনীপুর ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের অধীনস্থ কর্ম্মচারী একটী স্বাস্থ্যবান্ সুদর্শন যুবকের জন্য একটী সুন্দরী গৃহকর্ম্মে নিপুণা পাত্রী আবশ্যক। বক্স নং ১০ সদ্গোপ পত্রিকা।

পাত্রী চাই—একটি স্বাস্থ্যবান্ সুশ্রী শিক্ষিত, বিশিষ্ট ইঞ্জিনীয়ারের পুত্র, রেডিও ব্যবসায়ী ২২।২৩ বৎসরের যুবকের জন্য একটি স্বাস্থ্যবতী সুন্দরী শিক্ষিতা পাত্রী আবশ্যক। বক্স নং ১১ সদ্গোপ পত্রিকা।

পাত্র চাই—একটি ১৪ বৎসর বয়স্কা উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা স্বাস্থ্যবতী পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রীর জন্য ২২।২৩ বৎসর বয়স্ক উপার্জ্জনক্ষম পাত্রের আবশ্যক। কুল সম্বন্ধে কোন বাধ্যবাধকতা নাই। সম্ভবমত যৌতুক দেওয়া হইবে। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ শূর, ফটকবাজার, খরিদা, পোঃ খড়্গপুর, জেলা মেদিনীপুর।

নিয়মাবলী

১। সমস্ত টাকা কড়ি যুবকসঙ্ঘের ধনাধ্যক্ষের নামে ১০/১, স্যাহরস্ত লেন, কলিকাতা এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

২। রাজনৈতিক কোন প্রবন্ধ পত্রিকাতে আলোচিত হয় না।

৩। লেখক-লেখিকাগণের মতামত পত্রিকা সম্পাদক বা সদ্গোপ যুবকসঙ্ঘের মতামত নহে।

৪। লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।

৫। প্রবন্ধ কাগজের একপৃষ্ঠে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া পত্রিকা-সম্পাদকের নামে ৩৪ নং ইণ্ডিয়ান মিরার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। ডাকমাশুল না পাঠাইলে অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরত দেওয়া হয় না। প্রবন্ধ পাঠাইবার সময় আপত্তি না জানাইলে পত্রিকা পরিচালক মণ্ডলী প্রবন্ধের যে কোন অংশ পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন করিতে পারিবেন।

৬। যুবক-সঙ্ঘ ও তাহার পত্রিকা সম্বন্ধীয় যাবতীয় সংবাদ যুবক-সঙ্ঘ অফিস ৩৪ নং ইণ্ডিয়ান মিরার ষ্ট্রীটে জ্ঞাতব্য। সন্ধ্যা ৮টা হইতে ৯॥০টা পর্য্যন্ত অফিস খোলা থাকে।

৭। বিজ্ঞাপনের হার সাধারণ এক পৃষ্ঠা মাসিক ৮৲, আধ পৃষ্ঠা ৪॥০, সিকি পৃষ্ঠা ২॥৵, সূচীর নীম্নে আধ পৃষ্ঠা ৬৲, সিকি পৃষ্ঠা ৩॥০। বিশেষ বিশেষ স্থানে বিজ্ঞাপনের মূল্য প্রকাশকের নিকট জ্ঞাতব্য।

সদ্গোপ পাত্র-পাত্রীর

বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী

(১) সদ্গোপ পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপন বিনামূল্যে প্রকাশ করা হইবে। কেবলমাত্র পত্রিকার গ্রাহক-গ্রাহিকাগণই এই সুবিধা পাইবেন। কিন্তু স্থানাভাব বা অন্য কোন কারণ বশতঃ এই বিষয়ে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশ না করিবার ক্ষমতা সদ্গোপ যুবক সঙ্ঘের কর্ত্তৃত্বাধীন। (২) বিজ্ঞাপন-গুলি স্পষ্টাক্ষরে ও সংক্ষিপ্ত হওয়া আবশ্যক। উহা যেন এই পত্রিকার ৩ লাইনের অধিক না হয়। (৩) বিজ্ঞাপনে বিবৃত বিবরণের জন্য আমরা দায়ী নহি। পাত্র-পাত্রীর সম্বন্ধ নির্ণয়কারিগণ সমস্ত বিষয় তাঁহারা নিজেদের দায়িত্বে করিবেন। (৪) যাঁহারা নিজেদের নাম প্রকাশ না করিয়া বক্স নম্বর দিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা যদি আমাদের কার্য্যালয় হইতে পত্রাদি লইয়া না যান, তবে উহা প্রেরণের জন্য তাঁহাদিগকে আমাদের নিকট উপযুক্ত (অন্ততঃ আট আনার) ডাকটিকেট রাখিতে হইবে।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ নিয়োগী কর্তৃক দি নিউ ইণ্ডিয়ান প্রেস—৬, ডাফ ষ্ট্রীট হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

স্বাস্থ্য-সংখ্যা

সম্পাদক—শ্রীতারকনাথ হাজরা।

TO LET

বিজ্ঞাপনদাতাগণকে পত্র দিবার সময় অনুগ্রহপূর্ব্বক 'সদ্গোপ পত্রিকার' নাম উল্লেখ করিবেন।
স্বজাতিগণ সদ্গোপ পত্রিকার পাত্র-পাত্রীর জন্য বিজ্ঞাপন দিন। বিজ্ঞাপনের হার অতি সামান্য।

সূচী

১। স্বর্গীয় ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের স্মৃতিপূজা ৯৩
২। ভূসংস্থান ও দেশের স্বাস্থ্যের সম্বন্ধ ... ডাঃ শ্রীশচীন্দ্রনাথ সুর, এম-বি, ডি-পি-এইচ্, ডি-টি-এম্ ৯৫
৩। পল্লীগ্রামে বসন্তরোগ ... কবিরাজ শ্রীহরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ভিষগাচার্য্য ১০০
৪। শিশু-পালন ... ডাঃ ফণিভূষণ সুর, এম-বি ১০৫
৫। শ্যামাচরণ কুমার হস্পিটাল ... ১১১
৬। বাঙ্গালীর খাদ্য ও অন্ন-সমস্যা ... ক্যাপ্টেন শ্রীবিনোদবিহারী হাজরা ১১২
৭। যক্ষ্মার প্রতিকার কি ? ... ডাঃ শ্রীবঙ্কিমকুমার পাল, বি-এস্-সি, এম্-বি, ডি-টি-এম, এম্-আর্-সি-পি, টি-ডি-ডি ১১৯
৮। আকস্মিক দুর্ঘটনার প্রাথমিক প্রতিবিধান ... ডাঃ শ্রীমনোমোহন কুমার, এম্-বি ১২৭
৯। আমাদের কথা ... ১৩১

বিজ্ঞানাচার্য্য স্বর্গীয় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার।

স্বাস্থ্য-সংখ্যা

৭ম বর্ষ] ফাল্গুন, ১৩৪২ [৪র্থ সংখ্যা

স্বর্গীয় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের

স্মৃতিপূজা

দেব,

আজ দ্বাত্রিংশৎ বৎসর অতীত হইল, তুমি তোমার নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়াছ;—আমাদের মধ্যে অধিকাংশ যুবকেরই তেমাকে সশরীরে দেখিবার সৌভাগ্য হয় নাই; কিন্তু তুমি তোমার অবনিশ্বর অশরীরীরূপে আমাদের হৃদয়ে চির-সঞ্জীবিত—চিরপূজিত। তোমার পুণ্য নাম মোহিনী শক্তির মত আমাদের দেহে ও প্রাণে পবিত্র পুলক-স্পন্দন আনিয়া দেয়,—আমাদের মন গৌরব-গরিমা, আশা ও প্রেরণায় পূর্ণ করে।

হে বিরাট পুরুষ! আজ যাঁহার শতবার্ষিক জন্মোৎসবে সমগ্র জগতের গগন-পবন মুখরিত, সেই যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তোমার হৃদয়ের বিরাটত্ব দর্শন করিয়া একদিন

কেবলমাত্র যে তুমি সমুদ্রের মত বিরাট ছিলে তাহাই নহে, সমুদ্রেরই মত অশেষ গুণে বিভূষিত ছিলে ;—তাহার প্রমাণ তুমি তোমার প্রত্যেক কার্য্যের দ্বারা প্রদর্শন করিয়াছ ; কিন্তু বিজ্ঞানের সাধনা তোমার জীবনের ব্রত ছিল,—বিশেষতঃ চিকিৎসা-বিজ্ঞানকে তুমি প্রাণের সহিত ভালবাসিতে ; তাই আজ তোমার তিরোধানের দিনে, তোমার **স্মৃতিপূজায়** স্বজাতীয় চিকিৎসকগণের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধপূর্ণ 'সদ্গোপ পত্রিকা'র এই "স্বাস্থ্যসংখ্যা" শ্রদ্ধাবনত-মস্তকে তোমায় অর্ঘ্য প্রদান করিতেছি ;—ইহা যতই সামান্য হউক না কেন,—ইহা তোমার স্বজাতি যুবক-বৃন্দের ক্ষুদ্র-হৃদয়ের আন্তরিকতাপূর্ণ পূজার্ঘ্য—ইহা তুমি গ্রহণ কর !

হে মহামানবতার পুরোহিত ! প্রতীচ্যের বিজ্ঞান-সাধনা করিয়া তুমি জড়ের পূজা কর নাই ; প্রাচ্যের গৌরব,—ভারতের প্রজ্ঞান আজ তোমার বিজ্ঞান-প্রচারের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে জীবন্তমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতেছি ;—তোমার বিজ্ঞান-প্রচার প্রাচী ও প্রতীচীকে প্রেমময় মৈত্রীর বন্ধনে অবিচ্ছেদ্যভাবে আবদ্ধ করিতেছে ;—আশীর্ব্বাদ কর দেব, যেন আমরা তোমার মত প্রেমপূর্ণ মৈত্রীর বন্ধনে কেবল স্বজাতীগণকে নহে, সমগ্র মানব-সমাজকে সুসংবদ্ধ করিতে সমর্থ হই।

প্রণতঃ—

সদ্গোপ যুবক সঙ্ঘের সভ্যবৃন্দ।

N. B. Please see pages 16 to 22 of Barrackpore Govt School Magazine bound at the end of this

ভূসংস্থান ও দেশের স্বাস্থ্যের সম্বন্ধ

[ডাঃ শ্রীশচীন্দ্রনাথ সুর, এম-বি, ডি-পি-এইচ্, ডি-টি-এম্ এ্যাসিষ্টেণ্ট ডিরেক্টর, পাব্লিক হেলথ্, বেঙ্গল]

আজ আমার বক্তব্য বিষয় হচ্ছে যে,—দেশের স্বাস্থ্য তাহার ভূসংস্থানের বিশেষত্বের উপর কিরূপে নির্ভর করে। ভূসংস্থান বলতে দেশের বৈচিত্র্য বুঝায়; যেমন—পাহাড়, পর্ব্বত, পাহাড়তলী, বনভূমি, মরুভূমি, নদীবহুল ভূমি, সমতল ভূমি, সমুদ্র-উপকুল, লোণাভূমি, সহর, গ্রাম ইত্যাদি। আমি অন্যদেশের কথা না বলে, আজ আমাদের বাঙলা দেশের কথাই ব'লব। আমাদের এই বাঙলা দেশে উপর্য্যুক্ত প্রায় সকল রকম সংস্থানেরই সমাবেশ আছে। আমাদের দেশে—হিমালয়ের মত চির-তুষারাবৃত উচ্চ পর্ব্বতও আছে এবং সমুদ্রের জোয়ারের সময় জলে ডুবে যায় এমন জমিও আছে; ব্যাঘ্র-সঙ্কুল নির্জ্জন বনভূমিও আছে এবং ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সমৃদ্ধিশালী বড় সহর কলিকাতাও আছে; রাঢ় দেশের মতন উচ্চ-নীচ ভূমিও আছে এবং ২৪ পরগণার মতন সমতল ভূমিও আছে; পদ্মা মেঘনার মতন বিশাল নদীও বয়ে যাচ্ছে এবং কানা দামোদরের মতন মরা নদীও আছে! এই সকল বিশেষত্বের উপর দেশের স্বাস্থ্য কিরূপ নির্ভর করে—তাহাই আজ বুঝাবার প্রয়াস।

যে সকল প্রদেশে রোগের প্রাচুর্য্য কম, সচরাচর আমরা সেই অঞ্চলকেই স্বাস্থ্যকর বলে থাকি। রোগের তালিকা অনেক বড়ই করা যায়; যেমন,—কলেরা, বসন্ত, টাইফয়েড, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া ইত্যাদি। দেশে কলেরা হয়ত একবার আসে এবং কতকগুলি লোককে ট্যাক্স স্বরূপ নিয়ে সরে যায়। বসন্ত কতকগুলিকে একবারে নিয়ে এবং কতকগুলিকে শ্রীহীন ও কুৎসিত করে চলে যায়। Influenza ও Dengue কয়েকদিন জ্বরে ভুগিয়ে চলে যায়। Typhoid ও কয়েকটিকে বেশ ভুগিয়ে গৃহস্থকে প্রায় সর্ব্বস্বান্ত করে যায়। কিন্তু ম্যালেরিয়া দেশেতে বারমাসই থেকে যায় এবং সমস্ত দেশকে সর্ব্বস্বান্ত করে। ম্যালেরিয়া রোগে যিনি ভুগেছেন, তিনি ছাড়া এর মর্ম্ম আর কেহই বুঝতে পারবেন না। তবে ম্যালেরিয়ায় কখনও ভোগেন নাই এরূপ লোক পশ্চিম বা মধ্য বঙ্গে কেহ আছেন বলে মনে হয় না। যে কেহ এই অঞ্চলের গ্রামে বাস করেছেন, তিনিই বলতে পারেন যে, গ্রামে ম্যালেরিয়ার অবস্থা কিরূপ ভীষণ। জন্মাবধিই গ্রামবাসীদের প্রত্যেক বৎসরই কয়েক মাস ধরে ভুগতে হয়। অতএব, যদি কেহ বলেন—অমুক জায়গার স্বাস্থ্য ভাল তা'তে এই বুঝায় যে সেখানে ম্যালেরিয়া কম। এবং যদি বলা হয় যে

অমুক গ্রামের স্বাস্থ্য অত্যন্ত খারাপ; তাতে বুঝায় যে, সে স্থানে অত্যন্ত ম্যালেরিয়া। সুতরাং দেশের স্বাস্থ্য প্রধানতঃ নির্ভর করছে সে দেশেয় ম্যালেরিয়া প্রকোপের কম-বেশীর উপর। অন্য রোগের অস্তিত্ব ম্যালেরিয়ার কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়। এখন ভূসংস্থানের বিশেষত্বের উপর ম্যালেরিয়া অস্তিত্ব কিরূপে নির্ভর করে তাহাই বলছি।

পর্ব্বতাঞ্চল—যখন সমুদ্র হতে জলীয় বাষ্প বহন ক'রে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ হতে বাতাস উত্তর ও পূর্ব্বের পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা লাগে, তখন আর উহা ঐ বাষ্প ধরে রাখতে পারে না; তখন আকাশে মেঘের সঞ্চার হয়ে বৃষ্টি হয়। সেইজন্য পাহাড় অঞ্চলে খুব বৃষ্টিপাত হয়। বৎসরে ১৫০ হইতে ২০০ ইঞ্চি খুবই স্বাভাবিক। চিরাপুঞ্জিতে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী বৃষ্টিপাত হয়;—বৎসরে প্রায় ৫০০ ইঞ্চি। এ সকল অঞ্চলের আবহাওয়া সেইজন্য খুবই আর্দ্র থাকে;—গ্রীষ্ম-কালে, সমতলভূমির তুলনায় ঠাণ্ডা; উদাহরণ—দার্জ্জিলিং অঞ্চল। ৬০০০ ফুট উচ্চ ভূমিতে মশা নাই, মাছি নাই; অতএব ঐ সকল জীব যে সকল রোগ বহন করে, সে সকল রোগের প্রাদুর্ভাবও নাই।

১৫০০ হতে ৪০০০ ফুট উঁচু পাহাড়াঞ্চলে কিছু কিছু ম্যালেরিয়া দেখতে পাওয়া যায়। যত নীচে আসা যায় ততই ম্যালেরিয়া বেশী দেখা যায়। এই সব অঞ্চলে পাহাড়ের গা দিয়ে জল চুঁয়ে বেরোয় এবং ছোট ছোট ঝরণার সৃষ্টি করে। পাহাড়ীয়ারা পাহাড়ের গায়ে চাষের ক্ষেত করে এবং ঐ সকল ঝরণার জল ক্ষেতের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ধানের চাষ করে। ঐ অঞ্চলে ম্যাকুলটাস্ নামে ম্যালেরিয়া জীবাণু-বাহক এক রকম মশা পাওয়া যায়। তারা ঐ সকল ঝরণায় ও ধান ক্ষেতে জন্মায়। তারা দিনের বেলায় পাহাড়ের গায়ে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে থাকে এবং রাত্রে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করে ঘুমন্ত লোককে কামড়ায়।

হিমালয়ের পাদস্থিত ডুয়ার্স অঞ্চল প্রায় ৫০০ হ'তে ১৫০০ ফুট উচ্চ। এখানে স্তরে স্তরে জমি উঠেছে। পাহাড় কাছে থাকার জন্য ও জঙ্গল থাকার দরুণ এখানেও প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। এসব অঞ্চলে অত্যন্ত ম্যালেরিয়া হয়। এখানে মিনিমাস নামে একরূপ ম্যালেরিয়া-বাহক Anopheles মশা ঐ ম্যালেরিয়ার কারণ। আমরা দেখেছি—ঐ অঞ্চলে বারমাসই ঐ মশার শরীরে ম্যালেরিয়ার জীবাণু পাওয়া যায় এবং শতকরা প্রায় ১০টী মশার লালাকোষে জীবাণু থাকে। ঐ অঞ্চলে খুবই জঙ্গল ছিল, কিন্তু এখন জঙ্গল পরিষ্কৃত হয়ে চা-বাগানে পরিণত হয়েছে। এই মশার একটী বিশেষত্ব হচ্ছে যে, উহা গভীর অরণ্যের মধ্যে পাওয়া যায় না, কিম্বা যে সকল জলে রৌদ্রপাত হয় না সে সকল জলে জন্মায় না। জল যদি গভীর জঙ্গলে ঢাকা পড়ে ত উহা আপনিই চলে যায়। কিন্তু যদি ঐ জঙ্গল পরিষ্কার করা হয় ত উহা পুনরায় দেখা দেয়। দেখা গিয়েছে

বসতি হল, কোথা হতে মিনিমাস্ মশাও এসে অমনি ম্যালেরিয়ার সৃষ্টি করল। মনুষ্যজাতি অবশ্য জঙ্গলের মধ্যে কখনই বাস করতে পারবে না,—তাকে জঙ্গল পরিষ্কার করতেই হবে। অতএব এ সকল অঞ্চলে ম্যালেরিয়া থেকে যাবে। এই অঞ্চল সেইজন্য খুবই অস্বাস্থ্যকর।

৫০০ ফুটের নীচে অথচ হিমালয়ের ক্রোড়ে অবস্থিত যে সকল ভূমি আছে, তাদের আমরা সচরাচর তরাই বলে থাকি। এই অঞ্চলে ডুয়ার্সের মতই বৃষ্টিপাত হয়; এবং সেইরূপই অস্বাস্থ্যকর। এ সকল জায়গায় চা, ধান, পাটের চাষ হয়। এখানে মিনিমাস্ মশা ও সমতল ভূমির ফিলিপাইনেন্সিস্ মশা ম্যালেরিয়ার কারণ। এই দুইটির সমাবেশ যেন রাজযোটক হয়েছে।

এইত গেল পাহাড়াঞ্চলের কথা। এবার কিছু সমতল ভূমির কথা বলতে চাই। বাঙলার প্রায় ৯৫ ভাগই সমতলভূমি এবং ইহাই কৃষিপ্রধান। বাঙলাদেশ বলতে এই নদীমাতৃক সমতল ভূমিই বুঝায়। বাঙলাকে প্রধানতঃ—পূর্ব্ব, উত্তর, মধ্য ও পশ্চিম বাঙলায় ভাগ করা হয়েছে। পূর্ব্ব ও উত্তর বাঙলার স্বাস্থ্য প্রায় একইরূপ এবং পশ্চিম ও মধ্য বাঙলার অন্যরূপ। এই নদীমাতৃক দেশে নদীর কাজ সম্বন্ধে একটু বোঝা দরকার। এই বাঙলার মধ্য দিয়ে বড় বড় নদী সকল বয়ে যায়; যেমন—গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, দামোদর ইত্যাদি। উহারা বাঙলার বাহির হতে বর্ষাকালে জল, পলিমাটী ও মাছের পোনা নিয়ে আসে। বর্ষার সময় যখন নদী ফুলে উঠে, তখন উভয়কূল উপ্‌ছিয়ে নদীর ঘোলা জল মাছের ডিম নিয়ে মাঠের মধ্যে প্রবেশ করে। পুরাকালে সারা বর্ষাকালেই ঐ ঘোলা জল মাঠের উপর দিয়ে নানা ছোট ছোট খালের মধ্যে দিয়ে চলত। মাঠে ঐ ঘোলা জল থিতিয়ে যেত এবং পলিমাটীও মাঠকে উঁচু এবং উহার উর্ব্বরা শক্তি বৃদ্ধি করত। উহার ফলে প্রচুর শস্য জন্মাত এবং ঘোলা জলের সঙ্গে মাছের পোনা আসত বলে দেশে মাছের প্রাচুর্য্যও ছিল। আর এই বর্ষাকালই ম্যালেরিয়া প্রসারের উপযুক্ত সময়; অথচ পূর্ব্বে যখন এইরূপ নদীর জলের অবাধ গতি ছিল, তখন সমস্ত বদ্ধজল ধুয়ে ঘোলা জল চলত বলে ম্যালেরিয়া অতি অল্পই ছিল। যখন বাঙলায় প্রচুর শস্য ও প্রচুর মাছ জন্মাত ও ম্যালেরিয়া-শূন্য ছিল, তখনই কবি এই বাঙলাকে সোণার বাঙলা বলে গেছেন। আর আজ এই মধ্য ও পশ্চিম বাঙলার শস্য ও মাছ গেছে এবং ম্যালেরিয়ায় ধ্বংস প্রায়! পূর্ব্ববঙ্গে ত এ অবস্থা নয়। এর কারণ কি?

ডাঃ বেণ্ট্‌লি দেখিয়েছিলেন যে, পূর্ব্ববঙ্গে নদীগুলির কাজ নদীগুলিকে করতে দেওয়া হয়। সেইজন্য মাঠে প্রচুর শস্য জন্মে, প্রচুর মাছ জন্মে ও ম্যালেরিয়াও কম হয়। পশ্চিম ও মধ্য বাঙলায়ও যতদিন নদীগুলাকে কাজ করতে দেওয়া হয়েছিল, ততদিনই এ দেশের স্বাস্থ্য ভাল ছিল।

দিন নাই। এখন ম্যালেরিয়ার ভয়ে বর্দ্ধমান জেলা থেকে লোক দূরে থাকে। এর কারণ খুঁজলে দেখা যায় যে, দামোদর ও ভাগীরথীর বন্ধন। এই নদীগুলার উভয় দিক বাঁধ দিয়ে বাঁধা হয়েছে। তারা আর পলিমাটী ও মাছের পোনা মাঠের উপর ছড়াতে পারে না।

তাহ'লে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে, বঙ্গের যে-সকল প্রদেশে এখনও নদীর জল অবাধে মাঠের উপর যেতে পারে সে সকল দেশের স্বাস্থ্য খুব ভাল ; যেমন—পূর্ব্ববঙ্গ। এখানে লোক-সংখ্যাও অত্যধিক হয়েছে। প্রায় প্রতি বর্গমাইলে ১২০০ হতে ১৫০০ লোক আছে। তার মানে—মাথা পিছু ১৷৷০ বিঘা চাষের ভূমি আছে। এখানে খুব ভাল ফসল হয় বলেই এই ১৷৷০ বিঘা ভূমির শস্যে একটী লোকের ভরণপোষণ চলে। তবে বেশীদিন যে এভাবে চলবে, তা মনে হয় না। আজকাল রেল চাই, গ্রাম হতে গ্রামান্তরে যাওয়ার মোটরের রাস্তা চাই এবং বর্ষার সময় জুতা পায়ে দিয়ে এবাড়ী ওবাড়ী করার শুকনা রাস্তা চাই। অবশ্য এ সকল এ যুগে চাইই, তা না হ'লে অসভ্য বলবে। অথচ এমন পয়সাও নাই যে, এমন রাস্তা করবো যাতে জলের অবাধ গতি না রোধ করে। এই সব দেশে কিছুদিন পূর্ব্বেও বর্ষাকালে এবাড়ী ওবাড়ী করতে হলে, নৌকার সাহায্য ব্যতীত অন্য উপায়ে করা যেতে না ; গ্রাম হতে গ্রামান্তরের কথা ত ছেড়েই দিন। আর এখন ইউনিয়ন বোর্ডগুলা সস্তার রাস্তা করে জল চলাচলের পথ বন্ধ করছে এবং অচিরেই পশ্চিম বঙ্গের মতন ম্যালেরিয়ার সৃষ্টি করবে।

মধ্য ও পশ্চিম বঙ্গের অবস্থাও ৮০ বৎসর পূর্ব্বে পূর্ব্ব-বঙ্গের মতই স্বাস্থ্যকর ছিল। কিন্তু যখন হতে দামোদর ও ভাগীরথীর ধারের বাঁধ শক্ত করে বাঁধা হ'ল, তখন থেকে আর নদী অবাধে মাঠের মধ্যে তার ঘোলা জল পাঠাতে পারলো না। তার উপর আর দুটি রেল পথ (E. I. Ry. and E. B. Ry.) এবং সরকারের ও জেলা-বোর্ডের পূর্ত্ত বিভাগের রাস্তা দেশকে আরও বজ্র বাঁধনে বাঁধল। ইহার ফলে, যে সকল ছোট ছোট নালা দিয়ে দামোদরের ও ভাগীরথীর জল চলত, সে সকল মজে গেল। এখন সেই সকল নালার অস্তিত্ব কতকগুলি পুষ্করিণীতে পরিণত হয়েছে, কিম্বা কোনও কোনও জায়গায় ধান ক্ষেত হয়েছে। আর দামোদরের মাছ দেশে ছড়াতে পায় না এবং তার সারাল পলিমাটীও মাঠের উর্ব্বরা শক্তি বাড়াতে পারে না ; উপরন্তু মশার চাষের উপযোগী হয়ে পড়েছে। ইহারই ফলে ঐ অঞ্চল এত ম্যালেরিয়াগ্রস্ত। এখানে শতকরা ৮০টি ছেলের পেটে বড় বড় পিলে দেখতে পাওয়া যায়। এই সকল অঞ্চলে A. phillippinensisই ম্যালেরিয়ার জীবাণু বাহক। উহারা মজা পুষ্করিণী, মরা নদী, বন্ধ খালবিল ও

জীবাণু বহন করে। যদি নদী, খালবিল, মাঠ ও পুরাতন পুষ্করিণীগুলিতে নদীর ঘোলা জল অবাধ গতিতে চলতে পারত ত ঐ সকল জায়গায় ঐ প্রকার মশার উদ্ভবও কম হত।

তারপর আর এক প্রকার জমি আছে যেখানে সমুদ্রের জোয়ার-ভাঁটা খেলে। যেমন কলিকাতা হতে সমুদ্র পর্য্যন্ত। এই সকল জায়গায় জোয়ারের সময় সমুদ্রের লোনা জল পলি নিয়ে মাঠের মধ্যে ঢোকে। এই সকল জমি খুব নীচু, এখনও চাষবাসের উপযোগী হয় নাই। কিন্তু মানবজাতির জমির উপর লোভ অত্যন্ত বেশী এবং এই সকল জমি চাষের ও বাসের উপযোগী হওয়ার পূর্ব্বেই তাকে বাঁধ দিয়ে ঘিরে চাষের উপযোগী করে নিয়েছে। কিন্তু ইহার ফলে এই হয়েছে যে জমিগুলাকে উঁচু হতে না দেওয়ায় চিরকালের জন্য উহা নীচু রহেই গেল এবং নদীগুলার জল অবাধে ছড়াতে না পাওয়ায় উহারাও মজে যাচ্ছে। ইহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে বিদ্যাধরী নদী,—যার কথা আপনারা আজকাল প্রায়ই শুনতে পান। এই সকল লোনা দেশ এখনও পর্য্যন্ত অপেক্ষাকৃত ভাল আছে, কিন্তু আর বেশীদিন থাকবে না ; কারণ বিভিন্ন জায়গায় খুবই ম্যালেরিয়া দেখা দিয়েছে। এই সকল প্রদেশের লোনা জলে লাডলোই নামে একরকম Anopheles মশা জন্মায়। ঐ প্রকার মশার প্রায় শতকরা ২৪টি ম্যালেরিয়া জীবাণু বহন করতে পারে। এই সকল লোনা দেশে Phillippinensis মশা প্রায়ই জন্মাতে দেখতে পাওয়া যায় না। বোধ হয় উহারা লোনা জলে জন্মায় না। তবে যে সকল জায়গায় লোনা জল ঢোকা অনেকদিন বন্ধ করা হয়েছে, সে সকল জায়গা মিঠা হয়ে যাওয়ায় Phillippinensis মশা দেখা দিয়েছে। কলিকাতার পূর্ব্বধারে যে লোনা জলের জলা ভূমি আছে ঐখানে এখন খুবই Ludlowi মশা পাওয়া যাচ্ছে। এবং দেখতে পাওয়া গেছে যে, যখন থেকে ঐ মশা ওখানে জন্মাতে আরম্ভ হয়েছে তখন থেকেই কলিকাতার ঐ অঞ্চলে বেশ ম্যালেরিয়া দেখা যাচ্ছে।

সবশেষে কলিকাতা সহরের কথা বলে আজকের কথা শেষ করব। কলিকাতার উপকণ্ঠ ছাড়া সহরের মধ্যে ম্যালেরিয়া খুবই কম। এই কলিকাতাকে ম্যালেরিয়ার হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। কারণ, এই সহরই হচ্ছে বাঙলার মধ্যে একমাত্র স্থান—যেখানে গেলে ম্যালেরিয়ার হাত থেকে এড়াতে পারা যায়। কলিকাতার Stephensi বলে একরকম ম্যালেরিয়া বাহক মশা পাওয়া যায় ; উহারা বাড়ীর চৌবাচ্চা, ঘোলা জলের ট্যাঙ্ক, ইত্যাদিতে জন্মায়। সেইজন্য কলিকাতা করপোরেশন একটি মশা নিবারণ বিভাগ খুলেছেন,—তার কর্ত্তব্যই হচ্ছে যে, বাড়ী বাড়ী গিয়া কোথায় মশা জন্মাচ্ছে তা খুঁজে বের করা এবং প্রতিষেধক দেওয়া। এখনে যদি একবার ম্যালেরিয়া হতে দেওয়া হয় ত ম্যালেরিয়ার প্রকোপে এই সমৃদ্ধিশালী সহর গৌড়ের

গ্রামের অপেক্ষা সহরাঞ্চলে ম্যালেরিয়া কম থাকে বটে, কিন্তু সংক্রামক রোগ বেশী হয়। যেমন ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, ডেঙ্গু, বসন্ত, হাম ইত্যাদি। ইহার কারণ হচ্ছে যে, যেখানে লোকের বসতি ঘন, সেখানে এ সকল রোগের প্রসারের সুবিধাও বেশী। কিন্তু এ সকল দু'দিনের রোগ গ্রাম ও দেশের অপর অঞ্চলের ম্যালেরিয়ার মতন বারমেসে নয়। সেই জন্যই কলিকাতাকে এখনও স্বাস্থ্যকর জায়গা বলবো।

পল্লীগ্রামে বসন্তরোগ

[কবিরাজ—শ্রীহরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ভিষগাচার্য্য]

স্বজাতির মুখপত্র সদ্গোপ পত্রিকার মাননীয় সম্পাদক মহাশয়ের অনুরোধক্রমে এই প্রবন্ধ লিখিতে সাহসী হইলাম। সাধারণতঃ পল্লীগ্রামের লোকগণ কুসংস্কারাচ্ছন্ন, কিন্তু বিশেষ করিয়া বসন্ত রোগ সম্বন্ধে তাহাদের কুসংস্কার এরূপ ভয়াবহ যে, তাহা অপ্রতিহত প্রভাবে প্রাণঘাতী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং এই কুসংস্কার বিদূরিত করিয়া যাহাতে আয়ুর্ব্বেদ মতে সকলে অনায়াসলব্ধ ঔষধাবলী দ্বারা সহজে এই মারাত্মক বসন্ত রোগ প্রশমন করিতে প্রয়াস পায় তাহাই এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য।

বসন্ত (small-pox) যে কিরূপ জনপদ-বিধ্বংসী এবং সাংঘাতিক ব্যাধি,—কি চিকিৎসক, কি জনসাধারণ, সকলেই তাহা অবগত আছেন। শুধু যে ইহা বিসূচিকার (cholera) ন্যায় মহামারী রূপে আত্মপ্রকাশ করে তাহা নহে—ইহার তুল্য যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধি খুব কমই দেখা যায়। মৃত্যু মানুষের নিকট নানাভাবেই আসিয়া থাকে, কিন্তু ইহার ন্যায় বিভীষিকাময় মৃত্যু আর কিছুতে আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। প্রত্যেক বৎসর বহু ব্যক্তি ইহার কবলে কবলিত হইতেছে। কি আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক, কি এলোপ্যাথিক চিকিৎসক, কি হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসক, কেহই ইহার ধারাবাহিক সুচিকিৎসা করিবার সুযোগ পান না; তাহার একমাত্র কারণ, সাধারণতঃ সকলেরই ধারণা—"শীতলাদেবীর কোপদৃষ্টির জন্যই এই ব্যাধির উৎপত্তি হয় এবং হাতুড়ে বৈদ্য ও ওঝা ব্যতীত ইহার চিকিৎসক বা চিকিৎসা নাই।" এই অন্ধ বিশ্বাসের জন্য এই ব্যাধি ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া পড়ে; অধিকন্তু উক্ত হাতুড়ে বৈদ্য ও ওঝাগণও

দেহ হইতে অন্য দেহে সংক্রমিত হয়। এই প্রবন্ধে আমি সংক্ষেপে আয়ুর্ব্বেদীয় মতে এই নিদারুণ ব্যাধির উৎপত্তির কারণ, প্রকার ভেদ ও প্রতিষেধক বিষয়গুলিই প্রধানতঃ লিপিবদ্ধ করিলাম। যদি শ্রীভগবানের কৃপায় কোনদিন সুযোগ পাই, তবে এই সাংঘাতিক ব্যাধির আয়ুর্ব্বেদীয় মতে ধারাবাহিক চিকিৎসা প্রণালী লিখিবার প্রয়াস পাইব।

১। উৎপত্তির কারণ—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—ইহা জীবাণুজ ব্যাধি ; রোগাক্রান্ত লোকের শরীরে মশা ও মাছি বসিয়া, তথা হইতে জীবাণু (Bacillus) বহন করিয়া অপর সুস্থ ব্যক্তির খাদ্যে বসিয়া উক্ত জীবাণু ছাড়িয়া দেয়। এইরূপে ইহা ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করে। বস্তুতঃ এই রোগ কি করিয়া এক দেহ হইতে অপর দেহে সংক্রমিত হয়, তাহা অনেক সময় জানিতে পারা যায় না। বসন্তের বিষ অনেক দিন অবধি অলক্ষ্যভাবে ঘরে লাগিয়া থাকে। পূঁয, মাম্‌ড়ি, পূঁয সংযুক্ত কাপড়, বিছানা এবং বসন্তরোগে মৃত ব্যক্তির শবদেহ দ্বারা রোগ বীজ চারিদিকে বিস্তারিত হয়। রোগীর গাত্রসংস্পর্শে পূঁয, মাম্‌ড়ি, মল-মূত্রাদি, রোগীর গৃহ-মধ্যস্থ বায়ু, শয্যাবস্ত্র প্রভৃতিতে রোগ বীজ বর্ত্তমান থাকে। এই বীজ হয়ত চিকিৎসক, রোগীর পরিচর্য্যাকারী বা বন্ধু বান্ধবের সহায়তায় এক দেহ হইতে দেহান্তরে সংক্রমিত হয়। ধোপা, দরজী, গোয়ালা, খাদ্য বিক্রেতা প্রভৃতির গৃহে বসন্তরোগ হইলে, তথা হইতেও রোগ বীজ অন্যস্থানে সংক্রমিত হয়। সকলেরই মনে রাখা উচিত—বসন্ত অতি সংক্রামক রোগ ; আরও বহু প্রকারে ইহা সংক্রমিত হইতে পারে।

আয়ুর্ব্বেদীয় মতে এই ব্যাধির উৎপত্তির কারণ :—ক্ষীর, মৎস্যাদি সংযোগে বিরুদ্ধ ভোজন, দূষিত অন্ন, শিম, শাক এবং কটু, অম্ল, লবণ ও ক্ষার দ্রব্য ভোজন ; পূর্ব্বাহার অজীর্ণ সত্ত্বেও পুনরায় ভোজন ও দেশের প্রতি ক্রূর গ্রহদিগের কুদৃষ্টি প্রভৃতি কারণে এই ব্যাধি উৎপত্তি হয়।

২। প্রকার ভেদ :— আয়ুর্ব্বেদীয় বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ত্রিদোষজ, রক্তজ ও চর্ম্মদল ভেদে এই কয় প্রকারের বসন্তরোগ উৎপত্তি হয়। এলোপ্যাথিক মতে—বসন্ত দুই প্রকার ; যথা :—ডিস্‌-ক্রীট বা ফাঁক ফাঁক এবং কন্‌ফ্লুয়েন্ট বা পাশাপাশিরূপে পরিব্যাপ্ত। প্রথম প্রকারের বসন্ত প্রায়ই আরাম হয় ; দ্বিতীয় প্রকারের রোগে প্রায়ই মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

৩। প্রতিশেধক বা বসন্তে আত্মরক্ষার উপায় :— ইংরাজীতে একটী কথা আছে—"Prevention is better than cure" অর্থাৎ রোগ হইলে তাহার চিকিৎসা করা অপেক্ষা রোগ যাহাতে হইতে না পারে তাহার উপায় করা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কথাটী যে বিশেষ মূল্যবান তাহা বিজ্ঞ মাত্রেই স্বীকার করিবেন। এই মহামূল্য বাক্য ব্যাধিমাত্রেই প্রযোজ্য হইলেও বসন্ত

রোগের ন্যায় ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক সাংঘাতিক ব্যাধির পক্ষে সমধিক মূল্যবান তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

(ক) গো-বসন্তের বীজ লইয়া বা টীকার পরিপক্ক বীজের সহায়তায় মানবদেহে তাহা প্রবেশিত করিবার নাম—vaccination। এই vaccinationই রোগের প্রধান এবং প্রথম প্রতিশেধক। সদাশয় বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট ইহাকে Compulsory Vaccination Act এ সাধারণে প্রচার করিয়া বাস্তবিকই আমাদিগকে ঋণী করিয়াছেন। এক বা দেড় মাসের শিশু হইতে অশীতিপর বৃদ্ধগণেরও এই টীকা গ্রহণ করা উচিত। অনেক সময় দেখা গিয়াছে, টীকা লওয়ার কয়েক দিন পরই তাহার বসন্ত হইয়াছে; তাহার কারণ বিষ (bacillus) শরীরে প্রবিষ্ট হওয়ার পর টীকা লওয়া হইয়াছিল। বিষ শরীরে প্রবেশ করিলে এক হইতে বার দিবস মধ্যে এই ব্যাধি আত্মপ্রকাশ করে। ইহার স্থিতিকাল অন্যূন ছয় সপ্তাহ।

(খ) বসন্ত রোগ অনেকস্থলে অজ্ঞ, অশিক্ষিত হাতুড়ে বৈদ্য দ্বারা চিকিৎসিত হয় বটে, কিন্তু তাহা হওয়া আদৌ উচিত নহে। কাহারও বসন্ত হইবামাত্র উপযুক্ত চিকিৎসকের সহায়তা গ্রহণ করা উচিত। রোগীকে যদি সরকারী হাসপাতালে পাঠান সম্ভবপর হয়, তবে কাল বিলম্ব না করিয়া তথায় পাঠান উচিত। যদি সে সুবিধা না থাকে, তবে রোগীকে এমন ঘরে রাখা দরকার, যেখানে আর কেহ যাইতে না পারে এবং সেই ঘরে অপ্রয়োজনীয় আসবাব পত্র না থাকে।

(গ) রোগীর ঘরটী যেন বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে। সদাসর্ব্বদা ঘরে যাহাতে উত্তম বায়ু চলাচল করিতে পারে এরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে; কিন্তু ঘরে আলো যত কম যায় ততই ভাল।

(ঘ) গৃহে ধূপ-ধূনার ধূম ও গন্ধকের ধূম দেওয়া উচিত। অপবিত্র অবস্থায় যেন কেহ গৃহে প্রবেশ করিতে না পারে তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত।

(ঙ) দৈব-বিধানে যদি রোগীর মৃত্যু হয়, তবে তাহার কাপড় চোপড় ও শয্যাদি দগ্ধ করা উচিত। অসমর্থ হইলে গরম জলে সিদ্ধ করিয়া লওয়া উচিত। প্রত্যহ রোগীর মল, মূত্র পুঁয ও পরিত্যক্ত বস্ত্রাদি দগ্ধ করিয়া ফেলা উচিত। উহা কদাচ খাল, বিল, পুষ্করিণী বা নদীর জলে নিক্ষেপ করা উচিত নহে।

(চ) দুগ্ধ, মিষ্টান্ন প্রভৃতি বাজারের খাবার জিনিষ একেবারেই বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত।

(ছ) শুশ্রূষাকারী :— আমাদের দেশে সাধারণতঃ লোকে বলে—অশুচি অবস্থায় রোগীকে ছোঁয়া এমন কি, রোগীর ঘরে পর্য্যন্ত যাওয়া উচিত নহে। বাস্তবিকই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না থাকিলে বাহিরের অনেক অনিষ্টকর জীবাণু অপরিচ্ছন্নতার পথ অবলম্বন করিয়া দেহের ভিতর প্রবেশ

করিয়া রোগীর মৃত্যুর কারণ হইতে পারে। বসন্ত সংক্রামক ব্যাধি ; এইজন্য শুশ্রূষাকারীর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। যাহারা রোগীর সেবা করিবে তাহাদের প্রত্যেকের যেন টীকা দেওয়া হইয়া থাকে। যাহাদের টীকা দেওয়া হয় নাই বা বহুদিন পূর্ব্বে টীকা দেওয়া হইয়াছে, এরূপ ব্যক্তিকে রোগীর নিকট যাইতে দেওয়া উচিত নহে। রোগীর ঘর হইতে বাহির হইয়া জামা কাপড় ছাড়িয়া কোন জীবাণুনাশক দ্রব্য দ্বারা ধৌত করা উচিত। সে যেন পাকশালায় না যায়, তৎপ্রতি সতর্কদৃষ্টি রাখা উচিত।

(জ) যে গৃহে বসন্ত হইয়াছে সে বাড়ীর অন্য কোন লোক হাটে, বাজারে বা ক্ষেতে কৃষি-কর্ম্মের জন্য না যায়। স্কুল কলেজের ছাত্রদের স্কুল কলেজে যাওয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত।

(ঝ) রোগীর শয্যা :—রোগীর শয্যা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিবে ; সদা সর্ব্বদা মশারীর মধ্যে রাখিতে পারিলে ভাল হয় ;—যাহাতে মশা, মাছি রোগীর শরীরে বসিতে না পারে তৎপ্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা দরকার। রোগীর মুখ ব্যতীত সর্ব্বাঙ্গ পরিষ্কার চাদর দ্বারা ঢাকিয়া রাখা উচিত।

(ঞ) স্নান :—রোগীকে প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করাইয়া দেওয়া উচিত। অতি রুক্ষ ক্রিয়া বা অতি শীতল ক্রিয়া করা উচিত নয়। প্রত্যহ স্নান করিলে গাত্র পরিষ্কার থাকে এবং রোগীর জ্বর, গাত্রদাহ প্রভৃতি উপশম হইয়া সুনিদ্রা হয়।

(ট) বসন্তরোগের প্রাদুর্ভাবের সময় কোন না কোন সুগন্ধ দ্রব্যের ঘ্রাণ লওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। ক্ষুধিতাবস্থায় কখনও থাকা উচিত নয়। মন যাহাতে স্ফূর্ত্তিযুক্ত থাকে তাহার ব্যবস্থা করা উচিত ; এজন্য প্রতিদিন হরিসংকীর্ত্তন ও সৎগ্রন্থ পাঠ প্রভৃতি শুদ্ধ আনন্দদায়ক কার্য্যে লিপ্ত থাকা উচিত। কোথাও রাত্রি যাপন করা অনুচিত এবং নিজ নিজ বাড়ীতে শুদ্ধচিত্তে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে আহার ও নিদ্রা যাওয়া উচিত।

(ঠ) ঔষধীয় প্রতিষেধক—জলশূন্য কণ্টকারীর মূল ।• চারি আনা, গোল মরিচ ২১টী একত্র পরিষ্কৃত শীলে কিঞ্চিৎ জল সহ বাটিয়া একটী বটীকা প্রস্তুত করতঃ সেব্য। বসন্ত রোগ দেখা দিলে প্রতি তৃতীয় দিবস প্রাতে টাটকা প্রস্তুত করিয়া সেবন করিতে হয়। ৩।৪ বটীকার অধিক খাওয়া প্রয়োজন হয় না।

(ড) যতদিন বসন্তের আক্রমণ সম্ভাবনা থাকে, ততদিন কাঁচা উচ্ছে পাতার রস এক তোলা ও হরিদ্রাচূর্ণ দুই আনা পরিমাণ একত্র প্রত্যহ প্রাতে সেব্য।

(ঢ) কাঁচা সোনামুগের ডাল রাত্রে ভিজাইয়া পর দিবস প্রাতে খাইলে বসন্তের হাত

(ণ) একটী পুনর্ণবা গাছের মূল তিনটী গোল মরিচ সহ বাটিয়া একদিন মাত্র প্রাতঃকালে শুদ্ধ চিত্তে শ্রীভগবানের নাম স্মরণ পূর্ব্বক সেবন করিলে এক বৎসরের মধ্যে বসন্ত হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই।

(ত) আমরুলের গাছ পাতা সহ উত্তমরূপে বাঁটিয়া সিকি তোলা মাত্রায় প্রত্যহ তিনবার সেবন করিলে বসন্তের হাত হইতে নিস্তার পাওয়া যায়।

(থ) তুলসী ও নিম গাছ সংক্রমণ নাশক। যে বাড়ীতে উক্ত দুইটী, অথবা যে কোন একটী গাছ বিদ্যমান সে বাড়ীতে দেখা যায় সংক্রামক পীড়া অতি অল্পই হইয়া থাকে; অতএব প্রত্যেকেরই বাড়ীতে তুলসী অথবা নিম গাছ রাখা উচিত। নিম পাতার রস একটি শ্রেষ্ঠ সংক্রামক পীড়া নাশক ভেষজ।

(দ) দুই রতি পরিমাণ রস পর্পটী পরিষ্কৃত খলে মাড়িয়া পরে উহার সঙ্গে খাঁটি দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া পুনরায় মাড়িয়া খাইয়া কিঞ্চিৎ জল পান করিতে হইবে। ইহা পূর্ণ বয়স্কের মাত্রা।

৪। **চিকিৎসা প্রণালী**:—যাহাতে ঘর্ম্ম, মূত্র-বৃদ্ধি ও কোষ্ঠ-পরিষ্কার রাখে ও জ্বরের উপশম হয় এরূপ চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করা উচিত।

৫। **পথ্যাপথ্য**:—বসন্ত রোগে রোগীর গলাভ্যন্তরেও ক্ষত হয়। এজন্য প্রথম উপবাসের পর পথ্যের জন্য জলীয় সহজ পাচ্য খাদ্য ব্যবস্থা করা উচিত। নিম্নলিখিত খাদ্য দেওয়া যাইতে পারে:—

দুধ:—পেটের কোন গোলযোগ না থাকিলে কিঞ্চিৎ জল মিশাইয়া দুগ্ধ দেওয়া যাইতে পারে। দুগ্ধ সাবুও উৎকৃষ্ট পথ্য।

কমলা লেবুর রস, আঙ্গুর, বেদানা, ডালিম প্রভৃতি ফলের রস ও পানিফল দেওয়া যায়।

ডাবের জল এ ব্যারামে একটী উৎকৃষ্ট স্নিগ্ধ পানীয়।

পেটের গোলযোগ থাকিলে ছানার জল দেওয়া বিশেষ ফলদায়ক। বার্লির তরল সরবৎ লেবুর রস অথবা কিঞ্চিৎ মিছরীর গুড়া সহ দেওয়া যাইতে পারে।

অপথ্য:—মৈথুন, স্বেদক্রিয়া, পরিশ্রম, তৈল, গুরুদ্রব্য, ক্রোধ, রৌদ্র, দূষিত জল, বায়ু সেবন ও মল-মূত্রাদির বেগ ধারণ—এই সমুদয় বসন্ত রোগীর বিশেষ ভাবে নিষিদ্ধ।

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ

শিশু-পালন

[ডাঃ শ্রীফণীভূষণ সুর, এম্-বি, ইডেন হস্পিটাল]

সদ্যঃপ্রসূত হইতে ১।২ বৎসর বয়স্ক পুত্র বা কন্যাকে কি ভাবে লালনপালন করিলে শিশু সুস্থ ও সবল হইতে পারে এখানে তাহাই সংক্ষেপে আলোচনা করিব। সুখের বিষয়, ইদানী মাসিক পত্রিকা ও সভা-সমিতিতে লেখা ও বক্তৃতা দ্বারা এ বিষয়ে যথেষ্ট আন্দোলন চলিতেছে। এমন কি, আধুনিক যে কোন স্বাস্থ্য বা অন্য কোনরূপ প্রদর্শনীতে চিত্রাঙ্কন ও মাটীর মডেল দ্বারা লোকশিক্ষার যে প্রচলন হইয়াছে, তাহাতে এ বিষয়ে অনেকেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। তথাপি এ বিষয়ে কোন প্রবন্ধ পুনরুক্তি দোষে দুষ্ট হইতে পারে না। কারণ, এরূপ প্রত্যেক মাতাপিতার অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় যতই প্রচার হয়, ততই দেশের ও দশের মঙ্গল। "Child is the father of man" অর্থাৎ শিশুই মানুষের ভবিষ্যৎ গঠন করে। ভিত্তি শক্ত থাকা দরকার। গোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালা বৃথা।

সচরাচর বয়স্থ লোকের স্বাস্থ্যের জন্য যাহা যাহা দরকার শিশুদেরও সেই সেই গুলি আবশ্যক। সুপাচ্য পুষ্টিকর টাট্‌কা খাবার, বিশুদ্ধবায়ু, সূর্য্যকিরণ, ব্যায়াম, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি প্রত্যেক বিষয়েই লক্ষ্য রাখা উচিত।

খাদ্য—নবজাত শিশুর ২৪ ঘণ্টাকাল কোন খাদ্যের প্রয়োজন হয় না। মাত্র ফুটান জল ঠাণ্ডা করিয়া অল্প মিছরি, অথবা Sugar of Milk বা Glucose মিশাইয়া মিষ্ট করিয়া দেওয়া উচিত। ৩ দিনের পূর্ব্বে মাতৃস্তন্যে দুগ্ধ সঞ্চার হয় না। এই তিনদিন ঘন আটার মত অল্প অল্প দুগ্ধ স্তন্যে পাওয়া যায়—ইহাকে কেঁচুটে দুধ (Colostrum) বলে। ইহার বিশেষ গুণ যে, মৃদু রেচকের কার্য্য করে এবং শিশুকে খাওয়াইলে উহার উদরস্থ কালো আলকাতরার মত যে মল (Meconium) থাকে, তাহা সহজেই বাহির হইয়া যায়। এই অভিপ্রায়েই বোধ হয় ভগবান এইপ্রকার দুগ্ধ মাতৃস্তন্যে পাঠাইয়াছেন। সুতরাং প্রসবের দিন হইতেই শিশুকে মাতৃস্তন্য দান করা উচিত। অবশ্য দুগ্ধের পরিমাণ খুব অল্প ; সেজন্য প্রথমদিন ৮ ঘণ্টা অন্তর ও দ্বিতীয় দিন ৬ ঘণ্টা অন্তর স্তন্যপান করাইবার বেশী দরকার নাই। প্রথমদিন হইতে স্তন্যপান করানর আরও আবশ্যক এই কারণে যে, ক্ষুধার্ত্ত শিশু স্তন চুষিলে স্তনে বেশী দুগ্ধ আসে। দেখা যায় যে সব মায়ের স্তনে দুগ্ধ কম আসে, যদি তাঁহার শিশু দুর্ব্বল হয়, অন্য একটী সবল শিশুকে স্তন্যপান করাইলে তাঁহার

মাতৃদুগ্ধ স্বভাবজাত সৃষ্টি। ইহাতে শিশুর যে দাবী (birth right) আছে, তাহা অস্বীকার করা চলে না। অথচ যে সব শিক্ষিত মায়েরা আজকাল স্বরাজকে birth right (জন্মগত অধিকার) বলিয়া দাবী করিতেছেন, তাঁহারাই শিশুর এই birth right টুকু নির্ম্মম-ভাবে অগ্রাহ্য করিতে কুণ্ঠিত হন না। নচেৎ মাতৃদুগ্ধই যে শিশুর শ্রেষ্ঠ খাদ্য—ইহা ঘোষণা করিবার জন্য প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থ রচনার আবশ্যক হইত না।

মাতৃদুগ্ধের অভাব না হইলে, মাতৃদুগ্ধের বদলে অন্য কোন দুগ্ধ বা পেটেণ্ট ফুড ব্যবহার করা উচিত নয়। কারণ—

১। মাতৃদুগ্ধে যে যে উপকরণ যে যে পরিমাণে আছে, অন্য কোন দুগ্ধে বা ফুডে তাহা নাই। বৈজ্ঞানিক উপায়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও ঠিক ঐরূপ দুগ্ধ প্রস্তুত করা সম্ভব হয় নাই।

২। মাতৃদুগ্ধ শিশু স্তন হইতে সোজাসুজি পান করে—পাত্রের বা জীবাণুর সংস্পর্শে আসে না।

৩। যতটুকু পান করিলে ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় ততটুকুর বেশী শিশু পান করে না। দুই একটী পেটুক শিশু অনেক সময় প্রয়োজনের অধিক খাইয়া ফেলে, কিন্তু পরক্ষণেই বেশীটুকু বমি করিয়া ফেলে। সুতরাং বৈজ্ঞানিক উপায়ে দাঁড়িপাল্লায় ওজন করিয়া বা মাপ করিয়া জটীল অঙ্কশাস্ত্রের সাহায্যে দুগ্ধের পরিমাণ নির্ণয় করিতে হয় না।

৪। মাতৃ দুগ্ধের ভিটামিন নষ্ট হয় না।

৫। ভগবানের অপূর্ব্ব সৃষ্টিকৌশলে শিশুর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দুগ্ধের গাঢ়তা অনুপাতিক হিসাবে বাড়িতে থাকে ও শিশুর প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব ঘটিতে পারে না।

৬। অবশেষে গৃহস্থদের এইটুকুও মনে রাখা উচিত যে, মাতৃদুগ্ধে অর্থের প্রয়োজনীয়তা নাই। পেটেণ্ট ফুড বা দুগ্ধের জন্য অপব্যয়ের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। পরন্তু ঐ সব খাদ্য খাইয়া শিশুর যে অসুখ হইতে পারে, তাহার চিকিৎসার ব্যয়ের হাত হইতেও রক্ষা পাইবেন।

কতকগুলি বিশেষ কারণে শিশুকে মাতৃস্তন্যে বঞ্চিত হইতে হয়; যথা—মায়ের যদি ১। যক্ষ্মারোগ থাকে, অথবা ২। মাতা যদি মরিয়া যান, অথবা ৩। পরে জীবাণু ঘটিত জ্বরাদিতে ভুগিতে থাকেন, কিম্বা ৪। যদি মাতা উন্মাদ হন।

১। যক্ষ্মারোগে শরীরে Calciumএর বিশেষ দরকার; দুগ্ধের সহিত Calcium বহুল পরিমাণে নির্গত হয়; সুতরাং এ ক্ষেত্রে শিশুকে স্তন্যপান করাইলে, মায়ের রোগ বৃদ্ধির

২। Sepsis বা জীবাণুঘটিত জ্বরে স্তন্যপান করাইলে মায়ের শরীর ত দুর্ব্বল হইবেই, অধিকন্তু বিষাক্ত দুগ্ধ সেবনে শিশুরও অসুখ করিবে। অল্প জ্বর থাকিলে কিন্তু স্তন্যপান বন্ধ করান উচিত নয়; কারণ, একবার কিছুদিন বন্ধ করিলে দুগ্ধ শীঘ্রই কমিয়া যাইবে বা শুকাইয়া যাইবে।

৩। একটি স্তনে স্ফোটক হইলে অক্ষত স্তনটি পান করাইবে।

৪। উন্মাদ মাতার নিকট শিশুকে রাখিতে নাই; কারণ বেশীর ভাগ স্থলে শিশুর প্রতি মাতার গভীর বিতৃষ্ণা হয়, এমন কি হত্যা করিতে পারে।

উপরোক্ত কারণে মাতৃস্তন্যপান বন্ধ করিলেও অন্য প্রসূতির স্তন্যপান প্রশস্ত। এরূপ দৃষ্টান্ত পূর্ব্বে বিরল ছিল না। অধুনা কদাচিৎ দেখা যায়। ইহার দুইটী কারণ মনে হয়;— প্রথমতঃ, বোধ হয় অধুনা ভগ্নস্বাস্থ্য মায়েদের স্তনে একটী শিশুর প্রয়োজনের অধিক দুগ্ধ থাকে না; দ্বিতীয়তঃ, পেটেণ্ট ফুডের বিজ্ঞাপনের মোহ। শিশুকে অন্য মায়ের (wetnurse) স্তন্যপান করাইবার পূর্ব্বে নিম্নলিখিত কয়টী বিষয় লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

১। তাঁহার উপদংশঘটিত রোগ না থাকে।

২। তাঁহার সমান বয়স্ক শিশু থাকিলে উত্তম; কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, শিশুর বয়সের অনুপাতে দুগ্ধ গাঢ় বা পাতলা হয়। অল্পবয়স্ক শিশুর গাঢ় দুগ্ধ সহজে পরিপাক হয় না।

৩। যে শিশুকে স্তন্যপান করাইবে তাহার উপদংশ না থাকে। নতুবা তাহার ধাইমার ঐ রোগ হইবার সম্ভাবনা।

স্তন্যদুগ্ধের পরই প্রকৃষ্ট শিশুখাদ্য হইতেছে গোদুগ্ধ। গোদুগ্ধের বিভিন্ন উপকরণ অনেকাংশে নারীর দুগ্ধের সমকক্ষ। নিম্নলিখিত প্রক্রিয়া দ্বারা গোদুগ্ধকে প্রায় নারীর দুগ্ধের সমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

১½ ছটাক দুগ্ধের সহিত সমান ভাগ জল মিশাইয়া, তাহাতে ২ চামচ চিনি ও ২ চামচ সর মিশাও। ইহাতে উভয় দুগ্ধের আমিষ, শর্করা ও চর্ব্বি জাতীয় দ্রব্যের অনুপাত সমান সমান হইবে। কেবল প্রভেদ থাকিবে এইটুকু যে, গোদুগ্ধে যে আমিষজাতীয় পদার্থ আছে তাহাতে casein নামে দ্রব্য বেশী পরিমাণে ও lactalbumen কম পরিমাণে আছে। এই casein শিশুর পক্ষে কিছু দুষ্পাচ্য। একটু চূণের জল মিশাইলে উহা সুপাচ্য হয়।

সকল শিশুর হজমশক্তি সমান নয়। কোন কোন শিশু খাঁটী গোদুগ্ধ পান করিয়া বেশ পরিপাক করিতে পারে এবং তজ্জন্য শীঘ্র ওজনে বাড়িতে থাকে এবং সবলও হয়। কিন্তু এই পরিপাক শক্তি নির্ণয় করার কোন প্রকৃষ্ট উপায় নাই। সুতরাং অর্দ্ধেক জলমিশ্রিত দুগ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে দুগ্ধের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া যাওয়াই শ্রেয়ঃ। পরিপাকের ব্যাঘাতের সামান্য

অনেক দুঃস্থ পরিবারে দুগ্ধের অভাবে সাগু বা বার্লি—শুধু অথবা দুগ্ধের সহিত মিশাইয়া—খাওয়াইবার প্রথা দেখা যায়। ইহা বিজ্ঞানসম্মত না হইলেও, অনেকস্থলে দেখা যায় যে, শিশু এই খাদ্য পরিপাক করিয়া থাকে এবং বেশ সুস্থ ও সবল হয়। যদি শিশুর এরূপ খাদ্য সহ্য হয়, তবে উত্তম ;—কারণ, বার্লিতে পুষ্টিকর দ্রব্য দুগ্ধ অপেক্ষা বেশী আছে।

পেটেণ্ট ফুড বাজারে বহুল পরিমাণে আমদানী হইয়াছে। এবং সর্ব্বতোভাবে শিশুর আহারের উপযোগী না হইলেও উহাদের মধ্যে কতকগুলির বিশেষ বিশেষ গুণ আছে ; সেগুলি সবিশেষ অবগত না হইয়া কোন ফুড কোন্ কোন্ অবস্থায় শিশুর উপযোগী হইতে পারে ইহা বিবেচনা না করিয়া—এক কথায় এ বিষয়ে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের মত না লইয়া, ব্যবহার করিলে উহার অপব্যবহার হওয়া সম্ভব। প্রধানতঃ পেটেণ্ট ফুডকে ৩ ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে।

১। খাঁটী গোদুগ্ধকে উত্তাপে শুকনো ও চূর্ণ করা। যথা গ্লাক্সো, Cow & Gate.

২। গুঁড়া দুগ্ধের সহিত অন্য দ্রব্য মিশ্রিত। যথা—Horlicks Malted Milk.

৩। দুগ্ধকে সহজ পাচ্য করিবার জন্য উহার চর্ব্বি জাতীয় অংশ কিয়ৎ পরিমাণে বাহির করিয়া বা কোন অংশ কোনরূপ রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা রূপান্তরিত করা। যথা—Benzer's food.

Mellin's food প্রথমোক্ত ফুড। সুস্থ শিশুর জন্য টাট্কা দুগ্ধের অভাবে উহা ব্যবহার করা যাইতে পারে। পাঠক পাঠিকারা মনে রাখিবেন—এই সকল দুগ্ধ কোন অংশে টাট্কা দুগ্ধ অপেক্ষা সহজপাচ্য নয়। "আমার ছেলে বা মেয়ের গরুর দুধ হজম হয় না, তাই Glaxo বা Horlick খাওয়াচ্ছি"—এ কথা অনেক মায়ের মুখে শোনা যায়। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রকার ফুড সাধারণতঃ রুগ্ন শিশুর পথ্য—উহা ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে চিকিৎসকের পরামর্শ লওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। উপরোক্ত যে কোন প্রকার পেটেণ্ট ফুডই খাওয়ান হউক না কেন, উহাতে Vitaminএর অভাব থাকায় শিশুকে প্রত্যহ ১ বা ২ আউন্স কমলা লেবুর বা tomatoর রস খাওয়ান উচিত। সর্ব্বদাই এটুকু মনে রাখা উচিত যে, টাট্কা গোদুগ্ধের অভাব না হইলে পেটেণ্ট ফুড কখনই ব্যবহার করা উচিত নয়।

আহার্য্যের সম্বন্ধে এই কয়টী কথা শেষ করিয়া এখন আহারের সময় ও নিয়মাদি সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিব। মানুষ অভ্যাসের দাস। শিশুকাল হইতে সেইজন্য এমন অভ্যাস করা উচিত, যাহা শিশুর পক্ষে কেন বয়স্থের পক্ষেও প্রয়োজনীয়। নিয়মিত আহার নিদ্রা ও ক্রীড়ার অভাবে বেশীর ভাগ শিশুর স্বাস্থ্য ভগ্ন হয় এবং তাহাকে লইয়া মাকে নানা অসুবিধা ভোগ

আহারের নিয়ম—অতি শৈশব হইতেই ঘড়ি ধরিয়া দুই ঘণ্টা অন্তর স্তন্যপান করাইবে। রাত্রি ১০টা হইতে ভোর ৫টার মধ্যে প্রসূতির সুনিদ্রা আবশ্যক; সুতরাং এই সময়ে স্তন্যপান করান উচিত নয়। এই সময় এবং খাওয়ানর সময় ছাড়া, অন্য সময় শিশু কাঁদিলে চামচ বা ঝিনুকে করিয়া অথবা Feeding bottleএ করিয়া মিছরির জল সদ্য ফুটাইয়া খাওয়ান শ্রেয়ঃ। শিশু কাঁদিলেই স্তন্যপান করান অতি কদভ্যাস এবং অনিষ্টকর; কারণ শিশু শুধু ক্ষুধার জন্য কাঁদে না,—পেট্‌কামড়ামড়ান, কান কট্‌কটানি, ইত্যাদি নানা রকম শারীরিক অসুস্থতার জন্যও কাঁদে। শেষোক্ত স্থলে দুধ খাওয়াইলে অত্যাধিক খাওয়ান হয় এবং কুপথ্য করা হয়। স্তনদুগ্ধ গরম;—পেট কামড়াইলে দুগ্ধের উষ্ণতায় তাহার কিঞ্চিৎ উপশম হয়,—শিশু চুপ করে। এই চুপ করার যথার্থ কারণ না জানার জন্য, বেশীর ভাগ মায়েরা মনে করেন—শিশুর ক্ষুধা পাইয়াছিল তাই কাঁদিতেছিল; কিন্তু পরক্ষণেই সেই দুগ্ধ পান হেতু পেটের কামড়ানি বাড়ে—শিশু আবার কাঁদিতে থাকে—মাও স্নেহবশতঃ আরও স্তন্যপান করান। ফলে শিশুর ইষ্ট ত হয়ই না, বরঞ্চ পীড়া আরও বাড়িতে থাকে। ইহা ছাড়া যখন তখন স্তন্যপান অভ্যাসে শিশু আবদারে হয় এবং অত্যধিক দুগ্ধপানে পরিপাকশক্তির বিঘ্ন ঘটে।

স্তন মুখে দিয়া নিদ্রা যাওয়া—ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। ইহার কয়েকটী দোষ আছে। প্রথমতঃ—গাঢ় নিদ্রাবশে অজ্ঞাতে মাতা শিশুর উপর শুইতে পারেন এবং ২।১ স্থলে এরূপে শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হওয়ায় শিশুর মৃত্যু ঘটিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ—মাতাকে ইহাতে একভাবে শয়ন করিতে হয়—সুনিদ্রা হয় না। এই অভ্যাস এমন বদ্ধমূল হইয়া যায় যে, স্তন ছাড়াইয়া লইলেই শিশু কাঁদে। তৃতীয়তঃ—অধিকক্ষণ চুষিবার ফলে স্তনের বোঁটা ভিজিয়া উপরকার পাতলা চামড়া এত নরম হয় যে, স্থানে স্থানে উহা উঠিয়া আসে এবং ঐ সকল স্থানে জীবাণু-আক্রান্ত হইয়া অবশেষে স্তনের স্ফোটকের সৃষ্টি হয়।

তিন মাস বয়স পর্য্যন্ত ২ ঘণ্টা অন্তর. তিন মাস হইতে নয় মাস পর্য্যন্ত, ৩ ঘণ্টা অন্তর দুধ খাওয়ান উচিত। বসিয়া বা অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় স্তন পান করান সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়ঃ, কারণ এই অবস্থায় স্তনের বোঁটা মুখের মধ্যে এমন ভাবে থাকে যে, স্তনের অবশিষ্ট অংশদ্বারা শিশুর নাসারন্ধ্র বন্ধ হয় না। প্রত্যেকবার স্তন্য-পান করাইবার পূর্ব্বে ও পরে স্তনের বোঁটা ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া লওয়া উচিত।

গোদুগ্ধ বা অন্য কোনপ্রকার দুগ্ধ খাওয়াইতে হইলে ঝিনুক বা চামচ বা Feeding bottle ব্যবহার করা যাইতে পারে। Feeding bottleএ এই সুবিধা আছে যে, শিশু যথেচ্ছা টানিয়া

খাইতে পারে, অপর পক্ষে ঝিনুক বাটী পরিষ্কার রাখিতে bottle অপেক্ষা সুবিধা। বোতলের মধ্যে Allenburyর বোতলের মত নৌকার আকারের বোতলের কোণগুলি গোল থাকার জন্য পরিষ্কার রাখা সহজ। প্রত্যেকবার খাওয়ানর পর বোতল বুরুস দিয়া পরিষ্কার করিয়া একটী পাত্রে জল রাখিয়া তাহার মধ্যে ডুবাইয়া রাখিয়া দিতে হয়।

শিশুর নিদ্রা—শিশু সাধারণতঃ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রায় ১৮ ঘণ্টা নিদ্রা যায়। যত বেশী নিদ্রা যায়, ততই ভাল। দিনের বেলা খাওয়াইবার সময় হইলে নিদ্রাভঙ্গ করিয়া খাওয়ান ভাল। কারণ, অভ্যাস ঠিক থাকিবে এবং ভবিষ্যতে ঠিক খাওয়াইবার সময় জাগিবে। রাত্রে না কাঁদিলে জাগাইয়া খাওয়াইবার দরকার নাই।

শিশুর ব্যায়াম—শিশু স্বভাবতঃই যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চালনা করে তাহার অধিক ব্যায়ামের আবশ্যক হয় না। স্বাভাবিক অঙ্গচালনাটুকু যাহাতে হয় তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিলেই যথেষ্ট। মায়ের, ঝিএর বা স্নেহশীল ভাই-বোনেদের কোল অপেক্ষা মা বসুন্ধরার কোলে মানুষ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ইহাতে শিশু সুস্থ, সবল ও শীঘ্রই স্বাবলম্বী হয়।

রৌদ্রালোক—বেশী কোন জিনিষই ভাল নয়। সূর্য্যালোকও না। ছেলেকে শক্ত করবার জন্যে রোদে ভাজা ভাজা করা নিষ্ঠুরতা। সকাল বেলা নয়টা দশটা অবধি রৌদ্রে থাকা ভাল, তাহাও মাথাটা ছাওয়াতে রাখিলে ভাল হয়। শীতপ্রধান দেশে সূর্য্যের মুখ কচিৎ দেখা যায়; কাজেই সেখানে Sun bath একটা ফ্যাসান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখানেও Sun bathএর চেয়ে Sun burnt হওয়াই বেশী সম্ভব।

পোষাক পরিচ্ছদ—অত্যধিক জামাকাপড় পরান শুধু অনাবশ্যকই নয়, স্বাস্থ্য-হানিকর। গ্রীষ্মকালে সুতি কাপড়ের পাতলা জামা—যদি একটু বেশ ঢিলা হয়, যথেষ্ট তাপ সঞ্চয় করে। শীতকালে Flannel বা পশমের ফ্রক লম্বা হাত ও গলা বন্ধ এবং ভিতরে একটী সুতি ফ্রকের বেশী দরকার হয় না। ধনীপুত্রের আচ্ছাদন ভেদ করিয়া রৌদ্র ও বাতাস প্রবেশ করিতে পারে না।

ভবিষ্যতের লক্ষ আশা মোদের মাঝে সন্তরে
ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুদের অন্তরে
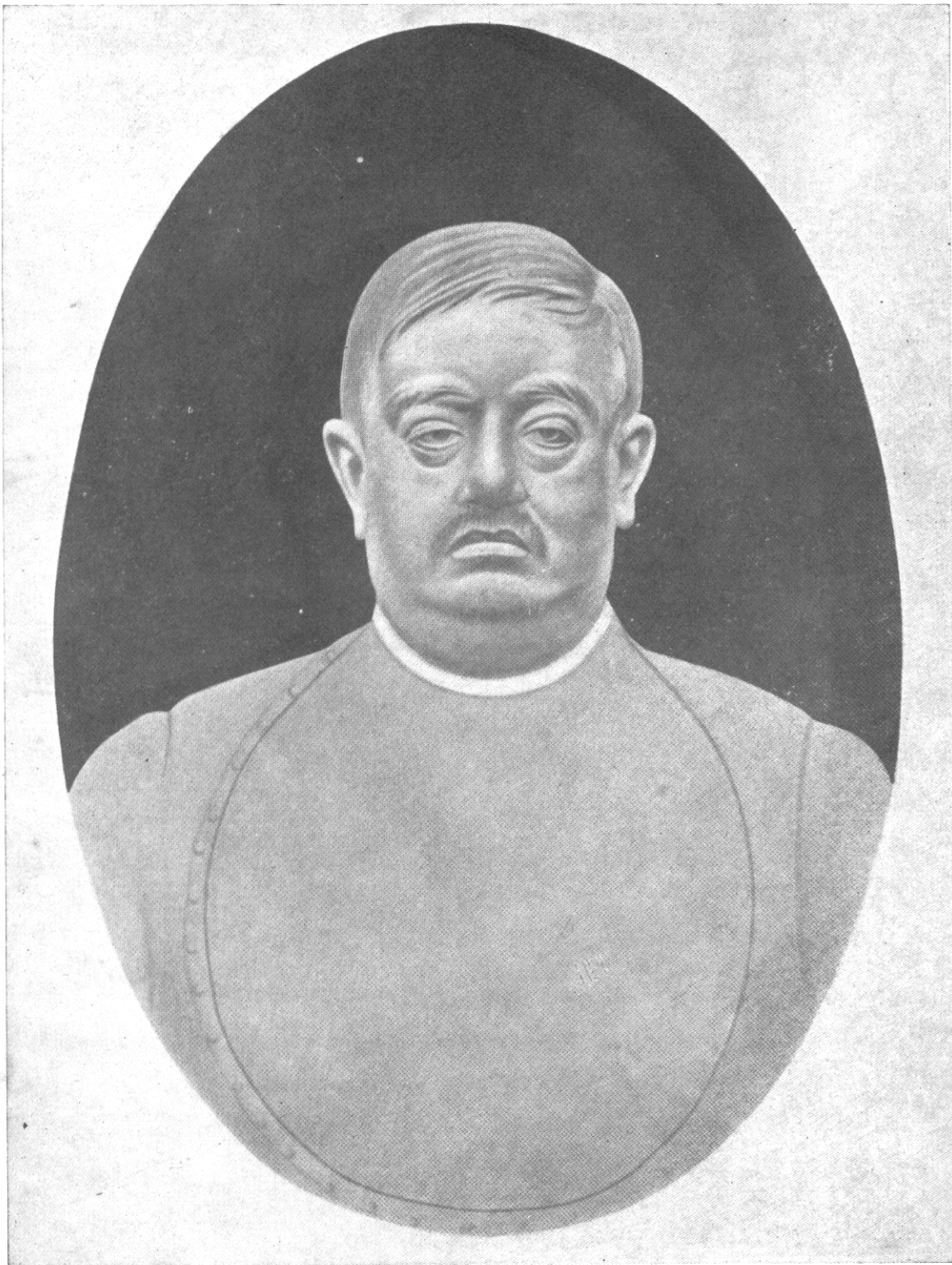
স্বর্গীয় শ্যামাচরণ কুমার।

জন্ম (খিদিরপুর)
ইং ১৮৩৪ সাল।

স্বর্গারোহণ (কলিকাতা)
৫ই ফেব্রুয়ারী ১৮৮৯ সাল।

শ্যামাচরণ কুমার হস্পিটাল

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ কণ্ট্রাক্টর স্বজাতির মুখোজ্জ্বলকারী বদান্যবর শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র কুমার তাঁহার পরলোকগত পিতৃদেব ৺শ্যামাচরণ কুমার মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষা কল্পে হুগলী জেলার অন্তর্গত চণ্ডীতলা থানায় প্রায় এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া একটি হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। জনহিতব্রতে অনুপ্রাণিত হইয়া কোমলপ্রাণ পূর্ণবাবু কেমন করিয়া এই হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিলেন তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি।

চণ্ডীতলা পূর্ণবাবুদের আদি বাসস্থান। এককালে যখন সরস্বতী খরতর বেগবতী ছিল এবং উহার মধ্য দিয়া বড় বড় পোত যাতায়াত করিত, তখন চণ্ডীতলা অতি সমৃদ্ধশালী জনপদ বলিয়া খ্যাত ছিল। এমন কি, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও লোকে চণ্ডীতলাকে একটি ধনজনপূর্ণ স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া মনে করিত। কিন্তু নানাকারণে, বিশেষতঃ সরস্বতী নদী মজিয়া যাওয়াতে, গত ত্রিশ বৎসর হইতে ইহার অবনতি আরম্ভ হইয়াছে এবং স্বাস্থ্যহানি ঘটিয়াছে। তথাপি এখনও চণ্ডীতলা হুগলী জেলার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জনাকীর্ণ স্থান—এই থানায় বর্ত্তমানে ১০১৫৯০ লোকের বাস। এই বিপুল জনাকীর্ণ স্থানের স্বাস্থ্যহীনতায় বিচলিত হইয়া দরিদ্র পল্লীবাসীদের দুঃখ বিমোচনের জন্য দয়ার্দ্রহৃদয় শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র কুমার মহাশয় তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেবের স্মৃতিতে 'শ্যামাচরণ কুমার চ্যারিটেবল্ ডিস্পেন্সারী' স্থাপন করিতে মনস্থ করেন এবং ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী জেলার ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডকে উক্ত কার্য্যের সকল ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য অর্থ দান করেন। তদানীন্তন বাঙ্গালার অন্যতম মন্ত্রী স্বনামধন্য স্বর্গীয় স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে ২৮শে এপ্রিল তারিখে উক্ত ডিস্পেন্সারীর ভিত্তিফলক স্থাপন করিয়া যান। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারী হইতে ডিস্পেন্সারীর চিকিৎসা ও ঔষধ বিতরণ কার্য্য আরম্ভ হয়। কার্য্যারম্ভের দিবস হইতেই প্রত্যহ বহু রোগী এখানে আসিয়া চিকিৎসিত হইতে থাকে। কিন্তু রোগীর সংখ্যা ক্রমশঃ এরূপ বৃদ্ধি পাইতে থাকে যে, কেবল মাত্র ১৯৩২ সালেই ৭৩,৩৫৮ জন রোগী এই ডিস্পেন্সারীতে চিকিৎসিত হয়! রোগীর সংখ্যার এরূপ অপ্রত্যাশিত বৃদ্ধি দেখিয়া এবং হাঁসপাতাল অভাবে সকল রোগের সম্যকরূপে চিকিৎসা করিবার অসুবিধার বিষয় উপলব্ধি করিয়া জনহিতাকাঙ্ক্ষী পূর্ণবাবু পুনরায় বিচলিত হইয়া উঠিলেন। তিনি হুগলী ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের নিকট প্রস্তাব করিলেন যে, উক্ত ডিস্পেন্সারীর বৃদ্ধিকল্পে তিনি উহার সহিত তাঁহার পিতৃদেবের

চিকিৎসাকার্য্যের সাজ-সরঞ্জাম প্রভৃতির জন্য সকল ব্যয়ভার তিনি নিজেই বহন করিবেন। ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড তাঁহার এই অযাচিত দান আনন্দচিত্তে গ্রহণ করেন এবং তাঁহার ইচ্ছানুসারে হাঁসপাতাল স্থাপিত হয়।

বর্ত্তমানে হাঁসপাতালটিতে ২০ জন রোগী থাকিয়া যাহাতে চিকিৎসিত হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কিন্তু ষাটজন রোগীর স্থান সংকুলনের মত আয়োজন আছে;—ভবিষ্যতে সেই পরিমাণে বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। তদ্ব্যতীত যক্ষ্মাচিকিৎসাগার, প্রসবাগার এবং সংক্রামক-ব্যাধির চিকিৎসাগার স্থাপনের চেষ্টা করা হইতেছে। কো-অপারেটিভ এ্যান্টিম্যালেরিয়াল সোসাইটির একটি কেন্দ্র এইস্থানে স্থাপনের ব্যবস্থা করা হইতেছে। বলা বাহুল্য, শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র কুমার মহাশয় এই সোসাইটির সভাপতি এবং ডাক্তার শ্রীযুত গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইহার সম্পাদক।

বাঙ্গালার গভর্ণর কর্ত্তৃক এই হাঁসপাতালের উদ্বোধনকার্য্য সুসম্পন্ন করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। কিন্তু মহামান্য সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের অকস্মাৎ মৃত্যুতে সে ব্যবস্থা পরিত্যক্ত হয়। সেইজন্য বঙ্গের অন্যতম মাননীয় মন্ত্রী স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় কে-টি, গত ২২শে ফেব্রুয়ারী চণ্ডীতলায় আগমন করেন এবং দেশের বহু বরেণ্য ব্যক্তিগণের উপস্থিতিতে পূর্ণবাবুর ভূয়সী প্রশংসা করিয়া এবং তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া হাঁসপাতালের দ্বারোদ্ঘাটন করেন।

বাঙ্গালীর খাদ্য ও অন্ন-সমস্যা

[ক্যাপ্টেন—শ্রীবিনোদবিহারী হাজরা, এম্-বি, সিভিল সার্জ্জেন, নদীয়া]

ভারতীয় খাদ্য পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে—শিখ, পাঞ্জাবী, হিন্দু ও মুসলমানের খাদ্য সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর; ইহা তাহাদের দেহের দৈর্ঘ্য ও স্বাস্থ্য দর্শনে প্রতীয়মান হয়। ভারতীয়দের মধ্যে মাদ্রাজী ও বাঙ্গালীর খাদ্য সর্ব্ব নিকৃষ্ট। ম্যাকারিসন্ ও উইলসন্ পরীক্ষার দ্বারা সাব্যস্ত করিয়াছেন যে, ইন্দুরের শারীরিক বৃদ্ধি বম্বেবাসীর খাদ্যের দ্বারা ৬৫ হইলে মাদ্রাজীর খাদ্যের দ্বারা মাত্র ১৩ হয়। বাঙ্গালী ও মাদ্রাজী খাদ্য পুষ্টি হিসাবে এতই নিকৃষ্ট। আমাদের দেশে দরিদ্রের খাদ্য কার্ব্বহাইড্রেট বা চাউল প্রধান। নাইট্রোজেন সংযুক্ত (মৎস্য, মাংস বা ছানা)

শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র কুমার।

ধনীর খাদ্যে প্রোটীন এবং ঘৃতের বাহুল্য দৃষ্ট হয়—লবণ জাতীয় এবং ভিটামিন অতি সামান্যই থাকে, কেন না, তাঁহারা কলে ছাঁটা শ্বেত তণ্ডুল ও ময়দা খাইতে অভ্যস্ত। অম্ল (চাউল, মৎস্য মাংস ইত্যাদি) এবং ক্ষার জাতীয় পদার্থের (অর্থাৎ ফলমূল ও কাঁচা শাকসব্জী) সামঞ্জস্য থাকে না। ফলতঃ ধনীর বা দরিদ্রের খাদ্য কোন না কোন অংশে হীন। অনেক বৎসর এইরূপ হীন (unbalanced) খাদ্য গ্রহণ করার ফলে ব্যাধি প্রতিষেধক শক্তি কমিয়া যায় এবং পেটের ব্যারাম (Dyspepsia, Gastric ulcer ইত্যাদি) বা রক্তহীনতা মধুমেহ (Diabetes), রিকেটস্ (Rickets) বেরি-বেরি প্রভৃতি ব্যাধিতে সকলে ভুগিয়া থাকে।

সুখের বিষয় বোম্বাই, কুণার, কলিকাতার স্কুল অব্ হাইজীনে খাদ্য এবং পুষ্টি (nutrition) সম্বন্ধে গবেষণা হইতেছে। এই গবেষণার ফল যদি সাধারণে অবগত হয় এবং তদনুসারে কার্য্য করে, তবে বাঙ্গালী অন্য জাতির তুলনায় শারীরিক ও মানসিক বলে পশ্চাৎপদ হইবে না। আমাদের দৈহিক খর্ব্বতা এত অধিক হইয়াছে যে, সামরিক বা পুলিশ বিভাগে কেন, আমরা সিভিল সার্ব্বিস্ বা অন্য কোন কার্য্যের জন্য অনুপযুক্ত বিবেচিত হইব। বোম্বাই শিশু-কল্যাণ ও স্বাস্থ্য সাপ্তাহিক সভা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ;—আমিষ ও নিরামিষ খাদ্য কিরূপে মাসিক ৫৲ ও ৭৲ টাকা ব্যয়ে সম্পন্ন হইতে পারে তাহার তালিকা প্রকাশ করিয়াছে। তন্মধ্যে ৫৲ টাকা ব্যয়ে কেবল মাত্র আমিষ ভোজীর তালিকাটি প্রদত্ত হইল—কেন না অধিকাংশ বাঙ্গলী আমিষ-ভোজী। খাদ্যগুলি বোম্বাই প্রদেশের উপযুক্ত, কিন্তু পরিবর্ত্তন করিয়া আমাদের দেশের খাদ্যানুযায়ী করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

খাদ্য			দৈনিক ওজন
১। চাউল	...	...	২৫ তোলা
টাট্কা কুঁড়া বা চাউলের ভূষি	...	...	২½ ,,
২। গমের আটা	...	...	১৫ ,,
৩। মুসুর, মুগ ইত্যাদি ডাল	...	...	২½ ,,
গোটা ছোলা	...	...	১ ,,
৪। সওয়াবীন (Soyabean)	...	...	২½ ,,
৫। সর্ষপ অথবা নারিকেল তৈল	...	...	২½ ,,
৬। মেষ অথবা ছাগ চর্ব্বি	...	...	২½ ,,
৭। মাঠা তোলা জমাট দুগ্ধ	...	...	১ ,,

	খাদ্য			দৈনিক ওজন
৯।	মাছ, মাংস অথবা ডিম	...	...	৮ তোলা
১০।	গুড়	...	...	২½ ,,
১১।	টম্যাটো, পিঁয়াজ, গাজর আলু	...	...	৭½ ,,
১২।	পালম্ শাক, কপি ইত্যাদি	...	...	১৫ ,,
১৩।	মসলা			
১৪।	লবণ			

মেষ বা ছাগ চর্ব্বি সহজ পাচ্য। কিন্তু যাঁহারা চর্ব্বি পছন্দ করেন না, তাঁহারা মাখন অথবা বিশুদ্ধ ঘৃত ব্যবহার করিতে পারেন। মাখনে ভিটামিন বেশী থাকে, ঘৃতে অল্প। ঘৃতের খরচ একটু বেশী পড়িবে—বলা বাহুল্য। চাউল ঢেঁকি-ছাঁটা এবং আতপ হইলেই ভাল। কলে ছাঁটা চাউলে ভিটামিন প্রভৃতি কম থাকে বলিয়া এবং সহরে অন্য চাউল দুষ্প্রাপ্য সেইজন্য চাউলের সহিত ১/১০ ভাগ টাট্কা কুঁড়া মিশাইয়া লওয়া উচিত। বাট্‌রা লিখিত বাঙ্গালীর উপযোগী একটী খাদ্য তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

প্রাতে ৮টী কলাযুক্ত (অঙ্কুরিত) মুগ বা ছোলা কলাই ১½ ছটাক তৎসঙ্গে একটু গুড় ও আদা ; দুধ এক পোয়া (৵৷০ পোয়া)।

বেলা ১১টার সময়ে—কাঁচা দ্রব্যের ওজন—

ঢেঁকি ছাঁটা চাউল	...	...	৩ ছটাক
ডাল	...	...	১ ,,
বিশুদ্ধ ঘৃত অথবা মাখন	..	...	¾ ,,
খাঁটী সর্ষপের তৈল	...	...	¾ ,,
মৎস্য অথবা ছানা	...	...	১ ,,
খোসা সমেত আলু	...	...	১½ ,,
কাঁচা সব্জী	...	...	১½ ,,
লবণ ইত্যাদি	...	...	¼ ,,
গুড়	...	...	½ ,,
দধি	...	...	৪ ,,

বিকাল ৪টার সময়—চিঁড়া অথবা মুড়ী ১½ ছটাক, অথবা ভাজা ছোলা ১ ছটাক, নারিকেল

সন্ধ্যা ৬টা হইতে ৭টা—দুপুরের ন্যায় ; কেবল মাত্র চাউলের পরিবর্ত্তে আটা—৪ ছটাক।

যাহারা পরিশ্রম করে এইরূপ প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষের জন্য উপরোক্ত তালিকা লিখিত হইল। বালক, স্ত্রীলোক, অথবা যাহারা পরিশ্রম করে না, তাহাদের অপেক্ষাকৃত কম খাদ্যের প্রয়োজন।

নিরামিষ-ভোজী মাংস ও মৎস্যের পরিবর্ত্তে দুগ্ধ অথবা ছানা খাইবেন। কলিকাতা অথবা বোম্বাইয়ের মত সহরে দুগ্ধ মহার্ঘ বলিয়া জমাট দুগ্ধ ও মাখন ব্যবহার করিতে বলা হইয়াছে। কিন্তু গ্রামে অথবা সহরে দুগ্ধের সের তিন আনা অথবা কম, সেখানে জমাট দুগ্ধ, মাখন অথবা ঘৃতের পরিবর্ত্তে টাট্‌কা দুগ্ধ ব্যবহার করাই প্রশস্ত। যাঁহারা ধনী তাঁহারা অধিক দুগ্ধ, ডিম্ব পাতাযুক্ত (Leafy vegetables) সব্জী ব্যবহার করিতে পারেন। দুগ্ধের মূল্য কম হইলে খাদ্যের মূল্য অপেক্ষাকৃত কম পড়িবে। বিলাত, নিউজিল্যাণ্ড, প্রভৃতি দেশে সকল দ্রব্যই মহার্ঘ ; কিন্তু দুগ্ধ এত সস্তা যে, আমাদের দেশে আমদানী হইয়া বিক্রীত হয়। ইহা কি প্রকারে সস্তা তাহা আমাদের দেশবাসীর প্রণিধান যোগ্য। যে সকল গাভী প্রচুর পরিমাণে দুধ দেয় সেই গাভীর এরূপ সাধারণ প্রচলন বাঞ্ছনীয়, যাহাতে দেশে টাকায় অন্ততঃ ৮ সের দুধ পাওয়া যায় এবং লোক পিছু অন্ততঃ অর্দ্ধসের দুধ সরবরাহ হয়। এ বিষয়ে ব্যবসায়ী ও দেশের নেতৃবৃন্দেরা কি দৃষ্টিপাত করিবেন ?

চাউল—সহরে এমন কি গ্রামেও, আজকাল কলের সুপরিষ্কৃত চাউলের যেরূপ বহুল প্রচলন, তাহাতে ঢেঁকি ছাঁটা চাউল সম্পূর্ণরূপে ব্যবহৃত হইবে বলিয়া আশা করা যায় না। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, পরিষ্কৃত চাউলের সহিত অপরিষ্কৃত চাউল এবং কুঁড়া (Rice-polishing) মিশাইয়া লইলেই চলিবে, অথবা তরকারির সহিত পাককরা যাইতে পারে। এই কুঁড়া খুব সস্তা, ৷৷০ আট আনা মণ ; একটু ভাজিয়া লইলে শীঘ্র খারাপ হয় না। পুরাতন তণ্ডুলের ব্যবহার পরিত্যাগ করাই ভাল। বলা বাহুল্য, সিদ্ধ চাউল হইতে আতপ অধিক পুষ্টিকর। অন্ন রন্ধন করিয়া ফেন ফেলিয়া দেওয়া একেবারে বিধেয় নহে। তাহাতে পুষ্টিকর ভিটামিন ও লবণ (Minral salts) অনর্থক নষ্ট হয়। চাউলে সেই পরিমাণ জল দেওয়া উচিত যাহাতে অন্ন সুপরিপক্ক হয়, অথচ অতিরিক্ত ফেন না থাকে। ইহা যে সম্ভবপর তাহা আমি জেলে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি—কয়েদীরা মিষ্ট বলিয়া ঐরূপ ভাত বেশী পছন্দ করে।

আটা—কলের ভাঙ্গা ময়দা এবং আটা ব্যবহার না করাই ভাল। জাঁতায় ভাঙ্গা আটা

সওয়াবীন (Soyabean)—ইহা খুব পুষ্টিকর খাদ্য—নাইট্রোজেন সংযুক্ত ৮০% এবং স্নেহময় পদার্থের ২০% পরিমাণ খুব বেশী। জাপানে খুব ব্যবহৃত হয়। বোম্বাইয়ে মূল্য ১॥০ টাকা মণ। ইহা বিদেশ (মাঞ্চুরিয়া) হইতে আমদানী হয়। বম্বে এবং ইউ-পি প্রদেশে ইহার চাষ হইতেছে। চাহিদা অনুসারে চাষের পরিমাণ বৃদ্ধি হইতে পারে। কিছু ভাজিয়া এবং গুঁড়া করিয়া কফির মত পানীয়রূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

চিনা বাদাম—বেশ পুষ্টিকর খাদ্য। মাদ্রাজ প্রদেশে খুব চাষ হয়। চেষ্টা করিলে আমাদের দেশে চাষ করা যাইতে পারে।

ছাগ চর্ব্বি—ঘৃত ও মাখনের মত পুষ্টিকর, অথচ সস্তা ও সহজ পাচ্য। মাংস ও তরকারীর সহিত ঘৃতের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা উচিত। আবার ঘৃত অপেক্ষা গব্য মাখন অধিক উপকারী। ঘৃত নষ্ট করার জন্য অধিক ভিটামিন নষ্ট হইয়া যায়। ভেজিটেবিল ঘি, বনস্পতি, ইত্যাদি ব্যবহার করা উচিত নহে—ইহাতে ভিটামিন নাই।

সব্‌জী—প্রতিদিন এক আউন্স হইতে দুই আউন্স সব্জী কাঁচা খাওয়া উচিত। ইহাতে অনেক ভিটামিন আছে এবং ক্ষার-প্রধান লবণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বাঁধাকপির কচিপাতা, পালম শাক, টম্যাটো, গাজর ইত্যাদি প্রথমতঃ ঠাণ্ডা জলে তদ্‌পরে গরম জলে ধৌত করা উচিত, অথবা পারম্যান্‌গ্যানেট লোসনে ধুইয়া লইলে কৃমি প্রভৃতি ব্যারাম হইবার সম্ভবনা থাকে না। আস্বাদ মত সামান্য ভিনিগার মিশাইয়া অথবা মশলা এবং দধি সংযোগে খাওয়া যায়।

কতকগুলি সাধারণ নিয়ম—আমাদের শেষ খাবার সন্ধ্যা ৭টার সময়ে খাওয়া উচিত। খালি পেটে শুইলে নিদ্রার এবং হজমের ব্যাঘাত হয় না। বালকদিগকে বিকালে একটী ডিম ও এক কাপ দুধ দেওয়া উচিত। খাদ্য ভাল করিয়া চর্ব্বণ করিয়া তবে গলাধঃকরণ করা উচিত—স্মরণ রাখিতে হইবে পাকস্থলীর দন্ত নাই। ৪০ বৎসর বয়স হইলে, প্রতি সপ্তাহে একদিন উপবাস শরীরের পক্ষে হিতকর। সেদিন ফল ও জল খাইলেই চলিবে। মানুষ উপবাস করিলে মরে না—শুধু জল খাইয়া অনেক দিন বাঁচিয়া থাকিতে পারে। অনেকে হয়ত জানেন, মহাত্মা গান্ধী প্রাতে ১৬ আউন্স দুধ ও ৪টী কমলা লেবু খান, একটার (১টার) সময়ে ১৬ আউন্স দুধ, আপেল, আঙ্গুর ইত্যাদি ফল খান। বিকালে ৫টার সময়ে এক চামচ বাদাম-বাটা, ২০।৩০টা আঙ্গুর, খেজুর, টম্যাটো, জল ইত্যাদি খান। দুধ, ফল, সব্জী খাইয়া

শরীরের উপযোগী খাদ্যের বেশী আহার করা শরীরের পক্ষে বিশেষ অহিতকর। তাহাতে পয়সা ও স্বাস্থ্য দুই-ই নষ্ট হয়।

কোষ্ঠ-কাঠিন্যের জন্য জোলাপ না লওয়াই ভাল। কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করিতে পেটের ব্যায়াম (Abdominal exercise) এবং ছিব্‌ড়াযুক্ত (Cellulose) খাবার, অর্থাৎ কুঁড়া (Bran) শাক সব্জী, ফলমূল, পেঁপে, বেল ইত্যাদি এবং যথেষ্ট জল অর্থাৎ দৈনিক ৩।৪ সের পর্য্যন্ত জল পান করা উচিত। চা পান ও ধূমপান শরীরের পক্ষে অনিষ্টকর—কাজেই পরিত্যাগ করা উচিত।

আমেরিকার বিশেষজ্ঞেরা গবেষণা করিয়া দেখিয়াছেন যে, কেবলমাত্র জীবন ধারণের জন্য লোক প্রতি ১'২ একর জমির প্রয়োজন। আবার একটু ভাল খাবার যাহা অত্যল্প খরচায় সম্ভব (adequate diet at minimum cost) এবং যাহার খরচ মাসিক ৫৲ টাকা, তাহার জন্য লোক প্রতি গড়ে ১'৮ একর জমি প্রয়োজন। বাঙ্গলা দেশের ধান্য জমির হিসাব করিয়া দেখিলে লোক প্রতি ০'৪৫ একর জমি পড়ে; যাহা জীবন ধারণের পক্ষে যথেষ্ট নহে। আমরা বর্ম্মা হইতে প্রতি বৎসর প্রায় তিন কোটী সাঁইত্রিশ লক্ষ মণ চাউল আনাইতে বাধ্য হই।

বৈজ্ঞানিক উপায়ে এবং পতিত জমী চাষ করিয়া হয়তো দেড়গুণ অথবা কিছু বেশী ফসল পাইতে পারি। হিসাব করিলে ইহাও আমাদের উপযুক্ত খাদ্যের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। আমাদের দেশ, বিলাত প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশের মত ধনশালী নহে যে, যথেষ্ট পরিমাণে শস্য আমদানি করিতে পারিব।

বাংলার কর্ষিত ভূমি	২ কোটী ৪০ লক্ষ একর,
তন্মধ্যে বাংলার ধান্য বপনের জন্য	২ কোটী ১৭ লক্ষ একর
বাংলার লোক সংখ্যা	প্রায় ৫ কোটী

গত আদম-সুমারীতে ৩৫ লক্ষ লোক বৃদ্ধি হইয়াছে। আশা করা যায় জনসংখ্যার হার আরও বৃদ্ধি পাইবে।

সার জন মেগো ও কর্ণেল রাসেল ভারতের লোকসংখ্যার বৃদ্ধির হার সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে, এখন হইতে মনোযোগ না দিলে ২০ বৎসর পরে ভারতের উৎপন্ন খাদ্যে ভারতের লোকের জন্য কখনই পর্য্যাপ্ত হইবে না।

শিশুমৃত্যু হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, দরিদ্রের সংসারে যত বেশী শিশু জন্মে, তাহার অধিকাংশই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মাতার ভগ্নস্বাস্থ্য এবং উপযুক্ত পথ্যের অভাবই তাহার প্রধান কারণ। এইজন্য বাংলায় প্রতিদিন ৬৫৩টী শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সুখের বিষয় শিশু-

প্রতি বৎসর সন্তান প্রসব করিয়া প্রসূতির স্বাস্থ্য যে, যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হয় এবং জীবনীশক্তির হ্রাস হয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। প্রতি দম্পতির দুইটী হইতে চারিটীর অধিক সন্তান বাঞ্ছনীয় নহে। যাহাতে মাতৃস্বাস্থ্য বিশেষ ক্ষুণ্ণ হয় না, শিশুমৃত্যুর হার কম হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা এবং দেশের লোকসংখ্যাও বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি পাইবে না ;—এইজন্য প্রতি দম্পতিরই ব্রহ্মচর্য্য সাধনা করা উচিত। যদি ব্রহ্মচর্য্য ব্রত সাধন করা অসম্ভব হয়, তবে উপযুক্ত চিকিৎসকের পরামর্শমত মাতৃজাতির সন্তানধারণ নিয়মিত করা উচিত। বিজ্ঞাপনের মোহে ভুলিয়া অর্থ অপব্যয় করা উচিত নহে। কারণ, ইহা বিপজ্জনক। যে সব জননীর ২।৩টী সন্তান হইয়াছে এবং স্বাস্থ্যের জন্য সন্তানজন্ম নিরোধ করা আবশ্যক, তাঁহারা কলিকাতার আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট স্থিত লেডি ডফরীন হাঁসপাতালে প্রতি শুক্রবার বিকাল ৪॥০টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত উপযুক্ত ব্যবস্থা এবং উপদেশ পাইতে পারেন। সম্প্রতি মেরি ষ্টোপল বাংলাদেশের দরিদ্র পরিবারের উপযোগী পন্থা অর্থাৎ যাহাতে কোন অর্থব্যয় হইবে না, এইরূপ উপায়ের একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন। (ইণ্ডিয়ান মেডিকেল গেজেট্ ১৯৩৬। জানুয়ারী সংখ্যা ৪৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

উপসংহার—এই প্রবন্ধের সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

১। বাঙ্গালীর খাদ্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নহে। দরিদ্রের খাদ্য শ্বেতশর্করা প্রধান। ধনীর খাদ্য নাইট্রোজেন এবং ঘৃতবহুল ;—কাঁচা সব্জী এবং ধাতব লবণের বিশেষ অভাব।

২। পরিষ্কৃত চাউলের সহিত কুঁড়া, জাঁতাভাঙ্গা আটা, সওয়াবীন, চীনাবাদাম, কাঁচা শাক সব্জী ও দুগ্ধ ব্যবহার দ্বারা, খাদ্যের অপূর্ণতা দূর করা যাইতে পারে।

৩। খাদ্য সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয় লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

৪। লোকসংখ্যা অতিবৃদ্ধি হইলে পরে খাদ্যাভাব অবশ্যম্ভাবী।

৫। বারম্বার সন্তান ধারণে মাতৃস্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হয় এবং শিশুর অকালমৃত্যু ঘটে।

৬। ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা সন্তান নিরোধ সম্ভব না হইলে, মাতৃস্বাস্থ্যের জন্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে সন্তানধারণ নিয়মিত করা উচিত।

শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্

২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩৬ খৃঃ চণ্ডীতলায় 'শ্যামাচরণ কুমার হস্পিটাল' উদ্বোধন কালে
মাননীয় মন্ত্রী স্যার বিজয় প্রসাদ সিংহ রায় ও সমবেত বরেণ্য ভদ্রমণ্ডলী।

যক্ষ্মার প্রতিকার কি ?

[ডাঃ শ্রীবঙ্কিমকুমার পাল, বি-এস্‌সি, এম্‌-বি, ডি-টি-এম্ (কলিঃ), এম্‌-আর্‌-সি-পি, (এডিন), টি-ডি-ডি (ওয়েল্‌স্), ভিজিটিং ফিজিসিয়ান্—ন্যাশনাল ইনফার্মারী, অনারারী স্পেশাল টিউবারকুলোসিস্ অফিসার—কার্ম্মাইকেল মেডিক্যাল কলেজ, এডিটর—জার্ণেল অব্ টীউবারকুলোসিস্ এ্যাসোসিয়েশন।]

গত বৎসর সদ্গোপ পত্রিকার স্বাস্থ্য-সংখ্যায় যক্ষ্মা সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিয়াছি। এইবার যক্ষ্মা রোগের 'প্রতিকার কি' সেই বিষয়ে কিছু আলোচনা করিব।

এই পৃথিবীর প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা যক্ষ্মা রোগের বিবরণ পাই। ইহাতে বুঝায় যে, তখনও এই রোগ মানব-সমাজে ছিল। তাহার পর দেখা যাইতেছে যে, এই রোগ ক্রমশঃই সভ্য জাতীর মধ্যে অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছে ও পাইতেছে। কোন্ রোগের প্রতিকার কি, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার পূর্ব্বে যদি আমরা তাহার বৃদ্ধির কারণ সঠিকভাবে নির্ণয় করিতে পারি, তবেই আমরা তাহার গতিরোধের পন্থা বাহির করিতে পারিব এবং যদি আমরা সকলে সেই পন্থা অবলম্বন করি, তবে কালে ঐ রোগকে এই মানবসমাজ হইতে দূরীভূত করিতে সক্ষম হইব।

পুরাকালে যক্ষ্মারোগ মানবসমাজে ছিল, তবে আজকালকার মত বিস্তৃতি লাভ করে নাই। তখন ভিন্ন ভিন্ন জাতির সহিত এত সহজ যোগাযোগের উপায় ছিল না। সাধারণতঃ সকলেরই কিছু কিছু জমিজমা থাকিত ও তাহাদের ভরণপোষণের জন্য স্ব স্ব জমির উৎপন্ন শস্যে এবং নিজ গৃহ বা গ্রামে প্রস্তুত বস্ত্রে তাহাদের সুখে দিন চলিয়া যাইত। আধুনিক কালের ন্যায় বহু জনপূর্ণ নগর খুবই কম ছিল; আর যে সকল নগর ছিল তাহাদের সহিত গ্রামসমূহের আদান প্রদান অতীব বিরল ছিল। দেশ-দেশান্তরে গমনাগমনের সুবিধা ছিল না;—দ্রুত যানবাহনাদির ব্যাপার ত' দূরের কথা! তাহার পর শিল্প-বাণিজ্য এবং একত্র বিরাটভাবে পণ্যোৎপাদনের যুগ আসিল। ফলে বড় বড় কারখানা তৈয়ারী হইল, এবং একস্থানে বহুলোক একত্রিত হইয়া কর্ম্ম ও বসবাস করিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে গমনাগমনের নূতন নূতন পন্থা বাহির হইতে লাগিল। প্রথমে নৌকা হইতে দ্রুতগামী জাহাজ, ক্রমে রেলপথের উন্নতি এবং অবশেষে মটরগাড়ী ও উড়ো জাহাজের আবির্ভাবে আজকাল দূরদেশে যাওয়াও খুবই সহজসাধ্য হইয়াছে। ইহাতে লোকের আদান-প্রদানের যেমন সুবিধা হইয়াছে—ব্যবসা-বাণিজ্য

অনেক স্থান আছে, যেখানকার অধিবাসীরা এই সভ্য জগতের আবর্ত্তনে আসে নাই,—বড় বড় সহরে বাস না করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামে বাস করে,– তাহারা সভ্য জগৎ অপেক্ষা যক্ষ্মার কালান্তক হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছে। আমাদের দেশেও হিমালয়ের পার্ব্বত্য প্রদেশের স্থানসমূহে, বিশেষতঃ, নেপালে গুর্খারা ভিন্ন ভিন্ন উপত্যকায় বাস করে,—তাহাদের মধ্যে যক্ষ্মারোগের সংখ্যা খুবই কম। কিন্তু বিগত যুদ্ধে যখন ঐ সকল গুর্খাজাতীয় সৈন্যগণ উহাদের পার্ব্বত্যপ্রদেশ ছাড়িয়া ভারতবর্ষের বড় বড় ছাউনিতে বসবাস করিতে লাগিল এবং যতই অন্যান্য লোকের সংস্পর্শে আসিতে লাগিল, ততই তাহাদের মধ্যে যক্ষ্মারোগের প্রসার হইতে লাগিল। শুষ্ক কাষ্ঠে অগ্নি লাগাইলে যে প্রকারে উহার প্রসার পায়, সেইপ্রকারে যক্ষ্মারোগ উহাদের মধ্যে বিস্তারলাভ করিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে বহু গুর্খাকে অকালে এই পৃথিবীর কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অপসরণ করিয়াছিল।

দেখা যায়, প্রধানতঃ দরিদ্রদের মধ্যেই যক্ষ্মা বিস্তার লাভ করে। যাহাদের বাসস্থান পরিষ্কার নহে—একটি ঘরে পাঁচজনে মিলিয়া থাকিতে হয়—পুষ্টিকর খাদ্য ক্রয় করিতে পারে না, সাধারণতঃ তাহাদেরই মধ্যে নানাপ্রকার রোগ দেখা দেয় এবং যক্ষ্মা ঐ সকল রোগের মধ্যে সর্ব্ব-প্রথম। ইহাও দেখা গিয়াছে যে, দেশের আর্থিক উন্নতির বা অবনতির সহিত যক্ষ্মার প্রসার কম বা বেশী হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের আর্থিক অবস্থা দিন দিন খারাপ বৈ ভাল হইতেছে না এবং প্রাণধারণ করিবার জন্য পরিশ্রম দিন দিন এত বৃদ্ধি পাইতেছে যে, সামান্য গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য দেহপাত করিতে হইতেছে। অর্দ্ধ অনশনে শরীর অর্দ্ধমৃত অবস্থায় থাকে, তাহার উপর যক্ষ্মার বীজ পড়িলে উহা অঙ্কুরিত হইয়া বৃক্ষে পরিণত হইতে বিলম্ব লাগে না। যাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য প্রতিদিন খাটিতে হয় এবং শরীর অসুস্থ হইলে অর্থাভাবে উপযুক্ত বিশ্রাম করিতে পারে না ও পথ্য পায় না, তাহাদের বাধ্য হইয়া অসুস্থ অবস্থাতেই পরিশ্রম করিতে হয়। ফলে, রোগের বিরাম না হইয়া, অতি অল্প সময়ের মধ্যে বৃদ্ধি পায়। দুর্ভাগ্যক্রমে যক্ষ্মারোগ ধীরে ধীরে এবং অজ্ঞাতসারে শরীরকে এরূপে আক্রমণ করে যে, যদি এ বিষয়ে আগে হইতে সবিশেষ সাবধান ও সজাগ না হওয়া যায়, তবে ইহার প্রথম অবস্থাতে রোগ নির্ণয় করা অতীব কঠিন হয়। কারমাইকেল হাঁসপাতালের যক্ষ্মা বিভাগে যে সকল লোক দেখাইবার জন্য আসে, তাহাদের মধ্যে যাহাদের যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত দেখা যায়, তাহারা অধিকাংশই শেষ অবস্থাতে অথবা যখন রোগটি বেশ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং রোগী আর কার্য্যক্ষম নয়, সেই সময়ে আমার কাছে হাঁসপাতালের শরণাপন্ন হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তখন এই মারাত্মক রোগের হাত হইতে আরোগ্যলাভ করিবার আশা অতিশয় অল্প হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে, এই সকল রোগীরা প্রতি কাশির ও কফের

যক্ষ্মারোগের প্রতিকার করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে ঐ প্রকার যক্ষ্মা বীজাণু উদ্গিরণকারী রোগীদিগকে এমনভাবে রাখিতে হইবে বা তাহাদের শিক্ষা দিতে হইবে যে, তাহারা যেন যেখানে সেখানে কফ ফেলিয়া বীজাণু চারিদিকে ছড়াইয়া না দেয়। যক্ষ্মার বীজাণু ব্যতিরেকে যক্ষ্মা হইতে পারে না। ঐ বীজাণু চারিদিকে যথেচ্ছা যতই প্রক্ষিপ্ত হইবে, ততই এই রোগের বৃদ্ধি পাইবে। আমাদের দেশে, বিশেষ করিয়া বাঙ্গালা দেশে, যক্ষ্মারোগীর, বিশেষতঃ দরিদ্র রোগীদের চিকিৎসা করিবার কোন সুবন্দোবস্ত নাই বলিলেই হয়। ফলে চিকিৎসকেরা রোগ ধরিতে ও রোগের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইলেও, হাঁসপাতালের স্থানাভাবের জন্য তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া অস্বাস্থ্যকর গৃহে ফিরিয়া যাইতে হয়। অবস্থার দুর্ব্বিপাকে, কুসংস্কার এবং অজ্ঞতার জন্য রোগের যে সকল প্রতিকার লওয়া উচিত, তাহা লওয়া হয় না। ফলে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের মত ইহা আমাদের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িতেছে। পূর্ব্বে এই রোগ দরিদ্রের মধ্যে ছিল, কিন্তু আজকাল ইহা মধ্যবিত্ত এমন কি, অবস্থাপন্ন সংসারেও দেখা দিয়াছে।

এই রোগের মূল কারণ প্রধানতঃ দুইটি—বীজাণুপূর্ণ কফ এবং গোদুগ্ধ। গোদুগ্ধ যক্ষ্মা বীজাণুতে দূষিত হইলেও আমাদের দেশে উহা এই রোগ বৃদ্ধির প্রধান কারণ নহে,—যেহেতু আমরা দুগ্ধ ফুটাইয়া পান করি। দুগ্ধ ফুটাইলে বীজাণু নষ্ট হইয়া যায়। আমাদের দেশে এই রোগ-বৃদ্ধির প্রধান কারণ হইতেছে—দূষিত কফ। যদিও পথে-ঘাটে, ট্রেণে-ট্রামে বড় বড় অক্ষরে লেখা থাকে—"থুথু ফেলিও না", কয়জন লোক এই মহান্ উপদেশটি পালন করে! আর কয়জন লোক উপলব্ধি করে যে, যেখানে সেখানে থুথু ফেলার জন্য যক্ষ্মা এবং অন্যান্য সংক্রামক রোগের এত বৃদ্ধি পাইতেছে! প্রত্যেক লোকের যেখানে সেখানে থুথু ফেলার গুরুত্ব বিবেচনা করা উচিত। বিশেষতঃ, যাহারা যক্ষ্মা-রোগগ্রস্ত, তাহারা নির্দ্দিষ্ট পাত্রে রোগ-বীজাণু-নাশক ঔষধ, যথা; লাইসল, কার্ব্বলিক এসিড, ফিনাইল প্রভৃতির কোন একটি রাখিয়া তাহাতে থুথু ফেলে,—অন্য কোন স্থানে যেন ফেলা না হয়। এই সামান্য উপদেশটী সঠিকভাবে পালন করিলেই রোগের বিস্তার যে কতকাংশে কমিয়া যাইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আর যখনই সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় হয়, তখনই যদি যাহারা আপন গৃহে থাকিয়া চিকিৎসা করিতে অপারগ, তাহাদের উপযুক্ত হাঁসপাতালে রাখিয়া চিকিৎসা ও বীজাণুপূর্ণ কফ সকল নষ্ট করিতে পারা যাইত, তবে এই রোগের প্রতিকারের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপায় হইত। উপস্থিত তাহা যখন সম্ভবপর নহে, তখন জনসাধারণ যাহাতে বুঝিতে পারে যে,

অনেক সময়ে, যক্ষ্মারোগীর হাঁচির এবং কথা কহিবার সময় নাসিকা ও মুখ হইতে যে সব জলকণা বাহির হয়, তাহাতেও যক্ষ্মা-বীজাণু থাকে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, রোগীর কথা কহিবার সময় মুখ হইতে এক গজ দূর পর্য্যন্ত বীজাণু আসিতে পারে। অতএব, রোগীর খুব নিকটে আসা, বা বসিয়া তাহার সহিত গল্প করা কাহারও উচিত নয় ;—যে ঘরে রোগী থাকে, সেই ঘরে অন্য কাহারও ঘুমান উচিত নয়। যদি জানা থাকে যে, সম্প্রতি কোন ঘরে যক্ষ্মারোগী কিছুদিন বাস করিয়াছে, তবে সেই ঘর প্রতিষেধক ঔষধ দ্বারা পরিশুদ্ধ করিয়া যেন ব্যবহার করা হয়। এই বিষয়ে Sanitary officer বা চিকিৎসকের পরামর্শ লইয়া কাজ করা যুক্তিযুক্ত।

যাহাতে শরীর ভাল থাকে, সে বিষয়ে সকলেরই চেষ্টা থাকা উচিত। স্বাস্থ্য ভাল থাকিলে রোগ প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা বেশী থাকে। স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে হইলে সাদাসিধা অথচ পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়া বিধেয়,—উপযুক্ত বিশ্রাম করা দরকার,—অধিক রাত্রি জাগরণ এবং কোনও প্রকার নেশার বশীভূত হওয়া উচিত নহে। দাঁতগুলির যত্ন লওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। দাঁতগুলি ও তাহার গোড়া খারাপ হইলে হজমের গোলযোগ হয়। বিনা চিকিৎসায় যদি খারাপ দাঁত ও দাঁতের গোড়া রাখিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া যায় ; ফলে, রোগ-প্রতিরোধের বিশেষতঃ, যক্ষ্মা-প্রতিরোধের ক্ষমতা হ্রাস হইয়া পড়ে। স্বাস্থ্যের পক্ষে, বিশুদ্ধ বায়ু পুষ্টিকর খাদ্যের চেয়ে উপকারী। বিশুদ্ধ বায়ু ব্যতীত আমাদের শরীর সুস্থ ও সবল হইতে পারে না—রক্তও পরিষ্কার হয় না। যে স্থান আবদ্ধ থাকে, সে স্থানে বিশুদ্ধ বায়ু পাওয়া যায় না। জানালা-দরজা দিয়া ঘরে যাহাতে বিশুদ্ধ বায়ু বহিতে পারে, তজ্জন্য ঘরের জানালা খুলিয়া রাখা দরকার,—এমন কি, শয়নকালেও জানালা খুলিয়া রাখা উচিত। যে স্থানে বহু লোকের সমাগম হয়, অথচ দূষিত বায়ু নির্গমনের পথ থাকে না, সেই সকল স্থানে না যাওয়াই ভাল। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য অবশ্য পালনীয়। বাড়ীঘর যথাসাধ্য পরিষ্কার রাখিতে হইবে,—কোন স্থানে যেন ধূলা-ময়লা থাকে না। ঘরের মেঝেয় শুকনা ঝাড়ু দেওয়া অপেক্ষা, ভিজা কাপড় দিয়া মুছিয়া লওয়া অনেক ভাল। ঘরে যাহাতে সূর্য্যালোক প্রবেশ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা বিশেষ প্রয়োজন। দেখা গিয়াছে যে, অন্ধকার আবদ্ধ ঘরে যক্ষ্মার বীজাণু অনেক দিন পর্য্যন্ত সজীব থাকে ; কিন্তু যে ঘরে সূর্য্যের আলো আসে,—মুক্ত বাতাস বহিয়া যায়, সে ঘরে বীজাণুর পক্ষে জীবিত থাকা অসম্ভব হইয়া পড়ে।

শুধু ব্যক্তিগত চেষ্টা করিলে সমুচিত ফল পাওয়া যাইবে না। এই রোগের এত বৃদ্ধি ও প্রসার সমষ্টিগতভাবে থাকিবার জন্যই হইয়াছে ও হইতেছে ; সুতরাং, ইহাকে বিদূরিত করিতে

সচেষ্ট থাকিতে হইবে ; যেমন, রাস্তা-ঘাট পরিষ্কার রাখা—গৃহসকল এমনভাবে তৈয়ারী করা যাহাতে মুক্ত বায়ু ও রৌদ্র অবাধে আসিতে পারে—সহরের বিক্রয়ার্থ খাদ্যদ্রব্য যাহাতে টাট্‌কা ও খাঁটি পাওয়া যায়, তাহার ব্যবস্থা করা—যাহারা খাদ্যদ্রব্য প্রস্তত করে, বা বিক্রয় করে, তাহারা কোন সংক্রামক রোগাক্রান্ত কিনা, তাহা মধ্যে মধ্যে পরীক্ষা করা এবং ঐরূপ রোগগ্রস্ত হইলে আইনবলে তাহাদিগকে কার্য্য হইতে নিরস্ত করা, ইত্যাদি। এই সকল বিষয়ে মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। কলিকাতার জল-বায়ু দিন দিন কি প্রকারে খারাপ হইতেছে, তাহা যাঁহারা কিছুদিন ধরিয়া এই সহরে বসবাস করিতেছেন তাঁহারা সকলেই কিছু না কিছু অনুভব করিতেছেন। এ ক্ষেত্রে এ বিষয়ে আর বেশী কিছু বলিতে চাহি না ; তবে এই মাত্র বলিতে চাহি—এই সহরের নানা অবস্থার জন্য সংক্রামক রোগের বৃদ্ধি পাইতেছে ; সহরের স্বাস্থ্য যাহাতে উন্নত হয়, তাহার জন্য কর্পোরেশন কর্ত্তৃপক্ষের আনুপূর্ব্বিক পর্য্যবেক্ষণ খুবই আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। খাদ্যদ্রব্যের বিশুদ্ধতা বাসগৃহে রৌদ্র ও মুক্ত বাতাসের সুবন্দোবস্ত, এবং পথ-ঘাট প্রভৃতির পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার সুব্যবস্থা করিলেই যে যক্ষ্মার প্রসার কমিবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

যক্ষ্মা নিবারণের একটি প্রকৃষ্ট উপায় হইতেছে যক্ষ্মা-রোগাক্রান্ত পিতামাতার শিশুগণকে পৃথকভাগে রাখা। পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কয়েকজন বৈজ্ঞানিক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, যদি শৈশব অবস্থাতে শিশুদের যক্ষ্মার বীজাণু হইতে রক্ষা করা যায়, তবে তাহাদের ভবিষ্যতে ঐ রোগদ্বারা আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা খুব কম থাকে। দেখা গিয়াছে যে, যক্ষ্মা-রোগাক্রান্ত পিতা বা মাতার নিকট হইতে, সন্তানকে ভূমিষ্ঠ হইবার পরই যদি সরাইয়া অন্য একটি সুস্থ পরিবারের মধ্যে রাখিয়া লালন-পালন করা যায়, তবে ঐ শিশু অন্য সুস্থ পিতামাতার দ্বারা পালিত শিশু অপেক্ষা অসুস্থ হয় না। ফরাসীদেশে গত ২৫ বৎসরে এই প্রকার যক্ষ্মা-রোগাক্রান্ত পিতামাতার ১২৫০০০ শিশুদের পৃথকভাবে লালন-পালন করিয়া দেখান হইয়াছে যে, তাহাদের মধ্যে পরে খুব কম সংখ্যকই যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়,—এমন কি, যে ক্ষেত্রে সাধারণ পিতামাতার পালিত সন্তানগণের ৪টির যক্ষ্মা রোগ হয়, সেইক্ষেত্রে ঐরূপ পৃথকভাবে লালিত-পালিত সন্তানদের একটিমাত্র ঐ রোগাক্রান্ত হয়। ইহার দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, যক্ষ্মারোগ বংশানুক্রমিক রোগ নহে এবং যক্ষ্মারোগাক্রান্ত পিতাপিতার শিশুসন্তানগণকে এই ভীষণ রোগের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে হইলে তাহাদিগকে পৃথকভাবে রাখা দরকার। আমাদের দেশে ভিন্ন ভিন্ন আচার প্রচলন থাকায়, এই প্রণালীটি পরীক্ষা করিয়া দেখিবার উপায় দেখি না। তৎপরে এই

দ্বিতীয় উপায় হইতেছে—কোন প্রকারে যক্ষ্মার বসন্তের ন্যায় এরূপ টিকা (Vaccine) তৈয়ারী করা যে তাহা শরীরের ভিতর প্রবেশ করিলে শরীরের ঐ রোগের রোধশক্তি এত বাড়িয়া যাইবে যে, উহা ঐ রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারিবে। বহু বৈজ্ঞানিক বহুদিন এই বিষয়ে অনেক গবেষণা করিয়াছেন ও করিতেছেন; তাঁহাদের মধ্যে ফরাসীবাসী Calmetteএর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি ১৩ বৎসর যক্ষ্মা-বীজাণু কৃত্রিম উপায়ে জন্মাইয়া এক প্রকার টিকা প্রস্তুত করিয়াছেন—উহার নাম দিয়াছেন B. C. G. Vaccine. তাঁহার মতে সন্তান জন্মাইবার দশ দিনের মধ্যে যদি তাহাকে ঐ B. C. G. Vaccine খাওয়ান হয়, অথবা পরে এক বৎসরের মধ্যে যদি তাহাকে এই টিকা দেওয়া হয়, তবে ভবিষ্যতে এই শিশুর যক্ষ্মারোগ হইবার আশা খুবই কম। ফরাসীদেশে লক্ষ লক্ষ সন্তানকে এইপ্রকার টিকা দেওয়া হইয়াছে ও হইতেছে এবং সমস্ত পৃথিবী এই বৃহৎ পরীক্ষার কি ফল হয়, তাহার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া আছে। B. C. G. Vaccine লইয়া জন্তু-জানোয়ারের উপর যত প্রকারে পরীক্ষা করা হইয়াছে, তাহাতে আশাতীত ফল পাওয়া গিয়াছে। আজকাল ফরাসী দেশ ছাড়াও হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, সুইজারল্যাণ্ড দেশেও আংশিকভাবে এই B. C. G. Vaccine এর পরীক্ষা চলিতেছে। বসন্তের টিকার ন্যায় ইহার সফলতা লাভ করিবার আশা করা যায় না। তবে, যদি ইহাতে আংশিক ফল পাওয়া যায়, তাহা হইলেও যক্ষ্মা প্রশমনের যে একটা নূতন পন্থা পাওয়া যাইবে, যাহার ব্যবহারে ভবিষ্যতে এই রোগীর সংখ্যা কম হইয়া পড়িবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। B. C. G. Vaccine ব্যবহারে এখন অনেকেই ইচ্ছুক নন। আশা করা যায় যে, কালে উহা অপেক্ষা ভাল প্রতিষেধক বা টিকা বাহির হইবে। উপযুক্ত টিকা ব্যবহারে রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার আশা খুব বেশী।

প্রতিকারের তৃতীয় উপায় হইতেছে যে, যক্ষ্মা-প্রতিরোধের একটি সঙ্ঘ করা (Anti-Tuberculosis Association)। উহার দুইটি অংশ থাকিবে; এক অংশের কাজ হইবে—এই রোগের সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি প্রচার করা এবং রোগের যাহাতে প্রসার না হয় সেই সব বিষয়ে লক্ষ্য রাখা; এবং দ্বিতীয় অংশের কাজ হইবে—যাহারা ফুসফুসের অসুখে আক্রান্ত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহাদের মধ্যে যাহারা যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত, তাহাদের সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় করা ও উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা,—যে পরিবারের মধ্যে কাহারও যক্ষ্মা রোগ ছিল বা আছে, সেই পরিবারের সমস্ত অল্প বয়স্ক বালক-বালিকাদের পরীক্ষা করিয়া দেখা যে তাহাদের মধ্যে যক্ষ্মার বীজ প্রবেশ করিয়া অঙ্কুরিত হইয়াছে কি না, এবং হইয়া

রোগাক্রান্ত তাহাদের রোগের উপযোগী হাঁসপাতালে রাখিয়া যাহাতে শীঘ্র রোগমুক্ত হয় তাহার যথোপযুক্ত বন্দোবস্ত করিতে না পারিলে, এই রোগের প্রতিকারের অন্য সব চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। দুর্ভাগ্যক্রমে, যক্ষ্মারোগের চিকিৎসার জন্য আমাদের সমগ্র বাঙ্গালা দেশে মোট মাত্র ২৮৪টী বিছানা ভিন্ন ভিন্ন হাঁসপাতালে আছে,—ইহার মধ্যে যাদবপুর যক্ষ্মা হাঁসপাতালে ১০০টি, কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে ২০।২৪টি, কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজে ১২টি, ন্যাসনাল ইন্‌ফার্মারীতে ৩০টি, জাতীয় আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ে ৫০টি এবং অবশিষ্ট বিছানাগুলি কলিকাতার বাহিরে হাঁসপাতালসমূহে আছে। গত ত্রৈবার্ষিক সরকারী স্বাস্থ্য বিবরণে প্রকাশ যে, সরকারী হাঁসপাতাল সমূহে গত বৎসর ৩৮৬৭২ জন যক্ষ্মারোগী চিকিৎসার্থে উপস্থিত হইয়াছিল। অতএব, বাঙ্গলাদেশে যক্ষ্মা-চিকিৎসার জন্য হাঁসপাতালে আরও যে অনেক অধিক স্থান প্রয়োজন, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। উক্ত সরকারী বিবরণে ইহাও বলা হইয়াছে যে,—"হাঁসপাতালে চিকিৎসার্থী সর্ব্বপ্রকার ক্ষয়রোগীর সংখ্যা প্রতি বৎসর ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। যদি ক্ষয়-রোগীদের জন্য আরও অধিক শয্যা থাকিত, তবে তাহাদের সংখ্যা আরও অধিক বৃদ্ধি পাইত।" সরকারী বিবরণে রোগ বৃদ্ধির প্রতিরোধের কোন পন্থাই উল্লিখিত হয় নাই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, যক্ষ্মারোগ যেমন ধীরে ধীরে শরীরকে আক্রমণ করে, তেমনই উহা সারিতে আরও অধিক সময় লাগে। বহুদিন ধরিয়া উহার চিকিৎসার আবশ্যক, অর্থাৎ উহা ব্যয় সাপেক্ষ। তাহার উপর রোগীকে উপযুক্ত পুষ্টিকর পথ্য দেওয়া আবশ্যক,—বীজাণুযুক্ত থুথু বা কফ হইতে যাহাতে আর রোগের প্রসার না হয়, তাহার সবিশেষ যত্ন লওয়া দরকার। আমাদের এই দরিদ্র দেশে অল্প লোকই এই রোগের উপযুক্ত চিকিৎসার বন্দোবস্ত আপন বাড়ীতে থাকিয়া করিতে পারেন। হাঁসপাতালে রাখিয়া যাহাতে উপযুক্ত চিকিৎসা হয়, তাহার ব্যবস্থা যদি কর্ত্তৃপক্ষগণ এবং ধনবান্ দানশীল ব্যক্তিগণ করিতে পারেন তবেই মঙ্গল। ইহা না হইলে, অচিরে আরও এই রোগের প্রসার বৃদ্ধি পাইবার আশঙ্কা করি।

এই শেষোক্ত পন্থাটি ইংলণ্ড ও আমেরিকা দেশে গত ৩০।৪০ বৎসর ধরিয়া প্রচলিত হইয়াছে। দেখা গিয়াছে যে. এত বৎসর ঐরূপ চেষ্টার ফলে যক্ষ্মারোগ ঐ দুই দেশে ২/৩ অংশ কমিয়া গিয়াছে এবং ভবিষ্যতে আরও কমিবে আশা করা যায়। অনেক বিশেষজ্ঞের মতে, উহা দেশের আর্থিক উন্নতি এবং সাধারণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার (Improvement of General Sanitation) জন্যই সম্ভব হইয়াছে। ইহা আংশিক সত্য হইতে পারে বটে, কিন্তু এই রোগ-প্রতিকারের বহু বৎসর ধরিয়া সম্মিলিত চেষ্টার যে সুফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহা

সম্মিলিত ও আন্তরিক চেষ্টা না হইলে কোন আশাপ্রদ ফল পাওয়া যাইবে না। এ পর্য্যন্ত কর্ত্তৃপক্ষগণ এই রোগের বিষয়ে নিশ্চেষ্টই আছেন; রোগটি যে প্রকার দ্রুত ছড়াইয়া পড়িতেছে, তাহাতে তাঁহাদের শীঘ্রই যাহা হয় কিছু করিতেই হইবে। কিন্তু, কবে তাঁহারা কিছু ব্যবস্থা করিবেন,—সেই আশায় জনসাধারণের চুপ করিয়া বসিয়া থাকা উচিত নয়—কারণ এই রোগটি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে না। এই রোগ সম্বন্ধে সামান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সকলেরই জানা উচিত; যথা—যেখানে সেখানে কফ বা থুথু ফেলা উচিত নয় এবং শরীর যাহাতে ভাল থাকে তাহার বিষয়ে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখা। আর যদি কাহারও এই রোগের সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে, তবে উপযুক্ত চিকিৎসকের দ্বারা শরীর-পরীক্ষা করাইয়া নিঃসন্দেহ হওয়াই কর্ত্তব্য। রোগের প্রথমাবস্থাতেই প্রতিকার, প্রতিরোধ এবং সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভের অনেক উপায় আছে; কিন্তু রোগটি অবহেলায় একবার বাড়িয়া গেলে সত্য সত্যই দুরারোগ্য হইয়া পড়ে। তখন সহস্র চেষ্টা করিলেও আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না।

পরিশেষে, বাঙ্গালাদেশে যক্ষ্মারোগের প্রতিকারের জন্য কি ব্যবস্থা করা হইতেছে, তাহার অতি সামান্য পরিচয় দিতেছি। এখানে একটি বেসরকারী যক্ষ্মাপ্রতিকার সঙ্ঘ আজ ছয় বৎসর হইল গঠিত হইয়াছে। এই অল্প সময়ের মধ্যে কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে ইহার ৫টী কেন্দ্র এবং কলিকাতার বাহিরে ৪টি কেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে। ঐ সকল কেন্দ্রে যে কেহ অভিজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারা শরীর পরীক্ষা করাইতে পারেন এবং যক্ষ্মা বিষয়ে সবিশেষ উপদেশ পাইতে পারেন। সম্প্রতি এই সঙ্ঘের কলিকাতায় একটি Central Clinic অর্থাৎ কেন্দ্রীয় রোগ-পরীক্ষাগার খুলিবার চেষ্টা চলিতেছে; তাহাতে শরীরাভ্যন্তরের আলোকচিত্র (X'ray) লইবার সকল যন্ত্রপাতি ও রোগটির গবেষণা-বিভাগ থাকিবে। বাঙ্গালার সমস্ত জেলায় যাহাতে অন্ততঃ একটি করিয়া এইরূপ রোগ-পরীক্ষাগার স্থাপিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করা এই সঙ্ঘের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু এই সব করিতে বহু অর্থের প্রয়োজন। যতদিন উপযুক্ত পরিমাণে অর্থসংগ্রহ না হয়, ততদিন যেমন আয় হইবে, সেই অনুসারে সঙ্ঘের ব্যয় অর্থাৎ প্রচারকার্য্য বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। এই রোগের প্রতিকারের কার্য্য অতিশয় বৃহৎ ব্যাপার। কতদূর ইহার সফলতা লাভ করা যাইবে, তাহা এখন হইতে বলিতে পারা যায় না। তবে জনসাধারণের যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত যাহাতে যক্ষ্মারোগ আর প্রসার না হয়; তাহাতে জনসাধারণের এবং জাতির মঙ্গল।
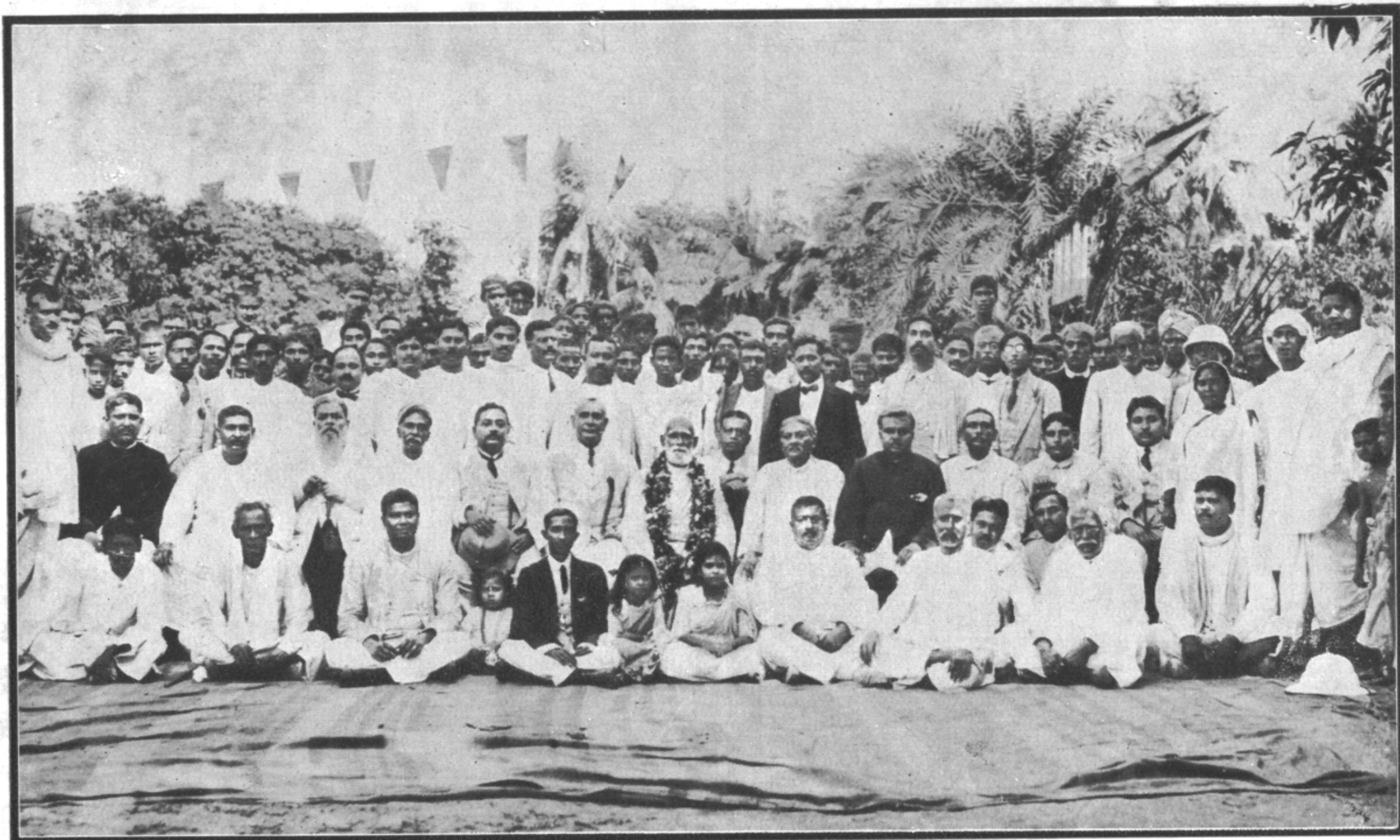
১৯২৩ খৃষ্টাব্দে চণ্ডীতলায় "শ্যামাচরণ কুমার চ্যারিটেব্‌ল্ ডিস্পেন্সারী'র" ভিত্তিফলক স্থাপনকালে মাননীয় মন্ত্রী স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সমবেত বরেণ্য ভদ্রমণ্ডলী।

আকস্মিক দুর্ঘটনার প্রাথমিক প্রতিবিধান

[ডাঃ শ্রীমনোমোহন কুমার, এম্‌-বি]

এক এক সময়ে দৈহিক আপদ-বিপদ এমন অতর্কিতে এসে পড়ে যে, তখনই তার প্রতিবিধান করবার অতি আশু প্রয়োজন হয়,—এমন কি, চিকিৎসক ডাকবার সময়ও পর্য্যন্ত থাকে না। দেহের এই রকম আপদ-বিপদের প্রতিবিধান বা প্রতিবিধান করবার প্রাথমিক সাহায্য দান মানুষ মাত্রেরই জানা দরকার এবং এর জন্যে প্রত্যেক গৃহস্থের কতকগুলি ওষুধ পূর্ব্ব থেকে কিছু কিছু সংগ্রহ করে রাখা উচিত। এই প্রবন্ধে আজ যে ক'টা আকস্মিক দুর্ঘটনার কথা আলোচনা ক'রবো, তার মধ্যে কয়েকটা অতি প্রয়োজনীয় ওষুধের নাম পাবেন; অন্ততঃ সেগুলি পূর্ব্ব থেকে জোগাড় ক'রে রাখবেন।

আকস্মিক দুর্ঘটনার সময়ে অনেকে ভয়ে হতভম্ব হ'য়ে পড়েন,—কেহ কেহ চিৎকার করে সোরগোল বাধিয়ে বসেন; এতে অনেক সময়ে অত্যন্ত খারাপ ফল হয়। রোগের সেবা ক'রতে হ'লে—মন থেকে ভয়, অস্থিরতা ও ঘৃণা একেবারে দূর করা দরকার। সাহস, স্থিরতা ও উদারতা যেখানে যত বেশী, রোগীর সেবা সেখানে তত ভাল হয় এবং রোগেরও তত শীঘ্র উপশম হয়। রোগীর সেবার সময়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে লক্ষ্য রাখা বিশেষ প্রয়োজন।

অগ্নিদাহ

আগুনে বা গরম তেল, জল প্রভৃতিতে কোন অঙ্গ পুড়ে বা ঝলসিয়ে গেলে, নিম্নলিখিত যে কোন একটী ব্যবস্থা অবলম্বন ক'রবেন।

১। কার্ব্বলিক ভ্যাসেলিন (ছোট এক চামচ ভ্যাসেলিনের সঙ্গে ২।৩ ফোঁটা কার্ব্বলিক এসিড মিশ্রিত ক'রে নেবেন) দগ্ধস্থানে প্রলেপ দিলে দগ্ধ স্থান ভাল হয়।

২। দগ্ধস্থানে ভাল ক'রে বোরাসিক পাউডার ছড়িয়ে দেবেন, অথবা এক চামচে বোরাসিক এসিড দুই চামচে ভ্যাসেলিনের সঙ্গে মিশিয়ে দগ্ধস্থানে লেপে দেবেন।

৩। মেথিলেটেড স্পিরিট বা ব্র্যাণ্ডিতে পরিষ্কার ন্যাকড়া ভিজিয়ে দগ্ধস্থানে ২৫।৩০ মিনিট কাল রেখে দেবেন। এতে জ্বালা নিবারিত হবে, ফোস্কা প'ড়বে না। ন্যাকড়া শুকিয়ে গেলে, আবার স্পিরিট বা ব্রাণ্ডিতে ভিজিয়ে নেবেন। কিন্তু লক্ষ্য রাখবেন—স্পিরিট বা ব্রাণ্ডির কাছে আগুন না থাকে, কেন না তাতে আবার আগুন ধ'রতে পারে।

নিম্নলিখিত ওষুধগুলাও ফলপ্রদ ব'লে শুনা যায় :—

(ক) নারিকেল তেল ও চূণের জল একসঙ্গে ফেনিয়ে দগ্ধস্থানে প্রলেপ।

(খ) ঘৃতকুমারীর রস, থোড়ের রস বা কলার এঁটের রসের প্রলেপ।

হঠাৎ বস্ত্রাদিতে আগুন লাগলে, তৎক্ষণাৎ আগুন নেভান দরকার। যার বস্ত্রে আগুন লাগে, সে যেন দৌড়াদৌড়ি না করে ; কেন না, দৌড়াদৌড়িতে বায়ুর বেগ স্বভাবতঃই হয়ে থাকে,—বায়ুর বেগে আগুন আরও জ্বলে ওঠে। কাপড়ের আগুন নেভানর উপায় হচ্ছে,—কাপড় ছিঁড়ে ফেলে বা অন্য কোন প্রকারে কাপড় ছাড়িয়ে দেওয়া। এ যদি সম্ভব না হয়,—তবে লেপ, কাঁথা, কম্বল কিম্বা মোটা কাপড় দিয়ে জড়িয়ে ধরলে আগুন নিভে যায়, অথবা ধূলা-বালি দগ্ধ বস্ত্রে চাপা দিলে আগুন নিভে। তাও যদি না পারা যায়, তবে রোগীকে মাটিতে গড়াগড়ি ক'রতে দেবেন, আগুন নিভে যাবে। তারপর উক্ত ২নং ব্যবস্থা অনুযায়ী কার্য্য করবেন।

মুখ, ঘাড়, পেট, গুহ্যস্থান বা শরীরের অনেকখানি জায়গা পুড়ে গেলে, প্রাথমিক সাহায্য দান করবার পর সুচিকিৎসকের সাহায্য নেবেন ;—যেহেতু, ঐরূপ পোড়াতে আশঙ্কার কারণ থাকে।

বিষপান

বিষ পানের চিকিৎসা বড়ই দুরূহ ; কারণ, বিষের প্রকার ভেদে বিভিন্ন প্রকার চিকিৎসা দরকার হয়। বিশেষতঃ, রোগী যে, কোন্ প্রকার বিষ পান করেছে, তা' স্থির করা সময়ে সময়ে বিজ্ঞ চিকিৎসকের পক্ষেও কঠিন হ'য়ে ওঠে। তথাপি বিষ-পানে প্রাথমিক সাহায্য দান অত্যন্ত আবশ্যক ; সেই উদ্দেশ্যে দু'একটা সাধারণ কথা বলা উচিত মনে করি। যদি জান্‌তে পারেন—রোগী কোনও রকম এ্যাসিড খায় নি,—অন্য প্রকার বিষ খেয়েছে, তা' হ'লে তাকে বমি করাবার চেষ্টা ক'রবেন। আধসের জলে এক ছটাক লবণ মিশ্রিত ক'রে অথবা আধসের জলে আধ ছটাক সরষের গুঁড়া মিশিয়ে পান করালে বমি হয়। প্রয়োজন বোধ ক'রলে এর ওপর গলায় সাবধানে আঙ্গুল দিয়েও বমি করাতে পারেন। কিন্তু আফিম খেলে বমি করান শক্ত। আফিম খেয়েছে জানতে পারলে, আধ তোলা পরিমাণ পার্ম্মাঙ্গানেট অব্ পটাশ দু'সের জলে মিশিয়ে ক্ষণে ক্ষণে পান করিয়ে ১০।১২ মিনিট অন্তর গলায় আঙ্গুল দিলে বমি হতে পারে। রোগীকে অন্ততঃ ২৪ ঘণ্টা কাল ঘুমাতে দিতে নেই ; জাগিয়ে রাখ্‌তে হয়। রোগীকে জাগিয়ে রাখবার জন্যে তার ওপর কোন রকম অত্যাচার করা, যেমন—চড় মারা, চুল ধরে টানা, ছুটাছুটি করান, প্রভৃতি করা না হয়। অনেক শিক্ষিত লোক পর্য্যন্ত এরূপ কার্য্য ক'রে থাকেন, কিন্তু এতে হিতে বিপরীত ফল হতে পারে। রোগীকে জাগিয়ে রাখবার আর উপায় হ'চ্ছে, মধ্যে মধ্যে চোখে মুখে জলের ঝাপটা দেওয়া।

কিন্তু যদি বুঝতে পারা যায় যে, রোগী নাইট্রেক, সালফিউরিক বা কার্বলিক এ্যাসিড খেয়েছে, তবে তাকে বমি করাবার চেষ্টা ক'রবেন না। নাইট্রেক বা সালফিউরিক এসিড খেলে, জলে খড়ি, সাবান, বা কাপড় কাচবার সোডা মিশিয়ে খেতে দেবেন, অথবা পটাসিয়াম কার্বনেট বা ১১/২ তোলা পরিমিত ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট প্রচুর পরিমাণে জলে মিশ্রিত করে খেতে দেবেন। তারপরে আধ পোয়া অলিভ অয়েল আধ সের জলে মিশিয়ে, অথবা ৪।৫ টি ডিমের শ্বেতাংশ দুধের সঙ্গে মিশিয়ে খেতে দেবেন। কার্বলিক এসিড খেলে, প্রথমেই আধ পোয়া অলিভ অয়েল আধ সের জলে মিশিয়ে, বা ৪।৫ টা ডিমের শ্বেতাংশ জলের সঙ্গে মিশিয়ে, অথবা কেবল দুধ পান করাবেন; কিম্বা, সোডিয়াম বা ম্যাগনেসিয়াম সালফেট ২ তোলা পরিমাণ জলে মিশিয়ে পান ক'রতে দেবেন। শরীর ঠাণ্ডা হ'তে আরম্ভ হ'লে গরম জলের বোতল দিয়ে পায়ে সেক দেবেন।

বিষ পানের রোগীর জন্য সুচিকিৎসকের সত্বর সাহায্য নেওয়া উচিত। প্রাথমিক সাহায্য করবার সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসককে ডেকে পাঠাবেন। বিষ খাওয়ার সংবাদ পুলিশকে জানান অবশ্য কর্ত্তব্য।

সর্পাঘাত

সর্পাঘাতের অব্যর্থ ওষুধ এখনও বেরোয় নি। তবুও সাপের কামড়ে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা অনুযায়ী কাজ করলে অনেক পরিমাণে সুফল পাওয়া যেতে পারে। সাপে কামড়ালে বিষ যাতে ওপরের দিকে উঠতে না পারে, তার ব্যবস্থা করা সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য। সেইজন্য রুমাল বা ন্যাকড়া পাকিয়ে দষ্টস্থানের চার আঙ্গুল ওপরে শক্ত করে তাগা বেঁধে দিতে হয়। প্রথম তাগার ৫।৬ আঙ্গুল অন্তর আরও দু'একটি তাগা বাঁধলে ভাল হয়। তারপর দষ্টস্থান ছুরি, পরিষ্কার নরুণ, অথবা অন্য কোন ধারাল অস্ত্র দিয়ে চিরে দূষিত রক্ত বার ক'রে ফেলবেন। এর সঙ্গে ঐ জায়গায় গরম জল ঢালবেন—তা'তে সহজেই অনেকখানি রক্ত বেরিয়ে যাবে। এর পর ঐ চেরা জায়গায় পার্ম্যাঙ্গানেট অব্ পটাশের গুঁড়া ভাল ক'রে মাখিয়ে দিলে বিষ নষ্ট হ'য়ে যায়। সাপের কামড়ের ঠিক পর থেকেই এই রকম চিকিৎসা ক'রতে পারলে বিষ অব্যর্থ নষ্ট হ'তে পারে।

বিছার কামড়

কাঁকড়া বিছা বা অপর বিছা কামড়ালে, দষ্টস্থান ছুঁচ দিয়ে গভীর ক্ষত ক'রতে হয়; তারপর পার্ম্যাঙ্গানেট অব্ পটাশ ছড়িয়ে দিলে অথবা তুলা ক'রে সামান্য মাত্র কার্ব্বলিক অ্যাসিড প্রলেপ

শুনা যায় নিম্নলিখিত প্রক্রিয়াগুলিও ফলপ্রদ :—

(ক) একটুকরা ফট্‌কিরী চিম্‌টে দিয়ে প্রদীপের শীষে ধ'রলে যখন গলে উঠবে, তখন ঐ গলিত ফট্‌কিরী দষ্টস্থানে বার বার ছ্যাঁকা দিলে সকল জ্বালা দূর হয় এবং বিষ নষ্ট হয়।

(খ) গাঁদাপাতার রস অথবা কচি পেঁয়াজের রস লাগালে উপকার পাওয়া যায়।

(গ) বকুল বীজ অভাবে বকুল ছাল জল দিয়ে চন্দনের মত ঘসে দষ্টস্থানে লাগালে, বিষ নষ্ট হয় এবং জ্বালার উপশম হয়।

পেরেক বা কাঁটা বেঁধা

সামান্য কাঁটা বা পেরেক বিঁধ্‌লে, সাধারণতঃ লোকে তা' গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না। কিন্তু এই অগ্রাহ্য বা অবহেলার ফল ভবিষ্যতে যে কত ভীষণ হ'তে পারে, তা' কেহ প্রথমে ভেবে দেখে না। এর দ্বারা ঘা, বা শোষ হ'তে পারে, এমন কি, এর বিষে পরিণামে ধনুষ্টঙ্কার রোগ পর্য্যন্ত হয়। অথচ, সময় মত সামান্যমাত্র ওষুধ দিলে এত ভয় থাকে না। পেরেক বা কাঁটা ফুটলে, ধীরে ধীরে তা' বার ক'রে ফেলবেন ; তারপর ক্ষতস্থানে ভাল ক'রে টিংচার অব্‌ আওডিনে পরিষ্কার তূলা বা ন্যাকড়া ভিজিয়ে প্রলেপ দিবেন।

কিন্তু বঁড়শী বিঁধলে, যেদিক দিয়ে বিঁধেছে ঠিক সেই দিকেই টেনে বার ক'রবেন না ;—তা' হ'লে বঁড়শীর ফলাতে (arrow) ভেতরের শিরা ছিঁড়ে বা কেটে যাবে। বঁড়শীর যে দিকে সূতা বাঁধা থাকে, সেই দিকটা সূতা খুলে ঠেলে দেবেন,—তা' হলে ফলাটা একটু পাশ দিয়ে বেরিয়ে পড়বে। তখন সাবধানে ফলাটা ধরে টান দিলে, বঁড়শীটি বেরিয়ে আসবে। তারপর বোরিক এ্যাসিড গরম জলে মিশিয়ে তা'তে পরিষ্কার তূলা বা ন্যাকড়া ভিজিয়ে ক্ষতস্থানে বেঁধে দেবেন। রোগী আরাম পাবে—ক্ষতও ভাল হবে।

* * * *

আকস্মিক দুর্ঘটনার নানা বিষয় এখনও অনেক বলবার আছে ; কিন্তু আমাদের পত্রিকার ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে একেবারে সব কথা পরিষ্কার ক'রে বলা সম্ভব নয়। আজ এই পর্য্যন্ত ব'ললাম ; সুবিধা পেলে বারান্তরে অপর বিষয়গুলো আপনাদের জানাব।

আমাদের কথা

ভারতগৌরব বিজ্ঞানাচার্য্য স্বর্গীয় ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়ের পুণ্যস্মৃতিতে আমাদের পত্রিকার স্বাস্থ্যসংখ্যা প্রকাশ করিতে যাইয়া, তিনি যাঁহার সমসাময়িক ছিলেন,—যাঁহার সংস্পর্শে তাঁহাকে বহুবার আসিতে হইয়াছিল ও যাঁহার অলৌকিক শক্তিতে তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন—যাঁহার গুণগান আজ জগতের শ্রেষ্ঠ মনীষিগণের মুখে ধ্বনিত ও দিগ্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত,—সেই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবকে আমরা স্মরণ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। ভারতের প্রজ্ঞানই ভারতের প্রাণশক্তি। এই প্রজ্ঞান কেবলমাত্র ভারতের ধর্ম্মে ও দর্শনশাস্ত্রে নহে,—তাহার সঙ্গীতে, কাব্যে, শিল্পে, সাহিত্যে, শিক্ষায়, দীক্ষায়, সমাজে, সভ্যতায়, সর্ব্বত্রই রূপায়িত ও লীলায়িত। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাপারেই কেবলমাত্র বিপ্লব নয়,—সমস্ত বিষয়ে একটা জড়ত্বপূর্ণ জটিলতা আসিয়া তাহার সহজ-সরল জীবনকে পঙ্গুপ্রায় করিয়া তুলিয়াছিল। এই শোচনীয় অবস্থাতেই পাশ্চাত্য জড়বাদের সভ্যতা আসিয়া তাহার মহা-সঙ্কটকাল উপস্থিত করিল,—ভারতের প্রাণশক্তি ক্ষীণপ্রভ হইয়া পড়িল। এই সঙ্কটকালের ঘোর তমিস্রা তিরোহিত করিয়া ভারতের অন্তরাত্মাকে প্রবুদ্ধ করিবার নিমিত্ত, প্রভাতের তরুণ অরুণের মত দীপ্ত ও দৃপ্ত তেজে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব আবির্ভূত হইলেন। যাহা অবলম্বন করিতে পারিলে, মানুষ রোগ, শোক, পরিতাপ, বন্ধন, ব্যসন হইতে মুক্ত হয়, তিনি তাহা লাভ করিবার পথ দেখাইয়া দিলেন। সকল বিরুদ্ধ মত ও পথের সমন্বয় করিবার জন্য তিনি শাক্ত, বৈষ্ণব, ইস্‌লাম, খৃষ্টীয় প্রথায় সাধনার দ্বারা সকল মত ও পথের চরম পরিণতি যে মহাসত্য তাহাই তিনি গোচরীভূত করিলেন। তাঁহারই প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগোর ধর্ম্মমহাসভায়, যেখানে জগতে সকল ধর্ম্মের প্রতিনিধিবর্গ অপর ধর্ম্মের তুলনায় স্ব স্ব ধর্ম্মকে নিজেই প্রধান বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিলেন, সেইখানে সকল ধর্ম্মকে প্রাধান্য প্রদান করিয়া ও শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করিয়া ইহাই প্রমাণ করিয়া বসিলেন—যাহা মানুষ কোনও প্রকারে এড়াইতে পারে না—যাহা প্রবহমানকাল ধরিয়া লোকে অন্তরের অন্তরতম স্থলে পূজা করিয়া আসিতেছে,—যাহা সর্ব্বধর্ম্মধারী,—যাহা শাশ্বত, সেই মহাসত্যই ভারতের সনাতন হিন্দু ধর্ম্ম। বর্ত্তমান যুগ রামকৃষ্ণের যুগ। তিনিই এ যুগের যুগাবতার। তিনিই স্বয়ং আব্রহ্ম পরিব্যাপ্ত মূর্ত্ত সত্য। আমরা তাঁহার শ্রীচরণে প্রণাম করি।

* * * *

এই স্বাস্থ্য সংখ্যায় যাঁহারা প্রবন্ধ লিখিয়া আমাদের পত্রিকার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই স্বনামখ্যাত সুচিকিৎসক। কর্ম্মাধিক্যবশতঃ নিজেদেরই সকল কর্ম্ম সম্যকরূপে সম্পন্ন করিতে যথেষ্ট সময় তাঁহারা পান না ;—তথাপি স্বজাতীয় যুবকগণের সাধু প্রচেষ্টাকে সাফল্য-মণ্ডিত করিবার নিমিত্ত তাঁহারা বিশেষরূপ কষ্ট ও ক্ষতি স্বীকার করিয়া তাঁহাদের সুচিন্তিত ও মূল্যবান প্রবন্ধ লিখিয়া দিয়াছেন। পরন্তু এই সংখ্যার সাফল্য ও গৌরব তাঁহাদেরই সাহচর্য্যের ফল ; এজন্য তাঁহাদিগকে আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। আশা করি ভবিষ্যতেও তাঁহারা আমাদের কার্য্যে এইপ্রকার সাহচর্য্য দানে আমাদিগকে উৎসাহিত ও বাধিত করিবেন।

শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র কুমার মহাশয় তাঁহার পরলোকগত পিতৃদেবের পুণ্যস্মৃতিতে চণ্ডীতলায় হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিয়া, তাঁহার বিরাট দানের যে পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার জন্য আমরা তাঁহাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতেছি। পূর্ণচন্দ্রবাবু কেবলমাত্র ব্যবসায়ী হিসাবে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি নহেন, নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে নিজেকে সংশ্লিষ্ট রাখিয়া, সেবাব্রতে অপর লোকদিগকে উৎসাহিত করিয়া ও বহু অর্থ দান করিয়া তিনি সাধারণের সম্মানভাজন হইয়াছেন। তাঁহার এইপ্রকার মহানুভবতার জন্য আমরাও গৌরব অনুভব করি। বস্তুতঃ, প্রত্যেক সমাজের ধনিগণ যদি এইরূপ পরহিতজনক কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তবে দেশের ত' মঙ্গল হয়ই, অধিকন্তু তাঁহাদের স্ব-সমাজও উন্নত হইয়া পড়ে। পূর্ণচন্দ্রবাবু এই প্রকারে দেশের ও দশের সেবা করিয়া এবং সাধারণের সম্মান ও শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়া দীর্ঘজীবন লাভ করুন—ইহাই শ্রীভগবানের নিকট আমাদের আন্তরিক কামনা।

* * * *

বর্ত্তমানে বাঙ্গালাদেশের স্বাস্থ্যের যে শোচনীয় অবস্থা, তাহা চিন্তা করিতে যাইলে হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়। বিভিন্নপ্রকারের ব্যাধির বিরাম নাই—বাড়িয়াই চলিয়াছে; অথচ, তাহার প্রতিকারের চেষ্টা অতি সামান্যই হইয়াছে ও হইতেছে। শ্যামাচরণ কুমার হস্পিটাল উদ্বোধন-কালে, বাঙ্গালার অন্যতম মাননীয় মন্ত্রী স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহরায় কে-টি মহাশয় হিসাব দেখাইয়াছিলেন যে, ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র বাঙ্গালাদেশে ৮৫,৬০৮ জন রোগী হাসপাতালে থাকিয়া চিকিৎসিত হইয়াছিল। কিন্তু বাঙ্গালাদেশে ৮৫ হাজারের অধিক গ্রাম আছে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, কোনও প্রকারে প্রতি গ্রাম পিছু একজন মাত্র রোগী হাসপাতালে থাকিয়া চিকিৎসিত হইতে পারে। অবস্থা যখন এইরূপ ভীষণ, তখন স্বাস্থ্যোন্নতি বিষয়ে জনসাধারণের বিশেষরূপে অবহিত হওয়া ব্যতীত গত্যন্তর নাই। দেশ হইতে বিবিধ ব্যাধির প্রকোপ প্রশমন করিতে হইলে, সকলের সমবেত চেষ্টা একান্ত আবশ্যক; স্বতন্ত্রভাবে কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় চেষ্টা করিলে বিশেষ ফল হইবে না, এ বিষয়ে সকলকে একযোগে কার্য্য করিতে হইবে। আমরা অর্থাৎ সদ্গোপ যুবক সঙ্ঘের সভ্যগণ স্ব-সমাজের সেবাব্রত গ্রহণ করিয়াছি। সেবাব্রতে স্বাস্থ্যতত্ত্বের প্রচার একটি অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য;—সেই কর্ত্তব্যবোধেই আমাদের এই স্বাস্থ্যসংখ্যা প্রকাশের আয়োজন। কিন্তু এ কথা আমরা ভাল করিয়াই জানি যে, স্বাস্থ্যোন্নতি করিতে হইলে ব্যক্তিগত বা সম্প্রদায়গত চেষ্টায় বিশেষ ফল হইবে না। সুতরাং আমাদের পাঠক-পাঠিকাগণ যদি এই পত্রিকা অপর সম্প্রদায়ের লোকদিগকেও পড়িতে দেন এবং এইশ্রেণীর পুস্তকাদি তাঁহাদের নিকট হইতে লইয়া পড়িতে পারেন এবং সকলে সমবেতভাবে স্বাস্থ্য-তত্ত্বের বিষয় অবগত হইয়া বিধিমত কার্য্য করেন, তাহা হইলে আমাদের শ্রম ও উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে মনে করিব। সকলকেই স্মরণ করিতে অনুরোধ করি যে,—ব্যাধি কখনও ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিচার করিয়া কাহাকেও আক্রমণ করে না।

সদ্গোপ পাত্র-পাত্রী.

পাত্র চাই—মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত কাঁদীর দুইটী সুন্দরী সুশিক্ষিতা সদ্‌গুণ-সম্পন্না স্বাস্থ্যবতী পাত্রীর জন্য সুশিক্ষিত অবস্থাপন্ন দুইটি পাত্র আবশ্যক। গুণবিশেষে যৌতুকাদি দেওয়া হইবে। কুল সম্বন্ধে কোন বাধ্য-বাধকতা নাই। বক্স নং ১ সদ্গোপ পত্রিকা।

পাত্রী চাই—মাসিক ২০০৲ টাকা উপার্জ্জনশীল ৩০।৩৫ বৎসর বয়স্ক বিপত্নিক পাত্রের জন্য একটী সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী বয়স্থা পাত্রী চাই। পাত্রের পূর্ব্ব-পত্নীর গর্ভজাত যথাক্রমে ৮ বৎসর ও ৫ বৎসর বয়স্কের দুইটী পুত্রকন্যা আছে। যৌতুকাদি নাই। বক্স নং ২ সদ্গোপ পত্রিকা।

পাত্র চাই—একটী চতুর্দ্দশবর্ষীয়া স্বাস্থ্যবতী শ্যামবর্ণা বাঙ্গলা লেখাপড়ায় অভিজ্ঞা গৃহকর্ম্মে নিপুণা পূর্ব্বকুল মৌদ্‌গোল্য গোত্র পাত্রীর জন্য একটী শিক্ষিত ব্যবসায়ী স্বাস্থ্যবান্ পাত্র চাই। যৌতুক ২০০০৲ টাকা। বক্স নং ৩ সদ্গোপ পত্রিকা।

পাত্র চাই—একটী ১৪।১৫ বৎসর বয়স্কা সুন্দরী শিক্ষিতা স্বাস্থ্যবতী পাত্রীর জন্য একটী সুশিক্ষিত সুদর্শন অর্থবান্ পশ্চিমকুল কুলীন পাত্র চাই। পাত্রী মৌদ্‌গোল্য গোত্র—একমাত্র কন্যা। বক্স নং ৪ সদ্গোপ পত্রিকা।

পাত্র চাই—একটী সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী ১৪।১৫ বয়স্কা পাত্রীর জন্য একটী সুদর্শন সুশিক্ষিত ও সম্পত্তিশালী পাত্র চাই। যৌতুক ৪০০০৲ হাজার হইতে ৫০০০৲ হাজার টাকা। বক্স নং ৫ সদ্গোপ পত্রিকা।

পাত্রী চাই—একটী গ্রাজুয়েট শিলং প্রদেশের ব্যবসায়ী সুদর্শন ভাল্‌কো কুলীন বংশের পাত্রের জন্য একটী ১৭।১৮ বৎসর বয়স্কা সুন্দরী শিক্ষিতা ভাল্‌কো ঘর ব্যতীত পাত্রী চাই। কুলীন না হইলেও চলিবে। যৌতুকাদি কিছুই নাই। বক্স নং ৮ সদ্গোপ পত্রিকা।

সদ্গোপ পাত্র-পাত্রী

পাত্রী চাই—একটী ২২।২৩ বৎসর বয়স্ক সুদর্শন স্বাস্থ্যবান শিক্ষিত পাত্রের জন্য একটী সুন্দরী দরিদ্র গৃহের পাত্রী চাই। পাত্র সাঁওতাল পরগণায় একটী পাথর কাটাই ফার্ম্মের ম্যানেজার। কন্যাটী সেই স্থানেই থাকিবে। পাত্রী মেদিনীপুর, বাঁকুড়া বা বীরভূম স্থানীয়া হওয়া চাই। যৌতুক নাই। বক্স নং ৯ সদ্গোপ পত্রিকা।

পাত্রী চাই—ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারীং স্কুলের শেষ পরীক্ষোত্তীর্ণ মেদিনীপুর ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের অধীনস্থ কর্ম্মচারী একটী স্বাস্থ্যবান্ সুদর্শন যুবকের জন্য একটী সুন্দরী গৃহকর্ম্মে নিপুণা পাত্রী আবশ্যক। বক্স নং ১০ সদ্গোপ পত্রিকা।

পাত্রী চাই—একটি স্বাস্থ্যবান্ সুশ্রী শিক্ষিত, বিশিষ্ট ইঞ্জিনীয়ারের পুত্র, রেডিও ব্যবসায়ী ২২।২৩ বৎসরের যুবকের জন্য একটি স্বাস্থ্যবতী সুন্দরী শিক্ষিতা পাত্রী আবশ্যক। বক্স নং ১১ সদ্গোপ পত্রিকা।

পাত্র চাই—একটি ১৪ বৎসর বয়স্কা উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা স্বাস্থ্যবতী পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রীর জন্য ২২।২৩ বৎসর বয়স্ক উপার্জ্জনক্ষম পাত্রের আবশ্যক। কুল সম্বন্ধে কোন বাধ্যবাধকতা নাই। সম্ভবমত যৌতুক দেওয়া হইবে। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ শূর, ফটকবাজার, খরিদা, পোঃ খড়্গপুর, জেলা মেদিনীপুর।

পাত্র চাই—একটি নিয়োগী, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, গৃহকর্ম্মে ও শিল্পে সুনিপুণা স্বাস্থ্যবতী ১৬ বৎসর বয়স্কা পাত্রীর জন্য ২৫।২৬ বৎসর বয়সের গ্রাজুয়েট বা আণ্ডার গ্রাজুয়েট, উপার্জ্জনক্ষম স্বাস্থ্যবান পাত্রের আবশ্যক। উপযুক্ত যৌতুক দেওয়া হইবে। বক্স নং ১২ সদ্গোপ পত্রিকা।

পাত্রী চাই—বি-এ ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র, ২০।২১ বৎসরের স্বাস্থ্যবান্ পাত্রের জন্য একটি সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী, শিক্ষিতা, সূচীশিল্পে সুনিপুণা, ধনশালী গৃহের পাত্রী আবশ্যক। পাত্রের পিতা ২৫০৲ বেতনে গভর্ণমেণ্ট চাকরী করেন এবং হুগলী ও মেদিনীপুর জেলায় তাঁহার বিষয়-সম্পত্তি আছে। বক্স নং ১৩ সদ্গোপ পত্রিকা।

নিয়মাবলী

১। সমস্ত টাকা কড়ি যুবকসঙ্ঘের ধনাধ্যক্ষের নামে ১৩।১, হ্যারল্ড লেন, কলিকাতা এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

২। রাজনৈতিক কোন প্রবন্ধ পত্রিকাতে আলোচিত হয় না।

৩। লেখক-লেখিকাগণের মতামত পত্রিকা সম্পাদক বা সদ্গোপ যুবকসঙ্ঘের মতামত নহে।

৪। লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।

৫। প্রবন্ধ কাগজের একপৃষ্ঠে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া পত্রিকা-সম্পাদকের নামে ৩৪ নং ইণ্ডিয়ান মিরার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। ডাকমাশুল না পাঠাইলে অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরত দেওয়া হয় না। প্রবন্ধ পাঠাইবার সময় আপত্তি না জানাইলে পত্রিকা পরিচালক মণ্ডলী প্রবন্ধের যে কোন অংশ পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন করিতে পারিবেন।

৬। যুবক-সঙ্ঘ ও তাহার পত্রিকা সম্বন্ধীয় যাবতীয় সংবাদ যুবক-সঙ্ঘ অফিস ৩৪ নং ইণ্ডিয়ান মিরার ষ্ট্রীটে জ্ঞাতব্য। সন্ধ্যা ৮টা হইতে ৯॥০টা পর্য্যন্ত অফিস খোলা থাকে।

৭। বিজ্ঞাপনের হার সাধারণ এক পৃষ্ঠা মাসিক ৮৲, আধ পৃষ্ঠা ৪॥০, সিকি পৃষ্ঠা ২॥০, সূচীর নীম্নে আধ পৃষ্ঠা ৬৲, সিকি পৃষ্ঠা ৩॥০। বিশেষ বিশেষ স্থানে বিজ্ঞাপনের মূল্য প্রকাশকের নিকট জ্ঞাতব্য।

সদ্গোপ পাত্র-পাত্রীর

বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী

(১) সদ্গোপ পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপন বিনামূল্যে প্রকাশ করা হইবে। কেবলমাত্র পত্রিকার গ্রাহক-গ্রাহিকাগণই এই সুবিধা পাইবেন। কিন্তু স্থানাভাব বা অন্য কোন কারণ বশতঃ এই বিষয়ে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশ না করিবার ক্ষমতা সদ্গোপ যুবক সঙ্ঘের কর্ত্তৃত্বাধীন। (২) বিজ্ঞাপন-গুলি স্পষ্টাক্ষরে ও সংক্ষিপ্ত হওয়া আবশ্যক। উহা যেন এই পত্রিকার ৩ লাইনের অধিক না হয়। (৩) বিজ্ঞাপনে বিবৃত বিবরণের জন্য আমরা দায়ী নহি। পাত্র-পাত্রীর সম্বন্ধ নির্ণয়কারিগণ সমস্ত বিষয় তাঁহারা নিজেদের দায়িত্বে করিবেন। (৪) যাঁহারা নিজেদের নাম প্রকাশ না করিয়া বক্স নম্বর দিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা যদি আমাদের কার্য্যালয় হইতে পত্রাদি লইয়া না যান, তবে উহা প্রেরণের জন্য তাঁহাদিগকে আমাদের নিকট উপযুক্ত (অন্ততঃ আট আনার) ডাকটিকেট রাখিতে হইবে।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ নিয়োগী কর্ত্তৃক দি নিউ ইণ্ডিয়ান প্রেস—৬, ডাফ ষ্ট্রীট হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সম্পাদক—শ্রীতারকনাথ হাজরা।

বিজ্ঞাপনদাতাগণকে পত্র দিবার সময় অনুগ্রহপূর্ব্বক 'সদ্গোপ পত্রিকার' নাম উল্লেখ করিবেন।

স্বজাতিগণ সদ্গোপ পত্রিকার পাত্র-পাত্রীর জন্য বিজ্ঞাপন দিন। বিজ্ঞাপনের হার অতি সামান্য।

সূচী

১।	যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ (প্রবন্ধ)	...	কুমারী সুলেখা হালদার	১৩৩
২।	বাসি ফুল (কবিতা)	...	শ্রীসুধীন্দ্রকুমার রায়	১৩৬
৩।	বেকার (প্রবন্ধ)	...	শ্রীঅনাথকুমার মণ্ডল	১৩৭
৪।	শ্রীশ্রীভোলানন্দ প্রসঙ্গ (প্রবন্ধ)	...	রায় সাহেব শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মণ্ডল	১৪১
৫।	রাজগৃহের পথে (ভ্রমণ কাহিনী)	...	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ	১৪৩
৬।	চতুর্থ নিখিল-বঙ্গ-সদ্গোপ-সম্মিলনী	...		১৪৯
৭।	অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ	...	শ্রীপূর্ণচন্দ্র কুমার	১৫০
৮।	সম্মিলনীর সভাপতির অভিভাষণ	...	শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ	১৫৩
৯।	আমাদের কথা	...		১৫৯

সদ্গোপ পাত্র-পাত্রী

পাত্র চাই—একটী চতুর্দ্দশবর্ষীয়া স্বাস্থ্যবতী শ্যামবর্ণা বাঙ্গলা লেখাপড়ায় অভিজ্ঞা গৃহকর্ম্মে নিপুণা পূর্ব্বকুল মৌদ্‌গোল্য গোত্র পাত্রীর জন্য একটী শিক্ষিত ব্যবসায়ী স্বাস্থ্যবান্ পাত্র চাই। যৌতুক ২০০০৲ টাকা। বক্স নং ১ সদ্গোপ পত্রিকা।

পাত্রী চাই—একটী গ্রাজুয়েট শিলং প্রদেশের ব্যবসায়ী সুদর্শন ভাল্‌কো কুলীন বংশের পাত্রের জন্য একটী ১৭।১৮ বৎসর বয়স্কা সুন্দরী শিক্ষিতা ভাল্‌কো ঘর ব্যতীত পাত্রী চাই। কুলীন না হইলেও চলিবে। যৌতুকাদি কিছুই নাই। বক্স নং ২ সদ্গোপ পত্রিকা।

পাত্রী চাই—একটী ২২।২৩ বৎসর বয়স্ক সুদর্শন স্বাস্থ্যবান শিক্ষিত পাত্রের জন্য একটী সুন্দরী দরিদ্র গৃহের পাত্রী চাই। পাত্র সাঁওতাল পরগণায় একটী পাথর কাটাই ফার্ম্মের ম্যানেজার। কন্যাটী সেই স্থানেই থাকিবে। পাত্রী মেদিনীপুর, বাঁকুড়া বা বীরভুম স্থানীয়া হওয়া চাই। যৌতুক নাই। বক্স নং ৩ সদ্গোপ পত্রিকা।

পাত্রী চাই—ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারীং স্কুলের শেষ পরীক্ষোত্তীর্ণ মেদিনীপুর ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের অধীনস্থ কর্ম্মচারী একটী স্বাস্থ্যবান্ সুদর্শন যুবকের জন্য একটী সুন্দরী গৃহকর্ম্মে নিপুণা পাত্রী আবশ্যক। বক্স নং ১০ সদ্গোপ পত্রিকা।

পাত্রী চাই—একটি স্বাস্থ্যবান্ সুশ্রী শিক্ষিত, বিশিষ্ট ইঞ্জিনীয়ারের পুত্র, রেডিও ব্যবসায়ী ২২।২৩ বৎসরের যুবকের জন্য একটি স্বাস্থ্যবতী সুন্দরী শিক্ষিতা পাত্রী আবশ্যক। বক্স নং ৪ সদ্গোপ পত্রিকা।

পাত্রী চাই—বি-এ ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র, ২০।২১ বৎসরের স্বাস্থ্যবান্ পাত্রের জন্য একটি সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী, শিক্ষিতা, সূচীশিল্পে সুনিপুণা, ধনশালী গৃহের পাত্রী আবশ্যক। পাত্রের পিতা ২৫০৲ বেতনে গভর্ণমেণ্ট চাকরী করেন এবং হুগলী ও মেদিনীপুর জেলায় তাঁহার বিষয়-সম্পত্তি আছে। বক্স নং ৫ সদ্গোপ পত্রিকা।

বিগত ২২শে ফেব্রুয়ারী 'শ্যামাচরণ কুমার হস্পিটাল' উদ্বোধনের আর একটি দৃশ্য—
মাননীয় মন্ত্রী আর বিজয় প্রসাদ সিংহ রায় ও সমবেত বরেণ্য ভদ্রমণ্ডলী।

৭ম বর্ষ]　　চৈত্র, ১৩৪২　　[৫ম সংখ্যা

যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

[কুমারী সুলেখা হালদার]

একশত বৎসর পূর্ব্বে এক ফাল্গুনের শুক্লা দ্বিতীয়াতে যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন বাঙ্গালার এক অখ্যাতনামা পল্লীপ্রান্তে। সেদিন ভারতের পূর্ব্বাকাশে যে দীপ্তশিখা দেখা গিয়াছিল, কে জানিত তাহাই প্রখর জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া একদিন সমগ্র পৃথিবীকে আলোকিত করিবে! সেদিন কে ভাবিয়াছিল যে, এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ-গৃহের শিশুটিকেই একদিন নিখিল-বিশ্ব আনত হইয়া শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিবে!

আধুনিক শিক্ষিতের দল যখন মূর্ত্তিপূজাকে পৌত্তলিকতা বলিয়া ঘৃণা করিতেছিল; জন্ম, ঐশ্বর্য্য, পাণ্ডিত্য এইগুলির বিচারে যখন মানুষ মানুষকে বিচার করিতেছিল; পাশ্চাত্যের মোহে সকলে যখন সাহেবীয়ানাকেই সার বলিয়া জানিয়াছিল; সর্ব্বগ্রাসী স্বার্থ এবং সংকীর্ণতায় যখন জগৎ অভিভূত ছিল; সত্য যখন মিথ্যার আড়ালে প্রচ্ছন্ন ছিল; সভ্যতাভিমানী সংশয়বাদীরা যখন "ঈশ্বর কিছু নয়" বলিয়া জড়বাদী হইয়া উঠিতেছিল;—সেই সময় সেই সন্দেহের অন্ধকারময় যুগে এক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিলেন—হুগলী জেলার অন্তর্গত কামারপুকুর গ্রামে। তাঁহার পিতা ক্ষুদিরাম তাঁহাকে পঞ্চ বৎসর বয়ঃক্রমকালে পাঠশালায় ভর্ত্তি করিয়া দেন। কিন্তু বালক রামকৃষ্ণ পাঠাভ্যাস না করিয়া দেবদেবীর মূর্ত্তিগঠন—তাহার পূজা, কৃষ্ণলীলা, গান, যাত্রা প্রভৃতি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সরস্বতীর কৃপা তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই—তবুও তিনি ছিলেন অনন্ত জ্ঞানের অধিকারী।

যুগে যুগে ভগবান তাঁহার অবতারের ভিতর দিয়া এই ধূলামাটিভরা মর্ত্তের বুকে আগমন করেন। তিনি আসেন—দীন, হীন, পতিত মানুষের কল্যাণের নিমিত্ত; তিনি আসেন—অত্যাচারীর উৎপীড়ন, সন্দিগ্ধের অবিশ্বাস, অধার্ম্মিকের ভণ্ডামী, অহঙ্কারীর দর্প, গর্ব্বিতের ঔদ্ধত্য চূর্ণ করিয়া সাধুদের পরিত্রাণ করিতে; তিনি আসেন—আর্ত্ত, পীড়িত মানবসন্তানকে সত্যের পথ দেখাইয়া দিতে—আত্মার ক্ষুধা মিটাইতে—সাম্য, মৈত্রীর মন্ত্র দানে ধরাতলে প্রেমরাজ্যের সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিতে।

রামকৃষ্ণ দেবও আসিয়াছিলেন। সুপ্ত, অচেতন মানবকে মোহনিদ্রা হইতে জাগাইবার জন্য মর্ত্তের দুয়ারে দেবতা আসিলেন—অমরত্বের মাধুরী লইয়া! কণ্ঠে কণ্ঠে বাজিয়া উঠিল জয়গান—স্বর্গ হইতে বাহির হইয়া আসিল মন্দাকিনীর ধারা—আকাশ হইতে বাজিয়া উঠিল দেবতাদের দুন্দুভি—ফুলে, ফলে, শোভায়, সৌন্দর্য্যে পৃথিবী অপূর্ব্ব শ্রীতে হাসিয়া উঠিল! তিনি আসিলেন—আত্মবিস্মৃতির অন্ধকার হইতে ভারতকে বাঁচাইতে; বলিলেন—আমি আছি, আত্মা আছে, সত্য আছে। দেবতা দূরে নাই। তিনি বহুরূপে আমাদের সম্মুখে আছেন। অতি নিকটতমরূপে তিনি আমাদের অন্তরে বাহিরে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন।

তিনি আসিয়াছিলেন—ধর্ম্মের নামে দিবানিশি যে ভণ্ডামি চলিতেছিল তাহাকে চূর্ণ করিতে—চিত্তের সংকীর্ণতা দূর করিতে। গোঁড়ামি তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তাই তিনি উপনয়নের সময় শূদ্রাণীর নিকট অগ্রে ভিক্ষা গ্রহণ করিলেন; ধনবতী কর্ম্মকার-পত্নী তাঁহার ভিক্ষামাতা হইয়াছিলেন। তিনি আসিয়াছিলেন—ভেদের প্রাচীর সরাইয়া বিশ্বপ্রেমের বাণী শুনাইতে—কেহ তুচ্ছ নহে, কেহ হীন নহে, কেহ দীন নহে। মানবের মনে তুচ্ছতা কিম্বা হীনতা—দীনতার আরোপমাত্র; সেই মোহ অপসারিত হইলেই মানুষ আপনার মহিমায় জাগিয়া উঠে। মহাপ্রভুর এই বাণী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব তাঁহার লীলার ভিতর দিয়া প্রকাশিত করিলেন। তিনি মানুষকে আহ্বান করিলেন—পরাণুকরণের প্রাণহীন আড়ষ্টতার ব্যর্থ প্রচেষ্টা হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য। তিনি ধনী, দরিদ্র, উচ্চ, নীচ, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল সকলকে একক্ষেত্রে আহ্বান করিলেন—আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হইবার জন্য। মানুষ এতদিনে বুঝি তাঁহার মনোমত আরাধ্য দেবতার সন্ধান পাইল! শীতের জড়তা বিদূরিত হইয়া বসন্ত-বায়ুর স্নিগ্ধস্পর্শে ভারতের বুকে বুঝি নবজীবনের স্পন্দন জাগিয়া উঠিল!

সত্যকার মানুষকে প্রকাশ করিবার ব্রত গ্রহণ করিয়া তিনি আমাদের নিকট আসিয়াছিলেন। যে মেরুদণ্ডের উপর মানুষের সত্য প্রতিষ্ঠা তাহাকেই দৃঢ়তর করিয়া তুলিবার জন্য

তিনি তাঁহার শিষ্যদের প্রাণে নিজের সাধনোজ্জ্বল প্রশান্তজীবন প্রতিবিম্বিত করিয়াছিলেন; তাই নাস্তিক 'নরেন্দ্রনাথ' সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দে পরিণত হইয়াছিলেন। যিনি স্বয়ং আদ্যাশক্তি, মহামায়া, বরাভয়দায়িনী, মহাকালীকে প্রত্যক্ষ করিয়া অপরকেও তাহা দেখাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাঁহাকে কেবল মহামানব বা অতিমানব বলিয়াই প্রাণ তৃপ্ত হয় না—মহামানব বা অতিমানবের বহু উর্দ্ধে তাঁহার স্থান।

তাঁহার ধর্ম্মের কোন সাম্প্রদায়িকতা ছিল না! কোন ধর্ম্মের প্রতি তিনি অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেন না। তিনি বলিয়াছেন,—"আন্তরিক হ'লে সকল ধর্ম্মের ভিতর দিয়াই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। বৈষ্ণবেরাও ঈশ্বরকে পাবে, শাক্তরাও পাবে, বেদান্তবাদীরাও পাবে, ব্রহ্মজ্ঞানীরাও পাবে, আবার মুসলমান, খৃষ্টান এরাও পাবে। কেউ কেউ ঝগড়া ক'রে বসে; বৈষ্ণব বলে—আমাদের শ্রীকৃষ্ণকে না ভজলে কিছু হবে না, শাক্ত বলে—আমাদের ভগবতী একমাত্র উদ্ধার কর্ত্তা—তাঁকে না ভজলে কিছুই হবে না, খৃষ্টানরা বলে—আমাদের খৃষ্টান ধর্ম্ম না মানলে কিছুই হবে না। এসব বুদ্ধির নাম মাতুয়ারা বুদ্ধি, অর্থাৎ আমার ধর্ম্মই ঠিক, আমি যা ভাবছি তাই সত্য, আর সকলের মত মিথ্যা—এ বুদ্ধি খারাপ। ঈশ্বরের কাছে নানা পথ দিয়ে পৌঁছানো যায়।"

যখন বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর বিবিধ মতের জন্য "কোন পথটি ঠিক," তাহা কেহ বুঝিতে পারিতেছিল না—ধর্ম্মের বিরুদ্ধে ধর্ম্মের অভিযান চলিতেছিল; যখন প্রত্যেকেই আর সকল কোলাহলকে ডুবাইয়া দিয়া কেবলমাত্র নিজের বিশ্বাস—নিজের সুরকে প্রাধান্য দিবার নির্লজ্জ দাম্ভীকতা প্রকাশ করিতেছিল—সেই সময় যাহা ধ্রুব, যাহা শাশ্বত ও যাহা সত্য তাহার জ্যোতির্ম্ময় রূপটী তিনি একাগ্র সাধনায় খুঁজিয়া আনিয়া প্রকাশ করিয়া ধরিলেন—নিখিল নরনারীর তৃষিত, ব্যাকুল হৃদয়ের সম্মুখে! বলিলেন—"ঈশ্বর এক বই দুই নাই। তাঁহাকে ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়া ভিন্ন ভিন্ন লোকে ডাকে। তিনি একই—কেবল নামে তফাৎ। কেউ বলছে গড্, কেউ বলে আল্লা, কেউ বলে ব্রহ্মা, কেউ বলছে কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম, যীশু, দুর্গা। এক রকম তাঁর হাজার নাম।" দিশাহারা নরনারী যেন ধ্রুব আলো দেখিতে পাইয়াছে,—এমনইভাবে সংশয়ের ঘনঘোর তমিস্রা বিদীর্ণ করিয়া ছুটীয়া চলিল সেই আলোক রশ্মি পানে! এই সত্য বাণীর রসধারায় সহস্র তাপিতের বক্ষে তিনি স্নিগ্ধ শান্তি বারি সিঞ্চন করিলেন। যুগ-যুগান্তরের দীর্ণতা জীর্ণতা এক নিমিষে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

ভেদবুদ্ধি আর সংকীর্ণতার মাঝে বিরাট মহাপ্রাণতার আভাস এমনিভাবেই এক নিরক্ষর

ধর্ম্মের দ্বারেই আবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। তিনি বুঝাইয়া দিলেন—সাধনার পথ বিচিত্র, এক নহে। তাঁহার নিকট সকল ধর্ম্মের মানুষই গমন করিতেন ; কাহারও জন্যে তাঁহার দ্বার রুদ্ধ ছিল না। এই উদারতাই রামকৃষ্ণের ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য। তাঁহার জন্মের পর শত বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। আজ তাঁহার পুণ্যস্মৃতির বেদীমূলে অসংখ্য নরনারী তাঁহাদের হৃদয়ের শ্রদ্ধার কনকাঞ্জলী নিবেদন করিতেছে। যাঁহারা শততম শুভ জন্মোৎসব উপলক্ষে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত বিরাট উৎসবের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। সেই সাধক-শ্রেষ্ঠ মহা-পুরুষের চরণতলে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

বাসি ফুল

[শ্রীসুধীন্দ্রকুমার রায়]

ফুল যবে পড়ে ঝরি'—শুষ্ক হ'য়ে যায়,
বিষাদে বিবশ মোরা করি—হায় হায়!
না করি বিচার শুধু হেরি বর্ত্তমান
ফলাফলে লক্ষ্যহীন, হই ম্রিয়মান।
কিন্তু এ যে নিখিলের নীতি চিরন্তন
ফুল না ঝরিলে কোথা ফল সুশোভন।
যে ফুল ফুটিয়া গেছে শেষ তার কাজ,
আবার নূতন ফুল ফোটাইতে আজ
ঝরে তাই বাসি ফুল শিথিল বাঁধন।
পুরাতনে লভে রূপ সে চির নূতন।
নয়নের অগোচরে নিত্য পলে পলে
জীবন মরণ দুঁহু পাশাপাশি চলে ;
জন্মে যদি প্রয়োজন, মরণেও তাই,—
বিকার বিহীন বিশ্বে কোন কাজ নাই।

বেকার

[শ্রীঅনাথকুমার মণ্ডল]

শ্যামবাজার কমলা বোর্ডিংএর সাম্নে—রাস্তার ওধারে বড় সাইনবোর্ড লটকানো চায়ের দোকানটা থেকে ছ' আনা দামের ছেঁড়া চটি ছু'টিকে টান্‌তে টান্‌তে নীলাম্বর যখন ফুটপাথে পা দিল, হিন্দুস্থানী পানওলার ঘড়িটায় তখন ছ'টা বেজে গেছে। 'ওঃ টু-উ-উ লেট'—পাঞ্জাবীর পকেট থেকে আধপোড়া সিগারেটটি বার ক'রে জ্বলন্ত দড়ি থেকে ধরিয়ে নিয়ে হন্‌-হনিয়ে চল্ল সে ধর্ম্মতলার দিকে। এতটা পথ তাকে পায়ে চলেই যেতে হবে, নীলাম্বরের কাছে এ-কিছু নয়, এ রকম কত পথ যে, সে রোজ হেঁটেই মেরে দেয়—তার ইয়ত্তা নেই। ট্রামে, বাসে যাতায়াত করা মানে—নিজেদের অক্ষমতা প্রকাশ করা ; অন্ততঃ নীলাম্বর তাই মনে করে। বাড়ীর এক পা বার হ'তে বাইকের দরকার, ট্রামের গদি মোড়া সীটে ব'সে আরাম ক'রে বাজার যাওয়া, গুণ্ডাদের কাছ থেকে বেশী পয়সা দিয়ে বায়স্কোপের টিকিট কেনা—এ সব সে মোটেই বরদস্ত ক'রতে পারে না। চল্লিশ না পেরোতেই আমরা বৃদ্ধ আখ্যা প্রাপ্ত হই—আমাদের জীবনের সজীবতার পর্দ্দা সরে গিয়ে তখন আসে সেখানে নির্জ্জীবতা, নিস্তেজতার একটা মিশ্‌মিশে কালো ছায়া,—অকালেই আমরা পঙ্গু হ'য়ে পড়ি ; এর কারণ আমাদের শ্রমবিমুখতা ছাড়া আর কিছু নয়—চায়ের দোকানে ব'সে এসব কথা সে প্রায়ই বলে। সেদিন এ নিয়ে দারুণ তর্ক করবার সময় সে বেশ জোর ক'রেই ব'লেছিল—একজন রিক্‌সাওয়ালা, সারাদিন যার পায়ের বিশ্রাম নেই, মোটরবিহারী এক বড় কাপ্তেনবাবুর চেয়ে শতগুণে শ্রেয় ও সুখী। কিন্তু হায়, তার এ কথা কেউ বোঝে না,—সকলেই হাসে।

সন্ধ্যা সাতটায় দেখা করবার কথা, এখন ছ'টা দশ—পানের দোকানের ঘড়িটা আবার সাত মিনিট 'শ্লো'—পৌঁছুতে অত্যধিক বিলম্ব হবে দেখে নীলাম্বর চলার গতি আর একটু বাড়িয়ে দিল।

দেড় বছর হোল নীলাম্বর এম্‌-এ পাশ ক'রে সেই থেকে ঠায় একরকম ব'সে আছে। কয়েক দিন সে ট্যুশানি করেছিল, দুটো ছেলেকে পড়াতে হোত দু'ঘণ্টা—পনর টাকা মাইনেতে। কিন্তু চার দিনেই ট্যুশানির প্রতি তার দিগ্‌দারি লেগে গেল—শুধু গোবর আর রাবিশে ভরা ছেলে দুটোর মাথা ব'লে এক মাস না যেতেই সে আপনার পথ বেছে নিল। তারপর শতকরা

ক'রে ক'রে তার কলমের নিব ভোঁতা হ'য়ে গেছে। সেদিন বোর্ডিংএ ব'সে হিসাব ক'রে সে দেখ্‌ছিল—চাকরির দরখাস্ত লিখতে কাগজ কিনতে হ'য়েছে এগার আনা তিন পয়সার; —ডাক টিকিটের খরচটা বাঁচিয়ে তেল কিনে নিজের পায়ে মালিশ করতে লেগেছে দু'টাকা পাঁচ আনা আড়াই পয়সা। কি না করতে সে বাকি রেখেছে! কিন্তু সবই সে অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিয়েছে। এত করেও একটা চাকরি মিললো না দেখে চাকরির আশা একেবারে ছেড়ে দিয়েছিল। তার দারিদ্র্যপূর্ণ বেকার জীবন দেখে মেসের যতীনদা'র বুঝি প্রাণ একটু কেঁপেছিল,--তাই সে নীলাম্বরকে সঙ্গে নিয়ে সেদিন 'বেঙ্গল পিকচার্‌স্‌'এর ম্যানেজার ভোঁস সাহেবের সঙ্গে খালি চাকরিটার জন্য 'ইন্‌ট্রোডিউস্‌' ক'রে দিয়ে এসেছিল। ভোঁস সাহেব যতীনদা'র বাল্য-বন্ধু, 'মহাবিদ্যা পাঠশালা'য় একসঙ্গে পড়েছিলেন,—নীলাম্বরকেই চাকরিটা দেবেন বলে আশা দিয়েছেন। আজ সন্ধ্যা সাতটায় আবার দেখা করতে হবে—নীলাম্বর চলেছে হন্‌ হন্‌ করে।

এ চাকরি তারই, দেখতে হবে না কাকেও! কাল রাত্রে যতীনদা'ও বল্‌ছিল,—চাকরিটা তারই ভাগ্যে নড়ছে। যতীনদা'কে খাওয়াতে হবে—মাইনে পেলেই যতীনদা'কে একদিন দ্বারিকের দোকানে খাইয়ে দেবে আশা মিটিয়ে! দেরী হ'য়ে যাবে বেশ খানিকটা, একটু আগে বেরোলেই পারত! কিন্তু ক্ষিতীশটা ছাড়ল না যে! তা হোক, একটু দেরী! এর চেয়ে জোরে সে আর হাঁটতে পারে না—অনেক দিন ঠিক সময়ে গিয়েওত দেখা পায় নি ..আজও সাহেব যদি বাইরে গিয়ে থাকে ..হুঁ ক্ষিতীশের টাকা ক'টা দেওয়া হয়নি—পূজোর আগে ধার দিয়েছিল, চাইছিল সেদিন . চায়ের দোকানের দু'টাকা অনেক দিন পড়ে আছে,—চা খেতে লজ্জা করে মেসের দু'মাসের খরচ বাকি পড়ে আছে,—সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট সেদিন মনে করিয়ে দিয়ে গেছে! প্রথম মাসের মাইনে পেলেই সব সে দেবে শোধ ক'রে। সে কি ইচ্ছে করে ফেলে রেখেছে, না সে কারও টাকা ফেলে রাখতে চায়! নেই তার কাছে, কি করবে সে! থাক্‌লে কারও টাকা ফেলে রাখত না।...এ মাসটা বড় টানাটানি, মাসের এগার তারিখ হ'য়ে গেল, দেশ থেকে টাকা কটা এখনও এল না...আহা, তারাই বা পাবে কোথায়,—বড় দুঃখের সংসার ..এই যাঃ! চটির ফিতেটা ছিঁড়ে গেল! কি ক'রবে সে,—পকেটে একটা পয়সাও নেই! তাইত! মোটেই চলা যায় না...ছেঁড়া চটি ফেলে দেওয়াই ভাল—না, না থাক্‌, মেসে গিয়ে মুচিকে দিয়ে সেলাই করিয়ে নেবে! চটি হাতে ক'রে এত ভীড়ের মধ্যে সে চ'লবেই বা কি করে,—লোকে পাগল বল্‌বে ..আচ্ছা পকেটে পুরলে মন্দ কি!—পকেটগুলোওত বেশ

একি! জামার কাঁধের কাছে ছিঁড়্‌ল কি করে!...খালি পা, ছেঁড়া জামা, সেলাই করা কাপড়—চোখে জল আসে;—আসবেইত! সুখের দিনে কেউ কখনও কাঁদে না—দুঃখেই জল আসে! দুঃখীর কান্নাই সম্বল—এই তার সান্ত্বনা! আরও কতক্ষণ এইভাবে নীলাম্বর ভাবনার জাল বুনত কে জানে! হুড়মুড় ক'রে গিয়ে সে পড়ল একটি ছোকরার গায়ের উপর; 'কানা নাকি'—বলে ছোকরাটী তার দিকে ফিরে দাঁড়াল। নীলাম্বরের তখন চেতনা হোল, মনে মনে বল্ল—সত্যই সে আজ অন্ধ হ'য়েছে,—ভোঁস সাহেবের দয়ায় তার অন্ধত্ব ঘুচবে। নীলাম্বরের মন আবার সুখস্বপ্নে বিভোর হ'য়ে উঠল।

ভোঁস সাহেবের বাড়ী গিয়ে হিন্দুস্থানী সেই বুড়ো দারোয়ানের কাছে নীলাম্বর শুন্‌ল,—সাহেব পাঁচটার সময় বাইরে গেছেন, ফেরবার কিছু ঠিক নেই। তার মুখখানা ক্ষণিকের জন্য গম্ভীর হ'য়ে গেল;—কয়েকটা পুরাণো স্মৃতি মনের মাঝে ভেসে উঠ্‌ল। কলেজে কবে 'পাংচুয়ালিটি' 'এসে' লিখে কোন প্রফেসারের কাছে প্রশংসা পেয়েছিল,—সে কথা তার মনে পড়্‌ল। যেখানে সে লিখেছিল,—বাঙ্গালীর নিয়মানুবর্ত্তিতার জ্ঞান একেবারে নেই, সাহেব প্রফেসার সেগুলোর তলায় দাগ দিয়ে পাশে লিখে দিয়েছিলেন—'ভেরী ট্রু।' নীলাম্বর সেখানে ব'সে সেকথা ভাব্‌তে লাগ্‌ল।

একখানা বড় মোটর এসে দাঁড়াল—ধর্ম্মতলার তিনতালা একটী বাড়ীর সাম্‌নে। দারোয়ান টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল; সাহেব ভিতরে ঢুকলেন—সঙ্গে দু'জন অতি আধুনিক নারী।

নীচে—সাম্নের ঘরেই সাহেবের পারলার। চেয়ারখানা টান্‌তে টান্‌তে সাহেব বল্লেন—আপনার ভাইকে তাহ'লে শিগ্‌গীর দেশ থেকে আস্‌তে লিখে দিন, লেখাদেবী! তাঁকেই চাকরিটা 'অফার' করা যাবে! তবে মাইনেটা বড় কম,—মোটে ষাট টাকা; আচ্ছা আমি পঁচাত্তর করে দেব'খন।

—আপনার দয়া।

বাইরে নীলাম্বরের কানে সমস্ত এল। তার পা দুটো একবার কেঁপে উঠ্‌ল। ভিতর থেকে দারোয়ান এসে সাহেবের তলব জানাতে, খালি পা নিয়ে ভিতরে আস্‌তে নীলাম্বরের মাথা কাটা গেল; কিন্তু তখন লজ্জা-সঙ্কোচের সময় নয়, সে ভিতরে গিয়ে নমস্কার ক'রে দাঁড়াতেই সাহেব বল্লেন—আমি খুব দুঃখিত, আপনাকে আমাদের ছবির কোম্পানীতে ঢোকাতে না পেরে ....। ঘরের আলোগুলো যেন দপ্‌ করে নিভে গেল,—নীলাম্বরের পায়ের তলা থেকে

তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল—উঃ! টল্‌তে টল্‌তে সে ফুটপাথে নাম্‌ল; তার মাথাটা তখন বোঁ বোঁ করে ঘুর্‌ছে! মাথাটা দু'হাতে চেপে ধরে সে ফুটপাথের উপর বসে পড়্‌ল!......

বিছানায় শুয়ে নীলাম্বর ভাবছিল—তার গত জীবনের কথা! মা, বাপ কত কষ্ট করে তাকে লেখা-পড়া শিখিয়েছেন! কলকাতায় বি-এ পড়বার সময় তার বাপ মারা যান, বাপের অবস্থা তেমন স্বচ্ছল ছিল না। নীলাম্বর ভাবল—বুঝি এখানেই তার লেখাপড়ার ইতি হোল। মা কিন্তু তা হতে দেননি,—বহুকষ্টে টাকা পাঠিয়ে ছেলেকে এম্-এ পর্য্যন্ত পড়িয়েছেন এই আশায়—ছেলে যেন সুখী হ'তে পারে, তাঁদেরকে সুখী কর্‌তে পারে। বিধি তাঁদের ভাগ্যে সুখভোগ লেখেন নি .. অভাব—পয়সার ভীষণ অভাব! নীলাম্বরের সব আছে,—নেই শুধু পয়সা—দুনিয়ায় যার দরকার সব চেয়ে বেশী। দেশে মা, বোন্, ভাই, সব আছে; বাড়ী আছে, ঘর আছে—কয়েক বিঘা জমিও আছে...আর একজন আছে, নীলাম্বরের জন্য এখনও বসে আছে—সে সিদ্ধেশ্বরী। এম্-এ পাশ ক'রে নীলাম্বর যেবার দেশে গিয়েছিল, সিদ্ধেশ্বরীকে বিয়ে করবার জন্য মা বড় ধ'রেছিলেন। নীলাম্বর বলেছিল,—এবার কলকাতায় গিয়ে চাক্‌রি যোগাড় ক'রে তবে বিয়ে করবে। বেচারা সিদ্ধেশ্বরী এখনও তার আশায় ব'সে আছে! তারপর যেদিন সে চাক্‌রির লোভে দেশ থেকে চলে আসে, সিদ্ধেশ্বরী বাড়ী থেকে লুকিয়ে তার সঙ্গে এসেছিল—হানিফ্ মিঞার ধানক্ষেত পর্য্যন্ত তাকে এগিয়ে দিতে...আহা বেচারা সিদ্ধেশ্বরী! বড় ভালবাসে সে...পথে তাদের কত হাসি, কত কথা! হানিফ্ মিঞার ক্ষেত থেকে বিদায় নেবার সময় তার ডাগর চোখদুটো জলে ভারী হ'য়ে উঠেছিল—নীলাম্বরের আজ সব মনে পড়ে! তার চোখের কোণ বেয়ে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে এল।

সেইদিন ভোররাতে দেশে যাবার প্রথম গাড়ীখানার থার্ডক্লাসের একটা বেঞ্চে নীলাম্বর চেপে বস্‌ল—সঙ্গে ছিল ছোট একটী টিনের বাক্স।

আমার সকল কাঁটা ধন্য ক'রে
ফুট্‌বে গো ফুল ফুট্‌বে—
আমার সকল ব্যথা রঙীন হ'য়ে
গোলাপ হ'য়ে উঠ্‌বে।

—রবীন্দ্রনাথ

শ্রীশ্রীভোলানন্দ প্রসঙ্গ

[রায় সাহেব শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মণ্ডল]

১। দানের ফল—

সে আজ বহুদিনের কথা। প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে বসন্তের শেষে। শ্রীগুরুদেবের তৎকালীন সন্ন্যাসী-শিষ্য স্বর্গীয় স্বামী ব্রহ্মানন্দ গিরি ও স্বামী গঙ্গা গিরি মহারাজের আশ্রমের কার্য্যাবলী তত্ত্বাবধান করিতেন। এখনকার গঙ্গার উপরের প্রধান ধর্ম্মশালাটির নির্ম্মাণকার্য্য তখনও শেষ হয় নাই। কতক কতক কাজ তখনও বাকী ছিল। সে সময় শ্রীগুরু মহারাজের কেহ বঙ্গদেশীয় সন্ন্যাসী-শিষ্য ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। ঐ সময় একদিন অপরাহ্নে শ্রীগুরুদেব পবিত্র হরিদ্বার আশ্রমে গঙ্গার কূলে বিশ্রাম করিতেছেন। আমি তাঁহার নিকটেই বসিয়া আছি। স্বামী গঙ্গা গিরি মহারাজ শ্রীগুরুদেবের সহিত বেদান্ত বিষয়ের আলোচনা করিতেছেন। বসন্তকাল,—নিকটস্থ একটী নিম্ববৃক্ষ নূতন পত্রে সুশোভিত হইয়াছে। সেই নিম্ববৃক্ষের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া পরম দয়ালু শ্রীগুরুদেব কথাপ্রসঙ্গে আমাকে বলিলেন— "দেখ্ বেটা, দানকা ক্যা ফল হ্যায়!" এই বলিয়া সেই নিম্ববৃক্ষের দৃষ্টান্ত দ্বারা আমাকে বুঝাইয়া দিলেন—"দেখ বৎস! এই নিম্ববৃক্ষ আপনার যথাসর্ব্বস্ব পত্র, পুষ্প, ফল সমস্তই মাতা ধরিত্রীকে দান করিয়াছে; আর সেই দানের ফলস্বরূপ মাতা ধরিত্রী আবার ঐ বৃক্ষকে নূতন নূতন বহু পত্র, পুষ্প, ফল দ্বারা সুন্দরভাবে সাজাইয়া দিয়াছেন এবং তৎসঙ্গে এই বৃক্ষকে বর্দ্ধিত করিতেছেন।"

২। উপপত্তি ছোড় দেও—

একদিন চট্টগ্রাম নিবাসী এক বৃদ্ধ ও তাঁহার পত্নী তীর্থভ্রমণে বহির্গত হইয়া সাধু-দর্শনের ইচ্ছায় হরিদ্বারে শ্রীগুরু মহারাজের নিকটে আসিয়াছেন। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী ভক্তিভরে শ্রীগুরু-দেবকে প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলে, শ্রীগুরুদেব তাঁহাদিগকে প্রসাদ বিতরণ করিয়া তাঁহাদের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তাঁহারা বহুদূর চট্টগ্রাম হইতে তীর্থ পর্য্যটনে আসিয়াছেন শুনিয়া প্রীত হইলেন ও তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিলেন এবং তাঁহার স্বাভাবিক সরলতার সহিত বলিলেন— "হে পুত্র, আজ আপ্ ব্রাহ্মন-ব্রাহ্মণী দোনোকে দেখ্ কর্ হি হাম্ ধন্য হুয়ে" ইত্যাদিরূপ বিনয় ও শিষ্টবচনে তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনা করিলেন। নানাপ্রকার উপদেশপূর্ণ ধর্ম্মপ্রসঙ্গের পর শ্রীগুরুদেব বলিলেন—"বেটা তু ধরম্ করনে আয়া হ্যায়, হামকো কুছ দে। ইয়ে বৃদ্ধ আপ্ লোক্‌গোঁকে ভরসে গঙ্গাজীকে কিনারে পর্ বৈঠা হ্যায়।" এইরূপ ভাবের বিনয় প্রার্থনায় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মনে

করিলেন বুঝিবা এই বৃদ্ধ সাধু তাঁহাদের নিকট কিছু অর্থভিক্ষা করিতেছেন। কিন্তু কিছুক্ষণ কথোপকথনের পর তাঁহাদের সে ভ্রম দূর হইল। শ্রীগুরুদেব বলিলেন—"হে পুত্র, তুম্‌কো ইয়ে নয় চিঁজে হিঁয়া পর্ ছোড়্‌নী হোঙ্গি—

(১) গালি নেহি দেনা, (২) নিন্দা চুগ্‌লি নেহি কর্‌না, (৩) শপথ নেহি কর্‌না, (৪) মাংস মছলি নেহি খানা, (৫) পরদার নেহি কর্‌না (৬) মদ্যপান নেহি কর্‌না (৭) চোরি নেহি কর্‌না (৮) জুয়া নেহি খেলনা (৯) ঈর্ষা-দ্বেষ নেহি করনা।

আয়োর হাম্‌সে ইয়ে নয় লে যাও—

(১) ভূমি কো প্রণাম করো। (২) জলকো প্রণাম করো। (৩) সূর্য্যনারায়ণকো প্রণাম করো। (৪) মাতা পিতাকো প্রণাম করো। (৫) শ্রীহরি-ভজন করো। (৬) শ্রীমদ্ভাগবদ্ গীতা নিত্য পাঠ করো। (৭) নিত্য সাধুসঙ্গ করো। (৮) অতিথি সংকার করো। (৯) দশমাংশ দান করো।

এইরূপ অপূর্ব্ব আদান-প্রদানের পর দয়াময় সেই সরলা বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিলেন—"মাতা, এক চিজ্ ছোড়ো—উপপতি ছোড়ো।" এই কথা শ্রবণমাত্র বৃদ্ধা বজ্রাহতের ন্যায় স্তম্ভিত হইলেন এবং কিছুক্ষণ পরে বলিলেন—"বাবা, কি বলিলেন! জীবনে ত স্বপ্নেও এই মহাপাপ কল্পনায় আসে নাই।"

গুরুদেব আবার বলিলেন—"ঠিক দেখ্ বেটী, তেরা উপপতি হ্যায়, জিস্‌কে হুকুম্‌সে তু চল্‌তী হ্যায়। আয়োর উহ উপপতি চাণ্ডাল হ্যায়।" ঘৃণা ও লজ্জায় বৃদ্ধা আরও মর্ম্মাহত হইলেন। কিছু বুঝিতে না পারিয়া রোরুদ্যমানা হইয়া সজলনয়নে নিস্তব্ধা হইলেন। তখন করুণাময় সেই বৃদ্ধা মাতাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—"বেটী, দেখ্, ক্রোধ চাণ্ডাল হ্যায়। যব ক্রোধ শিরপর্ চড়তা হ্যায়, তব পতি কা হুকুম নেহি চল্‌তা। উহ চাণ্ডাল ক্রোধ পতিসে ভি বড়া হো যাতা হ্যায়। ইয়ে উপপতি ছোড় দেনা। ক্রোধ নেহি কর্‌না।"

"ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥"

তথাচ

"ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্রয়ং ত্যজেৎ।"

বৃদ্ধ-বৃদ্ধা পরম প্রীত হইয়া শ্রীগুরুচরণে প্রণিপাত করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

রাজগৃহের পথে

[শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ফাহিয়ান্ পাহাড়ের সমতল ভূমিতে প্রবেশ করে আড়াই মাইল উঠে রত্নাগিরি পাহাড়কে দক্ষিণ-পূর্ব্বে রেখে গৃধ্রকূটে পৌঁছুতেন। এই সমতল ভূমি ছাড়া অন্য কোনো সমতল ভূমি সেখানে কোথাও নেই। আধ মাইল ওঠ্‌বার পরই তিনি 'গৃধ্রকূট-বিহারের' উচ্চতম চূড়াটা দেখ্‌তে পেতেন। এখন এই বিহারের কোনো চিহ্ন নেই;—কেবলমাত্র গোটা কতক ইট পাশাপাশি পড়ে' থেকে তার স্মৃতিটা জাগিয়ে রাখ্‌তে চেষ্টা করচে মাত্র। ফাহিয়ান্ ও হুয়েন সাঙ্ উভয়েই এখানে এসেছিলেন—তা সত্য; কিন্তু ফাহিয়ান্ যে পথ দিয়ে এসেছিলেন, হুয়েন্ সাঙ্ সে পথে না গিয়ে দক্ষিণ দিক দিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন,—যেখান দিয়ে গেলে গৃধ্রকূট উত্তর-পূর্ব্ব মুখে পড়ে। *

এই দুটো গুহা ছাড়া আরো গোটাকতক ছোট্ট ছোট গুহা আছে। সেগুলোর কোন নাম নেই। বোধ হয় বুদ্ধের প্রিয়তম শিষ্যেরা এই সব গুহায় থাক্‌তেন। এছাড়া আর কিছু দেখ্‌বার জিনিষ এখানে নেই। যাঁরা অপারক, ডুলিই তাঁদের সহায়। ভাড়া যাঁর কাছে যেমন,—তবে তিন টাকার কমে নয়।

এই সব দেখে আমাদের বেহারী বন্ধুর মাথায় কি ঝোঁক চাপলো, জানি না। তিনি জানালেন,—"ফের্‌বার মুখে পাহাড়ের ওপর দিয়েই যেতে হ'বে কিন্তু।" আমাদের তখন প্রশ্ন কর্‌বারও অবসর মিলেনি যে, জিজ্ঞাসা কর্‌বো—রাস্তা আছে কী না? কতটা সুবিধা হ'বে? ইত্যাদি।

রাস্তা ছেড়ে আমরা পাহাড়ের ওপরে উঠ্‌লাম। ঐতিহাসিক যুগের তৈরী আঁকা-বাঁকা দেওয়ালটা নজরে পড়্‌লো। সব পাহাড়েই জায়গায় জায়গায় এই দুর্গের প্রাচীর দেখা যায়। এটা রাজা বিম্বিসারের তৈরী! শত শত বর্ষ অতীত হ'য়ে গেছে, তবুও কালের নিষ্ঠুর কশাঘাতে সব ভেঙ্গে চূর্‌মার্ করে' দিতে পারেনি। চওড়া ৯।১০ ফুট, আর খাড়াইও ৪ হাত থেকে ৬ হাত

পর্য্যন্ত। পাথরের নুড়ি দিয়ে এমন পরিপাটী ভাবে সাজানো দেখ্‌লে এখনো তখনকার শিল্পীদের প্রশংসা কর্‌তে হয়। এখন এই সব পাথরের ফাঁকে ফাঁকে নানা বন্য গাছ জন্মে একটা জঙ্গল সৃষ্টি করেচে। তাই পথচলা দায়। কিন্তু তবুও আমরা তিনজনে গেলাম। খানিকটা গিয়ে শেষে এমন অবস্থা দাঁড়ালো যে, আর এগোনো যায় না। ভয়ে বুক দুর্ দুর্ করে' কাঁপ্‌চে, অথচ ফিরে যাবার কথা ব্যক্ত কর্‌তে পার্‌চি না। খুব সাবধানে পা টিপে টিপে চলেচি। যতই অগ্রসর হ'চ্চি, ভয় ততই বাড়্‌চে। এই রকম করে' আরো খানিকটা গেলুম। হঠাৎ এক জায়গায় মাটী পাওয়া গেলো। আমরাও তাই খুঁজ্‌ছিলাম। এতদূরে এসেও আমরা দমে যায়নি—যতটা গেলুম এই মাটী পেয়ে। নরম মাটীর ওপরে পায়ে চলা রাস্তা। মাঝে মাঝে পাথরের ওপর তীর আঁকা। পথিক যাতে না পথ ভুলে বেরাস্তায় চলে যায়, এগুলো তারই সঙ্কেত। পথ আর ফুরোয় না। মনে হ'লো যেন এর আর শেষ হ'বে না। হঠাৎ নারায়ণবাবু থম্‌কে দাঁড়িয়ে বল্লেন,—"দেখ্‌চেন বাঘের পায়ের দাগ।" সেই পায়ের দাগ অনুসরণ করে' খানিকটা গেলুম। মাটীর রাস্তা এইবার শেষ হ'য়ে গেলো। আবার জঙ্গল পড়্‌লো। গাছগুলো আমাদের মাথা ডিঙিয়ে উঠেছে। এই নির্জ্জন জঙ্গলের মধ্যেও মাছির হাত থেকে নিস্তার পাওয়া গেলো না। লোকালয় বর্জ্জিত, গাছপালা সমন্বিত পাহাড়! হিংস্র জন্তু বেষ্টিত পাহাড়! এখানেও মাছি! পাহাড়ের উচ্চতম শিখরে যেখানে বোধ হয় খাম্‌খেয়ালীর দল ছাড়া অন্য কেউ আসে না, সেখানেও মাছি! এদের হাত থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্যে হন্ হন্ করে' চলেচি, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আমরা যে স্পীডে চলেছিলুম্ তা কমে গেলো। পাশেই এলো মস্ত এক খাদ্। নীচের দিকে তাকালে আমি আছি কি না—নিজের বুকে হাত দিয়ে উপলব্ধি না করা পর্য্যন্ত বিশ্বাস হয় না। পাহাড়ের এই দিকটা একেবারে সোজা খাড়া। প্রকৃতি এরূপভাবে একে সৃষ্টি করেচে কিম্বা মানুষ কেরামতি দেখাতে গিয়েছিলো, তা ঠিক বোঝা গেলো না। যাই হোক্, অতি সন্তর্পণে খাদটা পার হ'য়ে এলুম। তার পরই পড়্‌লো কাঁটাবন,—পদে পদে বাধা জন্মায়। কাজেই সরু দেখে শুক্‌নো ডাল ভেঙ্গে নিয়ে আবার যাত্রা সুরু কর্‌লাম। উদ্দেশ্য এ নয় যে, বাঘ বা অন্য কোনো জন্তুর আক্রমণ হ'তে নিজেদের বাঁচাবো। ধরে' নেওয়া হোক্, এখন আমাদের তিনজনের হাতেই লাঠি। কোথায় সাহস বাড়্‌বার কথা—তা নয়, কেবলই আমরা দমে যাচ্চি আশপাশের আবহাওয়া দেখে। কতবার যে রাস্তা না পেয়ে আবার ফির্‌তে হ'য়েচে, তার ইয়ত্তা নেই। মাছিগুলো এখনও আমাদের সঙ্গ ছাড়েনি—এরা সঙ্গেই থাক্‌বে না কি? এই কথাটা ভাব্‌তে ভাব্‌তে সোজা বাঁধানো রাস্তা দিয়ে নেমে পড়্‌লুম। বন্ধু এতক্ষণে বল্লে, —"জাষ্ট ইন্ ভেন্।"

রত্নাগিরির বাঁকে যে বন—সেটির নাম 'অমর-বন'। একসময়ে জীবেকর এই বনটী ছিলো। জীবক ছিলেন রাজা বিম্বিসারের বৈদ্য। রাজা একটা বাড়ী নির্ম্মাণ করে' তাঁকে থাক্‌বার জন্যে দিয়েছিলেন। নিজের সুখ-সুবিধার জন্যে তিনি মোটেই ব্যস্ত হ'তেন না। বুদ্ধ ও সঙ্ঘের তত্ত্বাবধান কর্‌বার জন্যে তিনি জীবককে প্রধানতঃ নিযুক্ত করেছিলেন। গৃধ্রকূট ও বেণুবন উভয়ই জীবকের বাড়ী থেকে অনেক দূরে। তিনি বেশীর ভাগ সময়ই যুবরাজ অভয়ের সঙ্গে একসঙ্গে থাক্‌তেন। তিনি নিজেও বুদ্ধের সঙ্গে প্রগাঢ়ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। জীবক তাঁর 'অমর বনের' ভিতরে একটি বিহার স্থাপনা করে' প্রভুকে উপহার স্বরূপ প্রদান করেন। অমর-বনকে কেউ কেউ 'আম্র-কুঞ্জ' বলে থাকে।

'সামান্য ফল সুত্তা' বলেন যে,—অমর-বন বিহারে যেতে হ'লে অজাতশত্রুর প্রাচীর বেষ্টিত সহরের বাহির দিয়ে যেতে হয়। বুদ্ধ ঘোষ তাঁর টিপ্পনীতে যোগ দিয়েচেন,—'জীবকের আম্র-কুঞ্জ সহরের প্রাচীর ও গৃধ্রকূট পাহাড়ের মাঝামাঝি ছিলো। রাজা পূর্ব্বদিকের তোরণ দিয়েই গমনাগমন কর্‌তেন। একসময়ে তিনি বিহার ছেড়ে অন্য স্থানে গিয়েছিলেন। সেই সময়ে তাঁর বড্ড ভয় হ'য়েছিলো এই শুনে যে, তাঁকে হত্যা কর্‌বার জন্যে না কি এক ষড়যন্ত্র চল্‌চে। বুদ্ধ ঘোষ এইটা ব্যাখ্যা করে বলে' দিয়েছিলেন যে,—পূর্ব্বদিকের তোরণ দিয়ে সহর ছেড়ে রাজা এবং তাঁর পার্শ্ব-অনুচরেরা একটা পাহাড়ের ছায়ায় অন্ধকারময় স্থানে উপস্থিত হলেন।

তারপর ধর্ম্মপদের টীকাকার আমাদের জানিয়ে দেন যে,—বুদ্ধকে আঘাত কর্‌বার পরও যখন দেখ্‌লেন যে, তিনি অক্ষত শরীরে আছেন; তখন তিনি গৃধ্রকূটের চূড়ার ওপর হ'তে প্রকাণ্ড একখণ্ড পাথরের চাঙড় ছুড়ে তাঁকে হত্যা কর্‌বার চেষ্টা করে'ছিলেন। দেবদত্তের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। তখন বুদ্ধদেব অক্ষতদেহে প্রথমে "মাধো-কুচিতে" (Madda-kuchi) এবং তথা হ'তে জীবকের অমর-বনে গিয়েছিলেন। পূর্ব্ব দিকের তোরণ দিয়ে সহরে প্রবেশ করে' পাণ্ডব পর্ব্বতের ঢালুতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পাণ্ডব পর্ব্বত রত্নাগিরিকে বোঝায়। পূর্ব্বদিকের তোরণ অবশ্যই এর ঠিক পশ্চিমেই। এর মধ্যে দিয়েই অজাতশত্রু নগর ত্যাগ করেছিলেন। রত্নাগিরির দক্ষিণ-পশ্চিম বাঁকের মুখেই, পূর্ব্বদিকের তোরণের নিকটেই এবং গৃধ্রকূট ও নগরের প্রাচীরের মধ্যবর্ত্তী জীবকের অমর-বন। এই বাঁকের নাগালের মধ্যে কোনো অন্ধকার স্থান ছিলো না। অমর-বন তাহ'লে এইখানেই হোক্ কিম্বা এর কাছাকাছি কোথাও।

চৈনিক বিবরণী পড়ে' আমরা জান্‌তে পারি যে, পাহাড় বেষ্টিত নগরের উত্তর পূর্ব্বের বক্রটাই জীবকের অমর-বন;—যেহেতু রত্নাগিরির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ ঠিক নগরের প্রাচীরের বাহিরের দিকে। যদি এগুলো সত্য হয় তাহ'লে

তা' নিশ্চিত। কৌটিল্যের (Kautillya) অর্থশাস্ত্রে আমরা পাই যে, রাজার হাতীশালা সুরক্ষিত সহরের দক্ষিণ-পূর্ব্বে ছিলো। যদি অজাতশত্রুর হাতীশালা অমর-বনের ভিতরেই হ'তো, তা' হ'লে চৈনিক তীর্থযাত্রীরা রাজগৃহের দক্ষিণ দিক দিয়ে যাত্রা আরম্ভ করে' অমর-বনে পৌঁছুতেন। সুতরাং এও একটা অতিরিক্ত কারণ যে, অজাতশত্রুর হাতীশালা অমর-বনের মধ্যে মোটেই নয়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে এও লেখা আছে যে, ধনভাণ্ডার নির্ম্মাণের জন্যে নানাপ্রকার শক্ত কাঠ দিয়ে ওটা নির্ম্মিত হ'য়েছিলো। মহিলাদের কক্ষ অনেকগুলি—সবগুলিই একটি করে' পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত ও উন্নত প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। প্রত্যেক ঘরে একটা একটা করে' দরজা ছিলো। রাজপ্রাসাদের মতো, ধনভাণ্ডারও মাটীর নীচে হ'তো। মহিলাদের কক্ষগুলির মেঝে পাথর দিয়ে মোড়া। প্রত্যেক কক্ষে একটা করে' চৌকা কূয়াও থাক্‌তো। গুপ্ত রাস্তার অভাব ছিলো না। মিঃ জ্যাক্‌সন্ সাহেব সহরের দক্ষিণ দিকটায় একটা চৌকা কূয়া (ওপরটা চৌকা কিন্তু ভেতরটা গোলাকার) দেখ্‌তে পান। ইহাই মহিলাদের কক্ষের কূয়া তিনি প্রমাণ করেছেন। সুতরাং রাজার প্রমোদ গৃহ অমর-বনের কাছাকাছি কোনও স্থানে নিশ্চয়ই ছিলো। একটু আগেই বলেচি, জীবক যুবরাজ অভয়ের সঙ্গে বেশীর ভাগ সময়ই থাক্‌তেন। যদি এই বন হ'তে রাজবাড়ী বেশীদূর হ'তো, তা হ'লে কখনই তিনি সেখানে থাক্‌তেন না। সুতরাং তিনি এমন জায়গায় থাক্‌তেন, ; যেখানে গৃধ্রকূট ও অমর-বন দুই-ই কাছাকাছি। কারণ, তিনি বুদ্ধ ও সঙ্ঘের সেবার জন্যেই নিযুক্ত হ'য়েছিলেন।

হুয়েন্‌সাঙের বিবরণী পড়ে' আমরা জান্‌তে পারি যে, বুদ্ধদেব 'সঙ্ঘরমে' *(Sangharama) বাস কর্‌তেন। অমর-বনের মধ্যে এইরূপ অনেকগুলি সঙ্ঘরম্ ছিলো এবং তিনি যে সঙ্ঘরমে থাক্‌তেন, তার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে হাত কয়েকের মধ্যেই রাজপ্রাসাদ পড়্‌তো। বৌদ্ধ সাহিত্যের সহিত চৈনিক বিবরণী মিশিয়ে দিয়ে আমরা শেষ মীমাংসা কর্‌বো যে, অমর-বন রাজপ্রাসাদের ও গৃধ্রকূটের নিকটবর্ত্তী স্থানেই ছিলো।

'জরাসন্ধের পাঠশালা' কুণ্ডে যাবার রাস্তাতেই পড়ে। এখন এর আছে কেবল গোটাকতক থাম ছড়ানো অবস্থায়। এটা যে পাঠশালা ছিলো, তার কোনো প্রমাণ নেই। হিন্দুদের বিষয়ে তখন সকলে ঔদাসিন্য দেখিয়েছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের তখন বিজয়-বৈজয়ন্তী—হিন্দুদের অবস্থা ততো সুবিধাজনক মোটেই ছিলো না। পালি গ্রন্থে পাঠশালার কথা কিছুই লেখা নেই। হয়তো বা এটা পাণ্ডাদের নিজস্ব কল্পনা। এখন পাঠশালার বিনিময়ে গোশালা হ'তে বসেচে।

এখন পাথরের ফাঁকে ফাঁকে সবুজ গাছ দেখা দিয়েচে। গ্রামের যত রাখাল গোচারণ মাঠ ভেবে গাভী ও ছাগের দলকে এইখানেই ছেড়ে দেয়। তাদের গলার ঘণ্টার শব্দে পাশের বিপ্লাচল হ'তে মাঝে মাঝে শুনতে পাওয়া যায়। হিন্দুদের যা কিছু জীর্ণতম কীর্ত্তি এখনো আছে, অন্যজাতির সহানুভূতিতে তা' আর থাক্‌বে না বোধ হয় বেশীদিন। সিঁড়ির অস্তিত্ব এখনো সব মিলিয়ে যায়নি। তারই ওপর দাঁড়িয়ে আমরা দেখ্‌লুম, হিন্দুর এই পবিত্র স্থান মুসলমানের কবরে ভর্ত্তি। কোন্ যুগে, কোন্ সাহসী পুরুষ এরূপ আজ্ঞা দিয়েছিলেন, তা' ইতিহাসে লেখা নেই। তিনি আমাদের ঘৃণ্য হ'লেও, তাঁর সাহসকে প্রশংসা না কর্‌লে প্রকারান্তে তাঁকে অবমাননা করা হয়। কবরগুলোর অবস্থা এখন আমাদেরি ন্যায় ভগ্নপ্রায়, প্রাণহীন।

'অজাতশত্রুর' স্তূপের কথা বলেই এইবার শেষ কর্‌বো। এ সম্বন্ধে পরিপূর্ণরূপে লিখ্‌তে গেলে আরো অনেক কিছু লিখ্‌তে হয়, যেমন ইন্দ্রশালা গুহা, বালগঙ্গা, আম-বসন্ত গ্রাম, পঞ্চানন নদী, যক্ষগিরি বা গিরিয়াক্, ইন্দ্রকূট ইত্যাদি। নূতন রাজগৃহের পশ্চিম দিকে, তোরণ হ'তে প্রায় এক মাইল দূরে, ফাহিয়ান্ বুদ্ধের ধ্বংসাবশেষ স্তূপ দেখেছিলেন। এখন আগ্নেয়গিরির মুখের ন্যায় দেখায়। এই ধ্বংসাবশেষের ওপর তদানীন্তন উপাসকবৃন্দ নানাবিধ সুগন্ধি ও মালা দিতেন। তখন সবচেয়ে পবিত্র পুষ্প ছিলো 'কসিটাকি' (Kositaki)। রাজা অজাতশত্রু তথাগতের মৃতদেহের ওপর এই স্তূপ তৈরী করিয়ে দিয়েছিলেন বলেই একে 'অজাতশত্রুর স্তূপ' বলে। তিনি এই স্তূপ রাজধানীর উত্তরে নির্ম্মাণ করিয়েছিলেন। হুয়েনসাঙ্ এই মত পোষণ করেন। তিনি বলেচেন,—"এই প্রকার একটা দামী ও পবিত্র স্তূপ স্বভাবতঃ নিশ্চয়ই পুরাতন সহরের উত্তরে এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুদের শ্রেষ্ঠ আশ্রমের নিকটেই ছিলো। আজ পর্য্যন্ত কোনো সন্তোষজনক প্রমাণ পাওয়া যায়নি, যা থেকে আমরা বিশ্বাস কর্‌বো,—অজাতশত্রু বেণুবন বেষ্টিত উপত্যকায় নূতন নগর নির্ম্মাণ করেছিলেন। সম্রাট অশোকের মতে,—এই স্তূপ নূতন রাজগৃহের পশ্চিমেই; কেননা, পুরাতন নগর ঢের আগেই রাজা অজাতশত্রু সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন। তিনি পাহাড়বেষ্টিত নীচের সমতল ভূমিতে বাস কর্‌তেন এবং শোভাযাত্রা করে' অমর-বন বিহারে বুদ্ধদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌তে বাহির হ'তেন।

মহাপারিনি বান সুত্ত (Mahaparini Bhana Sutta) উল্লেখ করে' গেছেন,—'মহা কাশ্যপের অনুনয়ে রাজা অজাতশত্রু একটি অট্টালিকা মাটীর নীচে গুপ্তভাবে নির্ম্মাণ করেছিলেন,—তথাগতের দেহাবশেষ লুকিয়ে রাখ্‌বার জন্যে। এই রকম অট্টালিকাকে পালি ভাষায় 'ধাতু মিধানা' (Dhatu Midhana) কহে। সম্রাট অশোক এই লুক্কায়িত স্থান হ'তে তথাগতের দেহাবশেষ নিয়ে গিয়ে সহরের দক্ষিণপূর্ব্বে একটা পাহাড় কেটে ৮০ হাত গভীর

একটি গর্ত্ত খুঁড়ে আর একটা ধাতুনির্ম্মিত একটা ধাতুমিধানা তৈরী করেছিলেন। এই গর্ত্তের মধ্যে একটি সুরক্ষিত কক্ষ ছিলো, তার মধ্যে এই দেহাবশেষ থাক্‌তো। বেণুবনের পূর্ব্ব দিকে খানিকটা গেলে 'অজাতশত্রুর স্তূপ' দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

উপসংহারে আমাদের কিছুই বল্‌বার নেই। 'রাজগৃহ' শেষ কর্‌বার সময়ে 'নালন্দ' আরম্ভ কর্‌বার পূর্ব্বে শুধু একটি কথা বল্‌বো, যে কথাটা আমাদের মধ্যে সময়ে অসময়ে হ'তো। যেদিন রাজগীর ছেড়ে আবার ছোট গাড়ীতে উঠ্‌লুম সেদিনও সেই কথা,—"যদি ক্যামেরা ও গোটাকতক প্লেট থাক্‌তো, না জানি তাহ'লে আরো কতটা আমোদ পাওয়া যেতো।"

—শেষ—
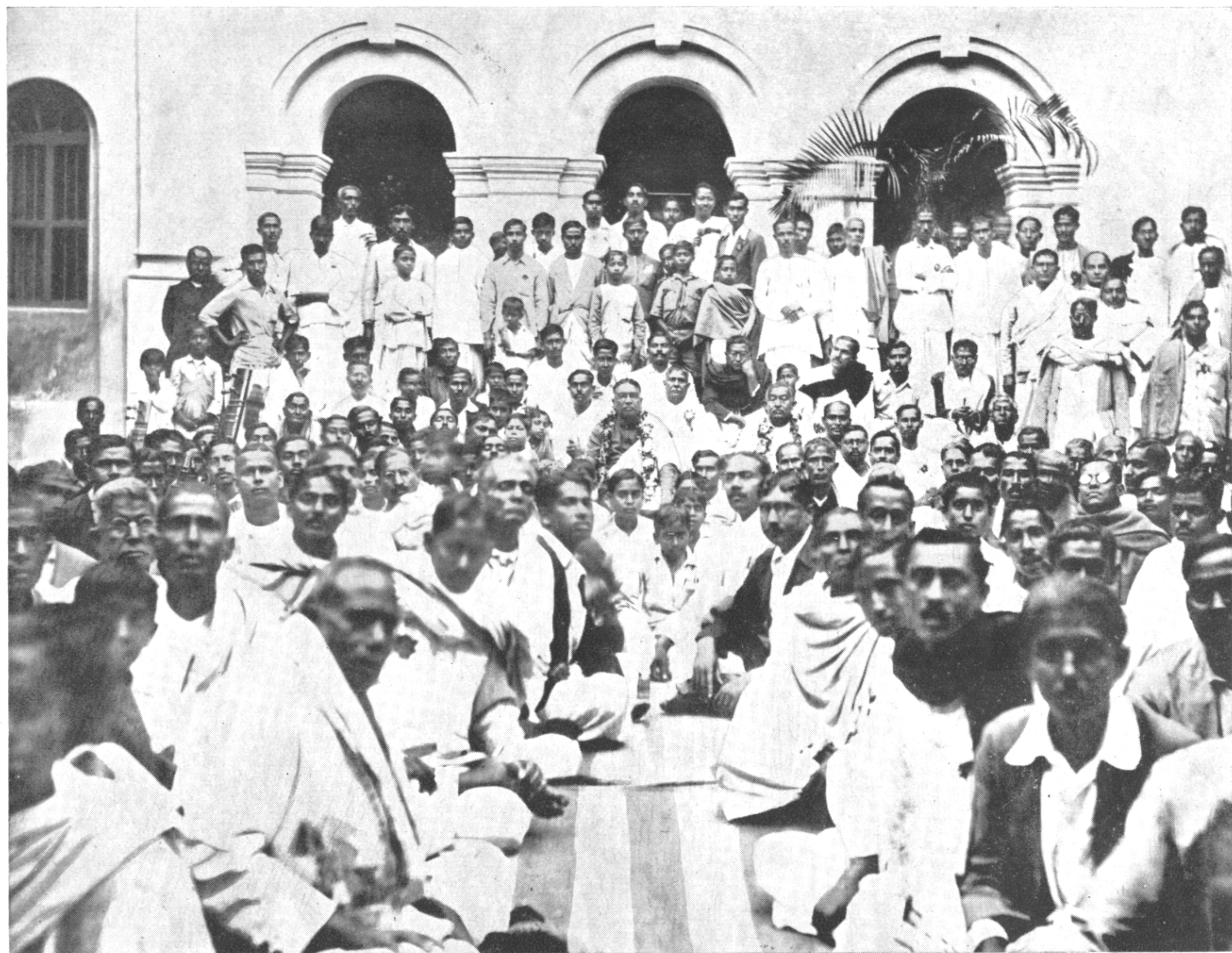
চণ্ডীতলায় নিখিল-বঙ্গ-সদ্গোপ সম্মিলনীর চতুর্থ অধিবেশন।

সম্মিলনীর মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী, এম-এ, পি-আর-এস, পি-এইচ-ডি,

চতুর্থ নিখিল-বঙ্গ-সদ্গোপ-সম্মিলনী

বিগত ৩রা ফাল্গুন রবিবার হুগলী জেলার অন্তর্গত চণ্ডীতলা গ্রামে বঙ্গীয় সদ্গোপ সভার উদ্যোগে নিখিল-বঙ্গ-সদ্গোপ-সম্মিলনীর চতুর্থ অধিবেশন শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র কুমার মহাশয়ের গৃহের সুবিস্তৃত অঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়। গৃহটি এবং উহার সম্মুখস্থ পথের বহুদূর পর্য্যন্ত বেশ সুসজ্জিত করা হইয়াছিল এবং সমাগত ভদ্রমহোদয়গণের সুখ-সুবিধার জন্য মধ্যে মধ্যে স্বেচ্ছাসেবকের ব্যবস্থা ছিল। সম্মিলনীতে কলিকাতা, হাওড়া, হুগলী, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, ২৪ পরগণা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদহ প্রভৃতি সদ্গোপ-অধ্যুষিত সকল জেলা হইতে প্রতিনিধিবর্গ আসিয়াছিলেন এবং স্থানীয় বহু স্বজাতীয়া মহিলাও যোগদান করিয়াছিলেন। প্রায় চারিশত ভদ্রমহোদয় ও মহিলার সমাগম হইয়াছিল। বেলা প্রায় ১১৷৷০টার সময় মঙ্গলাচরণ সঙ্গীত গীত হইলে সম্মিলনীর উদ্বোধন হয়। হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্-এ, বি-এল্ মহাশয়ের সম্মিলনীর পৌরহিত্য করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও কোন অনিবার্য্য কারণ বশতঃ তিনি চণ্ডীতলায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। সেইজন্য তাঁহার স্থলে অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী, এম্-এ, পি-আর-এস্, পি-এইচ্-ডি মহাশয় সর্ব্বসম্মতিতে সভাপতির পদে বৃত হন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র কুমার মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিলে সভাপতির (শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের) অভিভাষণ পঠিত হয়। বেলা ১২৷৷০টার সময় হইতে বিষয় নির্ব্বাচনী-সমিতির কার্য্যের জন্য সাধারণ-সভার কার্য্য বন্ধ থাকে এবং বৈকাল ৩৷৷০টার সময় পুনরায় উহা আরম্ভ হয়। এই সময় স্বজাতির সামাজিক ও আর্থিক উন্নতির জন্য অনেকগুলি প্রস্তাব উত্থাপিত ও গৃহীত হয়। সন্ধ্যা ৫৷৷০ ঘটিকার সময় সভাপতি ও সমবেত ভদ্রমণ্ডলীকে ধন্যবাদানান্তে সম্মিলনীর কার্য্য সম্পন্ন করা হয়। এই উপলক্ষে শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র কুমার মহাশয়, তাহার পরিবারবর্গ এবং চণ্ডীতলাবাসী স্বজাতিগন অভ্যাগত ভদ্রমহোদয়গণকে আদর আপ্যায়ন ও ভূরিভোজন দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন। সকলের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে ঐক্যতান বাদনেরও ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। অভ্যর্থনা-সমিতি ও চণ্ডীতলাবাসিগণ সমাগত ব্যক্তিবর্গের সুখ-সুবিধা ও সম্বর্দ্ধনার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম ও যত্ন করিয়া যে স্বজাতি প্রীতি প্রদর্শন করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহাদিগকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ

সমবেত ভদ্রমহোদয়গণ,

ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া হুগলী জেলার স্বজাতীয়দের পক্ষ হইতে আমি আপনাদিগকে আজ সাদরে অভিবাদন করিতেছি। আপনারা প্রসন্ন হইলে আমরা কৃতার্থ হইব।

আজ সত্যই আমাদের বড় আনন্দের দিন। জাতির সামাজিক উন্নতি করিতে হইলে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবেই সে চেষ্টা করা উচিত। পূর্ব্বে যে তিনটী সম্মিলনী হইয়া গিয়াছে, তাহার ফলে সমগ্রজাতির মধ্যে যে প্রেরণা ও প্রাণের স্পন্দনের সাড়া পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে এই প্রকার সম্মিলনীর উপকারিতা নিঃসংশয়রূপে প্রমাণিত হইয়াছে। নানাকারণে এ কয়বৎসর সম্মিলনীর অধিবেশন হইতে পারে নাই। আমাদিগকেও বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আপনাদের মত স্বজাতির সুসন্তানের অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। সুতরাং এই সম্মিলন সঙ্ঘটনের জন্য উদ্যোক্তারা সত্যই গৌরব অনুভব করিতে পারে।

আমি জানি আমি এই কার্য্যের অযোগ্য। কিন্তু আমার স্বগ্রামবাসী বন্ধুগণ যখন আমাকে এই সম্মানের পদে আহ্বান করিয়াছিলেন, তখন সেই আহ্বানকে অস্বীকার করিয়া বিনয় প্রদর্শনের চেষ্টা করি নাই। বরং এই অযাচিত সম্মান লাভের সুযোগ করিয়া দিলেন বলিয়া মনে মনে তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করিয়াছি। কেননা, আমাদের কথা, আমাদের ব্যথা আমরা না বলিলে কে বলিবে? এই মিলন-সভায় আমরা আপনাদের শরণাপন্ন হইয়াছি, আপনাদের পরামর্শ প্রার্থনা করিতেছি। সমাজ-শরীরে যে সব ব্যাধি আশ্রয় লইয়াছে, তাহার প্রতিবিধানের উপায় কি নির্দ্দেশ করিয়া দিলে, আমরা পরম উপকৃত হইব এবং এই মিলনেরও বিশেষ সার্থকতা প্রতিপন্ন হইবে।

পুণ্যতোয়া সরস্বতী নদীর তীরে এই চণ্ডীতলা গ্রাম অবস্থিত। এখানে যে কয় ঘর সদ্গোপ আছেন তাঁহারা কৃষিকেই উপজীবিকা করিয়াছেন; দুই-চারিটী বর্দ্ধিষ্ণু পরিবার পাট ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন। দুঃখের বিষয় যাঁহারা ব্যবসায়ে বা অন্য উপায়ে কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন তাঁহারা গ্রাম ছাড়িয়া সহরে যাইয়া বসবাস করিতেছেন; সুতরাং গ্রামের উন্নতি না হইয়া অবনতিই হইতেছে।

এইখানে একটী কথা নিবেদন করিতে চাই, আশা করি আপনারা চিন্তা করিয়া দেখিবেন। যাঁহারা এখনো গ্রামে বাস করিতেছেন তাঁহাদের ক্ষেত্রলব্ধ ফসল দ্বারাই সম্বৎসর সংসার প্রতিপালন

করিতে হয়। কিন্তু পিতার বিষয়ে সমস্ত সন্তানগণের সমান অধিকার থাকে বলিয়া ভূমি খণ্ডিত হইতে হইতে এরূপ ক্ষুদ্র হইয়া দাঁড়ায় যে চাষ করিয়া কোন ফলই হয় না; এইরূপ অল্প পরিসর জমিতে বৈজ্ঞানিক উপায়ও অবলম্বিত হইতে পারে না; ফলে কৃষক সমাজের দারিদ্র্য বাড়িয়াই যাইতেছে। সুতরাং ইহার প্রতিকার কি? আমার মনে হয় উত্তরাধিকার আইনের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন আবশ্যক এবং সেজন্য জনমত গড়িয়া তোলা প্রয়োজন। মাননীয় সভাপতি এ বিষয়ে পথ দেখাইবেন আশা করি।

স্বজাতীয় বন্ধুগণের মুখে প্রায়ই একটা কথা শুনি—আমাদের নাকি স্বজাতি প্রীতি নাই অর্থাৎ প্রতিষ্ঠাবান্ সদ্গোপ মহোদয়গণ স্বজাতীয় ভ্রাতাদের সাহায্য করেন না। এ বিষয়ে বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি জাতির দৃষ্টান্ত দিতেও শুনিয়াছি। কথাটা ভাবিয়া দেখিবার মত। দিন দিন আমাদের মধ্যে শিক্ষা বাড়িতেছে এবং সে-জন্য চাক্‌রীর মায়াও গভীরতর হইতেছে। অথচ সুযোগ কিছুই নাই। ইণ্ডিয়া বিলে যদি আমরা 'অবনত শ্রেণী' বা 'ডিপ্রেস্‌ড্ ক্লাস্' বলিয়া গণ্য হইতাম, তাহা হইলে আমাদের লেখা-পড়া-জানা ছেলেদের কিছু সুবিধা হইতে পারিত। পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণ-কায়স্থ শ্রেণীর শিক্ষিতদের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার অনুরূপ যোগ্যতা আমরা এখনো অর্জ্জন করি নাই; ফলে আমাদের হইয়াছে ত্রিশঙ্কুরের অবস্থা। এরূপক্ষেত্রে যদি স্বজাতীয় ভ্রাতৃগণকে পক্ষপাত না দেখান তাহা হইলে এইরূপ সম্মিলনী ব্যর্থ হইবে।

আমরা সাধারণতঃ রক্ষণশীল; কোন চলিত প্রথার পরিবর্ত্তন বা পরিবর্জ্জন সহজে করিতে চাহি না। কিন্তু কালের হাওয়ার সহিত যদি আমরা পা-ফেলিয়া চলিতে না পারি তাহা হইলে আমাদের মৃত্যু অনিবার্য্য। হিন্দুধর্ম্মের প্রসারনীতির প্রভাবে আদিম বা অস্পৃশ্যজাতি চাষের কাজ করিতে করিতে নিম্নশ্রেণীর হিন্দু-সমাজ অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে; তাহারাই আবার কালক্রমে দাস, রায়, গুপ্ত, শূর ইত্যাদি উপাধির জোরে বৈশ্য, বৈদ্য, ক্ষত্রিয়, সদ্গোপ প্রভৃতি হইয়া পড়ে। ইহাই হইল বর্ত্তমান সমাজ গঠন ধারা। এই সকল কথা হয়ত প্রীতিকর নয়, কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য। অধিকন্তু স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তার ও যৌবনবিবাহের ফলে সমাজ-গঠনের পরিবর্ত্তন হইবেই। এরূপ ক্ষেত্রে যদি সদ্গোপ যুবক ভিন্নজাতীয়া নারীকে বিবাহ করে তবে তাহাদের সন্তানগণকে সদ্গোপ বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়াই বাঞ্ছনীয়, কেননা, তাহা না হইলে সমাজের কৃতী সন্তানগণকেই পরিবর্জ্জন করিতে হইবে এবং তাহার ফলে বুদ্ধিহীন স্বজাতিমণ্ডলীকেই লইয়া গৌরব (?) করিতে হইবে। বিধবা-বিবাহ সমর্থন করিয়া আমরা যেরূপ সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছি, এই সম্মিলনীতে আমার এই

স্বাস্থ্য শিক্ষা, পণপ্রথা প্রভৃতি বিষয়ে বহু আলোচনা পূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছে, সুতরাং সে বিষয়ে কোন কথা বলিয়া আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি করিতে চাহি না। এইখানেই বক্তব্য শেষ করিতেছি। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যাহা উদয় হইয়াছে, তাহাই সংক্ষেপে নিবেদন করিলাম। আপনাদের নিকট অনেক নূতন কথা শুনিব আশা করিতেছি। আপনারা আমাদের দোষ-ক্রটী মার্জ্জনা করিয়া আমাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিলে আমরা সত্যই কৃতার্থ হইব।

উপসংহারে আমার এই নিবেদন যে, আপনাদিগের মধ্যে যাহারা এখন পর্য্যন্ত বঙ্গীয় সদ্গোপ সভার সভ্যভুক্ত হন নাই তাঁহারা যেন অবিলম্বে এই সভায় যোগদান করিয়া সভার কার্য্যের সহায়তা করেন এবং স্বজাতির উন্নতিসাধনে বদ্ধপরিকর হন। আপনারা অনুগ্রহ করিয়া অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছেন তজ্জন্য আমি চণ্ডীতলা নিবাসী স্বজাতীয় পক্ষ হইতে আপনাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। ইতি—

১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৬
চণ্ডীতলা।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র কুমার
সভাপতি, অভ্যর্থনা সমিতি
চতুর্থ নিখিল-বঙ্গ-সদ্গোপ সম্মিলনী।

সম্মিলনীর সভাপতির অভিভাষণ

আজ নিখিল-বঙ্গ সদ্গোপ সম্মিলনীর চতুর্থ অধিবেশন। হৃদয়ে বহু আশা পোষণ করিয়া ১৯২৮ সালের ২৪শে ডিসেম্বরে স্বনামধন্য স্বজাতিপ্রেমিক ৺ত্রৈলোক্যনাথ পাল মহাশয়ের সভাপতিত্বে এই সম্মিলনী প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনের মুদ্রিত কার্য্যবিবরণীতে ১৬টী প্রস্তাব দৃষ্ট হয়। দ্বিতীয় অধিবেশন সম্মানীয় কৃতবিদ্য শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী মহাশয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। কলিকাতার সদ্গোপ সভার বর্ত্তমান সুযোগ্য সম্পাদক স্বজাতি-সেবক শ্রীযুক্ত শরৎলাল বিশ্বাস মহাশয় সম্মিলনীর তৃতীয় অধিবেশনের সভাপতি হইয়াছিলেন।

প্রথম অধিবেশনের ১৬টী প্রস্তাব তৃতীয় অধিবেশনে সংখ্যায় ২৩টী এবং আয়তনে প্রায় দ্বিগুণিত হইতে দেখা যায়। কিন্তু তাহা হইলেও এই তিন অধিবেশনের প্রস্তাবগুলির মধ্যে বস্তুগত পার্থক্য নাই বলিলেও চলে। ইহা হইতে বুঝিতে হইবে যে **সদ্গোপ জাতির ব্যাধির বেদনা** আমরা সকলেই প্রথম হইতেই সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিয়া আসিতেছি।

কিন্তু **ব্যাধির নিরাকরণ বা প্রতিষেধ** আজ আট বৎসরে কোনও অংশে সাধিত হইয়াছে বা হইতেছে ইহার বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। সম্মিলনীর প্রস্তাব সকল এবং কার্য্যকলাপ ভাব ও ভাষায় উন্মেষিত হইয়া আজ পর্য্যন্ত ভাব এবং ভাষাতেই পর্য্যস্ত হইয়া আসিতেছে বলিয়াই মনে হয়।

আজ আট বৎসর ধরিয়া আমরা যে কেবল **ভাব এবং ভাষার হিসাব নিকাশ** লইয়াই আছি ইহা নিঃসন্দেহই দুঃখের বিষয়। তবে এই ভাব এবং ভাষামাত্র বিনিময়ের জন্যও এই সম্মিলনীর আবাহন যে একেবারে নিরর্থক ইহাও আমি কোনমতে স্বীকার করিতে পারি না। সদ্গোপ জাতির মধ্যে যাঁহারা শিক্ষিত এবং সম্পন্ন এবং অবস্থা এবং আচার হিসাবে যাঁহারা ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থাদি উন্নত জাতিভুক্ত ব্যক্তি সাধারণের সমকক্ষ বলিয়া গৌরব করার অধিকারী, তাঁহারা অনেক সময়েই ভুলিয়া যান যে, তাঁহাদের সমগ্র জাতি এবং সম্প্রদায়ের ভারকেন্দ্র, যে অঞ্চলে তাঁহাদের নিজ দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপ নির্ব্বাহ হইয়া থাকে সেখানে নয়; এই ভারকেন্দ্র পশ্চিম বাঙ্গালার ক্রমবর্দ্ধমান অনুর্ব্বরতাদুষ্ট জেলা সকলের মাঠে এবং প্রান্তরে ও তৎসন্নিহিত দরিদ্র সদ্গোপকৃষকগণের পল্লী এবং কুটীরগুলিতে। এই পল্লী এবং কুটীরনিবাসী দুঃস্থ সম্প্রদায় যে আমাদের নিতান্ত আপন এবং আত্মীয়—একথা নগর এবং উপনগরনিবাসী অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন মধ্যবিত্ত সদ্গোপগণকে বারংবার স্মরণ এবং হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিয়া সম্মিলনী

কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে **সম্মিলনীর মুখ্য উদ্দেশ্য** হইতেছে—এই কৃষিজীবিবহুল দুঃস্থ জাতির সংরক্ষণ ও উৎকর্ষসাধন। যতদিন সম্মিলনী এই উদ্দেশ্য কিয়ৎ-পরিমাণেও সফল করার দিকে অগ্রসর হইতে না পারিবে এবং অগ্রসর হইয়াছে প্রমাণ করিয়া দিতে অপারক থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত নিশ্চয়ই বলিতে হইবে যে, সম্মিলনীর মূল উদ্দেশ্য অসাধিত রহিয়াই গিয়াছে।

সম্মিলনীর এই **মুখ্য উদ্দেশ্যের বহির্ভূত অপরাপর** যে সকল উদ্দেশ্য সম্মিলনীর কার্য্যবিবরণীগুলিতে স্থান লাভ করিয়াছে সেগুলিকে তা বলিয়া আমি আদৌ উপেক্ষনীয় মনে করি না। সদ্গোপজাতির মধ্যে শ্রেণীবিভাগ নিরাকরণ, বাল্যবিবাহ ও বাল্যমাতৃত্ববর্জ্জন, যেখানে পণ লইয়া কন্যাদানের প্রথা প্রচলিত আছে এবং অপরপক্ষে যেখানে পণ লইয়া কন্যাগ্রহণের বিধি প্রচলিত হইতে চলিতেছে এই উভয় প্রথারই উচ্ছেদসাধন, বিধবাবিবাহ ও অশৌচান্তের সময় সংক্ষেপের বিরোধী সংস্কারগুলির উন্মূলন, সাময়িক ক্রিয়াকলাপে বাহ্যাড়ম্বরঘটিতব্যয়সংকোচ —এ সবগুলিই সমাজের সৌষ্ঠব এবং উন্নতিবিধানের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়; এবং এই সমাজ-সংস্কারগুলি আমাদের নিজেদের চেষ্টা ও অধ্যবসায় দ্বারাই সংসাধিত হইতে পারিবে; বাহির হইতে উপরপড়া হইয়া আসিয়া অন্য কেহ আমাদের জন্য ইহা করিয়া দিয়া যাইবে না। বক্তৃতা এবং বহুল আলোচনা দ্বারা এই সংস্কারগুলির আশু প্রয়োজনীয়তা এখন সদ্গোপ সাধারণের সকলেই রীতিমত উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন বলিয়াই আমার মনে হয়। এখন এই সংস্কারগুলি সম্বন্ধে কাজ না দেখাইয়া কেবলমাত্র বক্তৃতা শুনাইয়া যাওয়া শক্তিক্ষয়কারক এবং সেই কারণে দোষাবহ হইয়া দাঁড়াইতেছে। "এখন কথার কাজ শেষ হয়েছে কাজের কাজ চাই"। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে বক্তৃতার ফলে যতটা হউক বা না হউক, অবস্থাবিপর্য্যয়ের চাপে এই সংস্কারগুলির অনুশীলন, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, কিছু কিছু অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। সামাজিক ক্রিয়া ঘটিত ব্যয়সংকোচপক্ষে কিন্তু কোনও সফলতা এখনও লক্ষ্য হইতেছে না। ইহাও কিন্তু নিতান্ত সহজ-সাধ্য হইতে পারে যদি যাঁহারা ব্যয় করিতে সমর্থ তাঁহারা মাত্র একমত হইয়া কিছু আত্মসংযমের জন্য বদ্ধপরিকর হয়েন। এই সমাজসংস্কারটী কলিকাতাস্থ বঙ্গীয় সদ্গোপ সভারই অনুষ্ঠের বিশিষ্ট ব্রত হওয়া উচিত; এবং আশা হইতেছে হইবেও।

সমাজভুক্ত কোনও বালকবালিকা যাহাতে অন্ততঃ প্রাথমিক শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হইয়া না থাকে ইহা আজকার দিনের সকল সমাজ এবং সম্প্রদায়েরই একটি অপরিহার্য্য লক্ষ্য। নূতন সরকারী আইনের সহায়তায় এ উদ্দেশ্যটী অনেকটা সুসাধ্য হইবে আশা করা যায়।

এখন **সম্মিলনীর** যাহা **মুখ্য উদ্দেশ্য**—সদ্গোপ জাতির দারিদ্র্য বিমোচন—ইহার জন্য সম্মিলনীর উদ্যোক্তাগণ কি করিতে পারেন বা করিবেন—এ বিষয়ে কিছু আলোচনা আবশ্যক।

এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সম্মিলনীর কার্য্য বিবরণীগুলিতে লিপিবদ্ধ বর্ত্তমান প্রোগ্রাম হইতেছে এই :—

(১) "এই সম্মিলনী শিল্প, বাণিজ্য, গোরক্ষা, গোপালন ও কৃষির প্রতি প্রত্যেক সদ্গোপ, বিশেষতঃ যুবকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন"।

(২) "সদ্গোপ জাতীয় কৃষিজীবিগণের দারিদ্র্যনিরাকরণ ও ঋণমুক্তির জন্য সদ্গোপবহুল স্থানে সম্মিলনীর সমবায়মূলক ঋণদান সমিতি ও ক্রয়বিক্রয় সমিতি প্রতিষ্ঠা করার ও উন্নত প্রণালীর কৃষিকার্য্যাবলী পত্রিকায় প্রচার ও তৎসম্বন্ধে উপদেশ প্রদানের জন্য সদ্গোপদিগকে অনুরোধ করিতেছেন ও কলিকাতায় কেন্দ্রীয় সমবায় ঋণদান সমিতি গঠন করিবার জন্য বঙ্গীয় সদ্গোপ সভাকে উদ্যোগী হইতে অনুরোধ করিতেছেন"।

এখন বেকার ভদ্র সন্তানের সংখ্যা বাঙ্গলার সকল জাতির মধ্যেই এত অধিক যে প্রোগ্রামের প্রথম অংশটী সকল জাতির লোকসকলেই, বিশেষতঃ তাহাদের যুবকগণে, প্রযুজ্য হইতে পারে। কিন্তু ভুলিয়া যাইবেন না যে শিল্প, বাণিজ্য, গোরক্ষা, গোপালন ও কৃষি এ সকল অনুষ্ঠানগুলির মূল হইতেছে **দেশের জমি**।

দেশের যে জমি হইতে বর্ত্তমানে উৎপন্ন এবং আয় আসিয়া থাকে তাহাতে প্রোগ্রামের দ্বিতীয়াংশে উল্লিখিত কৃষিজীবিগণেরই সকলকে কুলায় না। গোরক্ষা, গোপালন ও কৃষিকার্য্যের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার আসরে ইহার উপর যদি দেশের বেকার ভদ্র সন্তানগণও নামিয়া পড়েন, তাহা হইলেত বর্ত্তমান চাষী এবং গোপালকদের একেবারে চক্ষুস্থির! ইহা বর্ত্তমানে প্রকৃত প্রস্তাবে অসম্ভব।

ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে বাঙ্গলার চাষী এবং গোপালক সম্প্রদায় সদ্গোপ জাতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে।

চল্‌তি শিল্পের আসরে ভদ্র যুবকদের আবির্ভাবে কি অবস্থা হইতেছে তাহা সহরে যে বহু সংখ্যক জুতার কারবার এবং Washing and Cleaning Houses হইয়াছে, তাহাদের ফলে দেশের ধোপা এবং মুচিরা কিরূপভাবে exploited, তাহা একটু অনুসন্ধান করিলেই বুঝা যাইবে। আর চল্‌তি বাণিজ্য? Producer এবং Consummerদের মধ্যে Middlemenদের সংখ্যা-বৃদ্ধিতে আখেরে কোনও সম্প্রদায়ই উপকৃত হয় না।

যেমন নূতন জমি চাই, তেমনই নূতন শিল্প এবং নূতন বাণিজ্যের সৃষ্টি করা আবশ্যক।

নূতন শিল্প ও নূতন বাণিজ্য সৃষ্টি বহু বিজ্ঞান, ব্যয় ও যত্ন সাপেক্ষ। সরকারের সহায়তা ভিন্ন ইহা হওয়া সুদুষ্কর। সৌভাগ্যক্রমে সম্প্রতি এদিকে সরকারের দৃষ্টি কিছু কিছু আকৃষ্ট হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

নূতন জমি? পশ্চিম বঙ্গের সদ্গোপবহুল অঞ্চলগুলিতে লাভে নূতন করিয়া আবাদে আনার উপযোগী পতিত জমিত নাইই—বরং আবাদি জমি যাহা ছিল তাহাও দুর্ণিবার Soil-erosionএর প্রকোপে বৎসরের পর বৎসর সমধিক পরিমাণে অনুর্ব্বর এবং অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছে। যে বর্ষার বৃষ্টিধারার আশায় চাষী সারা বৎসর ধরিয়া উন্মুখ হইয়া থাকে এবং যাহার অভাবে দুর্ভিক্ষ এবং অনশন অনপনেয়, সেই বৃষ্টিধারাই আবার চোরের মত তাহার জমির সার এবং সত্ব ধুইয়া লইয়া নদীগত করিতেছে। ইহাতে নদীরও গভীরতার ক্রমশঃ হ্রাস করিয়া সময়ে সময়ে মারাত্মক বন্যারও সৃষ্টি করিয়া থাকে। এইরূপ বন্যার প্লাবন সাধারণতঃ জমির অনুপকার ছাড়া উপকার করে না। পূর্ব্ববঙ্গে বৎসর বৎসর যে জলপ্লাবন হইয়া থাকে তাহার ধরণ অন্য; তাহাতে মোটের মাথায় জমির উৎপাদিকা শক্তি সংরক্ষণই করে। নদীগর্ভগুলি dredger দিয়া কাটিয়া সাফ করার প্রস্তাব হামেশা আলোচিত হইতে দেখা যায়। ইহাতে এই আকস্মিক বন্যাগুলির কতক প্রতিষেধ করিতে পারে বটে, কিন্তু Soil-erosion তাহাতে বৃদ্ধিই করিতে থাকিবে। অপহৃতসার জমিগুলিতে বিলাত এবং আমেরিকায় এ যাবত চল্‌তি উন্নত কৃষিপ্রণালীর প্রয়োগে শেষ পর্য্যন্ত ঐ জমিগুলিকে সত্বক্ষয়ের পথে আরও আগাইয়া দিবে। এক্ষণে যাঁহারা সরকারে চাকরি করেন এবং যাঁহারা Voterদের প্রতিনিধি স্বরূপে Councilএ প্রেরিত হন, তাঁহারা কেহ যে পশ্চিমবঙ্গের কৃষিজীবিদের এই সঙ্গীণ অবস্থা সম্বন্ধে মাথা ঘামাইতেছেন বা ইহা অবগতও আছেন ইহার কোনও লক্ষণই দেখা যায় না। অথচ, পশ্চিম বঙ্গের এই Soil-erosionএর সমস্যা তুলনায় পূর্ব্ববঙ্গের পাটচাষের সমস্যা হইতে গুরুত্বে কিছুমাত্র ন্যূন নহে। মনে রাখিতে হইবে যে এই Soil-erosion উৎপাত, শুধু সদ্গোপ জাতির নয়, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের চাষীসম্প্রদায়ের এবং পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের আদি মূলধন জমির উত্তরোত্তর ক্ষীণতা সম্পাদন করিয়া চলিতেছে। বর্ত্তমান অবস্থায় এক সুন্দরবনের জঙ্গল আবাদে আনিতে না পারিলে বেকার মধ্যবিত্ত যুবকদের কথাত ছাড়িয়াই দিলাম—বেকার কৃষিপরিবারদেরও মুখে ভাত দেওয়া সম্ভব হইবে না।

উল্লিখিত বিষয়গুলি পর্য্যালোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, সদ্গোপ যুবকদিগকে যত উচ্চকণ্ঠেই শিল্প, বাণিজ্য, গোরক্ষা, গোপালন ও কৃষি অবলম্বনের জন্য আমরা উপদেশ দিই না কেন—আপাততঃ উহা অরণ্যে রোদনেই দাঁড়াইবে।

বর্ত্তমান অবস্থায় সমবায় মূলক প্রতিষ্ঠানসকল দ্বারা যে যথেষ্ট উপকার সাধিত হইতে পারে ইহা অস্বীকার করা যায় না। এ অনুষ্ঠানগুলি কিন্তু আমরা যে জন্য চালাইতে চাই তাহা বেসরকারী হিসাবে চালান অসম্ভব। শুধু সদ্গোপজাতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ বেসরকারী Co-operative Societyর প্রতিষ্ঠা ও সঞ্চালনের কল্পনা সেইজন্য আমার মনে আকাশকুসুমেরই মত প্রতীয়মান হয়। সরকারী যে Co-operative প্রতিষ্ঠানগুলি বর্ত্তমানে আছে এখনকার প্রয়োজনীয়তার পক্ষে তাহাই পর্য্যাপ্ত—এখন উহাদেরই সুযোগ সকল সুকৌশলে লওয়া লইয়াই কথা।

আমি যে Soil-erosion উৎপাতের কথা আলোচনা করিলাম তাহাও সদ্গোপ জাতি বা অন্য কোনও জাতি বা সম্প্রদায় বিশেষ বা সম্প্রদায়-সঙ্ঘ দ্বারা ঠেকান যাইবে না। সরকারের কর্ত্তৃত্বাধীনে ভিন্ন ইহা হইতেই পারে না। এ কার্য্য সরকারের দ্বারা করাইয়া লইতে হইবে।

কিন্তু ইহা হইয়া উঠে কেমন করিয়া ?

ইহার একমাত্র উপায় হইতেছে, যে যে সকল কৃষিজীবিবহুল জাতির পশ্চিমবঙ্গে বাস—ও যাহাদের মধ্যে সদ্গোপজাতি অন্যতম—তাহাদের সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া যাহাতে তাহারা নূতন ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে প্রতিনিধি পাঠাইয়া পশ্চিমবঙ্গে কৃষিজীবিদিগের এই সঙ্গীন অবস্থা সরকারের গোচরে আনয়ন করিতে পারে ইহার ব্যবস্থা করা। Soil-erosion নিবারণ বহুব্যয় ও যত্নসাপেক্ষ ব্যাপার। অথচ এখন হইতেই ইহার ব্যবস্থা না করিতে পারিলে, শেষ পর্য্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ অধিবাসিগণ দ্রুতবেগে বিনাশের মুখে পতিত হইবে।

অনেকে হয়ত এই পর্য্যন্ত শুনিয়া মনে করিবেন সভাপতি নিজে **রাজনৈতিক প্রস্তাব** উত্থাপিত করেন কেন? যেখানে সরকার ভিন্ন গতি নাই সেখানে Councilএ প্রতিনিধি পাঠাইয়া আমাদের দুঃখ ও দৈন্য সরকারের গোচরে আনা আর কিছু হউক বা না হউক দুষ্টরাজনীতি নহে। নূতন ব্যবস্থাপক আইনে হীন অবস্থাপন্ন লোকেরা Constitutional উপায় অবলম্বনে তাঁহাদের মতামত সরকারের গোচরে আনিতে পারেন ইহা এখনকার গভর্ণমেণ্টের একান্ত অভিপ্রেত। আমাদের কথায় এবং কার্য্যপ্রণালীতে কোথাও কিছুমাত্র রাজনৈতিক আভাষ বা ইঙ্গিত (তা ভালই হউক বা মন্দই হউক) থাকিলেই যে সর্ব্বনাশ ডাকিয়া আনা হইবে এ আশঙ্কা এখনকার দিনে একেবারেই অমূলক বলিয়াই জানিবেন। তবে সম্মিলনীর কার্য্যে এবং কথায় দুষ্টরাজনীতি প্রবেশলাভ না করে ইহা সভাপতি মাত্রেরই বিশেষ দ্রষ্টব্য—আমি অন্ততঃ আজ তাহা দেখিবই।

বর্ত্তমান অবস্থায় আমি সমগ্র কৃষি সম্প্রদায়ের জন্য কোনও এক রাইয়ত সমিতি স্থাপনের আদৌ পক্ষপাতী নহি। এদেশের রাইয়তেরা এদেশের শ্রমজীবিদিগেরই মত অশিক্ষিত এবং অপটু। এরূপ সমিতি গঠিত হইলে প্রায়শঃই দেখা যায় যে, কোনও কোনও মধ্যবিত্ত Politicianই তাহার মোড়ল হইয়া বসিয়া উপায় অপেক্ষা অপায়েরই ব্যবস্থা করেন। আমি কৃসিজীবিবহুল জাতিগণের মধ্যে যেরূপ সহযোগিতা স্থাপনের প্রস্তাব করিতেছি—তাহা অন্য প্রকারের।

আমাদের জাতির শিক্ষিতগণের দ্বারা যেমন কলিকাতার বঙ্গীয় সদ্গোপ সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং কার্য্য করিতেছে ঐরূপ অন্যান্য অনেক জাতির শিক্ষিতগণও স্ব স্ব জাতীয় সভা এবং সমিতি গঠন এবং চালনা করিয়া আসিতেছেন। এই সকল সমিতিগুলির মধ্যে আমাদের অবস্থাপন্ন অনুন্নত অনেক সমিতি আছেন যাঁহাদের সঙ্গে Councilএ প্রতিনিধি পাঠান সম্বন্ধে একতা এবং সহযোগিতা স্থাপন অনধিক চেষ্টায় সম্ভব হইতে পারে। এই সকল সমিতিগুলির কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি সকল প্রত্যেকে দেশের স্বজাতিবর্গের মতামতের উপর যথেষ্ট ক্ষমতা সঞ্চালন করিতে পারেন ও করিয়া থাকেন—ইহার প্রমাণ আমি নানাদিক হইতে পাইতেছি। ইহাদের সহায়তায় কার্য্য উঠাইতে পারিলে আমাদের অশিক্ষিত এবং অপটু স্বজাতিবর্গ কোনও ক্রমেই কৃতবিদ্য অপর উন্নত জাতীয় জনবিশেষের কর্ত্তৃত্বাধীনে পড়িয়া পথভ্রান্ত হইতে পারিবে না।

সম্মিলনীর এই চতুর্থ অধিবেশনকে ভাষা এবং ভাববিনিময়ের সীমা ছাড়াইয়া কিছু কিছু কর্ম্মের দিকে লইয়া যাওয়ার সাধ্যমত চেষ্টা করিলাম। আশা করি এই চেষ্টা একেবারে নিস্ফল হইবে না। যদি হয়—"যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ"।

এক্ষণে এই সম্মিলনীর সভাপতিত্বে মনোনীত হইয়া আমি যে সম্মানিত হইয়াছি তাহার জন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইয়া আমি এই অভিভাষণের উপসংহার করিলাম।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ।

আমাদের কথা

নিখিল-বঙ্গ-সদ্‌গোপ সম্মিলনীর চতুর্থ অধিবেশনে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের সভাপতির অভিভাষণ প্রত্যেকেরই অবধানযোগ্য। অভিভাষণটি যদিও সংক্ষিপ্ত, তথাপি ইহাতে সমাজ-সমস্যার নানা চিন্তনীয় বিষয় এরূপ সুকৌশলে সন্নিবেশিত হইয়াছে যে, পঠনমাত্রেই উহা আমাদের সমাজের বর্ত্তমান সমস্যার একটি সুস্পষ্ট চিত্র চক্ষের সম্মুখে উপস্থাপিত করে এবং স্বতঃই মনকে তদ্বিষয়ে চিন্তান্বিত করিয়া তুলে। গতানুগতিকভাবে অভিভাষণটি স্বজাতির অতীত গৌরব কাহিনীতে অথবা ভাবরাজ্যের ভাবময় বাক্যে মুখরিত নহে। মান্যবর নগেন্দ্রবাবু ভারতীয় ইতিহাস-বেত্তা এবং দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ;—স্বজাতির অতীত গৌরব এবং ভাবময় কথা তিনি সমধিক পরিজ্ঞাত এবং সুললিত শব্দ-ঝঙ্কারে তাহা আলোচনা করিয়া সাধারণকে পুলকিত ও উদ্দীপ্ত করা তাঁহার পক্ষে সহজসাধ্য। তথাপি সে সকল পরিহার করিয়া সাংসারিক জীবনে যাহা আমাদের আশু প্রয়োজন—যাহার সহিত আমাদের সুখ-দুঃখ ওতপ্রোতভাবে সম্মিলিত—যাহা লইয়া বর্ত্তমানে ও অদূর ভবিষ্যতে আমাদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিতে হইবে, মুখ্যতঃ সেই সকল অপরিহার্য্য বিষয়বস্তুগুলি তিনি সহজ সরল ভাষায় যৌক্তিকতার সহিত আলোচনা করিয়াছেন। কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নতি ব্যতীত আমাদের এই দরিদ্র জীবন্মৃতপ্রায় ক্ষয়িষ্ণু সম্প্রদায়ের যে প্রাণবন্ত হইবার উপায় নাই এবং এই উন্নতি কেবলমাত্র একটি সম্প্রদায় বিশেষের চেষ্টায় সাধিত হইতে পারে না,—সকল সম্প্রদায়ের সম্মিলিত চেষ্টা আবশ্যক, ইহা তিনি ধন-বিজ্ঞান-[illegible]ত উপায়ে সুস্পষ্টরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন।

আমরাও এই মতাবলম্বী। গত বৎসরের 'সদ্‌গোপ পত্রিকার' মাঘ মাসের সংখ্যাতে 'আমাদের আর্থিক উন্নতি' শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে আমরা ইহাই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। বস্তুতঃ, বর্ত্তমানে দেশের যে আর্থিক দুর্গতি উপস্থিত হইয়াছে, তাহা কোন একটি সম্প্রদায়গত নহে,—তাহা সার্ব্বজনীন ; সুতরাং তাহা দূরীভূত করিতে হইলে সকলকে সমবেতভাবে কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে। অবশ্য এই কার্য্যে গভর্ণমেণ্টের সহায়তা ব্যতীত সুফল-লাভ দুষ্কর। কিন্তু একথাও স্বীকার করিতে হয় যে, সাধারণের ইহাতে যথেষ্ট কর্ত্তব্য আছে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ ও হিতকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ সত্বর

মিলিত হইয়া যদি বর্ত্তমান দুর্গতির প্রতিকারে অগ্রসর না হন, তাহা হইলে অচিরে অবস্থা ভীষণতর শোচনীয় হইবে। সুখের বিষয়, গভর্ণমেণ্ট সম্প্রতি দেশের কৃষি ও শিল্পের উন্নতির দিকে অধিকতর মনোনিবেশ করিয়াছেন। যদিও তাঁহাদের চেষ্টা অভাবের অনুপাতে পর্য্যাপ্ত নহে, তথাপি এই সময়ে সকল সম্প্রদায় যদি একযোগে কার্য্য করিতে রত হয়, তাহা হইলে সকলেরই দুঃখ-দুর্দ্দশা অনেক পরিমাণে যে লাঘব হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রদ্ধেয় নগেন্দ্রবাবু স্বজাতির বিষয় গভীরভাবে চিন্তা করিয়া থাকেন; সেই জন্য স্বজাতির বেদনা কি ও কোথায় এবং উহা নিরাকরণের উপায় কি তাহা তিনি দর্শন করিতে পারিয়াছেন। কোনও প্রকার পাণ্ডিত্য প্রকাশ না করিয়া, কেবলমাত্র এই অতিশয় প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি অভিভাষণে আলোচনা করিয়া তিনি সুপণ্ডিতেরই কার্য্য করিয়াছেন।

* * * * *

সভাপতির অভিভাষণ যে কালোপযোগী এবং স্বজাতির কল্যাণপ্রদ হইয়াছে তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। কিন্তু আমরা উহাতে আলোচিত সকল বিষয় সমর্থন করিলেও, কেবল একটি ক্ষেত্রে আমরা ভিন্নপ্রকার মত পোষণ করি। পশ্চিম বঙ্গের জমির সত্তাক্ষয়ের সমস্যা (Soil erosion) আলোচনা করিয়া শ্রদ্ধেয় নগেন্দ্রবাবু বেকার কৃষকগণের অন্নসংস্থানের নিমিত্ত সুন্দরবনের জঙ্গলকে কৃষি-ক্ষেত্রে পরিণত করিবার কথা বলিয়াছেন। আমাদের ধারণা—আপাতদৃষ্টে কয়েক লক্ষ লোকের এই কার্য্যের দ্বারা অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা হইলেও, প্রকৃত সুফল লাভ হইবে না। সুন্দরবনের পরিমাণ কিঞ্চিদধিক ৪০০০ বর্গ মাইল, অর্থাৎ প্রায় ২৫ লক্ষ ৬০ হাজার একরের উপর। সদ্গোপ পত্রিকার গতমাসের স্বাস্থ্য-সংখ্যায় ক্যাপ্টেন শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী হাজরা 'বাঙ্গালীর খাদ্য ও অন্নসমস্যা' প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন যে—'কেবলমাত্র জীবনধারণের জন্য লোক প্রতি ১·২ একর জমির প্রয়োজন।' সুন্দরবনকে কৃষিভূমিতে পরিণত করিলে, তদনুপাতে বাঙ্গালাদেশের প্রায় ২১½ লক্ষ কৃষিজীবীর অন্নাভাব দূর হইতে পারে। বাঙ্গালার কৃষকগণের দুর্দ্দশার সীমা নাই—তাহারা সকলে দিনান্তে অর্দ্ধাহারও পায় না। পাইবেই বা কোথা হইতে! স্বর্ণপ্রসূ বঙ্গমাতা আজ তাঁহার সকল সন্তানকে উদরপূর্ণ করিয়া আহার দান করিতে পারিতেছেন না;—বাঙ্গলার জনসংখ্যা অনুযায়ী মাত্র ·৪৫ একর কর্ষিত ভূমি লোকপ্রতি পড়ে। এরূপ-ক্ষেত্রে যদি ২১½ লক্ষ লোকের কোনরূপে উদরপূর্ণের ব্যবস্থা করিতে পারা যায়, তাহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিতে পারে না।

কিন্তু এইস্থলে আমাদের বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে যে, সুবিস্তৃত সুন্দরবনের উচ্ছেদসাধন করিলে বিশেষপ্রকার ক্ষতির সম্ভাবনা আছে কি না। আমাদের মনে হয়—ইহার দ্বারা উপকারের তুলনায় অপকার অধিকতর হইতে পারে। সুন্দরবনের অস্তিত্ব এখনও আছে বলিয়া উহার নিকটস্থ কয়েকটি জেলার অর্থাৎ ২৪ পরগণা, খুলনা ও মেদিনীপুরের বহুস্থানব্যাপী বারিপাত হইয়া থাকে এবং তজ্জন্য তথায় কৃষিকর্ম্ম সুপরিচালিত হইয়া বহুলক্ষ লোকের অন্নসংস্থান হইতেছে। সুন্দরবনকে বিনষ্ট করিলে উহার নিকটস্থ স্থানগুলিতে বারিপাতের অভাব হইবে এবং তদ্দ্বারা কৃষিকর্ম্মের যে অনিষ্ট হইবে তাহাতে লক্ষ লক্ষ লোকের অন্নাভাব উপস্থিত হইতে পারে। কৃষির দিক দিয়া দেশের স্থানে স্থানে বনভূমির প্রয়োজন আছে ;—কারণ অরণ্যের একটি শক্তি হইতেছে মেঘাকর্ষণ করিয়া বারিপাত করান। অনেকে এরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে,—বর্দ্ধমান, বীরভূম প্রভৃতি পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলায় বৃষ্টিপাতের অভাবহেতু এখন বার বার যে অজন্মা উপস্থিত হইতেছে, যদি তথায় কোন উল্লেখযোগ্য অরণ্য থাকিত, তাহা হইলে ঐরূপ হইবার সম্ভাবনা প্রায় থাকিত না। পশ্চিমবঙ্গের মৃত্তিকাক্ষয় ও ভূমির উর্ব্বরাশক্তি নাশের প্রতিরোধ এবং তাহার সম্পূরণ করিতে হইলে, ভাগীরথী ও দামোদরের দ্বারা বাহিত যে প্রচুর পরিমাণে পলি সাগরগর্ভে গিয়া অযথা বিনষ্ট হইতেছে তাহা যাহাতে কৃষিভূমিতে নীত হইতে পারে, গভর্ণমেণ্টের সহায়তায় তাহার ব্যবস্থা করা সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত উপায় বলিয়া মনে করি।

সুন্দরবনকে বিনষ্ট করিলে বিশেষ ফললাভ হইবে না ; অধিকন্তু উহা হইতে এখন যে আয় হইতেছে এবং ভবিষ্যতে যে অধিকতর আয়ের আশা করা যায় তাহাও নির্ম্মূল হইয়া পড়িবে। আমাদের অভিমত—যদি ধনবিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সুন্দরবনের উন্নতিসাধন করা যায় তাহা হইলে উহা হইতে বিশেষপ্রকার অর্থাগম হইতে পারে এবং মধ্যবিত্ত বেকারগণের কথঞ্চিৎ অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা হইতে পারে। সুন্দরবনের উন্নতি করিতে হইলে, বনজদ্রব্যের গবেষণা বিভাগ (Forest Research Department), বনজদ্রব্যের বাণিজ্যবিভাগ (Forest Commerce Department) বনের সংরক্ষণ ও সংস্কারবিভাগ (Forest Engineering Department) এবং বনের কার্য্যপরিচালনা বিভাগ (Forest Management Department) সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপরিচালিত করা অতিশয় প্রয়োজন। এইপ্রকার

দেশের বর্ত্তমান আর্থিক অবনতির উন্নতি করিবার সহায়তা হইতে পারে। আমাদের অভিমত এইরূপ।

* * * *

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র কুমার মহাশয়ের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণটি তাঁহার স্বভাবসুলভ সৌজন্যে পরিপূর্ণ। তাঁহার স্বজাতি-প্রীতি যে কত গভীর তাহার পরিচয় এই অভিভাষণে পাওয়া যায়। তিনিও স্বজাতির সমাজ-সমস্যা ও আর্থিক সমস্যার কয়েকটী চিন্তনীয় বিষয় উত্থাপন করিয়াছেন;—আশা করি স্বজাতির হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ তদ্বিষয়ে চিন্তা করিবেন। তিনি তাঁহার অভিভাষণের একস্থলে কর্ষিত ভূমি ক্রমশঃ খণ্ডিত হইয়া কৃষিজীবিগণের যে দুর্দ্দশা সমুদ্ভব করিতেছে তাহা সুন্দরভাবে উত্থাপন করিয়া বলিয়াছেন—"...পিতার বিষয়ের সমস্ত সন্তানগণের সমান অধিকার থাকে বলিয়া ভূমি খণ্ডিত হইতে হইতে এরূপ ক্ষুদ্র হইয়া দাঁড়ায় যে চাষ করিয়া কোন ফলই হয় না; এরূপ অল্প পরিসর জমিতে বৈজ্ঞানিক উপায়ও অবলম্বিত হইতে পারে না; ফলে কৃষক সমাজের দারিদ্র্য বাড়িয়াই যাইতেছে। সুতরাং ইহার প্রতিকার কি? আমার মনে হয় উত্তরাধিকার আইনের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন আবশ্যক এবং সেজন্য জনমত গড়িয়া তোলা প্রয়োজন। মাননীয় সভাপতি এ বিষয়ে পথ দেখাইবেন আশা করি।" মান্যবর নগেন্দ্রবাবু সেদিন সম্মিলনীতে উপস্থিত ছিলেন না; সেইজন্য এ বিষয়ে তাঁহার অভিমত বিশদরূপে জানিবার সুযোগ আমাদের ঘটে নাই; তবে আমরা তাঁহার অভিভাষণের একস্থলে দেখিতে পাই—"অপহৃতসার জমিগুলিতে বিলাত এবং আমেরিকার এ যাবৎ চল্‌তি উন্নত কৃষিপ্রণালীর প্রয়োগে শেষ পর্য্যন্ত এই জমিগুলিকে সত্বক্ষয়ের পথে আরও দ্রুতবেগে আগাইয়া দিবে।"

পাশ্চাত্য উন্নত কৃষি-প্রণালী বর্ত্তমান অবস্থায় এ দেশে নানা কারণে অবলম্বন করিতে না পারিলেও এবং ক্রমখণ্ডিত ক্ষেত্রের আলি-বন্ধনের জন্য বহুপরিমাণে ভূমির অযথা অপচয়ের কথা ছাড়িয়া দিলেও, এ বিষয়ে বিশেষ শঙ্কার কারণ আছে। সম্প্রতি নারীর উত্তরাধিকার স্বত্বের যে পাণ্ডুলিপি বিধিবদ্ধ করিবার ব্যবস্থা চলিতেছে, তাহা কার্য্যে পরিণত হইলে, অবস্থা অধিকতর শোচনীয় হইবে বলিয়া মনে হয়। এ বিষয়ের প্রতিকার করিতে হইলে শ্রদ্ধেয় পূর্ণবাবুর কথামত উত্তরাধিকার-স্বত্বের বিধানের পরিবর্ত্তন হওয়া আবশ্যক। এ স্থলে কেহ যেন মনে না করেন যে, আমরা কেবলমাত্র জ্যেষ্ঠ-পুত্রের উত্তরাধিকার স্বত্বের বিধিব্যবস্থার

(Law of Primogeniture) কথা বলিতে চাই ; উহা কোন প্রকারে সমর্থন-যোগ্য নহে। আমরা এইরূপ বিধি-ব্যবস্থা সমর্থন করি যাহাতে কৃষিভূমি আর খণ্ডিত না হইতে পারে। কিন্তু কেবলমাত্র আইন পরিবর্ত্তনই এ বিষয়ে যথেষ্ট হইবে না—ইহার সঙ্গে সঙ্গে দেশের শিল্প বাণিজ্যেরও উন্নতি আবশ্যক। এ বিষয়ে আরও একটি কথা চিন্তা করিবার আছে ;—চল্লিশ বা পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের দেশে বর্ত্তমান উত্তরাধিকার-বিধানই প্রবর্ত্তিত ছিল, কিন্তু তখন ত' কৃষিক্ষেত্র বর্ত্তমানের মত ক্ষুদ্রাকারে খণ্ডিত হয় নাই! ইহার কারণ কি? এই প্রসঙ্গে একান্নবর্ত্তী পরিবারের কথা চিন্তা করিবার বিষয়। একান্নবর্ত্তী পরিবারে বসবাস করিতে হইলে বিষয়-সম্পত্তির প্রতি লোকের যে মনোবৃত্তির প্রয়োজন তাহা বিদূরিত হইতেছে। ভূমির ক্রম-খণ্ডন নিবারণ করিতে হইলে লোকের মনোবৃত্তিরও পরিবর্ত্তন আবশ্যক।

মাননীয় পূর্ণবাবু এইরূপ আরও কয়েকটি চিন্তা করিবার মত বিষয়ের অবতারণা করিয়া তাঁহার অভিভাষণটি বেশ মনোজ্ঞ ও হৃদয়গ্রাহী করিয়াছেন। তবে দুই একটি ক্ষেত্রে আমরা তাঁহার অনুমতাবলম্বী নহি ; যেমন, এক স্থলে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন—"হিন্দুধর্ম্মের প্রসার নীতির প্রভাবে আদিম বা অস্পৃশ্য জাতি চাষের কাজ করিতে করিতে নিম্নশ্রেণীর হিন্দু সমাজ অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে ; তাহারাই আবার কালক্রমে দাস, রায়, গুপ্ত, শূর ইত্যাদি উপাধির জোরে বৈশ্য, বৈদ্য, ক্ষত্রিয় সদ্গোপ প্রভৃতি হইয়া পড়ে।" আমরা এইরূপ মত পোষণ করিতে পারি না।

*　　　*　　　*　　　*

এই উপলক্ষে মাননীয় শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র কুমার মহাশয়কে কেবলমাত্র অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হিসাবে নয়, ব্যক্তিগতভাবেও আমরা আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করি। তিনিই সদ্গোপ যুবক-সঙ্ঘকে উক্ত সম্মিলনীতে যোগদান করিবার নিমিত্ত স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অভিভাষণের উপসংহার পরিবর্দ্ধন করিয়া সদ্গোপ-যুবক-সঙ্ঘ দ্বারা পরিচালিত এই 'সদ্গোপ পত্রিকা'র গুণবর্ণন করিয়াছিলেন এবং উহার গ্রাহক হইয়া যুবকগণকে স্বজাতির

ইহা তাঁহার হৃদয়ের প্রসারতারই পরিচায়ক। তাঁহার স্বজাতি যুবকগণকে তিনি স্নেহ করিয়া যে তাঁহার উদার হৃদয়ে স্থান দান করিয়াছেন এ জন্য আমরা তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

* * * * *

নিখিল-বঙ্গ-সদ্গোপ-সম্মিলনীর অনুষ্ঠান বঙ্গীয় সদ্গোপ সভার অন্যতম প্রশংসনীয় কার্য্য। বঙ্গীয় সদ্গোপ সভার কর্তৃপক্ষগণ ইহার উদ্যোক্তা এবং ইহার সকল কর্ম্মের ভার তাঁহাদেরই উপর ন্যস্ত। বৎসরান্তরে এইরূপ সম্মিলনীর অধিবেশনের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে,—ইহার দ্বারা জাতির প্রভূত কল্যাণ-সাধন হইতে পারে। এই হিতকর উদ্যমের জন্য সদ্গোপ সভার কর্তৃপক্ষগণ আমাদের ধন্যবাদার্হ। কিন্তু এই প্রসঙ্গে বিগত সম্মিলনীর সভাপতির অভিভাষণে একটি মন্তব্যের প্রতি আমরা তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। অভিভাষণের প্রথমাংশেই উক্ত হইয়াছে—"কিন্তু ব্যাধির নিরাকরণ বা প্রতিষেধ আজ আট বৎসরে কোনও অংশে সাধিত হইয়াছে বা হইতেছে এরূপ কোনও বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। সম্মিলনীর প্রস্তাব সকল এবং কার্য্যকলাপ ভাব ও ভাষায় উন্মেষিত হইয়া আজ পর্য্যন্ত ভাব ও ভাষাতেই পর্য্যন্ত হইয়া আসিতেছে বলিয়াই মনে হয়। আজ আট বৎসর ধরিয়া আমরা যে কেবল ভাব এবং ভাষার হিসাব-নিকাষ লইয়াই আছি ইহা নিঃসন্দেহেই দুঃখের বিষয়।"

ইহার দ্বারা কর্তৃপক্ষগণের কর্ম্মনিষ্ঠার অভাবই প্রমাণিত হইতেছে। সম্মিলনীতে তাঁহারা ইহার কোন প্রতিবাদ বা এইরূপ হইবার কোন কারণ প্রদর্শন করেন নাই,—তাঁহারা এই বিষয়ে মৌন ছিলেন। সুতরাং আমাদের ধরিয়া লইতে হয় যে, ইহাতে তাঁহাদের কিছু বলিবার নাই,—মৌনভাবেই তাঁহারা এই ত্রুটী স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। ত্রুটী-স্বীকার সততার পরিচায়ক; এবং সে হিসাবে এই মৌনাবলম্বন প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। আশা করি এইবার তাঁহারা মৌন-স্তব্ধভাব ভঙ্গ করিয়া তাঁহাদের উক্ত কর্ম্মশৈথিল্য দোষ স্খালনে প্রবৃত্ত হইবেন। মানুষ সময়ে সময়ে চক্ষু-কর্ণ বন্ধ করিয়া নির্ব্বিবাদে কর্ত্তব্য কর্ম্মকে এড়াইবার নিমিত্ত ত্রুটী-স্বীকারের অন্তরালে আত্মগোপন করিতে মৌনাবলম্বনের অপব্যবহারও করিয়া থাকে— এই অপবাদ ভবিষ্যতে তাঁহাদের উপর যেন আরোপিত না হয়। বঙ্গীয় সদ্গোপ সভা স্বজাতির গৌরব—ইহার কর্ম্ম-প্রতিভা জাতির প্রভূত হিতসাধন করিয়াছে, এবং বহু স্বজাতিকে কৃতজ্ঞতা-

পাশে আবদ্ধ করিয়াছে ; আজ সে প্রতিভা যদি ম্লান হইতে বসে তাহা হইলে বড়ই পরিতাপের বিষয় হইবে। সুশিক্ষিত, পদস্থ, ধনী, প্রতিষ্ঠাবান্, সম্মানীয় ব্যক্তিগণ ইহার কর্ণধার ;—তাঁহারা যদি সামান্য চেষ্টা করেন, তাহা হইলে স্বজাতির নানা প্রকার প্রত্যক্ষ উন্নতি সহজে ও সত্বরে সাধিত হইতে পারে। সদ্গোপ জনসাধারণ বঙ্গীয়-সদ্গোপ-সভার উপর আস্থাবান্ ; সে আস্থা যেন চিরকাল অটুট থাকে ইহাই আমরা আন্তরিকতার সহিত কামনা করি।

*　　*　　*　　*

আরও একটি কথা,—এ বৎসর সম্মিলনীর কার্য্য যেরূপ ত্বরিতভাবে পরিচালিত হইয়াছিল তাহাতে সকলে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। বিষয়-নির্ব্বাচনী সমিতির কার্য্য শেষ হইবার পর যখন বেলা ৩॥০ ঘটিকার সময় সাধারণ সভা আরম্ভ হয়, তখন প্রথমেই ঘোষণা করা করা হইল যে, সন্ধ্যা ৫॥০টার মধ্যে সম্মিলনীর সকল কার্য্য শেষ করিতে হইবে। এই অল্প সময়ের মধ্যে ২০৷২২টি প্রস্তাব উত্থাপিত ও গৃহীত হয় ; সুতরাং ঐগুলি কিরূপে আলোচিত হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। কাহারও কাহারও কতকগুলি প্রস্তাব সম্পর্কে কিছু বলিবার ছিল—কিন্তু তাঁহাদের তাহা বলা হয় নাই। অবশ্য সভার নিয়ম-রক্ষার নিমিত্ত প্রতিনিধিবর্গকে প্রত্যেক প্রস্তাবের জন্য মতামত প্রকাশ করিতে অনুরোধ করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে সময়ের অল্পতার কথা স্মরণ করিয়া দেওয়াতে অনেকের পক্ষে সে অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভবপর হয় নাই। ইহা ব্যতীত সম্মিলনীর সভাপতির অভিভাষণে ও অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণে উক্ত কতকগুলি অত্যাবশ্যক বিষয়ের আলোচনা করা বিশেষ প্রয়োজন ছিল, কিন্তু তাহাও করা হয় নাই। যে সম্মিলনী লক্ষ লক্ষ লোকের সুখ-দুঃখের কথা আলোচনা করিবার জন্য অনুষ্ঠিত তাহার কার্য্য এত সত্বর সম্পন্ন করা কখনই সুশোভন হয় না। আশা করি, ভবিষ্যতে যাহাতে এরূপ না ঘটে তাহার জন্য সম্মিলনীর কর্ত্তৃপক্ষগণ বিশেষরূপে অবহিত হইবেন।

*　　*　　*　　*

সুপ্রসিদ্ধ ধনী ব্যবসায়ী স্বজাতিবৎসল শ্রীযুক্ত ভূতনাথ কোলে মহাশয় এবার ২৯ নং ওয়ার্ড হইতে কলিকাতা কর্পোরেশনের সদস্য-পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। নানা কারণে তিনি কলিকাতার বহু করদাতার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট এবং তাঁহাদের বিষয় তিনি

সমধিক পরিজ্ঞাত; অধিকন্তু তিনি জনহিত-ব্রতী,—বহু হিতকর অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানে তিনি সাহায্য করিয়া থাকেন এবং হাসপাতাল, স্কুল প্রভৃতি স্থাপন-কার্য্যে বহু অর্থ দান করেন। এই সকলের জন্য তিনি সাধারণের সমাদৃত ও সম্মানিত। তাঁহার নির্ব্বাচন উপযুক্ত কার্য্যই হইয়াছে। এই নির্ব্বাচন-সাফল্যে আমরা তাঁহাকে আমাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। আশা করি কলিকাতা মহানগরীর পৌরজনসেবায় ব্রতী হইয়া তিনি অধিকতর সুনাম অর্জ্জন করিবেন এবং স্বজাতির গৌরব বর্দ্ধন করিবেন।

নিয়মাবলী

১ সমস্ত টাকা কড়ি যুবকসঙ্ঘের ধনাধ্যক্ষের নামে ১৩/১, শ্যামরত্ন লেন, কলিকাতা এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

২। রাজনৈতিক কোন প্রবন্ধ পত্রিকাতে আলোচিত হয় না।

৩। লেখক-লেখিকাগণের মতামত পত্রিকা সম্পাদক বা সদ্গোপ যুবকসঙ্ঘের মতামত নহে।

৪। লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।

৫। প্রবন্ধ কাগজের একপৃষ্ঠে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া পত্রিকা-সম্পাদকের নামে ৩৪ নং ইণ্ডিয়ান মিরার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। ডাকমাশুল না পাঠাইলে অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরত দেওয়া হয় না। প্রবন্ধ পাঠাইবার সময় আপত্তি না জানাইলে পত্রিকা পরিচালক মণ্ডলী প্রবন্ধের যে কোন অংশ পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন করিতে পারিবেন।

৬। যুবক-সঙ্ঘ ও তাহার পত্রিকা সম্বন্ধীয় যাবতীয় সংবাদ যুবক-সঙ্ঘ অফিস ৩৪ নং ইণ্ডিয়ান মিরার ষ্ট্রীটে জ্ঞাতব্য। সন্ধ্যা ৮টা হইতে ৯॥০টা পর্য্যন্ত অফিস খোলা থাকে।

৭। বিজ্ঞাপনের হার সাধারণ এক পৃষ্ঠা মাসিক ৮৲, আধ পৃষ্ঠা ৪॥০, সিকি পৃষ্ঠা ২।৵০, সূচীর নীম্নে আধ পৃষ্ঠা ৬৲, সিকি পৃষ্ঠা ৩॥০। বিশেষ বিশেষ স্থানে বিজ্ঞাপনের মূল্য প্রকাশকের নিকট জ্ঞাতব্য।

সদ্গোপ পাত্র-পাত্রীর

বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী

(১) সদ্গোপ পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপন বিনামূল্যে প্রকাশ করা হইবে। কেবলমাত্র পত্রিকার গ্রাহক-গ্রাহিকাগণই এই সুবিধা পাইবেন। কিন্তু স্থানাভাব বা অন্য কোন কারণ বশতঃ এই বিষয়ে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশ না করিবার ক্ষমতা সদ্গোপ যুবক সঙ্ঘের কর্ত্তৃত্বাধীন। (২) বিজ্ঞাপন-গুলি স্পষ্টাক্ষরে ও সংক্ষিপ্ত হওয়া আবশ্যক। উহা যেন এই পত্রিকার ৩ লাইনের অধিক না হয়। (৩) বিজ্ঞাপনে বিবৃত বিবরণের জন্য আমরা দায়ী নহি। পাত্র-পাত্রীর সম্বন্ধ নির্ণয়কারিগণ সমস্ত বিষয় তাঁহারা নিজেদের দায়িত্বে করিবেন। (৪) যাঁহারা নিজেদের নাম প্রকাশ না করিয়া বক্স নম্বর দিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা যদি আমাদের কার্য্যালয় হইতে পত্রাদি লইয়া না যান, তবে উহা প্রেরণের জন্য তাঁহাদিগকে আমাদের নিকট উপযুক্ত (অন্ততঃ আট আনার) ডাকটিকেট রাখিতে হইবে।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ নিয়োগী কর্ত্তৃক দি নিউ ইণ্ডিয়ান প্রেস—৬, ডাফ ষ্ট্রীট হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সম্পাদক—শ্রীতারকনাথ হাজরা।

সূচী

১।	বেদন (কবিতা)	...	শ্রীকানাইলাল হাজরা	১৬
২।	সুবর্ণ সৃষ্টি (প্রবন্ধ)	...	শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সুর	১৬
৩।	সুপ্তস্মৃতি (গল্প)	...	শ্রীসমর পাল	১৭
৪।	প্রলয়-বিষাণ (কবিতা)	...	কুমারী সুলেখা হালদার	১৭
৫।	চতুর্ব্বর্গ (নাটক)	...	শ্রীশ্রীশচন্দ্র কুমার এম-এ, বি-এল	১৭
৬।	ঘূর্ণী (গল্প)	...	শ্রীশচীন্দ্রনাথ সুর	১৮
৭।	সংবাদিকা	...		১৮৮
৮।	আমাদের কথা	...		১৯

সদ্গোপ পাত্র-পাত্রী

পাত্র চাই—একটী চতুর্দ্দশবর্ষীয়া স্বাস্থ্যবতী শ্যামবর্ণা বাঙ্গলা লেখাপড়ায় অভিজ্ঞা গৃহকর্ম্মে নিপুণা পূর্ব্বকুল মৌদ্‌গোল্য গোত্র পাত্রীর জন্য একটী শিক্ষিত ব্যবসায়ী স্বাস্থ্যবান্ পাত্র চাই। যৌতুক ২০০০৲ টাকা। বক্স নং ৩ সদ্গোপ পত্রিকা।

পাত্রী চাই—একটী গ্রাজুয়েট শিলং প্রদেশের ব্যবসায়ী সুদর্শন ভালকো কুলীন বংশের পাত্রের জন্য একটী ১৭।১৮ বৎসর বয়স্কা সুন্দরী শিক্ষিতা ভাল্‌কো ঘর ব্যতীত পাত্রী চাই। কুলীন না হইলেও চলিবে। যৌতুকাদি কিছুই নাই। বক্স নং ৮ সদ্গোপ পত্রিকা।

পাত্রী চাই—ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারীং স্কুলের শেষ পরীক্ষোত্তীর্ণ মেদিনীপুর ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের অধীনস্থ কর্ম্মচারী একটী স্বাস্থ্যবান্ সুদর্শন যুবকের জন্য একটী সুন্দরী গৃহকর্ম্মে নিপুণা পাত্রী আবশ্যক। বক্স নং ১০ সদ্গোপ পত্রিকা।

পাত্রী চাই—একটি স্বাস্থ্যবান্ সুশ্রী শিক্ষিত, বিশিষ্ট ইঞ্জিনীয়ারের পুত্র, রেডিও ব্যবসায়ী ২২।২৩ বৎসরের যুবকের জন্য একটি স্বাস্থ্যবতী সুন্দরী শিক্ষিতা পাত্রী আবশ্যক। বক্স নং ১১ সদ্গোপ পত্রিকা।

পাত্রী চাই—বি-এ ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র, ২০।২১ বৎসরের স্বাস্থ্যবান্ পাত্রের জন্য একটি সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী, শিক্ষিতা, সূচীশিল্পে সুনিপুণা, ধনশালী গৃহের পাত্রী আবশ্যক। পাত্রের পিতা ২৫০৲ বেতনে গভর্ণমেণ্ট চাকরী করেন এবং হুগলী ও মেদিনীপুর জেলায় তাঁহার বিষয়-সম্পত্তি আছে। বক্স নং ১৩ সদ্গোপ পত্রিকা।

পাত্রী চাই—একটি জি-ডি-এ পাশ স্বাস্থ্যবান যুবকের জন্য একটি সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী, সাধারণভাবে শিক্ষিতা ১৭।১৮ বৎসর বয়স্কা পাত্রী আবশ্যক। পাত্র বর্ত্তমানে একটি অডিট অফিসের কর্ম্মচারী,—ভবিষ্যতে নিজের অফিস স্থাপনের সম্ভবনা আছে। বক্স নং ১৪ সদ্গোপ পত্রিকা।

৭ম বর্ষ] বৈশাখ, ১৩৪৩ [৬ষ্ঠ সংখ্যা

বেদন

[শ্রীকানাইলাল হাজরা]

(ওগো) লুকিয়ে তুমি কোথায় আছ ;—
দরশ দিয়ে যাও।
(আজি) ঝড়ের রাতে পরাণ-বীণায়
মধুর গীতি গাও।

এসে তুমি আঁধার-রাতে
রূপের প্রদীপ ধরি' হাতে ;—
জীর্ণ-কুঠীর সেই আলোতে
পূর্ণ করে দাও।

আধেক-রাতে ধরা যখন
গভীর ঘুমে হবে মগন,
মানস-পটে রেখো চরণ,—
ভুল করোনা তাও।

তোমার লাগি' রচি ডালা,
গাঁথি আশার রঙীন মালা,
জুড়াও আমার হৃদয়-জ্বালা,
চরণ-মূলে নাও।

সুবর্ণ-সৃষ্টি

[শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সুর]

নিকৃষ্ট ধাতুকে সুবর্ণে পরিণত করিবার প্রচেষ্টা মানুষের চিরন্তন। আমাদের হিন্দু বৈজ্ঞানিকগণ এ বিষয়ে অগ্রণী। তাঁহাদের ধারণা ছিল যে, 'কষ্টিপাথর' নামে এক অমূল্য পাথর আছে এবং তাহার বিশেষ গুণ এই যে, তাহার সংস্পর্শে লৌহ স্বর্ণে পরিণত হয়। এই ধারণা যে কতদূর সত্য তাহা বলা যায় না; তবে ইহার বশবর্ত্তী হইয়া অনেকে পাগলের ন্যায় এই কষ্টিপাথরের সন্ধানে বাহির হন। সনাতন এবং ক্ষ্যাপাও এই কষ্টি পাথরের সন্ধানে বাহির হইয়াছিলেন।

মধ্যযুগের ইউরোপীয় রসায়ন-শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণেরও স্বর্ণ তৈয়ারী করিবার প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল এই যে, প্রত্যেক ধাতুই পারা এবং গন্ধকের সহিত অন্যান্য নিকৃষ্ট দ্রব্যের সংমিশ্রণে প্রস্তুত। স্বর্ণ ধাতুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সুতরাং স্বর্ণের মধ্যে এই নিকৃষ্ট দ্রব্য বর্ত্তমান নাই, উহা খালি পারা এবং গন্ধকের সংমিশ্রণ। তাহা হইলেই সীসক, লৌহ প্রভৃতি ধাতু হইতে স্বর্ণ তৈয়ারী আর বিশেষ শক্ত কি? কোন প্রকারে ঐ নিকৃষ্ট দ্রব্যগুলি সীসা প্রভৃতি ধাতু হইতে বাহির করিয়া দিতে পারিলেই হইল। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া বহু রসায়নশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত সীসা প্রভৃতি ধাতু হইতে নিকৃষ্ট দ্রব্যগুলি বাহির করিয়া দিবার জন্য দিবারাত্র চেষ্টা করেন। কিন্তু শুধু চেষ্টায় কি হইবে! সীসা কিম্বা লৌহের সহিত স্বর্ণের প্রভেদ ত শুধু ঐ নিকৃষ্ট দ্রব্যগুলিতেই পর্য্যবসিত নহে! সুতরাং স্বর্ণ প্রস্তুত হইল না।

যাহা হউক, আধুনিক বিজ্ঞানের অভ্যুদয়ে ঐ মধ্যযুগের পণ্ডিতগণের প্রচেষ্টা একরকম চাপা পড়িয়া গেল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে স্যার জে, জে, টমসন (Sir J. J. Thomson) প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণের আবিষ্কারের ফলে এই প্রচেষ্টা পুনরায় দ্বিগুণ উৎসাহে দেখা দিল। নানাবিধ গবেষণার পর ইহা প্রমাণিত হইল যে, শুধু স্বর্ণ কেন, প্রয়োজন হইলে আরও অনেক পদার্থই বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহাদের পরীক্ষাগারে সৃষ্টি করিতে পারেন। এখন সেই সকল গবেষণার ফলাফল বিবৃত করা হইবে।

উনবিংশ শতাব্দীর রসায়নশাস্ত্রবিদ্‌গণের ধারণা ছিল যে প্রত্যেক পদার্থই কতকগুলি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরমাণুর (atom) সমষ্টি। এই পরমাণুই সেই পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ, এবং প্রত্যেক পদার্থের পরমাণু অন্যান্য পদার্থের পরমাণু হইতে ভিন্ন। স্যার জে, জে, টমসন (Sir J. J. Thomson) এবং লর্ড রাদারফোর্ড (Lord Rutherford) প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণের গবেষণায় ইহা প্রমাণিত হইল যে পরমাণুই কোন পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ নহে। প্রত্যেক পরমাণুও অন্যান্য ক্ষুদ্রতর তাড়িদাণুর সমষ্টি। সেই তাড়িদাণুগুলি হইতেছে - ইলেক্‌ট্রন্ (electron) এবং প্রোটন্ (proton)। এই ইলেক্‌ট্রন এবং প্রোটনগুলির বিভিন্ন সমাবেশের ফলে ভিন্ন ভিন্ন পরমাণু এবং পদার্থের সৃষ্টি হয়। প্রত্যেক পরমাণুতেই ইলেক্‌ট্রনের সংখ্যা প্রোটনের সংখ্যার সমান। ইলেক্‌ট্রনের ওজন একটি হাইড্রোজেন (hydrogen) পরমাণুর ওজনের ১৮৩৬ ভাগের এক ভাগ।

এখন এই ইলেকট্রন এবং প্রোটন কিরূপভাবে কোন পরমাণু বিশেষে সমাবিষ্ট আছে তাহা জানা আবশ্যক। প্রত্যেক পরমাণুতেই সমস্তগুলি প্রোটন এবং কতকগুলি ইলেকট্রন পরমাণুটির মাঝখানে একটি কেন্দ্রস্বরূপ হইয়া আছে, এবং অবশিষ্ট ইলেকট্রনগুলি গ্রহগণ যেরূপে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে সেইরূপে উক্ত কেন্দ্রটিকে বিভিন্ন বর্ত্মে প্রদক্ষিণ করিতেছে। বিভিন্ন পদার্থের পরমাণুর মধ্যে এই আবর্ত্তনশীল ইলেট্রনের সংখ্যা বিভিন্ন এবং দেখা গিয়াছে যে, কোন বিশেষ পদার্থের ধর্ম্মাবলী উক্ত ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রনের সংখ্যার উপর নির্ভর করে। কোন বিশেষ পদার্থের পরমাণুর মধ্যের আবর্ত্তনশীল ইলেট্রনের সংখ্যাকে ঐ পদার্থের আণবিক সংখ্যা (atomic number) বলা হয়।

এখন পরীক্ষার দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, একটী পারার পরমাণুর মধ্যে ৮০টি ঘূর্ণায়মান ইলেক্‌ট্রন আছে, এবং ২০০টী প্রোটন ও ১২০টি ইলেক্‌ট্রনের দ্বারা উহার কেন্দ্রটির সৃষ্টি হইয়াছে। স্বর্ণের পরমাণুর মধ্যে ৭৯টি ঘূর্ণায়মান ইলেক্‌ট্রন আছে এবং উহার কেন্দ্রটি ১৯৭টি প্রোটন ও ১১৮টি ইলেক্‌ট্রনের দ্বারা প্রস্তুত। সুতরাং পারদের আণবিক সংখ্যা ৮০ এবং স্বর্ণের আণবিক সংখ্যা ৭৯। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে এই আণবিক সংখ্যা অর্থাৎ ঘূর্ণায়মান ইলেক্‌ট্রনের সংখ্যার উপর বিভিন্ন দ্রব্যের গুণাবলী (স্বর্ণের স্বর্ণত্ব অবশ্য!) নির্ভর করে।

সুতরাং যদি কোন প্রকারে পারদের পরমাণু হইতে ঐ অপর্য্যাপ্ত ইলেকট্রনটিকে সরান যায়, তাহা হইলেই আবর্ত্তনশীল পরমাণুর সংখ্যা ৭৯টিতে দাঁড়াইবে এবং পারা সোণায় পরিণত

হইবে। এখন সমস্যার বিষয় হইল এই যে, কি করিয়া ঐ অপর্য্যাপ্ত অবাঞ্ছনীয় ইলেক্‌ট্রনটিকে সরান যায়। ইলেকট্রনটিকে সরাইতে হইলে প্রচুর শক্তির দরকার। শুধু শক্তি থাকিলেই হইবে না, —তাহাকে ঠিকমত যোজনা করিতে হইবে। সেইজন্যই আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ পদার্থের গঠন প্রণালী জানিয়াও অনেকদিন পর্য্যন্ত পারা হইতে সোণা প্রস্তুত করিতে পারেন নাই।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে মিথে (Miethe) নামক একজন জার্ম্মান বৈজ্ঞানিক Mercury vapour lamp নামক এক যন্ত্র লইয়া একটি পরীক্ষা করিতেছিলেন। সেই যন্ত্রটির মধ্যে পারার বাষ্প ছিল এবং তাহার মধ্য দিয়া প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক শক্তি পাঠান হইতেছিল। কিছুক্ষণ বৈদ্যুতিক শক্তি চালনার পর মিথে দেখিলেন যে, যন্ত্রটির ভিতর কাল কাল কি যেন জমা হইতেছে। তিনি ঐ দ্রব্যগুলি পরিষ্কার করিয়া দেখিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঐ দ্রব্যগুলি স্বর্ণকণা বলিয়া প্রমাণিত হইল। প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক শক্তিই প্রত্যেক পারার পরমাণু হইতে একটি করিয়া ইলেকট্রনকে সরাইয়া দিয়া উহাকে স্বর্ণ পরমাণুতে পরিণত করিয়াছিল।

বৈজ্ঞানিক মিথের এই কৃতকার্য্যতার সংবাদে অনেকে হয় ত মনে করিবেন যে, পৃথিবীর স্বর্ণ-সমস্যা ত এইরূপভাবে পরীক্ষাগারে স্বর্ণ প্রস্তুত করিয়া পূরণ করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে প্রথম বক্তব্য এই যে, মিথের প্রণালী অনুযায়ী যে স্বর্ণ প্রস্তুত হইতে পারে, তাহার মূল্য খনিজ স্বর্ণের মূল্য অপেক্ষা অনেক বেশী। দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, মিথের প্রণালী অনুযায়ী স্বর্ণ প্রস্তুত সব সময়েই সম্ভব নহে; কারণ, মিথের পরবর্ত্তী অনেক বৈজ্ঞানিক তাঁহার প্রণালী অনুসারে স্বর্ণ তৈয়ারী করিতে যাইয়া কৃতকার্য্য হন নাই।

যাহা হউক, আমাদের দমিয়া যাইবার কোন কারণ নাই। বৈজ্ঞানিকগণ সব সময়েই নূতন নূতন তথ্য ও নূতন নূতন প্রণালী আবিষ্কারে সচেষ্ট। সুতরাং আশা করা যায় যে, অচিরেই স্বর্ণ প্রস্তুত করিবার এমন এক যন্ত্র আবিষ্কৃত হইবে যাহা দ্বারা অল্পমূল্যে স্বর্ণ প্রস্তুত সম্ভব হইবে। এবং এই আশা দুরাশা নহে। কারণ অনেক বৈজ্ঞানিক আজকাল তামা হইতে সোডিয়াম (sodium) ও হিলিয়াম (helium) প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। সুতরাং পারা হইতে সোণাই বা কেন হইবে না? একথাও শুনা গিয়াছে যে, জনৈক জাপানী বৈজ্ঞানিক নাকি মিথের প্রথানুযায়ী কার্য্য করিয়া স্বর্ণ প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। সুতরাং

মাভৈঃ! আমাদের দিগ্বিজয়ী দাদাকে আর মিছামিছি টাকার স্বপ্ন দেখিতে হইবে না। তিনিও হয়ত এই স্বর্ণ প্রস্তুত করিবার যন্ত্র কিনিয়া বসিবেন এবং তদ্দ্বারা স্বর্ণ প্রস্তুত করিয়া স্বর্ণস্পর্শে স্বর্গসুখ অনুভব করিবেন।

সুপ্তস্মৃতি

[শ্রীসমর পাল]

চন্দ্রার সঙ্গে রমেনের আজ বিয়ে—

বর-কনে পিঁড়িতে বসেছে,—এইবার বিয়ে হবে। এমন সময় সদর থেকে কি একটা গোলমাল শুনতে পাওয়া গেল, রমেনের ছোট কাকার গলা,—"না এ বিয়ে হতে পারে না; —কথা বলে যারা কথা রাখতে পারে না, তাদের বাড়ী আমরা ছেলের বিয়ে দিতে পারি না; —কি রকম ভদ্রলোক আপনারা! আগে বল্‌লেই হতো যে, এত দিতে পারবো না।" এই কথা বল্‌তে বল্‌তে রমেনের কাকা সেইখানে উপস্থিত। পেছনে পেছনে জোড় হাতে কনের বাবা বিজয়বাবু। তিনি জানালেন যে তিনি তার এই অক্ষমতার জন্য নিতান্ত দুঃখিত। তিনি আরও বল্‌লেন,—"এই পন্থা অবলম্বন না করলে চন্দ্রার বিয়ে হয়তো দিতে পারতুম না। আজ দু'বছর ধরে দিন রাত খুঁজেছি কিন্তু পাই নি মনের মত একজন, তাই সমাজের ভয়ে ·······"

তার এই সব যুক্তি শুনে রমেনের কাকা আরও রেগে উঠলেন।

তিনি শেষ অবধি জানালেন যে, এই ঘর থেকে রমেনের বৌ তিনি কিছুতেই নিয়ে যেতে পারেন না। উত্তেজিত হয়ে রমেনকে বল্‌লেন,—"রমেন, উঠে এসো,—এখানে তোমার বিয়ে কিছুতেই হতে পারে না।"

রমেন বসে আছে,—আর তার সামনে নিশ্চল পাথরের মূর্ত্তির মত চন্দ্রা; রমেনের উত্তরের আশায় উদ্‌গ্রীব হয়ে বসে আছে,—যেমন বসে থাকে কাজল পরা মেঘের দিকে চেয়ে চাতক। সে ভাবছে,—রমেনের উত্তরের উপরে তার সমস্ত নির্ভর ক'রছে। জীবনের এই প্রথম

শুভমুহূর্ত্তে এ কি বিঘ্ন—সে আরও ভা'বছে,—সে কি এমন পাপ ক'রেছিল যার জন্য এতখানি বেদনা ও ব্যথা সারাজীবন তাকে ব'য়ে নিয়ে বেড়াতে হবে। আত্মহত্যা ক'র্‌বে কি সে?—না,—না, তা সে পা'র্‌বে না—তাতে যে আরও পাপ! চিন্তা তার শেষ হ'য়ে গেল এইতে যে, রমেনও কি তার কাকার মত হবে—সেও কি তার কাকার মতে মত দেবে! না, না, এত নিষ্ঠুর সে হ'তে পারে না। এ সব কথা সে ভা'বতে পারে না। তার চোখে মেঘের ছায়া এসে নাম্‌লো—সে আর তার কান্না থামাতে পার্‌ছে না। পড়ুক তার চোখের জল উপছে—যদি তাতে এদের মন গলে। সে আর ভাবতে পারলে না, তার মাথা ঝিম্ ঝিম্ ক'রে উঠলো—যেন বৈদ্যুতিক শিখা খেলে গেলো তার সারা দেহময়।

রমেন তার দিকে এতক্ষণ চেয়েছিল। সে স্পষ্ট দে'খতে পেলে যে, চন্দ্রার চোখ দিয়ে বন্যার ধারা ব'য়ে যাচ্ছে। রমেন বেশ নির্ভীক ভাবে ব'ল্‌লে,—"কাকাবাবু, সে হ'তে পারে না।—আমি এইখানেই বিয়ে ক'রবো—এই মেয়েকেই।"

"না রমেন, তুমি বোঝ না, এখানে তোমার বিয়ে হ'তে পারে না।" এই ব'লে তিনি রমেনের হাত ধ'রে একরকম টান্‌তে টান্‌তে নিয়ে চ'লে গেলেন। রমেন একবার পেছন ফিরে দেখলে যে চন্দ্রা বর্ষায় স্নাত রজনীগন্ধার ন্যায় মাটির কোলে নুয়ে প'ড়ছে।

নারী আপনার সর্ব্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে একমাত্র আশ্রয় চেয়েছিল পুরুষের নিভৃত বুকে, কিন্তু সে আশা যখন তার ভেঙ্গে যায়,—যে ব্যথা তখন বাজে বুকে, কোন্ নারী তা সহ্য ক'র্‌তে পারে?—যে চন্দ্রা পার্‌বে!

রমেনের সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে তার কাকার সঙ্গে চ'লে গেল। এতক্ষণ সে স্বপ্নমগ্ন হয়েছিল। তাদের গাড়ী যখন ষ্টেশনে এসে থাম্‌লো তখন তার চমক ভাঙ্গলো; তার অন্তরের আত্মা বিকৃত হ'য়ে জেগে উঠ্‌লো। অন্য সকলে যখন ব্যস্ত এমন সময় সে আস্তে আস্তে ষ্টেশন থেকে সরে পড়লো—চন্দ্রার বাড়ীর দিকে। দৌড়তে দৌড়তে সে যখন এসে পৌঁছুল, দেখলে—চন্দ্রা সম্প্রদান হ'তে চলেছে। সে মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগলো—উচিত হয়নি তার এত দেরী করা। তার মনে হচ্ছিল—যেন সেইখানের সমস্ত আলোগুলো তার দিকে চেয়ে রয়েছে অবজ্ঞায়। এখন সে একজন অনাহূত অতিথি,—কিন্তু ঘণ্টা দু'য়েক আগে সে ছিল এই সভার শ্রেষ্ঠ সম্মানিত অতিথি। কই এখন ত তার আগমনে আর শাঁখ বেজে উঠ্‌ছে না—তাকে আহ্বান করবার জন্য এখন ত আর কেউ

এসে সে যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেল্‌লে। অন্ধকারই এখন যেন তার ভাল লাগ্‌ছে, তার মনে হচ্ছে—এই যেন একমাত্র আশ্রয়। বাড়ী ফেরবার তার আর ইচ্ছা ছিল না। তাই সেই রাত্রেই সে ক'লকাতায় চ'লে এলো।

সে আবার বিয়ে করেছিল—চন্দ্রাকে ভুলবে ব'লে। কিন্তু তা সে পারেনি। তারপর দেখতে দেখতে আঠার বছর কেটে গেছে।

আজ তার নিজের মেয়ে স্মৃতিকণার বিয়ে। সমস্ত দিনই রমেন আজ ব্যস্ত। কখন বর আসবে এইটুকু জানবার জন্যে সে তিন-তিন বার বরের বাড়ী লোক পাঠিয়েছিল। কিছুতেই তার যেন আজ শান্তি নেই। ধৈর্য্য সে কিছুতেই ধরতে পার্‌লে না।

সন্ধ্যে হ'য়ে এলো। অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে বরও এলো। পুরুত ঠাকুরকে রমেন বল্‌লে, "ভট্‌চার্যি মশাই, সন্ধ্যের লগ্নটাতেই—।" পুরুত ঠাকুর বল্‌লেন,—"তুমি ব্যস্ত হচ্ছো কেন বাবা, আজকে অনেক লগ্ন আছে।" সে কাতর ভাবে বল্‌লে,—"না, না, ঠাকুর মশাই বেশী দেরী ক'রবেন না। শুভকাজ—যত তাড়াতাড়ি হ'য়ে যায়, ততোই মঙ্গল।"

সেই প্রথম লগ্নেই তিনি কন্যা-সম্প্রদান সেরে ফেল্‌লে। কন্যা-সম্প্রদান সেরে ফেলে তিনি উঠ্‌তে যাবে, এমন সময় অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়লে। সেই মূর্চ্ছিত অবস্থায় তিনি ব'লে যাচ্ছে শুনতে পেলাম—"বড় দেরী হ'য়ে গেছে ;—না, না, চন্দ্রা, বেশী দেরী ত হয় নি—চন্দ্রা! পাছে বেশী দেরী হ'য়ে যায় বলেই ত আমি এই প্রথম লগ্নেই সেরে ফে'ললাম।"

চোখে মুখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা লাগতেই তার জ্ঞান ফিরে এলো। রমেন দেখলে,—তার মেয়ে স্মৃতি বরের সাথে বাসর ঘরে যাচ্ছে। চারিদিকে চেয়ে দেখলে,—তাকে ঘিরে অনেক লোক দাঁড়িয়ে আছে। সে একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলেন। তার কাকা এই ভাব দেখে বল্‌লেন, "কিছু হয়নি রমেন। এই সারা দিন উপোস তার উপর খাটনিতে তুমি একটু অজ্ঞান হ'য়ে গিয়েছিলে।"

রমেন শুধু বল্‌লে,—"ওঃ!"

প্রলয়-বিষাণ

[কুমারী সুলেখা হালদার]

আজি কি তোমার প্রলয়-বিষাণ বাজালে হে নটরাজ !

তোমার প্রবল ঝড়ের দোলায়

সকলের প্রাণ শিহরি' ডরায়

ধূমকেতু সম একি এলে প্রভু—শান্ত পৃথিবী মাঝ ?

কাঁপিছে বিটপী কাঁপে ফল-ফুল,

দিশাহারা পাখী ভয়েতে আকুল ;

ধ্বংস কারণে হে প্রলয়কারি ! এলে কি ধরায় আজ !

অবিরত ধারে' পড়িছে করকা,

ঘর-বাড়ী ভাঙ্গে প্রবল ঝটিকা,

দীন-দরিদ্রে আশ্রয়হীন করিবে কি নটরাজ !

ধ্বংসের বীণা বাজে অবিরত

হারাইছে প্রাণ লোক কত শত

ধরার প্রভাতে আনিয়া দিবে কি গহন আঁধার সাঁঝ ?

পড়ে বজ্রাঘাত উগাড়ি' অনল,

সৃষ্টি বুঝি বা যায় রসাতল,

থামাও নাচন ওগো ভৈরব !—গেল গেল সব আজ ।

চতুর্ব্বর্গ

পরিচয়

পাত্রগণ

২৭ বৎসর হইতে ৩৮ বৎসর বয়সের বন্ধুগণ

অনন্ত—৩৮—কেরাণী, মধ্যাবিত্ত গৃহস্থ।

অশোক—৩৫—কর্ম্মিষ্ঠ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, স্বাবলম্বী, ভদ্র গৃহস্থ সন্তান—নিজের ভাগ্য নিজে গড়িয়াছে। গ্রাজুয়েট।

নীলাম্বর—২৯—স্বাধীন, অভিভাবকহীন ধনী সন্তান, য়ুরোপ প্রত্যাগত চরিত্রহীন যুবক।

ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ যুবকেরা নীলাম্বরের বাড়ীর আলফাগামা ক্লাবে তাস খেলে, চা খায়, পান খায় ও গান বাজনা করে।

৪২ বৎসর হইতে ৪৮ বৎসরের আড্ডাধারী বন্ধুগণ

রমেশচন্দ্র—৪৩—বড় লোকের নাতি, অবস্থাপন্ন, নিঃসন্তান। পূর্ব্বে ইঞ্জিনিয়ার আর্কিটেক্টের কাজ করিত। সম্প্রতি অবসরপ্রাপ্ত, খর্ব্বাকৃতি শ্যামবর্ণ, কোন য়ুনিভার্সিটির ডিগ্রি নাই।

বিনোদচন্দ্র—৪১—উকিল, ফরসা, রোগা, চোখে চশমাওয়ালা, বিবাহিত।

হেমচন্দ্র—৪৭—অবিবাহিত, চাকরিজীবী, মাথায় টাক, দোহারা চেহারা, সম্পন্ন ব্যক্তি

পাত্রীগণ

১৮ হইতে ২৩ বৎসর বয়সের বান্ধবীগণ

চতুরিকা—২২—ধনী সন্তান, বি, এ, পড়ে, বক্ষস্থল পুরুষের ন্যায় গঠন, হাতের কব্জিগুলি ও শরীর গঠন কিঞ্চিৎ পুরুষভাবাপন্ন, অবিবাহিতা, বুদ্ধিমতী।

কৃষ্ণা—১৯—সদ্য বিবাহিতা, বি-এ, পড়ে, সাধারণ গৃহস্থের মেয়ে। পিতৃহীনা, ভাই রোজগার করিয়া তাহার পড়ার খরচা যোগায়।

রেখা—১৮—আই-এ পড়ে, সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী, প্রফুল্ল, চঞ্চল, অবিবাহিতা।

অলকা—২৩—অবিবাহিতা, বি-এ পড়ে।

২৩ হইতে ৩২ বৎসর বয়স্কা বান্ধবীগণ

কলকলতা—৩২—নিঃসন্তানা, মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বালবিধবা।

জ্যোৎস্নাময়ী—২৭—নীলাম্বরের ভগিনী, ধনী, নিঃসন্তানা, পাঁচ বছর বিধবা হইয়াছে।

আনন্দময়ী—৩১—গৃহস্থ বধূ, সন্তানবতী, সদাহাস্যময়ী, একটু সেকেলে।

ভারতী—২৬—গ্রাজুয়েট, বালিগঞ্জ বয়েজ স্কুলের এসিষ্টাণ্ট প্রিন্সিপাল, চাকরী পাইবার পর নিজে দেখিয়া শুনিয়া বক্তা, স্বদেশ হিতৈষী ব্যারিষ্টার ঘোষ সাহেবকে ৪ বছর হইল বিবাহ করিয়াছে। দুই বছর হইল একটী "লিলি" বলিয়া একটি মেয়ে হইয়াছে।

রমলা—ভারতীর ছোট বোন।

বিনোদিনী—রেখার মা।

চতুর্ব্বর্গ

[শ্রীশ্রীশচন্দ্র কুমার, এম-এ, বি-এল]

এক।

নীলাম্বরের বাড়ী।

[পাশাপাশি দুইটি বসিবার ঘর।]

[একটী ঘরে "আল্‌ফাগামা ব্রিজ ক্লাবের" তাস খেলা চলে ও কিছু গান বাজনার আয়োজন আছে। ক, খ, গ, ঘ, ঙ, ব্রিজ খেলিতেছিল,—চুপ্ চাপ। খেলা শেষের পর হঠাৎ একটা তর্ক উঠিল—চেঁচামিচি সুরু হইল। চ একটা organ বাজাইয়া গান গাহিতেছিল; সকলে সেই গানে যোগ দিল। একটা ভীষণ গণ্ডগোল, বাহবা, হাততালি, চীৎকার চলিল। চা, পান আসিল। গোলমাল থামিয়া গেল। আবার ক, খ, গ, ঘ, তাস খেলা সুরু করিল।

পাশের বসিবার ঘরটি নীলাম্বরের নিজের। চারিদিকে বড় বড় আল্‌মারিতে নানারূপ পুস্তকাদি। একখানি প্রকাণ্ড টেবিলের সাম্‌নে নীলাম্বর বসে। কতকগুলি বই ছড়ান। দোয়াত কলম লইয়া একটা খাতায় কি লিখিতেছিল। এমন সময় দু'জন টেনিস্ ব্যাকেট্ লইয়া ঘরে ঢুকিল।]

নীলাম্বর—

কি খবর! বসো।

ছ, জ—

না Sir, কাল আমাদের একটা "টেনিস্ টুর্নী" সুরু হবে। আপনাকে একটী আপ্যায়ার হ'তে হবে। আপনার সময় হবে তো?

নীলাম্বর—

(হাসিমুখে) আচ্ছা যাবো এখন!

[ছ, জ নমস্কার করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইল।

নীলাম্বর আবার লিখিতে সুরু করিল। লেখা শেষ করিল। নীলাম্বর আপন মনে শীষ্ দিতে লাগিল এবং রবীন্দ্রনাথের "পূরবী" খুলিয়া এদিক-ওদিক উল্টাইতে উল্টাইতে "লীলা সঙ্গিনী" কবিতাটী পড়িতে লাগিল—]

"দুয়ার বাহিরে যেমনি চাহিরে
মনে হ'লো যেন চিনি,
কবে, নিরুপমা, ওগো প্রিয়তমা,
ছিলে লীলা সঙ্গিনী,
কাজে ফেলে মোরে চ'লে গেলে কোন দূরে,
মনে পড়ে গেল আজি বুঝি বন্ধুরে।
ডাকিলে আবার কবে কার চেনা সুরে,
বাজাইলে কিঙ্কিণী।
বিস্মরণের গোধূলি-ক্ষণের
আলোতে তোমারে চিনি ॥
এলোচুল ব'হে এনেছো কী মোহে
সে দিনের পরিমল।
বকুল গন্ধে আনে বসন্ত
কবে কার সম্বল।
চৈত্র হাওয়ার উতলা কুঞ্জ মাঝে
চারু চরণের মঞ্জীর বাজে
সে দিনের তুমি এলে এ-দিনের সাজে
ওগো চির চঞ্চল।
অঞ্চল হ'তে ঝরে বায়ু স্রোতে
সে দিনের পরিমল ॥
ইত্যাদি ইত্যাদি।

[নীলাম্বর একটু পরে বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেল—মুখখানি হাসিখুসী। নীলাম্বরের ঘরে অনন্ত প্রবেশ করিল। এ ঘর থেকে ওঘরে গিয়া ব্রিজ্ খেলা দেখিতে লাগিল। অশোক প্রবেশ করিল। অনন্ত ও অশোক নীলাম্বরের কক্ষে বসিল। অনন্ত একটী সিগারেট ধরাইল ও দুইজনে চুপি চুপি কথা কহিতে লাগিল।]

অনন্ত—

অশোক! তোর কাঠের ব্যবসা ভালই চলছে তো। তারপর তোর থ পোষ্ট

থেকেও অর্ডার আস্‌চে। শুনেচি মাসে ৪।৫ হাজার টাকা আয় এখন তোর। কি ক'রে যে তোর বরাত ফিরলো, জানি না। তবে হ্যাঁ আমরা তো তোকে দেখ্‌চি সেই বি-এ পাশ করা থেকে আজ ১৫ বছর ধরে। কি কঠিন তপস্যা ও কি অসাধ্য-সাধনা সুরু করেচিস্, তাতো না দেখ্‌লে কেউ বিশ্বাস করতে পারে না। ওঃ, সেই সারাদিন খাওয়া নেই—জল নেই—ঝড় নেই—রোদ নেই—পায়ের জুতা ছিঁড়ে গেছে, আর সেই জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে রংটাকে তো সাঁওতাল কুলির মতোই করেচিস্। তেম্‌নি করে সারাদিন খেটে—তারপর সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরে—বাড়ীর সকলের ও পাড়াপড়শীর তদারক ক'রে তারপর সুরু হ'লো রাত ৯টা থেকে রাত্রি ২টা পর্য্যন্ত অন্ততঃ ১০ বছর সে কী মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছিলি হোমিওপ্যাথী কবিরাজী শাস্ত্র অধ্যয়নে। তারপর তোরই কাছ থেকে শুনেচি—এ ছাড়া তো সময় ক'রে নিজের বিধবা দিদির ও মেয়েদিগকে বাড়ীতেই লেখাপড়া শেখার ব্যবস্থা ক'রে তাদের I.A., B.A., সংস্কৃত কাব্যতীর্থ পাশ করিয়েচিস্। আচ্ছা, তুই কি ক'রে এমন অদ্ভুত কর্ম্মী হ'য়েচিস্ এই কুঁড়ে বাঙালীর মাঝে জন্ম নিয়ে? আমাদের তো খেতে, ঘুমুতে, গল্প কর্‌তে, আর দশটা-পাঁচটা আপিস কর্‌তেই দিন কেটে যায়। একবার যে ছেলেমেয়েটাকে আধঘণ্টা পড়াটা দেখিয়ে দেবো সে ফুরসুৎও পাইনি—তার জন্য আবার একটী প্রাইভেট টিউটর রাখতে হ'য়েচে। আচ্ছা তোর উন্নতির গোড়ার কথাটা বুঝিয়ে দে না!

অশোক—

অনন্ত দা,—আমি তোমাদের মতো অত কথা জানি না। তুমি রাগ ক'রো না। আমার বলবার বেশী কিছু নাই। বাবা বলেছিলেন—বাবার কথা বরাবর মেনে চলি,—বাবাও তাঁর ছেলেদের মানিয়ে নিয়ে চল্‌তেন। বাবা শিখিয়েছিলেন—কুঁড়েমি ক'রে বসে থেকো না, সকল সময় কাজ কর্‌বে। লেখাপড়ার চর্চ্চা মরণের দিন পর্য্যন্ত কর্‌বে। সত্যিই অনন্তদা, বাবা বই পড়্‌তে পড়্‌তে মারা যান। কখনও কাকেও ভয় কর্‌তে বারণ করেচেন। কখনও কোন ছোট কাজ করতে মানা করেচেন। সকলকে যথাযথ সম্মান স্নেহ দিতে বলেচেন। তুমি শুন্‌লে হাসবে—আমি জীবনে কখনও কোন কবিতার বই, নাটক, নভেল উপন্যাস বৃথা সময় কাটানোর জন্যে পড়িনি। তোমার আমার উপর অরুচি ধরে যাচ্চে হয়তো—দেখো কখনও আমাদের বাড়ীর কেউ দেলখোস কেবিন, পুটিরামের দোকান, গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেল বা বাজারের কোন খাবার খিদে পেলেও খাইনি বা লোভে পড়েও খাইনি। জান কি খেতুম?—চার পয়সার শশা, চিনেবাদাম, ফলফুলুরি,—তাতেই এই রকম কাঠ খোট্টা চেহারা আজও আছে।

অনন্ত—

বলিস্ কিরে !

[অনন্ত বিস্ময় প্রকাশ করিল।]

অশোক—

আমরা নিজেরা না মানুষ হ'লে, মনের জোর করতে না শিখলে, আমাদের উপায় কী আছে ? হতাশ হ'য়ে বসে গালে হাত দিয়ে উল্টো বাজে বাজে ভাবলে, আর পেয়ালার পর পেয়ালা চা শেষ করলে এ দরিদ্র জাতের উপায় হবে না। ঠোঁট বুজে কাণে তুলো আর চোখে ঠুলি দিয়ে আগুয়ান হ'তে হবে। নিজের মনের আনন্দে নিজেদের এই দারিদ্র্য দুঃখুকে লজ্জার বিষয় না ভেবে—সেই ছেঁড়া কাপড়কে ছেঁড়া চাদর দিয়ে ঢাকতে গিয়ে আরও দুঃখু না বাড়িয়ে—সেই গরীবানা তাড়াতে হবে কাজের আনন্দে। যতো জাত উঠচে—খেতে পাচ্চে, নাচ্চে-ফিরচে, বাড়চে—কাজ কোরে, জ্ঞানের ভাণ্ডার বাড়িয়ে। তারা শুধু যে পেটের জ্বালায় কাজ করে তা নয়, খেলার ছলে তারা প্রাণপণ করে হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ শিখরে উঠে,—কেউবা অতল সমুদ্রের তলায় ঘুরতে ফিরতে মণিমুক্তার সন্ধান পায়। মোট কথা, ও-সব জাত বসে বসে ঘুমোয় না। তারা বড় হয়েচে কথা ক'য়ে নয়, চাকরী ক'রে নয়, কপালের উপর বরাত দিয়ে নয়, ভগবানের দোষ দিয়ে নয়, রাজার দোষ দিয়ে নয়। আমরা নিজেদের দোষ দেখতে চাই না। তাই বাবা কখনও অপরের দোষ না দিয়ে নিজের দোষ কোথায় তাই ভাবতেন। তাই বাবা তাঁর ছেলেদের কেবল নিষেধ বিধি দিয়ে ব্যতিব্যস্ত না ক'রে, সকল সময়ই হাতের কাছে কাজ এগিয়ে দিতেন। বাগান খোঁড়তেন, ঘর বাড়ী পরিষ্কার করাতেন, বাজার করাতেন, রোগীর সেবা শুশ্রূষা করতে পাড়া-পড়শীদের বাড়ী পাঠাতেন। গুরু পরিশ্রমের কাজ নিজেও করতেন। তিনি বলতেন—কাজই ভগবান। আর বলতেন—মহৎ লোকদের জীবনী প'ড়ে দেখো, তাদের দুঃখু-কষ্ট অনুধাবন কর। দেখবে কাজ ক'রেই সকলেই মহাপুরুষ হয়েচেন। আর সব চেয়ে বলতেন—টাকা-পয়সা, গাড়ী, বাড়ী কম থাকলেই মানুষ ছোট লোক হয় না—আর টাকা-পয়সা অনেক থাকলেই মানুষ ভদ্রলোক হয় না। ভদ্রলোক জামাকাপড় পরলে আর গাড়ী চড়লে হয় না; বলতেন—অকু ! তুই সত্যিকারের ভদ্রলোক হবি।

[মৃত পিতার কথা স্মরণ করিয়া চুপ করিয়া তন্ময় হইয়া অশোক বসিয়া রহিল।]

অনন্ত—

তোর সবই তো আমাদের দৈনন্দিন কার্য্যপদ্ধতির উল্টো ব্যবস্থা। আমরা জানি—কাজ না ক'রে, আরাম ক'রে শুয়ে ব'সে থাকতে পেলেই সুখ। আর তুই বলচিস্—কাজ করতে খাটতে পেলেই আনন্দ হয়। কি আশ্চর্য্য—

[অনন্ত দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিল। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।]

আচ্ছা, অশোক! চাক্‌রী কর্‌তে কর্‌তে মন জিনিষটা বোধ হয় উড়ে যায়। আপিসের বাবুরা এক একটী ফাউণ্টেন পেন, না হয় টাইপরাইটার হ'য়ে যায়—বড় সাহেব লিখ্‌তে বল্‌লেই ঘাড় নাড়ে ও সুবোধ বালকের মতো লিখে যায়।

[অশোক চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।]

আমাদের তো মনের বালাই নেই। কিন্তু তোর মন্‌কে দুঃখু-কষ্ট কিছুই flat করে দিতে পারে না। তুই সবই যেন কি মন্তরের জোরে গা ঝাড়া দিয়ে ফেলিস্;—তুই যেন নিজেকে—তোর মনকে ইস্পাতের মতো শক্ত ধারালো করে রেখেচিস্। যত দুঃখু-কষ্ট বিপদ আসুক, সব কেটে কুটে খান্‌খান্ করে তাদের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসিস্ নিঃশব্দে। সত্যই তোর মিথ্যা কোন জিনিষের ভার বয়ে বেড়াতে হয় ব'লে—তোর মনটাও বাজে ভাব্‌নাতে বুড়ো হ'য়ে পড়েনি—এখনও তুই সাহসে ভর ক'রে যে-কোন দুর্ঘটনার মধ্যে পড়িস্ তাকে বরণ ক'রে নিস্। আর আমাদের না আছে ভরসা,—চল্লিশ পেরুলেই ফরসা।

[অশোক হাত নেড়ে অনন্তকে থামিয়ে দিল ও বলিল।]

অশোক—

দেশে—অনন্ত দা, মিটিংএর বক্তৃতা দিয়ে কী লাভ? কেন তোমাদের এতো দুঃখু! তাই ভেবেচ কি? কোন গৃহস্থ কি কখনও সংসারের প্রতিদিনের আয় ও ব্যয় এর Classification ক'রে একবার ভেবে দেখে? সত্যিকারের শরীর ধারণ ও আচ্ছাদনের জন্য উপযুক্ত খাদ্য ও পোষাকের খরচা যদি করে শতকরা ২৫৲ টাকা—তবে অপ্রয়োজনীয় বেনারসী ক্রেপ, নিদেন জাপানী সিল্কের কাপড়, শাড়ী, বা কালিয়া পোলোয়া, কোপ্তা, চপ্ কাট্‌লেট্, সিনেমা, থিয়েটারের বাজে খরচা করে শতকরা ৪০৲ টাকার উপর। এই রকম করে ৪০৲ টাকা অপব্যয়ের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যের ও পোষাকের কম্‌তি পড়ে—সেই অভাবে রোগ-জ্বালাও জোটে; কাজেই রোগ-জ্বালার জন্যে ৪০৲ টাকা খরচা কর্‌তে বাধ্য হয়। তখন অপ্রয়োজনীয় ৮০৲ টাকা খরচের ধাক্কায় পড়ে। কিন্তু চাক্‌রী তো ৬০৲ টাকার। কাজেই কর্জ্জ কর্‌তে বাধ্য হয়। পৈত্রিক ভিটাটুকু পড়ে Mortgage—তার সুদ বেড়ে বেড়ে ক্রমে বেড়াজালের মত ঘিরে ফেলে চারিদিক থেকে, তখন তার হয়—মাথা খারাপ। এই যদি হ'লো—সংসারের কর্ত্তার শরীর ও মনের অবস্থা, তার গৃহিনীর কি মুস্কিল—তাদের আবার ১০টী ছেলেপুলে আত্মীয়দের কি হবে ব্যবস্থা!—ব্যবস্থা নিকৃষ্টই হবে। ঐ নিকৃষ্ট ব্যবস্থার ফলে উৎকৃষ্ট সোনার চাঁদ সব, ছেলেবেলা থেকে মিথ্যা জোচ্চুরী, প্রতারণা, অসরলতা, Unnatural Conditionsএর মধ্যে মানুষ হয়ে ছোট

কাজে প্রবৃত্ত হয়। ফলে চাকরিজীবী—হা চাক্‌রী হা চাক্‌রী ক'রে ভিখারীর মতো ঘুরে বেড়ায়। এই বাঙ্‌লা দেশের ছেলেগুলোকে দেখ্‌লে কান্না পায়। কিন্তু সোনার চাঁদদের দোষ তত নয়, যত দোষ তাদের বাবার।

অনন্ত —

ঠিক্! ঠিক্ বলেচিস্।

অশোক—

তোমার তো সব শেষ করেচ। এখন একটু নিজের ছেলেমেয়েগুলোকে দেখো। তাদের কচি মাথাগুলো নষ্ট ক'রো না। ছেলেমেয়েদের অসম্ভব কল্পনাবাগীশ বা ভাববিলাসী না ক'রে, কাজ-পাগলা ক'রে দিয়ো,—সব ঠিক চলে যাবে।

[অশোক একটু দূরে গিয়া বসিল। অনন্ত উঠিয়া ঘুরিতে লাগিল। নীলাম্বর প্রবেশ করিল—হাতে ৫০টী নানা রঙের বেলুন্ এক সঙ্গে বাঁধা।]

নীলাম্বর—

(একটু হাসিয়া)—এই যে অনন্ত দা! অশোক ভাই ভাল তো ?

[নীলাম্বর বেলুনগুলা নিজের চেয়ারে হাতার সঙ্গে বাঁধিয়া দিয়া সেগুলাকে হাতে করিয়া নাড়িতে লাগিলো। নীলাম্বর কেষ্ট খান্‌সামাকে ডাকিয়া চা সিগারেট দিতে বলিল। নীলাম্বর নিজে Pipe ধরাইল। কেষ্ট চা সিগারেট দিয়া গেল।]

নীলাম্বর—

একটা কথা সেদিন বল্‌তে ভুলে গেছি। আমি শিগ্‌গির যাচ্চি। এবার ফির্‌তে বোধ হয় এক বছর দেরী হবে। কিন্তু অনন্ত দা! তুমি তাই এসো ক্লাবে রোজ। অশোক তুমি তো কাজের লোক—সময় পেলে এসো। অন্য বিলিব্যবস্থা সব ক'রে ফেলেচি। জ্যোৎস্নাকেও খবর দেওয়া হয়েচে। কেবল মামাকে একটী খবর দিতে হবে। আর চতুরিকার মা, প্রায়ই খোঁজ খবর নেন – ওঁকেও বলে যেতে হবে। তাছাড়া আমার কেউ নেই।

[নীলাম্বরের মুখে একটী লঘু বিষাদ-ছায়া। অনন্তের চোখ ছল্‌ছল্ করিতে লাগিল এই আসন্ন বিচ্ছেদের কথা ভাবিয়া। অশোক চুপচাপ।]

(ক্রমশঃ)

পটক্ষেপ।

ঘূর্ণী

[শ্রীশচীন্দ্রনাথ সুর]

বিবাহবাসরে মন্দাকে একা পেয়ে বিনোদ বলেছিল—এত রূপ নিয়ে আমার গলায় মালা দিয়ে সুখী হতে পার নি বোধ হয়! উত্তরে সদ্যপরিণীতা মন্দা স্বামীর পায়ের কাছে একটা প্রণাম করে বলেছিল—ও কথা বলো না,—তা ছাড়া তোমারই বা কিসে কম?

এর পর দীর্ঘ দু'বৎসর কেটে গেল।

বিনোদের সংসারে এক বিধবা পিসী আর মন্দা ছাড়া আপনার বলতে আর কেহই নাই। বিনোদ থাকে কলিকাতায় আর মন্দা দেশের বাড়ীতে। সহরে থেকে বিনোদের ভাগ্যে সময়মত দেশে যাওয়া হয়ে ওঠে না। এর জন্যে পিসীমা মধ্যে মধ্যে অনুযোগ করেন ও বলেন—আর ক'দিনই বা বাঁচব! একটা নাতি-নাত্নীর মুখ দেখে যদি যেতে পারতুম! পিসীমা একদিন জোর করেই মন্দাকে নিয়ে ষষ্ঠীতলায় ঢিল বেঁধে এলেন—নাতি-নাত্নীর আশায়। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না।

হঠাৎ একদিন সনাতন এসে বিনোদকে তার পিসীর মৃত্যুসংবাদ দিল। পিসীমার কাজ চুকে গেলে, বিনোদ মন্দাকে কলিকাতার এক একতলা ভাড়াটে বাড়ীতে এনে ওঠালে। দেশের বাড়ীর তদারক করবার ভার রইল তাদেরই প্রতিবেশী সনাতনের উপর। সনাতন জাতে কৈবর্ত্ত হলেও—লোক বড় ভাল ছিল।

বিনোদ কলিকাতার কোন এক মার্চ্চেন্ট আফিসে কাজ করে,—মাইনা তার ষাট টাকা। বাড়ীভাড়া তাকে দিতে হয় কুড়ি টাকা, আর যা থাকে তাতে তাদের দুটী প্রাণীর মন্দ চলে না। দিন এইরূপ চল্‌তে থাকে।

বিনোদ বলে—তোমার বাইরের রূপটাই আসল নয়—এর চেয়ে যেটা মধুর সেটা হচ্চে তোমার ভেতরের গুণ। উত্তর আসে—ফের সেই এক কথা! তুমি আবার বই-টই লিখতে আরম্ভ করলে না কি?

বিনোদ দশটা-পাঁচটা আফিস করে—মন্দা এই সময়টা কাটায় হয় বই পড়ে, নয় পাশের বাড়ীর নুতন ভাড়াটেদের বউটির সঙ্গে গল্প ক'রে। নাম তার—বিমলা, স্বামী উকিল, বিবাহ হয়েছে

তাদের প্রায় আট বৎসর। তার এক ছেলে ও দুই মেয়ে। মন্দার সাথে তার কথা হয়—নানা সুখ-দুঃখের এবং নিত্য নূতন।

মন্দা তার ছেলেটিকে খুব ভালবাসে—নিজেই খাইয়ে দেয়, জামা পরায়, ইত্যাদি। একদিন ঠাট্টার ছলে বলেছিল—ভাই এটিকে আমায় দিতে হবে। বিমলা হেসে এর উত্তরে বলে—ও তো ভাই তোমারই ছেলে, নিলেই পার। এমনি ভাবেই দুই সখীর দিন কাটে।

* * * *

একদিন বাড়ী ফিরলো বিনোদ জ্বর নিয়ে, কারণ তাকে মাঠে খেলা দেখবার সময় অনেকক্ষণ ভিজতে হয়েছিল। জ্বর খুব সামান্য, তবু মন্দা বলে—ডাক্তার ডাকলে হয় না! বিনোদ বলে—এ সামান্য জ্বর সেরে যাবে, তোমার যা সেবার গুণ! ভাল কথা, আমার জ্বরের মধ্যে তোমারও আবার জ্বর না হয়। খাওয়া হয়েছে ত?

জ্বর সামান্য হ'তে ভীষণাকারে দেখা দিল। ডাক্তার এল, ব'ললে—শক্ত কেস, হাঁসপাতালে দেওয়াই ভাল।

মন্দা রাজী হয় না................।

শেষে নিরুপায় হ'য়ে বিমলার মতামত চায়।

বিমলা বলে—হাঁসপাতালে পাঠানই উচিত ভাই। আর উনিও বলছিলেন - কেসটা শক্ত। টাকাও খরচা হবে অজস্র, তার চেয়ে ঐ হাঁসপাতালই ভাল ..। শেষ পর্য্যন্ত তাই হয়।

মন্দা স্নানাহার প্রায় ভুলে গেল, রোজ হাঁসপাতালে যাওয়া তার চাইই। বিমলা জোর করে খাওয়ায়। বিমলার স্বামী রোজ নিজের গাড়ী করে মন্দাকে হাঁসপাতালে দিয়ে আসে এবং নিয়ে আসে।

আফিসের বড় সাহেব মিঃ এণ্ডারসন্ বিনোদকে খুব পছন্দ করে। তাছাড়া সে ৫।৬ বৎসর কাজ ক'রছে—কামাই নাই বললেই চলে। অসুখ শুনে সাহেব ছয় মাসের ছুটী দিল।

মাস তিন পরে বিনোদ আরোগ্য লাভ ক'রলো, কিন্তু দেহে সম্পূর্ণ বল পেল না। ডাক্তারের মতে চেঞ্জে যাওয়া দরকার। কিন্তু অর্থাভাবে তাদের যাওয়া হয়ে উ'ঠলো না।

আরও তিন মাস পরের কথা............

বিনোদ বেশ সুস্থ হয়েছে। আফিসেও যায়, তবে তার মন আজকাল বড় খারাপ, সে লতিকা নামে একটী নার্সের সেবা শুশ্রূষায় মুগ্ধ। লতিকার চামড়াটা সাদা না হ'লেও, দে'খতে মন্দ নয়। মুখের গড়ন তার নিখুঁত। চোখ দুটী তার আরও সুন্দর।

বিনোদ যখন তার কালো সুন্দর চোখের দিকে চাইত' তখন বিনোদ আর বিনোদেতে থাকত' না। বিনোদ তার সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে লতিকাকে ভালবেসে ফেললো।

বিনোদ মন্দার সহিত আর পূর্ব্বেকার মত তত মিশতে পারে না। সর্ব্বদা যেন একটা কিসের সঙ্কোচ। এখন মন্দা থেকে দূরে থাকতে পারলে সে বেঁচে যায়।

বিনোদ আবার নেশা করতেও আরম্ভ করেছে। একথা মন্দার কাণে উ'ঠতে বেশী দেরী হ'ল না।

স্বামীকে সে কিছুই বলে না। কেবল ভগবানের নিকট প্রার্থনা করে, আর বলে—হে অন্তর্য্যামী ওঁকে সুমতি দাও।...............

বিনোদ প্রায়ই বাড়ী ফেরে রাত ক'রে—আফিস থেকে ফেরবার পথে একবার লতিকার বাড়ী হ'য়ে আসে। লতিকার বাড়ীতে কেহ নাই—সে একা।

এমনি ক'রে দিন যায়। মন্দা ডাকে ভগবানকে তার সমস্ত মিনতি উজাড় ক'রে। মাহিনার টাকা যায় লতিকার কাছে, আর বিনয় সাহার দোকানে। মন্দা কিন্তু জানতে দেয় না সংসারের অভাব অনটন।

আজ স্বচক্ষে সে দেখলো—বাড়ীওয়ালা তার স্বামীকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে অপমান করছে। তার নাকি দু'মাসের বাড়ী ভাড়া বাকী। মন্দার চোখ দিয়ে নেমে আসে জল দরদর করে ....। বিকালে বিমলাকে ডেকে বলে,—ভাই বিমলা, আমার একটা উপকার করতেই হবে, এই হারটা বিক্রী করে বাড়ী ভাড়াটা দিয়ে দাও।

বিমলা বলে—টাকা আমি দিচ্ছি ভাই......হার তোমার থাক; টাকা না হয় পরে দিও।

মন্দা বলে—পরে কোথা পাব ভাই, হার না নিলে টাকা নেব না।.........

বিমলা নিরুপায় হ'য়ে হার রেখে টাকা দেয়।

সনাতন হঠাৎ কি একটা কাজে কলিকাতায় আসে।

মন্দার কাছে সব শুনে বল্‌ল,—তাই নাকি দিদিমণি......দাদাবাবুর এতদূর হয়েছে! এ যে ভাবতেও কেমন কেমন লাগে .....।

রাত্রে সনাতন বিনোদকে বলে,—দাদাবাবু ও খারাপ নেশাটা ছেড়ে দিন,......দিদিমণির অবস্থাটা কি দেখতে পান না, সোণার পিতিমে যেন কি হ'য়ে গেছে!......দাদাবাবু তোমার পায়ে ধরি বলেই সনাতন কেঁদে ফেলে।

দাদাবাবু তখন একেবারে সপ্তমে গলা চড়িয়ে বলেন—কে বল্‌লে রে আমি নেশা করি? ব্যাটা হারামজাদা—কুকুরকে নাই দিলে মাথায় ওঠে, না? আমাকে উপদেশ দিতে আসা

হয়েছে। ব্যাটা ছোটলোক্ কোথাকার,—দূর হয়ে যা এখান থেকে। কাঁদতে কাঁদতে সে চলে যায়।

এমনি ক'রে এক বৎসর কেটে গেল।

* * * *

তখন সন্ধ্যা আসি আসি ক'রছে,—সূর্য্য তার শেষ রশ্মি টুকু পৃথিবীর বুক থেকে সরিয়ে নেব কি না নেব ভাবছে,—এমন সময় মন্দা শুনতে পেল তার স্বামীর ডাক।

মন্দা তখন তুলসীমঞ্চে প্রদীপ জেলে গলায় আঁচল দিয়ে নীচু হয়ে প্রার্থনা ক'রছিল,—হে ঠাকুর, ওঁকে সুমতি দাও, সৎপথে চালাও। আমার কোন কষ্ট নাই, কোন দুঃখ নাই। শুধু ওঁকে ভাল ক'রে দাও ঠাকুর। এমন সময় শুন্‌তে পেল সে—তার স্বামীর স্বর।

তাড়াতাড়ি প্রণাম সেরে যা দেখ্‌ল তাতে সে যেন কেমন হ'য়ে গেল।

বিনোদ বললে—ভয় পেও না মন্দা। আজ আমি মদ খাইনি। টল্‌ছি মাথার ঠিক নেই বলে।

বিনোদ বসে পড়ল দালানে।

মন্দা অস্পষ্ট আলোতে দেখ্‌তে পেল...তার স্বামীর চোখে জল।

জিজ্ঞাসা করল, ..কাঁদছ কেন?

বিনোদ বল্‌লে,—কাঁদছি তোমায় দেখে . এ হতভাগার হাতে পড়েই না তোমার আজ এই অবস্থা!

মন্দা বল্‌লে,—না না আমার কিছু হয়নি, তোমার নিজের দিকে একবার চেয়ে দেখ দিকি!

বিনোদ মন্দার হাত ধরে বল্‌লে—মন্দা, আমায় ক্ষমা করতে পারো না?... ..

মন্দা বল্‌লে,...ছিঃ, ও-কথা বলে আমাকে অপরাধী করো না।

বিনোদ উত্তর খুঁজে পায় না, শুধু বলে—মন্দা আজ অফিস থেকে ফেরবার পথে লতিকার ওখানে গিয়ে দেখি—তার বাড়ীর দরজায় একখানা গাড়ী দাঁড়িয়ে। একটু কি রকম সন্দেহ হল,... .....ভিতরে গিয়ে দেখি দুটো চেয়ারে মুখোমুখি বসে লতিকা আর এক আমার মত হতভাগা।

লতিকা আমায় দেখেই বলে উঠল......কে? কে? কি করতে এখানে? যেন চিনতেই পারলো না।... ..

আমি বল্লুম্,—কি চিনতে পারছো না, এই কয়েক ঘণ্টার অদেখাতেই ভুলে যাচ্ছ?

আমি আর থাক্‌তে পারলুম না সেই হতভাগার মুখে এমন ঘুসি মেরেছি যে বাছাধন আর টুঁ শব্দটি করলো না,...আর লতিকা একটু পেছিয়ে গেল।.....আমি বললুম,.. ..ভয় পেয়ো না লতিকা, তোমার গায়ে হাত দেবো না।.....তবে জেনে রেখো বিনোদ চ্যাটার্জ্জি লম্পট হতে পারে—বেইমান নয়।.. ..আজ আমার ভুল ভেঙেচে মন্দা।...কি একটা মরীচিকার পিছনে ঘুরছিলুম্ এতদিন এই স্বর্ণপ্রতিমা পায়ে ঠেলে।......বিনোদ আবার কেঁদে ফেল্‌লে।

মন্দা চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বল্‌লে, ..,...কেঁদো না, যা হবার তা হয়েছে .....

বিনোদ বল্‌লে,—না না মন্দা কাঁদতে দাও, কাঁদলে হয় ত' মনটা একটু হালকা হবে।

মন্দা বললে,......অনুশোচনা এলেই সব দোষ চলে যায়।

বিনোদ বল্‌লে, ...তুমি, তুমি আমাকে ক্ষমা করবে ত মন্দা? ..তা হলে আমি বোধ হয় আবার মানুষ হতে পারব।

মন্দাও ভগবানের কাছে তখন মনে মনে প্রার্থনা ক'রছিল, . তাই কর ঠাকুর।

বিনোদ আবার বলে উঠল,—না, না মন্দা, আজ আমার সমস্ত অন্যায় তোমার কাছে ব'লে তবে আমি শান্তি পাব।

মন্দা বল্‌লে,...আচ্ছা ব'লো, কিন্তু এখন নয়, আগে কিছু মুখে দাও।

বিনোদ বল্‌লে,—আচ্ছা, তুমি যা ব'লছ তাই হবে, পরেই বল্‌ব ..

না—না আমাদের বাঁচতেই হবে। আমাকে এখনই সব বলতে দাও।

মন্দা বলে, ..লক্ষ্মীটি কিছু মুখে দাও, তার পর ব'লো।...তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছ।

বিনোদ বল্‌লে,...আচ্ছা, কিন্তু আজ আমার কি মনে পড়ছে না মন্দা? ..মনে পড়ছে,—যে বিবাহ বাসরে তোমার শুধু রূপটাই দেখেছিলুম, আর এখন দেখছি—তোমার হৃদয় তোমার রূপের কাছে অতি তুচ্ছ।

তারপর হাত মুখ ধুয়ে বিনোদ খেতে বসল, ..আর মন্দা পাশে বসে হাওয়া করতে লাগল।

মন্দার মনে ভেসে উঠল বহু পুরাতন এক স্মৃতি। বিনোদ এ রকম খেতে ব'সত, আর মন্দা ক'রত বাতাস।

বিনোদ ব'ল্‌ত—তুমি আগে একটু খাও আমার পাত থেকে, তবে আমি খাব।

মন্দা ব'ল্‌ত—দূর, স্ত্রী বুঝি আগে খায়।

বিনোদ ব'ল্‌ত—আচ্ছা বেশ, আমিই আগে খাচ্ছি, বলে লুচির আধখানা মন্দাকে দিত। এমনি কত আব্দার, কত অভিমান চলতো দু'জনের।

অদূরে তখনও একটা শাঁখ অস্পষ্ট একটানা সুরে বাজছিল... ..।

সংবাদিকা

শুভবিবাহ

পোষ্ট এ্যাণ্ড টেলিগ্রাফ বিভাগের ইলেক্‌ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার-ইন্-চিফ্ শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ সুর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সুরের সহিত কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ নিয়োগী মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী অপর্ণার শুভবিবাহ গত

অপর্ণা-শৈলেন্দ্র

২০শে বৈশাখ রবিবারে সুসম্পন্ন হইয়াছে। অবসর প্রাপ্ত পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল মিঃ জে, এন, মুখার্জ্জী, বর্ত্তমান পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল রায় পি, এন, মুখার্জ্জী বাহাদুর, প্রেসিডেন্সী কলেজের অস্থায়ী অধ্যক্ষ পি, সি, মহালানবীশ, অধ্যাপক ডাঃ এস, সি, মিত্র, অধ্যাপক ডাঃ পি, নিয়োগী, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, অধ্যাপক বি, সি, দাস,

অধ্যাপক এস, এল, বিশ্বাস, অধ্যাপক জি, ভড়, মিঃ পি, এস, এম, সুন্দরম্, মিঃ এস, কে কাঞ্জিলাল প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি বিবাহ উৎসবে ও প্রীতিভোজন অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সুর এখন বি-এস্‌সি চতুর্থ বার্ষিক ছাত্র। তিনি সদ্গোপ যুবক সঙ্ঘের একজন বিশিষ্ট সভ্য। 'সদ্গোপ পত্রিকা' ও অন্যান্য পত্রিকায় তিনি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিয়া থাকেন। পাঠক সমাজে তাঁহার লেখা বিশেষরূপে আদৃত হইতেছে। আমরা নব দম্পতির সর্ব্বাঙ্গীন কুশল কামনা করি।

বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

সদ্গোপ যুবক সঙ্ঘের উদ্‌যোগে এই প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হয়। নানা প্রতিকূল অবস্থার জন্য ইহা মধ্যে বন্ধ ছিল। এ বৎসর আমাদের সঙ্ঘের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত ললিত মোহন কুমার মহাশয়েরই আগ্রহাতিশয্যে ও কঠোর পরিশ্রমের ফলে পুনরায় ইহার অনুষ্ঠান সম্ভব হইয়াছে। বিগত ৫ই এপ্রিল রবিবার প্রাতঃ ৭৷৷০ ঘটিকার সময় ওয়াই-এম-সি-এ মাঠে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। ইহাতে অন্যান্য ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানের বহু বিশিষ্ট সভ্য আমন্ত্রিত হন এবং তাঁহাদের মধ্য হইতেই প্রতিযোগিতার অধিকাংশ বিচারক নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। এ বৎসর প্রতিযোগিগণের সংখ্যা ৪৪ জন হইয়াছিল। উপযুক্ত সংখ্যায় বালিকাগণ যোগদান করে নাই বলিয়া এবারে তাহাদের কোনও প্রতিযোগিতা হয় নাই। আশা করি আগামী বৎসরে স্বজাতি বালক-বালিকাগণ অধিক সংখ্যায় যোগদান করিবে। সদ্গোপ যুবক সঙ্ঘের বাৎসরিক সাধারণ অধিবেশনে এই প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ কার্য্য সমাধা করা হইবে স্থিরীকৃত হয়। যাহারা এই প্রতিযোগিতায় সাফল্যলাভ করিয়াছে তাহাদের নাম নিম্নে প্রকাশ করিলাম :—

১। জুনিয়ার বয়েজ ফ্ল্যাট্ রেশ—৫০ গজ :— ১ম—শ্রীমান্ রজতকুমার পাল।
২য়—শ্রীমান্ কমলকুমার কুমার। ৩য়—শ্রীমান্ বিশ্বনাথ ঘোষ।

২। ইন্টারমিডিয়েট ফ্ল্যাট্ রেশ—১০০ গজ :—১ম—শ্রীমান্ পুলিনবিহারী ঘোষ।
২য়—শ্রীমান্ অর্দ্ধেন্দু ঘোষ।

৩। সিনিয়র ফ্ল্যাট্ রেশ—১০০ গজ :— ১ম—শ্রীমান্ কৃষ্ণপ্রসন্ন সরকার।

৪। ইন্টারমেডিয়েট্ ফ্ল্যাট্ রেশ—২২০ গজ :—১ম—শ্রীমান্ পুলিনবিহারী ঘোষ।

৫। সিনিয়র ফ্ল্যাট্ রেশ—৪৪০ গজ :—১ম—শ্রীমান্ কৃষ্ণপ্রসন্ন সরকার।

৬। ইন্টারমিডিয়েট্ লং জাম্প্ :—১ম—শ্রীমান্ অর্দ্ধেন্দু ঘোষ।

৭। সিনিয়র থ্রোয়িং দি ক্রিকেট বল ঃ—১ম—শ্রীমান্ অনিলকুমার ঘোষ।

৮। জুনিয়ার এরিথ্মেটিক্ রেশ ঃ—১ম—শ্রীমান্ অমল ঘোষ।
২য়—শ্রীমান্ নিতাই সরকার। ৩য়—শ্রীমান্ সত্যকুমার ঘোষ।

৯। ইণ্টারমিডিয়েট স্যাক্ রেশ ঃ—১ম—শ্রীমান্ অমিয়কুমার ঘোষ।

১০। জুনিয়ার অরেঞ্জ রেশ ঃ—১ম—শ্রীমান্ কমলকুমার কুমার। ২য়—শ্রীমান্ সমদর্শন সুর।
৩য়—শ্রীমান্ নিতাই সরকার।

১১। সিনিয়র লং জাম্প্ ঃ—১ম—শ্রীমান্ অনিলকুমার ঘোষ।

১২। সিনিয়র—হাই জাম্প্ ঃ—১ম—শ্রীমান্ সুশীলকুমার সুর।

১৩। শ্রীমান্ বিশ্বনাথ ঘোষ। ২য়—শ্রীমান্ রজতকুমার পাল। ৩য়—শ্রীমান্ অমল ঘোষ।

১৪। চিলড্রেন্ ফ্ল্যাট্ রেশ ঃ—১ম—শ্রীমান্ গোপীনাথ ঘোষ।, ২য়—শ্রীমান্ সুধাংশু বিশ্বাস।
৩য়—শ্রীমান্ সন্তোষকুমার বিশ্বাস। ৪র্থ—শ্রীমান্ নলিনীরঞ্জন কুমার।

স্বর্গীয়া সারদা সুন্দরী নিয়োগী

মাতৃ-বিয়োগ উপলক্ষে ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী কর্ত্তৃক পনের দিনে অশৌচ পালন।

আপনারা সকলে অবগত আছেন যে, বঙ্গীয় সদ্গোপ সভার উদ্‌যোগে বঙ্গদেশের বিভিন্নস্থানে নিখিল সদ্গোপ সম্মিলনীর এ পর্য্যন্ত চারিটী অধিবেশন হইয়াছে। প্রত্যেক অধিবেশনেই সদ্গোপ জাতি বৈশ্যবর্ণভুক্ত এবং তজ্জন্য সদ্গোপ জাতি বৈশ্যোচিত পনের দিন অশৌচ পালন করিবেন এই মর্ম্মে প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার একটি বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত আজ স্বজাতির সর্ব্বসাধারণের নিকট ব্যক্ত করিতেছি।

নিখিল বঙ্গ সদ্গোপ সম্মিলনীর প্রথম অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, দ্বিতীয় অধিবেশনের সভাপতি, বঙ্গীয় সদ্গোপ সভার সহকারী সভাপতি, সদ্গোপ যুবকসঙ্ঘ ও সদ্গোপ পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং সদ্গোপ যুবকসঙ্ঘের প্রথম সভাপতি, সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাঃ শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী এম-এ, পি-এইচ-ডি, পি-আর-এস্, আই-ই-এস্, মহাশয় ও তাঁহার ভ্রাতৃবৃন্দ গত ৪ঠা বৈশাখ তাঁহাদের পূজনীয়া মাতাঠাকুরাণী সারদা সুন্দরী নিয়োগী মহাশয়ার পরলোকগমন উপলক্ষে পনের দিন অশৌচ পালন করিয়াছেন। এজন্য ডাঃ নিয়োগী মহাশয়কে কোন প্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই; বরং তিনি শাস্ত্রজ্ঞ বিশিষ্ট ব্রাহ্মণগণের, স্বজাতীয় এবং অপর জাতীয় বরেণ্য ব্যক্তিগণের উৎসাহ ও সমর্থন লাভ করিয়াছিলেন। নিম্নলিখিত বিবরণ হইতে আপনারা তাহা সহজেই উপলব্ধি করিবেন।

(১) বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধের জন্য যে সাত আট জন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পুরোহিতের আবশ্যক হয়, তাহা তিনি পাইয়াছিলেন। হুগলী জেলাস্থ তাঁহার স্বগ্রাম হইতে তাঁহার কুলপুরোহিত শ্রীঅংশুমালী মুখোপাধ্যায় পৌরহিত্য করিতে আসেন এবং কুলপরামাণিকই ক্ষৌরকার্য্য সম্পন্ন করে। কুলপুরোহিত ব্যতীত কলিকাতার হাতীবাগান নিবাসী শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থ বেদান্তরত্ন ও অন্যান্য পণ্ডিতগণ হোতা, সদস্য, প্রভৃতি পদে বৃত হইয়াছিলেন। পণ্ডিত রামেন্দ্রসুন্দর ব্রাহ্মণ বিদায়ের নিমন্ত্রণেরও ভার লইয়াছিলেন। বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ, অশেষশাস্ত্রজ্ঞ, পণ্ডিতপ্রবর, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় সভারোহণ করিয়া সর্ব্বতোভাবে ডাঃ নিয়োগীকে সাহায্য করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবার দিবসে উপযুক্ত সংখ্যক ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়া দক্ষিণা গ্রহণ করিয়া গিয়াছিলেন। যে সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শ্রাদ্ধকার্য্যে ব্রতী বা বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নামের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা এখানে প্রদত্ত হইল :—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ, শ্রীসত্যপদ কাব্যতীর্থ, শ্রীপুরাণদাস সপ্ততীর্থ, শ্রীকালীচরণ শাস্ত্রী, শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ, শ্রীফণিভূষণ বিদ্যারত্ন, শ্রীক্ষেত্রনাথ শিরোমণি,

শ্রীনগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী কাব্য-পুরাণতীর্থ, শ্রীরমণীরঞ্জন বিদ্যানিধি, শ্রীমহেশচন্দ্র স্মৃতিরত্ন, শ্রীগৌরহরি বিদ্যাবিনোদ, শ্রীভবরাম শিরোমণি, শ্রীরামকৃষ্ণ শাস্ত্রী, শ্রীসীতারাম কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীনারায়ণ কবিরত্ন, শ্রীনকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ, শ্রীরামপ্রসাদ ষট্তীর্থ, শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসতীশচন্দ্র স্মৃতিরত্ন, শ্রীচারুচন্দ্র কাব্যতীর্থ, শ্রীচণ্ডীচরণ স্মৃতি-জ্যোতিভূর্ষণ, শ্রীঅংশুমালী মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমহেন্দ্রনাথ জ্যোতিসার্ণব, শ্রীকৈলাশ চন্দ্র শিরোমণি, শ্রীরাজেন্দ্রকুমার পদনিধি, শ্রীনগেন্দ্রনাথ ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীমহেন্দ্রনাথ ন্যায়রত্ন, শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থ, বেদান্তরত্ন প্রভৃতি।

(২) নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের মধ্যে স্বজাতীয় ও অন্য জাতীয় প্রায় সকলেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়াছিলেন। ডাঃ নিয়োগীর স্বগ্রাম হোয়েড়া হইতে ব্রাহ্মণ ও স্বজাতি সকল নিমন্ত্রিতই আসিয়াছিলেন ও কলিকাতায় তাঁহার প্রতিবেশী বেলগাছিয়ার ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি সকল নিমন্ত্রিত ব্যক্তি যোগদান করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া, চন্দননগর, ভরতপুর, দিগশুই, তারাগুণ, ভদ্রেশ্বর, বৈদ্যবাটী, বালী প্রভৃতি পল্লীগ্রাম হইতে নিমন্ত্রিত কুটুম্বগণও আসিয়াছিলেন, কলিকাতার নিমন্ত্রিত স্বজাতি প্রায় প্রত্যেকেই যোগদান করিয়াছিলেন। স্বজাতির মধ্যে যাঁহারা যোগদান করিয়াছিলেন তাঁহাদের নামের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা এখানে প্রদত্ত হইল :—

শ্রীহৃষীকেশ সুর, শ্রীপূর্ণচন্দ্র কুমার (সহকারী সভাপতি—বঙ্গীয় সদ্গোপ সভা), শ্রীপ্রফুল্লকুমার সুর (ঐ), শ্রীভূতনাথ কোলে (ঐ), শ্রীসতীশচন্দ্র বিশ্বাস এটর্ণি (ঐ,) শ্রীসতীশচন্দ্র বিশ্বাস, ক্যাপ্টেন মনোমোহন কুমার (সদ্গোপ যুবক সঙ্ঘের সভাপতি), শ্রীবিনেবিহারী পাল (বঙ্গীয় সদ্গোপ সভার ভূতপূর্ব্ব সভাপতি), শ্রীরাধারমণ সুর এটর্ণি, শ্রীরাধাকান্ত সুর, ডাঃ শচীন্দ্রনাথ সুর, ডাঃ সুশীলকুমার নিয়োগী, ডাঃ ব্রহ্মপ্রসাদ সুর, ডাঃ বিজয়গোপাল সুর, শ্রীপ্রিয়নাথ সুরের পুত্রগণ, রায় জ্ঞানচন্দ্র সুর বাহাদুরের পুত্র, শ্রীনিমাইচরণ পাল, (বঙ্গীয় সদ্গোপ সভার সভাপতির পুত্র), ৺ভুবন মোহন নিয়োগীর পুত্রগণ, শ্রীবিভূতিকুমার পাল, শ্রীভবতারণ সরকার, অধ্যাপক শ্রীশরৎলাল বিশ্বাস, অধ্যাপক শ্রীনরেন্দ্রনাথ নিয়োগী, শ্রীসত্যচরণ বিশ্বাস, শ্রীঅমূল্যচরণ সুর, শ্রীচুণিলাল বিশ্বাস, শ্রীঅমর নাথ বিশ্বাস, শ্রীতারকনাথ হাজরা (সদ্গোপ পত্রিকার সম্পাদক), শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায়, শ্রীপাঁচুগোপাল সুর, ৺ঠাকুরচরণ বিশ্বাসের পুত্র, শ্রীগণেশচন্দ্র সুর, শ্রীশ্রীশচন্দ্র বিশ্বাস, শ্রীউপেন্দ্রনাথ বিশ্বাসের পুত্রগণ, শ্রীহারাধন রায়, শ্রীআশুতোষ ঘোষ, শ্রীবঙ্কুবিহারী ঘোষ, শ্রীবলাইচরণ বিশ্বাস ও তাঁহার ভ্রাতাগণ, শ্রীললিতমোহন সুর, শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ এম-এ, বি-এল, শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীকানাইলাল মণ্ডল, শ্রীকালীপ্রসাদ নিয়োগী, ৺নারায়ণচন্দ্র বিশ্বাসের পুত্রগণ, শ্রীকেদারনাথ বিশ্বাস, শ্রীসতীশচন্দ্র নিয়োগী, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সুর, শ্রীবীরেশ্বর ঘোষ, শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ নিয়োগী, শ্রীহরিসাধন নিয়োগী, শ্রীতারকচন্দ্র বিশ্বাসের পুত্রগণ, শ্রীমন্মথনাথ সুর, শ্রীদিগম্বর বিশ্বাস (কাশী), শ্রীশিবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

(কাশী), শ্রীরবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস (কাশী),শ্রীসুধীরচন্দ্র বিশ্বাস (ভদ্রেশ্বর), শ্রীমন্মথনাথ সুর (ভদ্রেশ্বর), শ্রীমহাদেব নিয়োগী (ভরতপুর), শ্রীমণীন্দ্রনাথ সরকার (পিয়াশালা), শ্রীনগেন্দ্রনাথ সুর (তেলেনীপাড়া), শ্রীবিপিনবিহারী নিয়োগী (বরাহনগর), শ্রীবিপিনবিহারী সুর (কোন্নগর), শ্রীরাজকুমার নিয়োগী (চন্দননগর), শ্রীমদনমোহন ঘোষ (বৈষ্ণবাটী), প্রভৃতি।

অন্যজাতীয় মাননীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে যাঁহারা নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখযোগ্য—

জাষ্টিস স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, পোষ্টমাষ্টার জেনারেল রায় পি, এন, মুখার্জ্জি বাহাদুর, শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু, রায় শ্রীমল্লীনাথ রায় বাহাদুর, রায় শ্রীহেমচন্দ্র দে বাহাদুর, রায় শ্রীআশুতোষ ব্যানার্জ্জি বাহাদুর, ডাঃ পি, সি, মিত্র, শ্রীভূতনাথ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ শ্রীভুপেন্দ্রনাথ বসু, কাউন্সিলার শ্রীপুলিনবিহারী সাহু, কাউন্সিলার শ্রীমৃগাঙ্কমোহন মজুমদার, অধ্যাপক শ্রীহরিদাস মুখার্জ্জি, অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ মৈত্র, শ্রীসিদ্ধেশ্বর গাঙ্গুলী, শ্রীনগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, শ্রীআশুতোষ রায়, প্রভৃতি। জাষ্টিস্ ডাঃ দ্বারিকানাথ মিত্র মহাশয় বাটীতে বিবাহ থাকায় আসিতে না পারায় পত্র দিয়াছিলেন।

বলা বাহুল্য উপরোক্ত তালিকাগুলি হইতে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম বাদ পড়াই সম্ভব।

উপরোক্ত বিবৃতি হইতে সকলে বুঝিতে পারিতেছেন যে, পনের দিন অশৌচ পালন ও তদন্তে শ্রাদ্ধ উপলক্ষে পুরোহিতাদি পাইতে ডাঃ নিয়োগী মহাশয়ের অসুবিধা হয় নাই এবং নিমন্ত্রিত স্বজাতি ও অন্যজাতি প্রায় প্রত্যেকেই যোগদান করিয়াছিলেন। পনের দিন অশৌচ পালনে ইচ্ছুক স্বজাতীয় কোনও ব্যক্তি যদি পুরোহিতাদি পাইতে অসুবিধাভোগ করেন, তাহা হইলে তিনি 'সদ্গোপ যুবক সঙ্ঘে'র সম্পাদক শ্রীললিতমোহন কুমার মহাশয়কে (৩৪ নং ইণ্ডিয়ান মিরার ষ্ট্রীট, কলিকাতা) জানাইলে তিনি তাহার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। আশা করা যায় যে, এখন হইতে নিঃসন্দেহে ও নিঃসঙ্কোচের সহিত প্রত্যেক স্বজাতি ডাঃ নিয়োগীর প্রদর্শিত পথানুসরণ করিবেন।

পরলোকে জ্যোতিষচন্দ্র হাজরা

আমরা শোক-সন্তপ্ত-চিত্তে জ্ঞাপন করিতেছি যে, সদ্গোপ-কুল-তিলক কলিকাতা হাইকোর্টের সুবিখ্যাত ব্যারিষ্টার জ্যোতিষচন্দ্র হাজরা আর নাই। বিগত ১১ই বৈশাখ শুক্রবার বেলা ৪-৩০ মিনিটের সময় মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে তিনি মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। তাঁহার পরলোকগমনে কেবল যে সদ্গোপ জাতিরই ক্ষতি হইল তাহাই নহে, বাঙ্গলার জনপ্রিয় এক বিশিষ্ট ব্যক্তির তিরোধান হইল। সাধারণের নিকট তিনি "মিঃ জে, সি, হাজরা" নামেই পরিচিত ছিলেন। বিগত ইষ্টারের ছুটীতে তিনি ভ্রমণের জন্য কালিম্পং গমন করেন। সেখান হইতে ৫ই বৈশাখ শনিবার কলিকাতার ভবানীপুরস্থ ৬নং গোপাল ব্যানার্জ্জী ষ্ট্রীটে নিজ বাস-

ভবনে প্রত্যাগমন করেন। পথে ট্রেণে আসিবার সময় তাঁহার সামান্য জ্বর হয় এবং গলা ফুলিয়া উঠে। কিন্তু এই জ্বর ও গলা ফুলা তাঁহার আর নিরাময় হইল না। বুধবার রাত্রি ১২টার সময় তাঁহার গলা ফুলা ও যন্ত্রণা এরূপ বাড়িয়া উঠিল যে, তাঁহার চিকিৎসকগণ তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তরিত করিবার পরামর্শ দেন। হাঁসপাতালে আসিবামাত্র তাঁহার অস্ত্রোপচার করা হয়। শুক্রবার প্রাতে ৮ ঘটিকার সময় আর একবার অস্ত্রোপচার করা হইয়াছিল। তারপর সেইদিনই বৈকাল ৪৷৷০ সময় তিনি নশ্বর দেহ ছাড়িয়া গেলেন। অবিলম্বে তাঁহার মৃত্যু সংবাদ কলিকাতা সহরে ছড়াইয়া পড়ে। তাঁহার গুনমুগ্ধ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে শেষ-বিদায় দিবার জন্য দলে দলে আসিয়া তাঁহার দেহাবশেষ দেখিয়া যাইতে লাগিলেন। মেডিক্যাল কলেজ, তাঁহার বাসগৃহ বা শ্মশানে যাঁহারা উপস্থিত হইয়াছিলেন তাঁহাদের কয়েকজনের মাত্র আমরা এস্থলে নামোল্লেখ করিলাম ঃ—

স্বর্গীয় জ্যোতিষচন্দ্র হাজরা

জাষ্টিস্ স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, জাষ্টিস্ ডি, এন, মিত্র, জাষ্টিস্ রূপেন্দ্রকুমার মিত্র, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চান্সেলার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, এড্‌ভোকেট্ জেনারেল মিঃ এ, কে, রায়, লিগ্যাল রিমেম্ব্রেন্সার মিঃ খন্দকার, শ্রীশরৎচন্দ্র বসু, মিঃ জে, সি,গুপ্ত, শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র, শ্রীসুশীলচন্দ্র সেন, মিঃ ডি, পি, খৈতান, শ্রীসন্তোষকুমার বসু, মিঃ সি, ব্যাগ্রাম, মিঃ পাল্‌সিটি, ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল মিঃ এস্, এম্, বোস, মিঃ পি, এল, ত্রিবেদী, মিঃ পি, সি, কুমার, মিঃ এস, এন, ব্যানার্জ্জী, গভর্ণমেণ্ট প্লিডার ডাঃ এস্, সি, বসাক, মিঃ বি, কে, মুখার্জ্জী, মিঃ এন্, ঘটক, প্রভৃতি।

মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স একান্ন বৎসর মাত্র হইয়াছিল। এখন তাঁহার দুই পুত্র—সলিল কুমার (বয়স ১৯) ও শিশিরকুমার (বয়স ১৩), বিধবা পত্নী এবং বহু আত্মীয়-স্বজন বর্ত্তমান।

(দ্রষ্টব্য ঃ—আগামী সংখ্যায় আমরা জ্যোতিষচন্দ্র হাজরা মহাশয়ের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশের ব্যবস্থা করিতেছি)

আমাদের কথা

জ্যোতিষচন্দ্র হাজরা মহাশয়ের অতর্কিত মৃত্যুতে, পিতৃহারা সলিলকুমার ও শিশিরকুমার এবং তাহাদের স্বামীহারা মাতাঠাকুরাণীকে আজ আমাদের কথা যে কি বলিব,—কি বলিয়া সান্ত্বনা দিব তাহা ভাবিয়া পাইতেছি না। ভাষা এখানে স্তব্ধ হইয়া যায়! আমাদের কথা এখানে কিছু নাই! দুঃখ-ভারাক্রান্ত মনে এইমাত্র প্রার্থনা করি যে,—শ্রীভগবান, যিনি জ্যোতিষবাবুকে আপন ক্রোড়ে টানিয়া লইয়াছেন, তিনিই যেন তাঁহার পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা দান করেন।

* * *

জ্যোতিষবাবুর জ্যোতিঃপ্রভা পূর্ণরূপে প্রতিভাতোন্মুখ হইবার সময়েই তিনি যেরূপে ইহলোক ত্যাগ করিলেন, তাহা যেমন আকস্মিক তেমনই মর্ম্মান্তিক। ব্যবহারশাস্ত্রের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, তীক্ষ্ণ ধীশক্তি, ভূয়োদর্শিতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, বাক্যের উপর আধিপত্য, সহাস্য মধুর ব্যবহার, প্রভৃতি গুণে তিনি যেরূপ সর্ব্বজন-প্রিয় ও লোকসমাজে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন তাহাতে অনেকে আশা করিতেছিলেন যে, তাঁহার দ্বারা ভবিষ্যতে দেশের ও দশের মঙ্গলজনক অনেক কার্য্য সাধিত হইতে পারে। কিন্তু ভগবানের অভিপ্রায় ভিন্ন প্রকার! তাঁহার এই আকস্মিক পরলোক গমনে বাঙ্গালার একজন বিশিষ্ট লোকের অভাব ত হইলই; কিন্তু সদ্গোপ জাতির যে ক্ষতি হইল তাহা অপূরণীয়। স্বজাতিকে তিনি প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন। সর্ব্বদা তিনি কর্ম্মরত থাকিতেন বলিয়া তাঁহার স্বজাতির প্রতি অনুরাগ বাহিরে বিশেষ প্রকাশ পায় নাই। কিন্তু যে কোন স্বজাতি তাঁহার একবার সংস্পর্শে আসিতেন, তিনিই বুঝিতে পারিতেন যে, তাঁহার স্বজাতির প্রীতি কত গভীর ছিল। স্ব-সম্প্রদায়ের কোনও লোক তাঁহার কোন প্রকার সাহায্যপ্রার্থী হইলে তিনি সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকে সাধ্যমত সাহায্য দান করিতেন। সদ্গোপ যুবক সঙ্ঘকে তিনি অতিশয় স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। একবার তিনি সদ্গোপ যুবক সঙ্ঘের বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সভাপতিত্ব করেন। সদ্গোপ পত্রিকা পুনঃ প্রকাশিত হইলে, পত্রিকার মঙ্গল কামনা করিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। আজ মনে পড়ে—তাঁহার মৃত্যুর প্রায় দুইমাস পূর্ব্বে যে দিন তাঁহার সহিত আমাদের শেষ সাক্ষাৎ হয় সেই দিনের কথা! সেদিন রবিবার;—আমরা তাঁহার বাড়ীতে তাঁহার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। রবিবার হইলেও তিনি তখন আপন কর্ম্মে ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু তিনি আমাদিগকে দেখিবামাত্র সকল কার্য্য ফেলিয়া আমাদের সহিত সহাস্য বদনে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। কথা প্রসঙ্গে 'তিনি বলিয়াছিলেন—"আমি যখনই সময় পাই, তখনই আগে সদ্গোপ পত্রিকা পড়ি'। কেন—জান? পত্রিকাখানি আমাদের নিজেদের দিকে ফিরে দেখবার অনেকটা সুযোগ দেয়। যখন দেখি—আমার স্বজাতির লোকেরা লিখ্‌ছেন,—বিশেষ ক'রে যখন আমাদের

ছেলেমেয়েদের লেখা দেখি, তখন মনে যে কি আনন্দ হয়, তা' তোমরা এখন বুঝে উঠ্‌তে পারবে না। তোমরা যেমন ক'রে পার, পত্রিকাকে বাঁচিয়ে রেখো। এর ফল আজ হয় ত' তোমরা কিছু নাও পেতে পার; কিন্তু পত্রিকাকে যদি বাঁচিয়ে রাখতে পার,—ভবিষ্যতে এমন একটা দিন আসবে, যে দিন সত্যই তোমরা দেখে আনন্দ লাভ ক'রবে যে, তোমরা স্বজাতির কতখানি গৌরবজনক কাজ তোমাদের যৌবনকালে করেছ।" আমাদের প্রতি তাঁহার এই শেষ কথা! তাঁহার এই উপদেশবাণী সফল হউক। শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করি—তাঁহার আত্মা যেন শান্তিতে থাকে।

* * * *

সদ্গোপ যুবক সঙ্ঘের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম সভাপতি শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী মহাশয়ের মাতা ঠাকুরাণী গত ৪ঠা বৈশাখ পরিণত বয়সে মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। এরূপ স্বনামধন্য পুত্র এবং আত্মীয় পরিজন রাখিয়া পরিণত বয়সে মৃত্যু সকলের ভাগ্যে ঘটে না। ডাঃ নিয়োগী মহাশয়ের মাতাঠাকুরাণী ভাগ্যবতী ছিলেন। কিন্তু মাতা যতই বৃদ্ধ বয়সে পরলোক গমন করুন না কেন, মাতৃবিয়োগজনিত শোক-দুঃখ সন্তানের নিকট মর্ম্মান্তিক। আমরা ডাঃ নিয়োগী মহাশয় ও তাঁহার পরিবারবর্গের এই শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

* * * *

ডাঃ নিয়োগী মহাশয় এই উপলক্ষে পনের দিনে অশৌচ পালন করিয়া যে তেজস্বীতা ও আন্তরিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা প্রশংসনীয়। প্রায়ই দেখা যায়—সমাজের নেতৃগণ সমাজ-সংস্কারের নানা প্রস্তাব উত্থাপন ও সমর্থন অতি আগ্রহের সহিত বহু সময়ে করিয়া থাকেন; কিন্তু সেগুলি কার্য্যে পরিণত করিতে তাঁহারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেরূপ আগ্রহ প্রকাশ করেন না। অধিকন্তু, তাঁহাদের প্রস্তাবমত কার্য্য করিতে গিয়া সাধারণ লোকে নানা সামাজিক দুর্ভোগে বিপর্য্যস্ত হয়। নিখিল বঙ্গ সদ্গোপ সম্মিলনীতে কয়েক বৎসর ধরিয়া পনের দিনে অশৌচ পালনের প্রস্তাব গৃহীত হইতেছে। কিন্তু ডাঃ নিয়োগী মহাশয়ের পূর্ব্বে, আমাদের সমাজের নেতৃস্থানীয় যাঁহারা এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য বিশেষরূপ ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ যে উক্ত প্রস্তাবমত কার্য্য করিয়াছেন তাহা আমাদের জানা নাই। কেহ হয়ত প্রস্তাবটি সম্বন্ধে দ্বিমত প্রকাশ করিতে পারেন; কিন্তু এ কথা সকলেরই একবাক্যে স্বীকার করিতেই হইবে যে, আপন কর্ম্মের সময় প্রস্তাবটি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া ডাঃ নিয়োগী মহাশয় হৃদয়ের তেজস্বীতা ও অকৃত্রিমতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন; অধিকন্তু উক্ত প্রস্তাবমত কার্য্য যাহাতে অপরেও নির্ব্বিবাদে করিতে পারেন তাহারও ব্যবস্থা করিতে তিনি সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছেন। ইহা প্রকৃত নেতার উপযুক্ত কার্য্য হইয়াছে। এজন্য আমরা তাঁহার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি।

নিয়মাবলী

১ সমস্ত টাকা কড়ি যুবকসঙ্ঘের প্রধানাধ্যক্ষের নামে ১৭/১, হ্যাস্বরভ লেন, কলিকাতা এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

২। রাজনৈতিক কোন প্রবন্ধ পত্রিকাতে আলোচিত হয় না।

৩। লেখক-লেখিকাগণের মতামত পত্রিকা সম্পাদক বা সদ্গোপ যুবকসঙ্ঘের মতামত নহে।

৪। লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।

৫। প্রবন্ধ কাগজের একপৃষ্ঠে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া পত্রিকা-সম্পাদকের নামে ৩৪ নং ইণ্ডিয়ান মিরার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। ডাকমাশুল না পাঠাইলে অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরত দেওয়া হয় না। প্রবন্ধ পাঠাইবার সময় আপত্তি না জানাইলে পত্রিকা পরিচালক মণ্ডলী প্রবন্ধের যে কোন অংশ পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন করিতে পারিবেন।

৬। যুবক-সঙ্ঘ ও তাহার পত্রিকা সম্বন্ধীয় যাবতীয় সংবাদ যুবক-সঙ্ঘ অফিস ৩৪ নং ইণ্ডিয়ান মিরার ষ্ট্রীটে জ্ঞাতব্য। সন্ধ্যা ৮টা হইতে ৯৷৷৽টা পর্য্যন্ত অফিস খোলা থাকে।

৭। বিজ্ঞাপনের হার সাধারণ এক পৃষ্ঠা মাসিক ৮৲, আধ পৃষ্ঠা ৪৷৷৽, সিকি পৃষ্ঠা ২৷৷৽, সূচীর নীম্নে আধ পৃষ্ঠা ৬৲, সিকি পৃষ্ঠা ৩৷৷৽। বিশেষ বিশেষ স্থানে বিজ্ঞাপনের মূল্য প্রকাশকের নিকট জ্ঞাতব্য।

সদ্গোপ পাত্র-পাত্রীর

বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী

(১) সদ্গোপ পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপন বিনামূল্যে প্রকাশ করা হইবে। কেবলমাত্র পত্রিকার গ্রাহক-গ্রাহিকাগণই এই সুবিধা পাইবেন। কিন্তু স্থানাভাব বা অন্য কোন কারণ বশতঃ এই বিষয়ে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশ না করিবার ক্ষমতা সদ্গোপ যুবক সঙ্ঘের কর্ত্তৃত্বাধীন। (২) বিজ্ঞাপনগুলি স্পষ্টাক্ষরে ও সংক্ষিপ্ত হওয়া আবশ্যক। উহা যেন এই পত্রিকার ৩ লাইনের অধিক না হয়। (৩) বিজ্ঞাপনে বিবৃত বিবরণের জন্য আমরা দায়ী নহি। পাত্র-পাত্রীর সম্বন্ধ নির্ণয়কারিগণ সমস্ত বিষয় তাঁহারা নিজেদের দায়িত্বে করিবেন। (৪) যাঁহারা নিজেদের নাম প্রকাশ না করিয়া বক্স নম্বর দিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা যদি আমাদের কার্য্যালয় হইতে পত্রাদি লইয়া না যান, তবে উহা প্রেরণের জন্য তাঁহাদিগকে আমাদের নিকট উপযুক্ত (অন্ততঃ আট আনার) ডাকটিকেট রাখিতে হইবে।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ নিয়োগী কর্ত্তৃক দি নিউ ইণ্ডিয়ান প্রেস—৬, ডাফ ষ্ট্রীট হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সম্পাদক—শ্রীতারকনাথ হাজরা।

সূচী

১।	অনপেক্ষ (প্রবন্ধ)	...	রায় সাহেব সুরেন্দ্রনাথ মণ্ডল	১৯৭
২।	স্বর্গীয় জ্যোতিষচন্দ্র হাজরা (জীবনী)	...		২০০
৩।	প্রণাম (কবিতা)	...	শ্রীরমেন্দ্রনাথ ঘোষ	২০৪
৪।	দয়ার কাজ (কবিতা)	...	শ্রীশচীন্দ্রনাথ সুর	২০৪
৫।	চতুর্ব্বর্গ (নাটক)	...	শ্রীশ্রীশচন্দ্র কুমার এম-এ, বি-এল	২০৫
৬।	ঝড়ে দিলো দুলিয়ে (গল্প)	...	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ	২১৩
৭।	সংবাদিকা	...		২২৩
৮।	আমাদের কথা	...		২২৭

সদ্গোপ পাত্র-পাত্রী

পাত্র চাই—একটী চতুর্দ্দশবর্ষীয়া স্বাস্থ্যবতী শ্যামবর্ণা বাঙ্গলা লেখাপড়ায় অভিজ্ঞা গৃহকর্ম্মে নিপুণা পূর্ব্বকুল মৌদ্‌গোল্য গোত্র পাত্রীর জন্য একটী শিক্ষিত ব্যবসায়ী স্বাস্থ্যবান্ পাত্র চাই। যৌতুক ২০০০৲ টাকা। বক্স নং ৩ সদ্গোপ পত্রিকা।

পাত্রী চাই—একটী গ্রাজুয়েট শিলং প্রদেশের ব্যবসায়ী সুদর্শন ভালকো কুলীন বংশের পাত্রের জন্য একটী ১৭।১৮ বৎসর বয়স্কা সুন্দরী শিক্ষিতা ভাল্‌কো ঘর ব্যতীত পাত্রী চাই। কুলীন না হইলেও চলিবে। যৌতুকাদি কিছুই নাই। বক্স নং ৮ সদ্গোপ পত্রিকা।

পাত্রী চাই—ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারীং স্কুলের শেষ পরীক্ষোত্তীর্ণ মেদিনীপুর ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের অধীনস্থ কর্ম্মচারী একটী স্বাস্থ্যবান্ সুদর্শন যুবকের জন্য একটী সুন্দরী গৃহকর্ম্মে নিপুণা পাত্রী আবশ্যক। বক্স নং ১০ সদ্গোপ পত্রিকা।

পাত্রী চাই—একটি স্বাস্থ্যবান্ সুশ্রী শিক্ষিত, বিশিষ্ট ইঞ্জিনীয়ারের পুত্র, রেডিও ব্যবসায়ী ২২।২৩ বৎসরের যুবকের জন্য একটি স্বাস্থ্যবতী সুন্দরী শিক্ষিতা পাত্রী আবশ্যক। বক্স নং ১১ সদ্গোপ পত্রিকা।

পাত্রী চাই—বি-এ ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র, ২০।২১ বৎসরের স্বাস্থ্যবান্ পাত্রের জন্য একটি সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী, শিক্ষিতা, সূচীশিল্পে সুনিপুণা, ধনশালী গৃহের পাত্রী আবশ্যক। পাত্রের পিতা ২৫০৲ বেতনে গভর্ণমেণ্ট চাকরী করেন এবং হুগলী ও মেদিনীপুর জেলায় তাঁহার বিষয়-সম্পত্তি আছে। বক্স নং ১৩ সদ্গোপ পত্রিকা।

পাত্রী চাই—একজন এম্-এ উপাধিধারী উপার্জ্জনক্ষম স্বাস্থ্যবান্ যুবকের জন্য একটী সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী, শিক্ষিতা, গৃহকর্ম্মে নিপুণা পাত্রীর আবশ্যক। পাত্রের বয়স ২৬।২৭।

৭ম বর্ষ]　　জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়, ১৩৪৩　　[৭ম ও ৮ম সংখ্যা

অনপেক্ষ

[রায় সাহেব শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মণ্ডল]

প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ ইংরাজ সাহিত্যিক, মিষ্টার সামুয়েল স্মাইলস্, তাঁহার Self-Help নামক গ্রন্থের প্রারম্ভেই লিখিয়াছেন—"Heaven helps those who help themselves" অর্থাৎ যাঁহারা স্বাবলম্বী ভগবান্ তাঁহাদের সাহায্য করেন। গ্রন্থকারের এই পুস্তকের সর্ব্বপ্রথম বাণীই ঈশ্বরের সাহায্য।

মিষ্টার স্মাইলস্ ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের গুরু বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, কারণ তাঁহার লিখিত বহু পুস্তক আমরা অনেকেই পাঠ্যাবস্থায় পড়িয়াছি।

এই দীর্ঘ এক শতাব্দী কাল পূর্ব্বে প্রবীণ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের যাহা বিশ্বাস ছিল, আজও আধুনিক পাণ্ডিতেরা সেই কথাই বলেন,—অর্থাৎ নিজের পায়ে দাঁড়াও পরমুখাপেক্ষী হইও না।

জীবনের প্রথমে যখন জীব নিজের শরীর পালনে অক্ষম তখন ভগবান দয়া করিয়া মাতৃস্তনে তাহার জন্য খাদ্য সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া দেন এবং মাতা-পিতার স্নেহানুবন্ধনে তাহাকে অতি যত্নে লালন-পালন করেন। তারপর যখন সে দিন দিন বড় হয় তাহার স্বাবলম্বন শক্তিও বাড়িতে থাকে। শৈশবে কিছুদিন মাতা-পিতা শিশুর জীবন-ধারণের আবশ্যকীয় সমস্তই তাহাকে জোগান। কিন্তু ইহার সীমা আছে। চিরদিন পশুপক্ষীও সন্তানের ভরণ-পোষণ করে না। পক্ষী-শাবক যতদিন না উড়িতে পারে ততদিন তাহার মাতা তাহার চঞ্চুপুটে খাদ্য আনিয়া দেয়; শাবক উড়িতে শিখিলে সে আর মাতার মুখাপেক্ষী থাকে না, নিজেই

সংগ্রহ করিয়া জীবন-ধারণ করে। এইরূপ গো-মহিষাদি পশুগণও যতদিন না শাবকেরা বড় হয় ততদিন তাহাদের স্তন্যদান করে। সন্তান বড় হইয়া স্তন্যপানের জন্য নিকটে আসিলে পদপ্রহারে সন্তানকে বিতাড়িত করে।

এই যে প্রাকৃতিক রীতি ইতর জীব-জগতে দেখা যায় তাহা মনুষ্যজীবনে সভ্য শিক্ষিত সমাজের অনুকরণীয়। পিতামাতার স্নেহে পুত্রকন্যা চিরদিনই বদ্ধ। কিন্তু সন্তান বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ভরণপোষণের জন্য তাহার আর পিতা-মাতার মুখাপেক্ষী হওয়া উচিত নয়। তখন তাহার নিজের চেষ্টায় নিজের পায়ে দাঁড়ান উচিত।

এই চেষ্টায় স্বাবলম্বন এবং এই চেষ্টার দৃঢ়তার উপরই জীবনের কৃতকার্য্যতা নির্ভর করে। এইজন্য ইহার প্রয়োজনীয়তা এত বেশী। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জ্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে সারথীরূপে বরণ করেন এবং নিজ পুরুষকারের ও চেষ্টার দ্বারা জয়ী হইয়াছিলেন। এইজন্যই সঞ্জয় ঋষি যুদ্ধ শেষ হইবার পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন—

—"যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়োভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্ম্মম॥"

অর্থাৎ সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যেখানে সহায়, যেখানে ভগবানে পূর্ণ বিশ্বাসী ও নির্ভরশীল মহাবীর ধনুর্ধর অর্জ্জুন সেইখানেই শ্রী (অর্থাৎ লক্ষ্মী), বিজয় ও বিভূতি ইহার আমার দৃঢ় বিশ্বাস। ইহা ঋষি বাক্য,—ফলেও তাহাই হইয়াছিল।

আমাদের প্রথম দোষ আমাদের ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই। আমরা সবই আগে বুঝিয়া পরে বিশ্বাস করিতে চাই। কিন্তু সব সময় তাহা হইতে পারে না। যখন আমরা প্রথমে জ্যামিতি পড়িতে আরম্ভ করি তখন প্রথমেই আমাদের "বিন্দু" ও "রেখা"র সংজ্ঞায় কতকগুলি অসম্ভব বিষয়ের কল্পনাকে সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে হয়। যথা—"যাহার আকার আছে কিন্তু পরিমাণ নাই তাহাকে 'বিন্দু' বলে" এবং "যাহার দৈর্ঘ্য আছে কিন্তু প্রস্থ নাই তাহাকে 'রেখা' বলে।" এইরূপ পদার্থের অনুমান করা অসম্ভব। কিন্তু গুরু বাক্যে বিশ্বাস সনাতন রীতি ও প্রথা। যখন ছাত্র এই কাল্পনিক "বিন্দু" ও "রেখা"র অস্তিত্বকে সত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়া সমস্ত জ্যামিতি শাস্ত্রের পাঠ শেষ করে তখন তাহার সেই গুরু ও শাস্ত্র বাক্যের বিশ্বাসের ফল ফলে। এইরূপ অনেক বিষয় প্রথমে অসম্ভব বা কাল্পনিক বলিয়া মনে হইলেও, যাহা

বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। ইহাকেই গুরু বা শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস করা বলে। জীবনের প্রথম ও প্রধান শিক্ষা—ঈশ্বরে বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া সমস্ত কাজ করিতে হয়। তারপর নিজের পুরুষকারের নির্ভরতা ও প্রাণপন চেষ্টা। পণ্ডিতরা এই প্রকার উদ্যম ও চেষ্টার সহিত কাজ করা ও তাহার ফল নিম্নলিখিত এই প্রাচীন প্রবচনে নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—

"উদ্যোগিনম্ পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মী
দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি।
দৈবম্ নিহত্য কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা,
যত্নে কৃতে যদি ন সিদ্ধতি কোঽত্র দোষঃ॥"

অর্থাৎ উদ্যোগী পুরুষসিংহের লক্ষ্মী লাভ হয়। কাপুরুষেরা "দৈবাৎপ্রাপ্ত" এইরূপ বলে। এইরূপ দৈব-বিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আত্ম-শক্তির দ্বারা কার্য্য কর। যদি যত্ন করিয়া কার্য্য সিদ্ধি না হয় তবে যত্নে কোন দোষ হইয়াছে।

যাঁহারা এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিয়ম পালন করেন সর্ব্বত্র সমস্ত শিক্ষিত সমাজে তাঁহারাই পুরুষ-সিংহ। তাঁহারাই জীবনে কৃতকৃত্য হইয়া দেশের আদর্শ হইয়াছেন। ভারতে ও বঙ্গদেশে এইরূপ আদর্শ পুরুষের অভাব নাই, স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগার, ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রাজা রামমোহন রায়, সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সার গুরুদাস বন্দ্যোপধ্যায়, গোখেলে, বাল গঙ্গাধর তিলক ও মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি মহাপুরুষেরা চিরদিনই প্রাতঃস্মরণীয়। আমাদের স্বজাতির মধ্যেও এইরূপ আদর্শ স্বনামধন্য পুরুষসিংহের অভাব নাই। তাঁহাদের অনেকেই অতি দীন দরিদ্র অথবা অতি সামান্য অবস্থা হইতে জীবন যাত্রা আরম্ভ করিয়া ঈশ্বর ও আত্ম-পুরুষকারের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ন্যায় ও ধর্ম্ম পথে কার্য্য করিয়া সমাজে ও দেশের মধ্যে আদর্শ স্থানীয় হইয়াছেন।

কি ইতর জীবে কি মনুষ্য সমাজে এই এক প্রাকৃতিক নিয়ম অনাদি কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইহাই মহাজনোচিত পথ। ইহাই আদর্শ। ইহাকেই পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন,—

"মহাজনো যেন গতঃ স এব পন্থাঃ।" যুগাবতার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পুরুষসিংহ অর্জ্জুনকে এই কথাই আরও বিশদভাবে বলিয়াছিলেন :—

অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥ গীতা ১২।১৬

স্বর্গীয় জ্যোতিষচন্দ্র হাজরা

পরলোকগত জ্যোতিষচন্দ্র হাজরা সাধারণের নিকট মিঃ জে, সি, হাজরা নামেই সুপরিচিত ছিলেন। কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার হিসাবে তিনি লোকসমাজে যথেষ্ট সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। কিরূপে তিনি এই সম্মান ও প্রতিপত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন তাহা সকলেরই বিশেষতঃ তাঁহার স্বজাতির জ্ঞাত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

জ্যোতিষচন্দ্রের পৈত্রিক বাসস্থান হুগলী জেলার অন্তর্গত দোয়াদণ্ড গ্রামে। তাঁহার পিতৃদেব স্বর্গীয় বৈকুণ্ঠনাথ হাজরা মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল ছিলেন। বৈকুণ্ঠ বাবুর তিন পুত্র ও পাঁচ কন্যা। পুত্রগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ শরৎচন্দ্র, মধ্যম সতীশচন্দ্র এবং কনিষ্ঠ জ্যোতিষচন্দ্র। শরৎচন্দ্র তমলুকের একজন সুপ্রসিদ্ধ উকীল ছিলেন এবং সতীশচন্দ্র কাঁথিতে চিকিৎসা ব্যবসায় করিতেন। জ্যোতিষচন্দ্র ১৮৮৪ সালে কাঁথিতে জন্মগ্রহণ করেন।

বাল্যকাল হইতেই জ্যোতিষচন্দ্রের বিদ্যাশিক্ষার প্রতি অতিশয় অনুরাগ ছিল। বিদ্যাশিক্ষার প্রতি জীবনে তিনি কখনও অবহেলা করেন নাই। সেইজন্য অধ্যয়নকালে কোনও পরীক্ষাতে তিনি কখনও বিফল হন নাই। প্রথম ছাত্রজীবনে তিনি কাঁথির স্কুলে অধ্যয়ন করেন। সেই সময়ে মেদিনীপুরের প্রসিদ্ধ জননায়ক স্বর্গীয় বীরেন্দ্রনাথ শাসমল তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ঐ কলেজ হইতে তিনি বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ইতিহাসে এম-এ উপাধি লাভ করেন। এই বৎসরেই হুগলী জেলার অন্তর্গত পাতুল গ্রাম নিবাসী স্বর্গীয় বেণীমাধব ঘোষ মহাশয়ের কন্যা কুমারী নিভাননীর সহিত তাঁহার শুভ পরিণয় হয়। ১৯০৭ সালে তিনি বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দ হইতে জ্যোতিষচন্দ্রের কর্ম্মজীবনের সূত্রপাত। স্বাবলম্বী হইয়া জীবন-যাপন করিবার প্রবল বাসনা তিনি বাল্যকাল হইতে মনোমধ্যে পোষণ করিতেন। স্বোপার্জ্জিত অর্থে যাহাতে নিজের জীবিকা অর্জ্জন ও সংসার প্রতিপালন করিতে পারেন তাহার চেষ্টা তিনি প্রাণপণে করিতেন। ঐ বৎসর জুলাই মাস হইতে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন। ব্যবহারাজীবের কার্য্যে সাফল্যলাভ করিতে হইলে ব্যবহারশাস্ত্রে যেরূপ ব্যুৎপত্তি আবশ্যক সেইরূপ বাকচাতুর্য্য, সাহসিকতা, তীক্ষ্নদর্শিতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, ধৈর্য্য, স্থৈর্য্য, প্রভৃতি
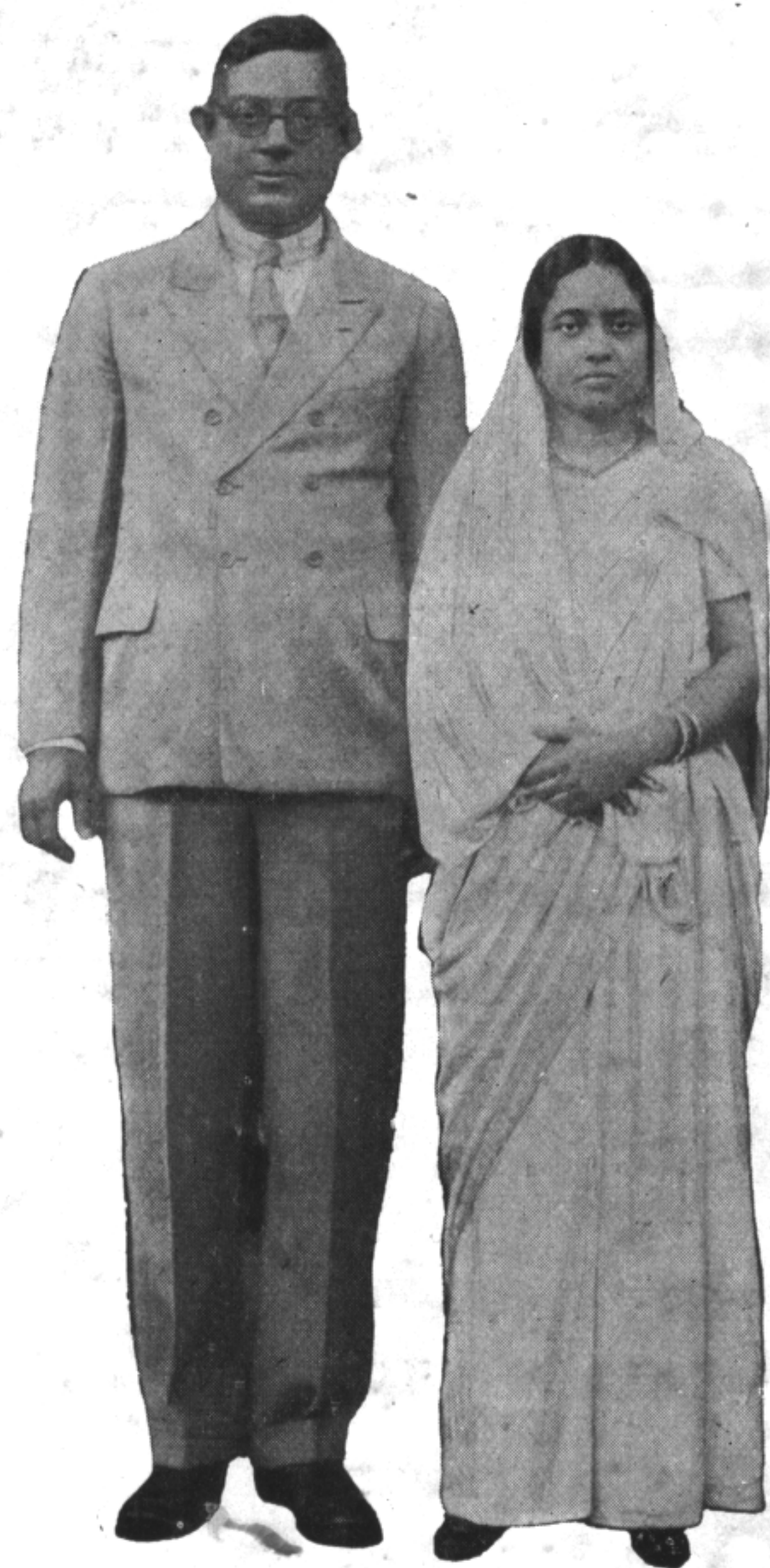
স্বর্গীয় জ্যোতিষচন্দ্র হাজরা ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী

গুণ সমধিক প্রয়োজন। কিন্তু সাধনা ও অভ্যাস ব্যতীত এই সকল গুণের অধিকারী হওয়া যায় না। হয়ত, স্বভাবতঃ কেহ কেহ এই সকল গুণের অধিকারী হইতে পারেন; কিন্তু উহাদের পূর্ণ বিকাশের জন্য তাঁহাদেরও সাধনা ও অভ্যাসের প্রয়োজন হয়। জ্যোতিষচন্দ্র ইহা বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সেইজন্য তিনি গৃহে যেরূপ নিবিষ্ট মনে ব্যবহারশাস্ত্র ও নিষ্পত্তিকৃত মকর্দ্দমা সকল পাঠ করিতেন, সেইরূপ সুবিখ্যাত ব্যবহারাজীবিগণের মকর্দ্দমা পরিচালনা-কার্য্য লক্ষ্য করিয়া ঐ সকল গুণের অধিকারী হইতে ছাত্রাবস্থা হইতেই বিশেষ যত্ন লইতেন।

ওকালতী কার্য্যে প্রথম হইতেই অধিক অর্থোপার্জ্জন হয় না; কারণ, নবীন ব্যবহারাজীবীর উপরে সহজে সকলে আস্থা স্থাপন করিতে পারে না। অথচ স্বাবলম্বী হইবার তাঁহার প্রধান বাসনা ছিল। সেই কারণে হাইকোর্টে প্রবিষ্ট হইবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বঙ্গবাসী কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপকের কার্য্য গ্রহণ করেন। এই সময়ে আত্মোন্নতির জন্য তিনি যেরূপ কষ্ট-সহিষ্ণুতা, অক্লান্ত পরিশ্রম, স্থিরবুদ্ধি, চিত্তের দৃঢ়তা, প্রভৃতি গুণের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন তাহা সচরাচর দেখা যায় না। এই সময় তিনি একজন চব্বিশ বৎসরের যুবক মাত্র। এই বয়সে সাধারণতঃ লোকে আমোদ-প্রমোদে রত হয়। কিন্তু তিনি এই বয়সেই সকল প্রকার বিলাসিতা আমোদ-প্রমোদ বর্জ্জন করেন। এমন কি, বন্ধুবান্ধবগণেরও সহিত বেশী দেখা সাক্ষাৎও করিতেন না। হাইকোর্টের ও কলেজের কার্য্য করিয়া বাড়ী ফিরিতে সন্ধ্যা হইয়া যাইত। কিন্তু বাড়ীতে প্রবেশ করিলে সহজে আর তিনি বাড়ীর বাহির হইতেন না। আপন মক্কেলগণের যে সকল কার্য্য থাকিত তাহা সমাপন করিয়া তিনি অধিক রাত্র পর্য্যন্ত অধ্যয়নে রত থাকিতেন। সে সময়ে তিনি কলিকাতার ভবানীপুরে মাত্র ২৫৲ টাকায় একটি বাসা ভাড়া করিয়া থাকিতেন। তখন ভবানীপুর এখনকার মত জনসঙ্কুল ছিল না এবং বাড়ী ভাড়াও অতি অল্প ছিল। উত্তর বা মধ্য কলিকাতা অপেক্ষা নির্জ্জন স্থানে অধ্যয়ন ভালরূপে হইবে বলিয়া এবং ব্যয়ও অল্প হইবে বলিয়া, ভবানীপুর তাঁহার কর্ম্মস্থল হইতে কিঞ্চিৎ দূরস্থ হইলেও তিনি ঐ অঞ্চলে বাস করা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া স্থির করেন।

জ্যোতিষচন্দ্র যখন এইরূপ অনন্যচিত্তে আত্মোন্নতির জন্য নিবিষ্ট, সেই সময়ে তাঁহার কর্ম্ম-জীবনের প্রবেশ-দ্বারেই তাঁহার উন্নতির পথে প্রবল বাধা উপস্থিত হইল। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পিতৃদেব বৈকুণ্ঠনাথ হাজরা পরলোক গমন করেন এবং ইহার কিছুদিন পরে ১৯১০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শরৎচন্দ্র হাজরা মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহারা দুইজনেই অধিক উপার্জ্জন করিতেন এবং প্রধানতঃ তাঁহাদেরই উপার্জ্জনে তাঁহাদের বৃহৎ একান্নবর্ত্তী পরিবারের ব্যয় নির্ব্বাহ হইত।

পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুতে সমগ্র পরিবারের ভার সংসারে নব প্রবিষ্ট এই যুবকের উপর নিপতিত হইল। কিন্তু কর্ত্তব্যনিষ্ঠ জ্যোতিষচন্দ্র ইহাতে ভগ্নোদ্যম হইলেন না। তিনি সেই ভার মাথায় করিয়া লইলেন। এই সময়ে তাঁহার সহধর্ম্মিণী, যদিও বয়সে তখন কেবলমাত্র বালিকা ছিলেন, তথাপি বর্ষীয়সী গৃহিণীর ন্যায় সংসার পরিচালনা-কার্য্যে স্বামীকে সাহায্য করিতে লাগিলেন এবং আত্মোন্নতি করিয়া অধিকতর অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত তাঁহাকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। তিনি একজন বহুগুণ-বিভূষিতা মহিলা। হিন্দু নারীর ঔদার্য্য, পরিমিতাচার ও নৈপুণ্যের দ্বারা হিন্দুসংসার কিরূপ ধনজনসমন্বিত হইয়া সুগঠিত হইয়া উঠে, তাহা তিনি আপন কর্ম্মের দ্বারা প্রমাণিত করিয়াছেন। এই সুযোগ্যা পত্নীর সাহচর্য্যেই জ্যোতিষচন্দ্র জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত তাঁহাদের সুবৃহৎ একান্নবর্ত্তী পরিবার পরিচালন-ভার বহন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

অদম্যচিত্ত জ্যোতিষচন্দ্র অধিকতর নিগূঢ়ভাবে আত্মোন্নতিতে মনোনিবেশ করিলেন। হাইকোর্টে প্রবেশের দুই বৎসরের মধ্যেই তাঁহার কর্ম্মপ্রসারতা এরূপ বৃদ্ধি পাইল যে, তাঁহাকে বাধ্য হইয়া ১৯১০ খৃষ্টাব্দে বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপনা কার্য্য পরিত্যাগ করিতে হইল। অধ্যাপনা কার্য্যেও তিনি অতি অল্প দিনের মধ্যেই বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং ছাত্রগণের শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছিলেন। যাহা হউক, তিনি অধ্যাপকের পদ পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত সময়ই হাইকোর্টের কার্য্যে নিয়োজিত করিলেন এবং ক্রমে ক্রমে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ১৯১৬-১৭ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ মাত্র আট নয় বৎসর কার্য্য করিবার পর তাঁহার কর্ম্মপ্রতিভা এরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, ফৌজদারী মকর্দ্দমায় তদানীন্তন উকীল বর্ত্তমান হাইকোর্টের স্বনামধন্য জজ স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, স্বর্গীয় দাশরথি সান্ন্যাল, স্বর্গীয় অতুলচন্দ্র বসুর পরই তাঁহার নামোল্লিখিত হইত। এই সময় হইতে তিনি প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিতে লাগিলেন এবং ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা হরিশ পার্কের উপর ৬ নং গোপাল ব্যানার্জ্জি লেনে ভূমি ক্রয় করিয়া একটি সুদৃশ্য গৃহ নির্ম্মাণ করেন।

তৎকালীন নিয়ম অনুযায়ী উকীলগণ হাইকোর্টের আদিম বিভাগে কার্য্য করিতে পারিতেন না। কিন্তু জ্যোতিষচন্দ্রের মনে প্রবল বাসনা ছিল যে, তিনি হাইকোর্টের আদিম বিভাগেই আপন কর্ম্ম বিস্তৃত করিবেন। সেইজন্য তিনি ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে স্বদেশ ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে যাত্রা করেন। সেখানকার গ্রেজ্ ইন্ হইতে 'ব্যারিষ্টার-এ্যাট-ল' উপাধি লাভ করিয়া ১৯২১ খৃষ্টাব্দ হইতে কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করিতে আরম্ভ করেন। অতি অল্প দিনের মধ্যেই তিনি আদিম বিভাগের কার্য্যেও যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জ্জন

করিয়াছিলেন। শেষ জীবনে তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর ব্যারিষ্টার বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতিগণ এবং তাঁহার সমব্যবসায়িগণ তাঁহাকে সম্মানের চক্ষে দেখিতেন।

তাঁহার প্রতিভা অধিকতর বিকশিত হইবে বলিয়া অনেকেই আশা করিতেছিলেন। কিন্তু সামান্য কয়েক দিনের রোগ ভোগ করিয়া অতর্কিতে বিগত ১১ই বৈশাখ অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে অক্ষয়ধামে চলিয়া গেলেন।

জ্যোতিষচন্দ্র লোকসমাজে যে প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা কেবল তাঁহার ব্যবহারজীবির কার্য্যদক্ষতার জন্যই নয়, তাঁহার অমায়িক মধুর ব্যবহারও তাহার অন্যতম কারণ। অনেক লোকে কিঞ্চিৎ অর্থ ও খ্যাতি অর্জ্জনে সমর্থ হইলে দাম্ভিক ও অহঙ্কারী হইয়া পড়েন। কিন্তু জ্যোতিষচন্দ্র প্রভূত অর্থ ও খ্যাতি অর্জ্জন করিলেও, কোনও দিন তাঁহার মনে দম্ভ বা অহঙ্কার স্থান পায় নাই। সকল শ্রেণীর লোকের সহিত তিনি অন্তরঙ্গতার সহিত মিশিতে পারিতেন। তাঁহার দ্বার সকলের নিকট উন্মুক্ত ছিল। অপরকে সাহায্য দানও তাঁহার যথেষ্ট ছিল,—বহু দরিদ্র লোক তাঁহার নিকট হইতে অনেক সাহায্য পাইয়াছে। মামলা-মকর্দ্দমায় বিপন্ন অর্থহীন লোকে তাঁহার শরণাপন্ন হইলে তিনি যথাসাধ্য সহায়তা দান করিতেন। হুগলী জেলায় তাঁহার পৈত্রিক বাসস্থানটি তিনি একটি আশ্রমের জন্য ছাড়িয়া দেন। তাঁহার স্বজাতি-প্রীতিও অতিশয় গভীর ছিল। তাঁহার গৃহে কোন স্বজাতি গমন করিলে, তিনি আনন্দ অনুভব করিতেন এবং স্বজাতীয় যুবকগণকে উন্নতি লাভ করিবার জন্য উৎসাহ দান করিতেন।

এখন তাঁহার দুই পুত্র ও বিধবা পত্নী বর্ত্তমান। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সলিলকুমার হাজরা স্কটিশ চার্চ্চ কলেজে বি-এ চতুর্থ বার্ষিক ছাত্র এবং কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ শিশিরকুমার হাজরা মিত্র ইনিষ্টিটিউসনের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র। ইহা ব্যতীত তাঁহার বহু আত্মীয় স্বজন বর্ত্তমান। তাঁহার দুই ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুত সুকুমার হাজরা (মিঃ এস্, হাজরা) ও শ্রীযুত অজিতকুমার হাজরা (মিঃ এ, কে, হাজরা) কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার।

প্রণাম

[শ্রীরমেন্দ্রনাথ ঘোষ]

নূতন বছরে প্রথম প্রভাতে প্রণাম পাঠায়ে দিতেছি সবারে।
বন্ধু আমার সবাই আজিকে—সকলে তাহারা যাহারা এপারে।
ওপারেতে যারা গিয়াছে চলিয়া আমারে একাকী ফেলিয়া এখানে—
তাদেরও আজি প্রণতি জানাই স্বর্গে নরকে যে আছে যেখানে।

বছরের এই গোড়ার দিনেতে পুরাণোর পানে বন্ধু চেও না
নব জীবনের নব সূচনায় বিগত দিনের রাগিণী গেও না।
স্মরণের যত চিহ্ন আজিকে ঝরিয়া যাওয়া পাতার মতন,—
পদানত করি এগোও সুমুখে ফেলনা অশ্রু, এনোনা বেদন।

চলে যে গিয়াছে দূরে—বহুদূরে সঞ্চিত যাহা সব তার নিয়ে,
তুমি কেন মিছে তাহাকে ফেরাও দু'দিনের তরে ভালবাসা দিয়ে।
একদা যেখানে সবুজ গহনে বাতাস বহেছে সবুজেরে ঘিরে
আজিও কি সেথা বসন্তের দূত বহিয়া যাইবে অতি ধীরে ধীরে ?

সবুজের গান গেয়েছে তাহারা যত দিন ছিল সবুজের তান,
শুষ্ক পাতার মর্ম্ম চিরিয়া শুনিতে পারে কি নূতনের গান।
তাই আমি আজ করি নমস্কার তাদের সকলে যাহারা গাহিবে
নূতন প্রভাতে নব নবগান—নূতন বারতা যাহারা আনিবে।

দয়ার কাজ

("Little Things" নামক ইংরাজী কবিতার অনুবাদ)

[শ্রীশচীন্দ্রনাথ সুর]

করুণার কথা ব্যথিত চিত্তে
প্রীতি বরষণ করে,
পরের বয়ানে হাস্য দেখিলে
প্রীতির ঝরণা ঝরে।

পরের কার্য্য মঙ্গলময়
লাগেনা তাহাতে অর্থ,
দয়ার কার্য্য বিহনেতে হয়
জীবন সকলি ব্যর্থ।

দয়ার কার্য্য জগৎ মাঝারে
মণি-মাণিক্য-সম,
লোকের চক্ষে হোক্ সামান্য
মূল্যে সে অনুপম।

চতুর্ব্বর্গ

দুই

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীশ্রীশচন্দ্র কুমার, এম-এ, বি-এল]

জ্যোৎস্নাময়ীর দোতলার শয়নকক্ষ।

[জ্যোৎস্নাময়ী কানে রেডিও হেড্‌ফোন্ লাগাইয়া পায়ে-চালানো সেলাইয়ের কলে পড়শীদের মেয়েদের পেনি ফ্রক সেলাই করিতেছিল। কনকলতা একখানি "ভারতবর্ষ" লইয়া পড়িতেছিল। তাহারও কানে 'রেডিও হেড্‌ফোন' লাগান। মেঝেতে ছোট ছোট মেয়েগুলি লেখাপড়া করিতেছিল।

এমনি সময়ে ভারতী হাতে 'এট্যাচি কেস্', রুমাল, ফাউন্টেনপেন্, প্রবাসী, বৈজয়ন্তী লইয়া ঢুকিল। চটি ফট্ ফট্ করিতে করিতে দরজা গোড়া থেকে উঁকি মারিয়া চেঁচাইয়া উঠিল।]

ভারতী—

মহাশয়াগণ! গৃহপ্রবেশে গৃহস্থাশ্রমের শান্তির কোন ব্যাঘাত হবে না ত?

[জ্যোৎস্নাময়ী ও কনকলতা কান হইতে হেড্‌ফোন নাবাইয়া লইল, জ্যোৎস্না উঠিয়া দাঁড়াইল।]

জ্যোৎস্না—

এসো ভাই এসো, আজ বড় সৌভাগ্য তোমার দেখা পাওয়া গেল।

কনক—

কোন্ গগনের চাঁদ কোন্ গগনে উদয়। ব্যাপার কি লো? স্কুলের সেক্রেটারীর বাড়ীর চায়ের কাপ ভুলে এই হতভাগিনীদের পান-জর্দ্দার আসরে শুভ্র দন্ত পংক্তির হাসি ছড়াতে এসেচো কি মনে করে?

[ভারতী বই-পত্র সব কোণের একটা টেবিলে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া—একটা চেয়ারে ধপ

ভারতী—

না ভাই তোরা একবার থাম্। আমি একটু জিরিয়ে নিই—তারপর সব বল্‌চি। আর পারিনে দিদি—মরলেই বাঁচি।

[আনন্দময়ী একটী মেয়ে কোলে লইয়া হাসিতে হাসিতে প্রবেশ করিল—আঁচলখানি মেঝেয় লুটাইতেছিল।]

আনন্দময়ী—

ওমা, কি করচিস্ তোরা ? ভারতী যে লো ! এবার এসেচে আনন্দময়ী নয়—গণ্ডগোলময়ী। সে তোদের মুখ বুজে, ঈষৎ ঠোঁট নেড়ে, আঙ্গুল নেড়ে সভ্য তর্ক বিতর্ক ভেঙ্গে, জোর গলায় পাড়া কাঁপিয়ে, ঘুমন্ত ছেলের ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিয়ে জ্বালানে যে এসেচে আনন্দময়ী [হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল।]

[কোলের মেয়েটী হঠাৎ কাঁদিয়া উঠিল—আনন্দময়ী বসিয়া তাহাকে স্তন্যপান করাইতে লাগিল। পড়ুয়া মেয়েগুলি জ্যোৎস্নার কাছে লেখাপড়ার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিল।]

আনন্দময়ী—

নে-নে, জ্যোৎস্না ওদের ছুটী দে, অত পড়ে কি হবে—শেষে যে ভারতীর অন্ন উঠিয়ে দেবে। [হো হো করে হাসিতে লাগিল।]

[জ্যোৎস্না মেয়েদের ছুটী দিয়া দিল ; মেয়েরা গোলমাল করিতে করিতে চলিয়া গেল।]

ভারতী—

আর বলিস্ কেন ? আজ এক ঘটনা হয়েচে ;—এই সেখান থেকে হন্ত দন্ত হয়ে ছুটে আস্‌চি।—গেছলুম আজ মুখুয্যেদের বাড়ীতে ; মুখুয্যে মশায়ের নাতনীকে পড়াতে। হঠাৎ আমার ডাক পড়লো ; চাকর এসে বল্‌লে—কর্ত্তা মশায় আপনাকে ডাকচেন ঐ পাশের ঘরে। আমি ধীরে ধীরে চল্লুম ; গিয়ে দেখি—কর্ত্তা মশায় প্রায় ষাট বৎসরের বৃদ্ধ—কোচান ধুতি পরা—গিলে করা ঢিলা হাতা পাঞ্জাবী পরা—গোঁফ, দাড়ি কামান চোখে চশমা। আমি ঘরে ঢুক্‌তেই শশব্যস্তে উঠে বৃদ্ধ একটী চেয়ার এগিয়ে দিয়ে আমায় বস্‌তে বল্‌লেন্। আমি বস্‌লে নিজেও একটী চেয়ারে বসে গলার স্বর নামিয়ে আত্মীয়তার সুরে বল্‌লেন—"দেখুন ! অনেকদিন আপনার খবরটা নেবো ভাবি, তা সময় হয়ে ওঠে না—কিছু মনে করবেন্ না। আপনি একথা ভাববেন না যে, আমি আপনার সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন ; তা নয় !—বরং

আমি লক্ষ্য রাখি আপনি কবে কোন শাড়ী পরে আসেন—ঠিক যখন আপনার জুতার শব্দ কানে আসে আমি তখন বড়ই অন্যমনস্ক হয়ে পড়ি। যতক্ষণ না আপনি বীণাকে পড়িয়ে চলে যান, ততক্ষণ আমি কোন কাজেই মন দিতে পারি না। যাক্‌গে,—আচ্ছা বলুন তো—আপনার বাড়ীতে কে আছে ? ......

আনন্দময়ী—

ওঃ ! বুড়ো মিন্সের খুব দরদ্ যে ....

ভারতী—

আমি এবার একটু নড়ে চড়ে চেয়ারটা দূরে সরিয়ে নিয়ে অসহিষ্ণু হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম্—"আপনি কি জন্য আমায় ডেকেচেন্ কিছুই তো বুঝ্‌তে পার্‌চি না !—এসব কি অবান্তর কথা বল্‌চেন।"

[দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া ভারতী বলিতে লাগিল।]

বৃদ্ধ মুখুয্যে তখন ধীরে ধীরে চশমাটা খুলে রুমাল দিয়ে নিজের চশমাটা ও মুখটা মুছে নিয়ে চেয়ারটা একটু আমার দিকে এগিয়ে নিয়ে বল্লেন—'দেখুন আপনি এই বৃদ্ধকে ক্ষমা করবেন—আজ ছয় মাস যাবৎ আপনি এখানে পড়াতে আসচেন্—আমি এই কয়মাস আপনার কথা অনেক ভেবেচি, আপনার বিষয় নিয়ে নিজের সঙ্গে অনেক বোঝা-পড়া করে পরাস্ত বিপর্য্যস্ত হয়ে আজ আপনাকে ডেকেচি, একটা কথা বলে ফেলতে চাই। আপনি শুনে যা খুসী হয় বিচার করুন। দেখুন ! আমি খোঁজ নিয়েচি যে আপনি আপনার স্বামীর সঙ্গে সিভিল ম্যারেঁজ আইনের বিবাহে বদ্ধ—এবং এখন ব্যারিষ্টার সাহেবের বিশেষ কিছু রোজগারপাতি নাই, আপনার উপার্জ্জনের উপর নির্ভর। তা সত্ত্বেও ব্যারিষ্টার সাহেব আপনার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেন না।" আমি তখন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বল্লুম—"আপনি বড়ই অভদ্র—আমাদের ঘরোয়া কথায় আপনার মন্তব্য বা সহানুভূতি প্রকাশ একেবারেই নিষ্প্রয়োজন"। তখন মুখুয্যে মশায় কাতরস্বরে বলে উঠ্‌লেন—"আপনি দয়া করে আর দু মিনিট বসুন।"—আমি হতাশভাবে পুনরায় বসে পড়লুম—তখন মুখুয্যে মশায় আরও একটু কাছে সরে এসে বল্‌লেন্—"আমি পনের বৎসর বিপত্নীক। আমি তোমায় পত্নীরূপে পেতে চাই। আমি তোমায় আমার যথাসর্ব্বস্ব দোব—তোমায় রাজরাণী করবো"—বলেই খপ করে আমার হাতটা ধরে ফেল্‌লেন্। আমি অমনি উঠে দাঁড়িয়ে আমার হাতটা টেনে নিয়ে, বাঁহাতে করে ঠাস করে বুড়োর গালে এক চড় মেরে ঘর থেকে একেবারে ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম্। [দীর্ঘশ্বাস ফেলিল] তারপর, জ্যোৎস্না

আনন্দময়ী—

পোড়ার মুখো মিন্সে ; বুড়োর আক্কেল দেখো! আমি হ'লে বুড়োর মুখে তিন ঝাঁটা মারতুম আর নুড়ো জেলে মুখে ধরিয়ে দিতুম।

ভারতী—

ট্রামে চড়ে প্রথম ভেবেছিলুম—যাই বাড়ীতে ফিরে কাঁদিগে ; ভগবান্ এমন হতভাগা স্বামী দিয়েচেন যে, নিজে রোজগার করে স্ত্রীকে খাওয়াতে পারে না। স্ত্রী এমনি করে লাঞ্ছিতা হ'য়ে টাকা এনে অন্নের যোগাড় করে দেবে, তবে হতভাগা বসে বসে খাবে—এমন মানুষের মরণও হয় না! কিন্তু তারপর জানিনে কেমন করে তোমাদের মজলিসের কথা মনে পড়লো—মনে হোলো তোমাদের ওখানে গিয়ে বস্‌লে একটু জুড়োতে পার্‌বো—মনের সব জ্বালা ধুয়ে মুছে যাবে।

[ভারতী কাঁদিতে লাগিল।]

জ্যোৎস্না—

কাঁদিস্ কেন ভাই—এতে তোর কাঁদবার কি আছে? দেখ্ এই পুরুষমানুষগুলো হচ্চে আস্তো জানোয়ার। এরা কেবল জামা কাপড় প'ড়ে বাইরের একটা আবরণে নিজেদের উচ্ছৃঙ্খলতাকে অতি কষ্টে শৃঙ্খলিত করে রেখেচে। না হলে, মিন্সেগুলোর না আছে সংযম, আর না আছে হৃদয়ের দয়া মায়া। তাদের যেমন বাচ্চা তেমনি ধাড়ী ;—কি বলিস্ কণকদি।

কনক—

ছি ভারতী, তুই চুপ্ কর্। তোর কথা শুনে আমার কিন্তু বড্ড হাসি পাচ্ছে। আমি ভেবেই পাচ্চি না—তুই কেন কাঁদ্‌চিস্। বুড়ো বয়সে মুখুয্যের এখন ভীমরথী ধরেচে—ভট্টাচার্য্যি ডেকে বুড়োর সঙ্গে একটা ন বছরের মেয়ের বিয়ের ঘটকালি কর্‌তে ইচ্ছে যাচ্চে। আর সেই বিয়ের বাসর ঘরে বুড়োর জোরে জোরে বার কয়েক কান মলে কান লাল করে দিতে ইচ্ছে হচ্চে।

আনন্দময়ী—

শুধু কান মলা নয়—ঝাঁটা পিটে তবে ছাড়্‌বো।

ভারতী—

না দিদি, আমি বুড়োর কথা মোটেই ধর্‌চিনা—ওদের বাড়ীর চাকরীটা ছেড়ে দেবো। কিন্তু যতই আমার গুণধর সাহেবের কথা ভাব্‌ছি, কান্না কিছুতেই আর থামতে চায় না। যমরাজ কি আমায় ভুলে গেছেন! মরবোই বা কি করে—আমার লিলির কি হবে, কে দেখ্‌বে, কে মানুষ করবে মেয়েটাকে?

কনক—

আচ্ছা ভারতী, আমাদের তো পোড়া কপাল ! আমি সতের বছর বয়সে আজ পনের বছর আগে সব খেয়ে বসে আছি ! স্বামীর কথাত একরকম ভুলেই গেছি ! রোজ তোমাদের যা সব ব্যাপার দেখ্‌চি শুনচি, এক এক সময় মনে হয় বেশ আছি—এই দেখনা সেদিন ঐ বস্তিপাড়ার দাশেদের মেয়ে সুধারাণী, বয়েস পঁচিশ হবে—একটী ছেলে, একটী মেয়ে—তার স্বামী উকিল না ডাক্তার,—স্বামীর অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে পালিয়ে এসে বাপের বাড়ীতে বসে আছে। সুধার বাবা মাষ্টার রেখে সুধাকে ফের লেখাপড়া শেখাচ্চেন্ যাতে ভবিষ্যতে দরকার হলে সে নিজের ও ছেলেপিলের অন্নের সংস্থান করে নিতে পারে।

আনন্দময়ী—

সুধা মুখপুড়ী—লজ্জা কর্‌লোনা, তার স্বামীর ঘর জ্বালিয়ে চলে এলো বুক ফুলিয়ে বাবার বাড়ীতে, আর বাপ মিন্সেও আদর করে তাকে ঘরে ঠাঁই দিলে ! আমাদের বাড়ী হ'লে, সুধাকে ঝাঁটা পিটে দূর করে দিত। সুধার বাবাতো শুধু পেটের ব্যবস্থা কর্‌লেন, অন্য ব্যবস্থা কি সুধা নিজেই খুঁজে নেবে ?

কনক—

কেন ওরকম কথা বল্‌লে আনুদি ? সুধা কিইবা কর্‌তে পারে—সে পড়ে পড়ে শুধু স্বামীর মার-ধোর খাবে—তাতে তারই বা কি লাভ হোতো, আর তার ছেলেমেয়েদেরই বা মায়ের এই দুঃখু কষ্ট দেখে ও বাপের এই গুণ্ডাপনা দেখে কি শিক্ষাই হোতো ? আমিত বলি সুধা বেশ করেচে—আমি সুধার বাবার উদ্দেশ্যে প্রণাম করি।

[কনক মাথায় হাত ঠেকাইল]

আনন্দময়ী—

ওলো কনক—সত্যিকথা বলি, পুরুষ মানুষগুলোকে আমরা যত গালি দেই না কেন, এ কথা ঠিক যে তাদের না হলে আমাদের চলে না। তাই পুরুষরা যখন খেটে খুটে টাকার ভাবনায় ও ভাতের যোগাড়ে ঘুরে ঘুরে একেবারে বেদম হ'য়ে পড়ে—তখন আমরা হয়তো তাকে বল্‌লুম্—"ওগো মেয়ের বিয়ের আর দেরী করা চলে না, পাড়ার লোকে নানান কথা বল্‌চে, কিম্বা আমায় একটী নূতন গয়না গড়িয়ে দাও—না হয়, হাওয়া বদলাতে না গেলে শরীরত টেঁকে না" ইত্যাদি বায়না করে পয়সা খরচের নূতন একটা উপায় উদ্ভাবন করে পুরুষের ভাবনার বোঝা

হারিয়ে সে গাল-মন্দ মারধোর সুরু কর্‌লে।—কিন্তু আমরা যদি একটু সবুর সয়ে পুরুষের সেই মনের দুঃখু বুঝে তখন তাঁর হাতের কাছে তাঁর মনোমত তামাকের কল্‌কে, হাত মুখ ধোবার জল, ঠাণ্ডা মিছরীর পানা তৈরি রাখি, পাখা দিয়ে হাওয়া দিই—তারপর ঠাণ্ডা হ'লে খাওয়া-দাওয়ার পর মন মেঝাজ বুঝে কথা পাড়্‌লে—সব বোঝাই পুরুষেরা ঘাড় পেতে বয়ে নিয়ে বেড়ায়—[একটু থেমে]—আমি তোদের নিশ্চয় করে বল্‌চি যে, যত দোষ সব ঐ সুধী-পোড়ার মুখীর। সুধীর বাবা এবারে আর একটী নূতন জামাই—হাড়ী কি ডোমের ঘর থেকে - - এনে বরণ করুন।

জ্যোৎস্না—

তুমি রাগ কর্‌চো কেন? কনকত কিছু অন্যায় বলেনি। তোমার স্বামী যদি তোমায় ধরে মার-ধোর কর্‌তেন বা অন্যায় অত্যাচার কর্‌তেন তুমিও তাহলে বাপের বাড়ী পালিয়ে যেতে। তা-ছাড়া, যদি স্বামীরই আদর যত্ন হারালো, তবে তার দুটী ভাতের জন্যে স্বামীর ঘরে পড়ে থেকে কি লাভ? মেয়ে মানুষ বলে কি সুধা কেবল মার-ধোর খাবে।

আনন্দময়ী—

দেখ লো এসব তোদের ইংরিজি বুলি! তোরা বল্‌তে চাস্—পুরুষে যা করবে মেয়েদিগেও তাই কর্‌তে হবে; পুরুষ যদি মেয়েদিগে মার-ধোর করে তবে মেয়েরাও পুরুষদের কিলচড় মারবে।

কনক—

নিশ্চয়।

আনন্দময়ী—

তোরা কিন্তু ভুলে যাচ্চিস্ যে পুরুষ মেয়ে দুই দলই মারমুখী হ'লে এই সংসার—যেখানে আমাদের নিজেদের সুখ জলাঞ্জলি দিতে হয় ছেলেমেয়েদের মুখের দিকে চেয়ে—সেই সংসার টেঁকে না;—সংসার ছারখার হয়ে যায়। পুরুষরা সহজেই অস্থির হয় ও মাথা খারাপ করে ফেলে। তার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরাও যদি সেই আগুনে কাঠ ঘুঁটে কেরোসিন ঢেলে দেয়, সে আগুন তা হলে সংসার পুড়িয়ে ফেল্‌বে। তার চেয়ে মেয়েদের একটু ধৈর্য্য ধরা ভাল।

ভারতী—

কনকদি, শুন্‌চিস্ আমরা লেখাপড়া শিখেছি, দরকার পড়লে চাক্‌রী কর্‌তে হচ্চে বলে, কি আমরা পুরুষ মানুষ হ'য়ে গেছি,—তা নয় গো, তা নয়। আমরাও ভাতারের কাছে শুই,

বেড়াই না, বা স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া হলে স্বামীকে ঘোড়ার চাবুক লাগাই না। কিম্বা আন্নদি যেমন মনে করে, আমরা কথায় কথায় এক ভাতার ছেড়ে দিয়ে আর এক ভাতার খুঁজ্‌তে গাড়ী ছুটীয়ে দিই—তাও নয়। তবে আন্নদি আমরা পুরুষদিগে বুঝাতে চাই যে, আমরাও সংসারে অবহেলার অশ্রদ্ধার পাত্রী নই—আমরাও মানুষ।

আনন্দময়ী—

আচ্ছা ভাই, আজ আসি বেলা পড়ে এলো।

[আনন্দময়ী চলিয়া গেল। কনকের মুখ চোখ যেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞাব্যঞ্জক—চোখ দিয়া যেন আলো ঠিকরাইয়া পড়িতেছে]

কনক—

ভারতী ভাই! এটা তোমার শুধু মুখের কথা না মনের কথা? মুখের কথা যদি হয়, যত খুসী বলে যাও—মনের কথা যদি হয়, তবে হুঁসিয়ার হ'য়ে বলো। জানো ভারতী তোমার এখন কি কর্‌তে হয় তা হলে।

[কনক্ ভারতীর দিকে কঠিনভাবে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সকলে কনকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।]

ভারতী—

(ভয়ে আস্তে আস্তে)—কি?

কনক—

কি? জিজ্ঞেস কর্‌চো। গোড়াতে যখন মুখুয্যে বুড়োর কথা শুনি তখন আমার হাসি পেয়েছিল। এখন ভেবে দেখ্‌চি—পুরুষরা এমনি করে মেয়েদের তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কর্‌বে, অপমান কর্‌বে, যন্ত্রণা দেবে—আর মেয়েরা সেটা বেমালুম হজম্ কর্‌বে! না ভাই ভারতী এই যে তোমার গুণমণি ঘোষ সাহেব কোথায় মিটিং কর্‌তে গেছেন, দেশোদ্ধার করে বেড়াচ্চেন, আর মুখুয্যে বুড়ো খামোকা তোমায় অপমান করে বস্‌লে! আমরা ত জানি ঘোষ মোটেই সংসারের খোঁজ নেন না, কেবল মিটিং-মিটিং বক্তৃতা-বক্তৃতা সেক্রেটারী-গিরি করে টো টো করে ঘুরে বেড়াচ্চেন। তুই সংসারের জ্বালায় মর্‌ছিস এমন করে। কেন! কেন অমন

যে মেয়েরাও মানুষ, তোমায় তাহ'লে ঘোষকে ছেড়ে একা আলাদা থাকতে হয়; তবে মিন্সে বুঝ্বে কত ধানে কত চাল্। ভাই ভারতী, রাগ কর্লি নাকি!—আমার কেমন গা জ্বালা কর্চে।

জ্যোৎস্না—

থাম না কনকদি, কেন ওর মনে মিছে কষ্ট দাও?

ভারতী—

উনি যে রকম আজ বছর দু'য়েক বাড়াবাড়ি কর্চেন—আমরা আছি কি মরে গেছি, তাও ভাল করে খোঁজ নেবার সময় নেই ওঁর;—আমার ত মাথা খারাপ হ'য়ে যাবার যোগাড় হয়েচে! কি যে কর্বো বিষ খেয়ে মর্বো, না সংসার ছেড়ে কোথাও চলে যাব—কিছু ঠিক করে উঠ্তে পার্চি না কনকদি! আমি ত কিছু দিন থেকে ভাব্ছিলুম যে ওঁর সঙ্গে একটা বোঝা পড়া করবো। আজ আমি ক্ষেপে গেছি—তোমরাই বলনা এ জীবনে কি প্রয়োজন।

[ভারতী সহসা দাঁড়াইল।]

ভারতী—

[চলিতে চলিতে] চল্লুম বাড়ী। এ রকম করে আর পারিনে। আজ যা হয় এর একটা হেস্তনেস্ত কর্বো।

জ্যোৎস্না—

শোন—শোন......।

[ভারতী ঝড়ের মত বাহির হইয়া গেল।]

জ্যোৎস্না—

এ কি কর্লে কনকদি! ভারতী কিছু না একটা করে বসে।

[কনক চুপ করিয়া রহিল।]

পটক্ষেপ।

(ক্রমশঃ)

ঝড়ে দিলো দুলিয়ে

[শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ]

তাদের বিবাহিত জীবনের দু'টো বছর কোথা দিয়ে যে চলে গেলো, তা' না জান্‌তে পার্‌লে নিশীথ,—না পারলে ক্ষমা। এমন নয় যে, এই দু' বছরের মধ্যে এমন একটাও তুচ্ছ ঘটনা ঘটেনি, যাতে তাদের মনোমালিন্যের উদ্রেক হ'য়েছিলো, কিন্তু সে অতি নগণ্য। লেখ্‌বার মতো নয়।

রাত্রি ঘুমিয়ে পড়েছে বনের বীথিতলে—সহরের বুকে।

নিশীথ এতক্ষণ ঢুলে ঢুলে এইমাত্র ঘুমিয়ে পড়েছে। ক্ষমা এর আগে কতবার অনুরোধ জানিয়েও তাকে নিরস্ত কর্‌তে পারেনি। নিশীথের কেউ নেই যে, একগ্লাস জল চাইলে হাতের গোড়ায় এগিয়ে দেবে। সেদিন সে ঘুমিয়ে পড়েছিলো আর সেই অবসরে ক্ষমা জল আন্‌তে গিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে গেছলো। সেই থেকে সে আর ঘুমোয় না—ক্ষমার না ঘুমোনো পর্য্যন্ত। আজকের রাতটা কাট্‌লে দুর্ভাবনা কথঞ্চিত কাট্‌বে। তাই নিশীথও দস্যুর মতো সজাগ হ'য়ে ছিলো এতক্ষণ। কিন্তু শরীরের অবসন্নতা আর অন্তরের অবসাদ নিয়ে সে পার্‌লে না বেশীক্ষণ জেগে থাক্‌তে।

"শুন্‌ছো"—

নিশীথ অকাতরে ঘুমিয়ে পড়েছে।

পুনরায় ডাক এলো, "শুন্‌তে পাচ্ছো।—"

ক্ষমা তার শীর্ণ হাতখানা স্বামীর কাঁধের ওপর রাখ্‌লে। নড়ে উঠ্‌তেই ক্ষমা বল্‌লে, "বড্ড ঘাম হ'চ্ছে! জান্‌লাটা খুলে দাও।"

জান্‌লাটা খুলে দিতেই ভোরের আলো এসে ঢুক্‌লো।

"আর কতদিন এম্নি করে' আমায় আগ্‌লে তুমি বসে থাক্‌বে"—ক্ষমা কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্‌লে।

"যতদিন না আমাদের যাত্রা স্রোতের মুখ ধরে, যতদিন—না তুমি সুস্থ হ'য়ে ওঠো।"

"হবো কি ?—বাঁচ্‌বো আমি ?"

"কেন বাঁচ্‌বে না? তুমি বল্‌তে চাও, মানুষের ব্যথা-বেদনা কেবল বেড়েই চল্‌বে দিন দিন?"

"কিন্তু আর কতদিন আমায় এম্নি ক'রে পড়ে থাক্‌তে হ'বে! আর যে পারি না—"

"ছিঃ! অত অধৈর্য্য হ'লে কি চলে! চুপ করে' শুয়ে থাকো।"

ক্ষমা ভোরের আকাশের দিকে তাকালে। নিদ্রা-হারা তারাটি তখনো জেগে রয়েছে উন্মুখ হ'য়ে।

আজ বার বার নিশীথের সেই ফাগুন রাতটির কথা মনে পড়্‌ছে। দু' বছর পূর্ব্বের সেই রঙিন্ প্রত্যুষ—আজো তেম্নি তার সমস্ত রস-মাধুর্য্য নিয়ে উপস্থিত। ঘুমন্ত বিশ্বের বুকে সেদিনের মতো আজো ঝরা-জ্যোৎস্নার আলোর ধারা। সুবাসের ম্লান-গন্ধে-ভেজা বাতাস আজো যেন কার অভিসারে পাগল। সেদিনের সব কথাই একে একে জমা হ'লো তার অপূর্ণ অন্তরে। সেদিনের কথা কি এত সহজে ভোলা যায়? সেদিনের স্মৃতি কি এতই তুচ্ছ?

কত ভুলিয়ে, কত দেশ-বিদেশের কথা শুনিয়ে, কত প্রলোভন দেখিয়ে, যেদিন জেদী নিশীথ প্রথম তাকে আনে,—সেদিন ছিলো মেঘ আর ঝঞ্ঝার হুটোপাটির একটা দিন। ট্রেণ চলেছে নিরুদ্বেগে সেই প্রলয়ের মধ্য দিয়ে সর্ব্ব গর্ব্ব-ভরে। সার্শির গায়ে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়ে বাহিরটা একেবারে অস্পষ্ট আর অন্ধকার, আকাশটা ঝাপ্‌সা আর ঘোলাটে করে' তুলেছিলো। কামরার আলো সে সখ করেই নিভিয়ে দিয়েছিলো। ভেতরে নিশীথ আর ক্ষমা; দু'জনে পাশাপাশি দু'টো বেঞ্চে আধ্‌ শোয়া অবস্থায় জেগে। দৃষ্টি তাদের অন্ধকারের দিকে।

নিশীথ জিগ্‌গেস্ করেছিলো,—"নতুনদির জন্যে মন কেমন কর্‌ছে বুঝি? যত ভাব্‌বে—ততোই বাড়্‌বে। তার চেয়ে উঠে এসো এই বেঞ্চে, কথায় কথায় ভাবনাকে তাড়িয়ে দি'।"

"আস্‌ছে সপ্তাহে আমায় আবার রেখে আস্‌তে হ'বে। যদি না নিয়ে যাও—" ক্ষমার স্বর ভিজে আস্‌তে লাগ্‌লো।

"যদি নিয়ে না যাই।"

"বল্‌বো মিথ্যেবাদী।"—অবস্থা তার কাঁদ' কাঁদ'।

"আর কিছু বল্‌বে না তো?"

"আমি ছোড়্‌দার সঙ্গে চলে যাবো।"

"বেশ যেও:—এখন উঠে এসো এই বেঞ্চে।"

সেই অন্ধকারে ক্ষমার নীল্‌চে চোখ জ্বল্ জ্বল্ করে' জ্বলেছিলো। কুচ্‌কুচে চুল অন্ধকারের সঙ্গে মিশে গেছ্‌লো। নিশীথ তা'কে পাশে টেনে এনেছিলো, কিন্তু কিছুতেই সে বস্‌লো না। পাশে এসে' থাক্‌লে সে চেন্ টেনে দেবে—চেঁচাবে।...

...সমস্তই নিশীথের অন্তরে আজ পাক খেতে লাগ্‌লো।

নিশীথ ক্ষমাকে নিয়ে বেড়াতে এসেছে পুরীতে। মোটে তিন মাসের সে ছুটি পেয়েছে। যদি দেখে তার কিছু উন্নতি হ'য়েছে—এইখানেই সব ছুটি কাটিয়ে দেবে; নচেৎ অন্য কোথাও। শরীর শোধ্‌রাবার আরো অনেক জায়গা আছে এবং ভালোও। কিন্তু কম পয়সার মধ্যে এ জায়গাটা নিতান্ত খারাপ নয়। জেসিডি, মধুপুর, কাশীটা কাছাকাছির মধ্যে মন্দ নয়, কিন্তু বড় ঘেঞ্জি। সেবার পুজোর সময় ক'দিনেই তারা বেশ মালুম পেয়েছিলো।

ছোট্ট একখানা বাংলো ধরণের বাড়ী পেয়েছে স্বর্গদ্বারের দিকে—একেবারে সমুদ্রের তীরে। দিব্যি নিরিবিলি। নিস্তব্ধতার মাঝে দিনগুলো তাদের সঙ্গীহীন ভাবে কাটে বটে, কিন্তু তা'তেও আনন্দ। নিশীথের ভালো লেগেছে, সমুদ্রের বিরামহীন তর্জ্জন-গর্জ্জনের একটানা শব্দ। কোল্‌কাতার জীবনে এসেছে তাদের অবসাদ; বিতৃষ্ণা জন্মেছে তাদের ওর বুকে বিচরণ কর্‌তে। বালীগঞ্জের দিকে ছোটোখাটো একটা বাড়ী কিনে এবার তারা জীবন সজীবতায় ভরিয়ে তুল্‌বে। এই বিপদটা সাম্‌লে নিতে পার্‌লেই দেখাশোনা আরম্ভ করে দেবে। এই রকমই সে ঠিক-ঠাক্ করে রেখেছে। ক্ষমার হাঁপ লাগে এই রকম ঘেঁসাঘেঁসি ভাবে থাক্‌তে। নিশীথেরও অনেক দিনের বাসনা—তারা খেতে পাক্ বা না পাক্, কিছু এসে যাবে না;—সন্ধ্যের পর দু'দণ্ড রাস্তায় বেরিয়ে দিনের সমস্ত ক্লান্তি দূর করে দিতে পার্‌বে; না-ই বা রইলো তাদের আভিজাত্য,—বড়লোকি চাল; তারা তো বাবুয়ানি কর্‌বার জন্যে এখানে আসেনি;—এসেছে বাঁচ্‌তে।

ক্ষমা এখানে এসে অবধি ভালোই আছে। মনের প্রফুল্লতা তা'কে বিবশ করে' ফেলেছে—তার বিস্মরণ এনেছে। প্রতিষেধ এতদিন পরে তার ধরেছে। মনে মনে সে কল্পনা কর্‌তে আরম্ভ করেছে আগামী কালের। সকাল-সন্ধ্যে বেড়ায় প্রাণ খুলে। প্রাণে আসে তাজা শক্তিপ্রতিভা; আশঙ্কা তার যায় ঘুচে।

দিনের আলো নিভে আসে। নিশীথরা বেড়াতে বেরুলো। রোজই তারা এতদূর এসে ফেরে। ফের্‌বার পথে আচম্‌কা সুহাসের সঙ্গে দেখা। নিশীথ তাকে সচকিত করে দিয়ে বল্‌লে,—

সুহাস তাকে আঁক্‌ড়ে ধরে উত্তর দিলে,—"খুব ! চিন্‌তে আবার পার্‌বো না ! তা' হঠাৎ একেবারে এখানে ? হাওয়া বদ্‌লাতে এসেছিস্ বুঝি ?

নিশীথের আবাল্যের বন্ধু সুহাস। বি-এ পড়্‌তে পড়্‌তে সেই যে সে কলেজের সাম্নে পিকেটিং কর্‌তে গিয়ে জেলে গেলো—তার পর থেকে তার আর সাক্ষাৎ নেই।

ক্ষমা পা-পা-করে' বেশ খানিকটা এগিয়ে এসেছে। পুতুলের মতন দাঁড়িয়ে থাক্‌তে তার মোটেই ভালো লাগে না। বস্‌বে যে, তারও জো নেই। যা-ও দু'-একটা বেঞ্চ ধারে ধারে ছড়ানো রয়েছে, সবগুলোই কারুর না কারুর অধিকারে এসে গেছে। তার মাথা কাটা যায়—সে অপমানিত বোধ করে নিজের নির্লজ্জভাবে অকারণ দাঁড়িয়ে থাক্‌তে।

সুহাসই প্রথমে বল্‌লে,—"চল্, ফেরা যাক্। যেতে যেতে অনেক রাত হ'য়ে যাবে।" আবার সেই বেলাভূমি মুখরিত কোলাহল; সেই পদশব্দের অস্ফুট ধ্বনি; সেই লাল আলো।

আজ যখন নিশীথ তার দেখা পেলে, ছাড়্‌বে না কিছুতেই। তার অন্তর আজ আনন্দের আতিশয্যে উপ্‌ছে উঠেছে কানায় কানায়। কোন মতে সে এখুনি বিসর্জ্জন দিতে পারে না তার প্রদীপ্ত প্রতিমাকে। সে চায় ভর্ত্তি করে' নিতে জীবনের এই সূক্ষ্মতম অংশটিকে চিরতরে—যা' তাকে কারণে-অকারণে মাতিয়ে তুল্‌বে হর্ষে ও পুলকে।

"তাহ'লে এতদিন কেবল ঘুরে ঘুরে কাটিয়েছিস্"—নিশীথ প্রশ্ন কর্‌লে।

"ঘুর্‌তেই তো মানুষ এখানে আসে।"—সুহাস পাষাণের ন্যায় শক্ত হ'য়ে বল্‌লে।

নিশীথ অকুণ্ঠিত হ'য়ে বল্‌লে,—"তা' বটে, কিন্তু এক জায়গায় স্থায়ীভাবে থাকার আনন্দটা তা'তে পাওয়া যায় না !"

"না-ই বা পাওয়া গেলো। যেটা পাওয়া যায়, সেটাও কম নয়।

"কিন্তু তবু কি জানিস্—"

"সে কথা শুনবো'খন আর একদিন ভাই ; আজ যাই—"

সুহাস অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে গেলো মুহূর্ত্তে।

ক্রমশঃ তাদের বাল্যের দিনগুলো ফিরে এলো। সুহাস কাজের ফাঁকে যখন-তখন আসে। ক্ষমা তার সঙ্গে গল্প করে, দেশের কথা নিয়ে তর্ক তোলে, তার জীবন যাত্রাকে সুখ্যাতি করে, নিশীথ এ সমস্ত মুখ বুজে সহ্য কর্‌তে পারে না। অন্তর তার বিরক্তিতে ভরে ওঠে।

আজ তর্ক উঠলো অস্পৃশ্যতা নিয়ে ; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দাঁড়ালো—

"দেশের লোকের পয়সা কমে গেছে। সব অফিসেই রিট্রেঞ্চমেন্ট্। সব লোকেরই মুখে ভীষণ রিডাক্‌সান্। কে যায়—কে থাকে, তার ঠিক নেই। দশ পারসেন্ট গিয়েও নিস্তার নেই—এই সব। চালের দাম হু-হু করে নেমে যাচ্ছে। ট্রাম কোম্পানী ভাড়া কমিয়ে দিচ্ছে। ক্লাইভ ষ্ট্রীটে মোটার চলা ক্রমশঃ বন্ধ হয়ে আস্‌ছে, অথচ একটার পর একটা করে' নতুন সিনেমা খানিকটা জায়গা জুড়ে বস্‌ছে।"—এক নিঃশ্বাসে এতগুলো কথা বলে' নিশীথ চুপ করলে।

সুহাস জবাব দিলে,—"এগুলো হচ্ছে আমাদের "হুজুগ-প্রিয়তা আর আমোদ-প্রিয়তা, এই দুইয়ের জন্যে।"

নিশীথ পুনরায় আরম্ভ করলে,—"তোমরা তো দেশ নিয়ে ব্যস্ত। এ'দিকে ফিরে তাকাবারও সময় পাও না। তোমরা চেষ্টা করছো দেশের পয়সা যাতে দেশে থাকে। বিদেশী কাপড় তোমরা আস্‌তে দিচ্ছো না,—কিন্তু ফিল্ম আসা বন্ধ করতে পারছো? খবর রাখো কি এতে কত টাকা বিদেশে যায়?"

সুহাস বললে,—"সেটা আমাদের হাতে নয়। তোমরা না গেলে, আপন-ই সব বন্ধ হ'য়ে যাবে। এতে পিকেটিং করবার দরকার হয় না, অনুরোধ জানাতে হয় না।"

ক্ষমা আর চুপ করে' থাক্‌তে পারলে না। সুহাস থামতেই সে অতর্কিতভাবে বলে উঠ্‌লো,—"আর চুপ ক'রে থাক্‌তে পারলুম না, সুহাসদা'। তোমরা বিলাতী কাপড় যাতে এদেশে না আসে, তার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছো ; কিন্তু জাপানী কাপড় যে দেশটা ছেয়ে ফেল্‌লে, তার কি প্রতিকার করছো? দেশকে ভালবাস্‌তে গেলে তার প্রত্যেক জিনিষটাই ভালবাস্‌তে হ'বে। তার ভালটাকেও হ'বে—তার মন্দটাকেও হ'বে। তোমরা সুশ্রী ছেলেকে ভালোবাসো, কুশ্রীকে দেখ্‌তে পার না!"

"তা' ঠিক।" সুহাস নিশ্চল হ'য়ে বললে, "কিন্তু দেশটা যে আমাদের গরীব।"

তখনো চতুর্থীর চাঁদ অস্ত যায় নি। তার আগেই আকাশের এক কোণে কালো মেঘ এসে জমলো ; নিমেষে চারিদিক অন্ধকার হ'য়ে উঠলো। নিশীথ তখনো ফেরেনি। ক্ষমা চুপ ক'রে স্বামীর প্রতীক্ষায় জেগে আছে—মিট্‌মিট্ ক'রে টেবিল ল্যাম্প জ্বল্‌ছে ঘরে। রাস্তার দিক্‌কার জানলা খোলা। দক্ষিণ দিকের খালি বারান্দায় টবে সাজান মল্লিকার ছোট ছোট গাছ। বাতাস তাদের সুরভিটুকু ঘরের ভেতর উড়িয়ে নিয়ে আস্‌ছে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে এক

সমুদ্রের শব্দ ছাড়া অন্য সব নিস্তব্ধ হ'য়ে গেলো। ক্ষমা বুঝতে পারলে, নিশ্চয়ই কোথাও আট্‌কে পড়েছে, তবুও আজ সে জানিয়ে দেবে যে, অত রাত পর্য্যন্ত বাহিরে থাকবার ইচ্ছে থাকলে যেন কালই সন্ধ্যের এক্সপ্রেসে তাকে পাঠিয়ে দেয়। একলা সে! তার ওপর আবার বিদেশ। ভয় কার না করে? চেঁচেমি মরলেও কারো সাড়া পাওয়া যাবে না!

যেমন বৃথা আস্ফালনে নড়ে ওঠে শৃঙ্খলাবদ্ধ কয়েদীর বন্ধন ঝন্ ঝন্ শব্দে, তেম্নি নড়ে উঠলো দমকা বাতাসে বন্ধ কবাট দু'টো। ক্ষমা আলোটা বাড়িয়ে দিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেলো।

ক্ষমাকে কিছু বলবার অবকাশ না দিয়ে নিশীথ বল্‌লে,—"সুহাস যায়-যায়।"

ক্ষমা নিরুত্তর;—অন্তর তার বিরক্তিতে ছেয়ে রয়েছে।

নিশীথ বল্‌লে,—"যাবে তাকে দেখ্‌তে?" কণ্ঠে অস্পষ্ট বেদনার ছাপ।

মিছে কথা ক্ষমা স্বামীর মুখে শোনেনি। অথচ আজ এ কথার কোনো অর্থ হয় না। কালও যে সুহাসদাকে বেড়াতে যাবার সময় দেখেছে। কোনও প্রকার পরিবর্ত্তন দেখেছে বলে তো তার মনে হয় না। কথার জবাব না দিয়ে, সে ওঘরে চলে গেলো। তার চোখে ঘুম নেমে এসেছে, তবুও সে ঘুমবে না আজ এখুনি। জানলার সাম্নাসাম্নি চেয়ারখানাতে গিয়ে বস্‌লো। সমুদ্র আজ বিক্ষুব্ধ—আলোড়িত। নিশীথ শ্রান্ত—উত্তেজিত। কোন প্রকারে সে বাড়ী আস্‌তে পেরেছে, এই-ই যথেষ্ট। এখন একটু আরামে ঘুমতে পার্‌লে বাঁচে। তার ক্লান্ত দেহখানাকে বিছানায় এলিয়ে দিলে। সব চুপ-চাপ। কেবল বাতাসের সাঁই সাঁই শব্দ।

ক্ষমা প্রশ্ন করলে, "ঘুমলে নাকি?"

উত্তর এলো, "না।"

ক্ষমা অভিমানের সুরে বল্‌লে, "এত রাত পর্য্যন্ত কোথায় গিস্‌লে শুনি?"

"সুহাসের ওখানে"—নিশীথ সরলভাবে উত্তর দিলে।

ক্ষমার চোখ দু'টো যেন অবিশ্বাসী হ'য়ে উঠ্‌লো।

নিশীথ অনর্গল বলে' যেতে লাগ্‌লো, "হঁ্যা ক্ষমা, সন্ধ্যের উন্মত্ত ঢেউগুলো তাদের ব্যাকুল বেদনা জানাতে এসেছিলো সুহাসের কাছে। সে অবহেলা ক'রেছিলো বলে', তাকে ঠেলে ডাঙ্গায় তুলে দিলে পাঁজরা ক'খানা চুরমার করে' দিয়ে। কেউ ছিলো না ব'লেই আমাকে তার ভার নিতে হ'লো।"

ঘড়িতে দু'টো বাজ্‌লো। নিশীথ বল্‌লে, "ঘুমিয়ে পড়ো—ভোরেই যেতে হ'বে আমার।"

নিশীথের ঘুম নেই। তবু সে চোখ বুজিয়ে রইলো, যদি তন্দ্রা আসে। আধ্‌-ভেজানো জান্‌লার ভেতর দিয়ে চাঁদের আলো যতটুকু আস্‌বার অধিকার আছে, ঠিক ততোটুকু না এসে বরং কমই এসেছে। এতে ক্ষমার চক্‌চকে চুড়িগুলো ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। আছ্‌ড়ে-পড়া সমুদ্রের গোঙানোর শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না।

সমুদ্রের উপকূলে পদচারণ সুরু হ'লো। ক্ষমা রোজই এম্নি সময়ে উঠে স্বামীকে জাগিয়ে দেয়। আজো তার ব্যতিক্রম হলো না। অন্যদিন হ'লে কখনোই সে উঠ্‌তো না। চোখ তার ঘুমে জড়িয়ে রয়েছে। স্বপ্নে-বিভোর রাজকন্যার সোণার কাঠির স্পর্শে সে যেন জেগে উঠ্‌লো।

তারা দু'জনে সোজা চলেছে, সমুদ্রের তীর ধরে। সহরের বাড়ীগুলো পশ্চাতে পড়ে রইলো। এতক্ষণে তারা রাস্তা ধরেছে যেতে যেতে হঠাৎ নিশীথ বল্‌লে, "ওই বাঁকের মুখে—"

বাড়ীর মধ্যে ঢুক্‌তেই মন্দার সঙ্গে দেখা। মন্দা—যাকে সুহাস একসময়ে বিয়ে কর্‌তে চেয়েছিলো। কিন্তু সুহাসের মতো ছেলেকে নিজে বিয়ে করতে রাজী হয়নি। নিশীথ তাকে দেখে যেন আকাশ থেকে পড়লো। বিস্মিত হ'য়ে জিগ্‌গেস করলে, "তুমি?"

মন্দা হারিয়ে গেলো নিজের মধ্যে, যেমন হারিয়ে যায় কোন ক্ষীণকায়া জনরাশি চল্‌তে চল্‌তে। নিজেকে সামলে নিয়ে বল্‌লে, "হ্যাঁ, কাল রাত থেকেই তো রয়েছি। আপনি যান না ভেতরে, আমি এক্ষুণি আস্‌ছি।"

নিশীথ ঘরের দিকে অগ্রসর হলো। তার কণ্ঠস্বর সুহাসের চেনা। সে চঞ্চল হ'য়ে উঠলো তার আগমনে। আর স্থির থাক্‌তে না পেরে বিছানা ছেড়ে টল্‌তে টল্‌তে উঠে দাঁড়ালো। পার্‌লে না বেশীক্ষণ দাঁড়াতে অবসন্ন ও দুর্ব্বল শরীর নিয়ে। পায়ের মাটি যেন সরে যেতে লাগলো, মাথা গুলিয়ে গেলো। নিশীথ ছুটে এসে তার পতনশীল দেহটাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলো।

হাওয়া করতে কর্‌তে ক্ষমা বল্‌লে 'কি ভয়ানক রকমের দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছো, এই শরীর নিয়ে উঠতে গেলে পড়ে তো যাবেই।"

সুহাস উত্তর দেয় না,—অব্যক্ত বেদনার ভারে সে অস্থির।

ক্ষমা তার মাথার রুক্ষ চুলগুলোর মধ্যে

কণ্ঠে ব্যথা ও করুণা ঝরে পড়ে।

বেদনাতুর কণ্ঠে সুহাস উত্তর দিলে, "আর যে পারি না!"

ক্ষমা বল্‌লে, "হ্যাঁ, বড্ড লেগেছে কি না, তাই। চুপ ক'রে শুয়ে থাকো ঘুমিয়ে পড়লে অনেকটা কমে যাবে।"

সুহাস দেখে, এই নারীটির সেবা, করুণা স্নেহ ও সহানুভূতির মধ্যে এমন একটা গাম্ভীর্য্য ও মহত্ত্ব লুকিয়ে আছে, যাতে এর নারীত্বের দুয়ারে অপনা হ'তেই ভক্তিতে মাথা নত হ'য়ে আসে। সে ঘুমিয়ে পড়লো খানিকক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তির পর .....।

শান্ত সুন্দর সন্ধ্যা ধীরে ধীরে নেমে এসেছে পৃথিবীর বুকে, চন্দ্রহীন নিবিড় সুনীল আকাশে ফুটে উঠেছে শত সহস্র তারার স্নিগ্ধ হাসি। সুহাস জান্‌লা দিয়ে পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখলে, লাল আলোটা তেম্নি জ্বলে উঠেছে—চারিদিনের মতোই। বুকে কত কথাই যে অনাদি কাল হ'তে জমে রয়েছে তার ঠিক নেই। সে যতদিন না মর্‌ছে, ততোদিন এ বোঝারও মৃত্যু নেই। এইটে বড় দুঃখ—এইটেই সবচেয়ে বড় ব্যথা। সংসারে আঘাতে আঘাতে একজন মাটীর সঙ্গে মিশে যাবে, আর অকৃতজ্ঞ পৃথিবীর কেউ এ-কথাটা জান্‌তে পার্‌বে না, এইটুকু সুহাসের কাছে অসহনীয়। সকাল বিকাল এক বিছানাতেই পড়ে থাকা তার কতদিন যে এইভাবে কাটাতে হ'বে কে জানে? তবে তার দিন যে ঘনিয়ে আস্‌ছে, তা' বুঝতে তার বাকী নেই। তবু জীবনের এই একঘেয়ে অবস্থা আর ভালো লাগে না। সে ভেবে পায় না, জীবনটা কি? কিছুই নয়—যেন স্বপ্ন! ভালোবাসা ..শুধু একটা ভাণ; তা ছাড়া আর কি!

আজো মন্দা এসেছিলো। সুহাসের মাথার চুলগুলো নাড়া দিতে দিতে দিতে জিগ্‌গেস কর্‌লে, "আজ কেমন?"

আর কেমন? কেমন তা তোমরা জানো, সে ও জানে। মরণ পারের পথিকের কাছে সংসারের সুখৈশ্বর্য্যের ছবি এঁকে তোমরা কি সুখ পাও? মন্দা অদ্ভুত প্রকৃতির মেয়ে সদাই চঞ্চল। যেন শরতের একখণ্ড মেঘ। রোজই অতনুবাবুর সঙ্গে আসে এই পর্য্যন্ত। একদিন এই মন্দাকেই সে চেয়েছিলো—তার দীপ্তিতে সে মুগ্ধ ছিলো। তার প্রদীপ্ত অহঙ্কার এখন আর কোন সাড়া তুল্‌তে পারে না তার হৃদয় তন্ত্রীতে। এখন আর সে চায় না যে, কেউ এসে তাকে

এতদিন দেশের কাজে প্রাণকে নিয়োজিত করে সব ভুলে সে তো বেশ ছিলো। আবার তাকে কেন প্রলোভিত করা, আবার কেন তাকে দেওয়ালা করা? জীবন-মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে এখন আর প্রেমের লীলা বা অভিনয় তার ভাল লাগে না। জানি, মানুষ অচেনাকেই বেশী করে চিন্‌তে চায়, কিন্তু তারও একটা সময় আছে। ওগো দুর্ব্বোধ্য মেয়েটি, তোমায় আজো সে চিন্‌তে পার্‌লে না। সেই মন্দা আজ স্বেচ্ছায় ধরা দিতে আসে। আকাশ-কুসুম, না তার শোন্‌বার ভুল! সুহাস চোখ বুজিয়ে রইলো, সমস্ত চিন্তাকে মন থেকে সরিয়ে দিয়ে।

আজ এখনো অতনুবাবু আসেননি। কিন্তু সুহাসের মনে হচ্ছিলো, আস্‌ছে হয়তো আস্‌ছে। সত্যিই অল্পক্ষণের মধ্যে তিনি এলেন। বিছানার একপাশে বসে বল্‌লেন, "মনে পড়ে তোমার সেই যতীনকে; যে দিনকতক গোরু-গোরু করে' কাটালো; বিলাত থেকে ব্যারিষ্টার হ'য়ে ফিরে এসেছে। আজ সকালে হঠাৎ আমাদের বাসায় এসে উপস্থিত। সারাদিন তাই আস্‌তে পারিনি। তা—আজ কেমন?

কিছু উত্তর দেবার সুহাসের মন ছিলো না,—চুপ করে রইলো। মন্দা মাথা নীচু করে বসে রয়েছে। সে যেন আগেকার মন্দা থেকে অনেক তফাৎ! তার সে চপলতাটুকু কোথায় অন্তর্হিত হয়ে গেছে। তার সে অতলস্পর্শী-কালো চোখ দু'টোর দিকে চাইলে মনে হয়—যেন তার মধ্যে কিসের ছায়া পড়েছে। সুহাস আদৌ ভেবে ঠিক কর্‌তে পার্‌লে না, কেন মন্দা আসে! আজ সে সব জিগে্‌গেস কর্‌বার সুযোগ এসেছে। মন্দা অতনুবাবুর নির্দ্দেশমত সুহাসের মাথার পর কোমল হাতখানি বুলিয়ে দিচ্ছিলো। সুহাস একমুঠো শেফালীর ন্যায় হাতখানা চেপে ধরলে। অনেকদিনের মৌনতার বাঁধ ভেঙ্গে দিয়ে বল্‌লে, 'আজ তোমায় বল্‌তেই হ'বে মন্দা, তুমি এখানে রোজ কি কর্‌তে আসো? মৃত্যুপথের যাত্রীর মধ্যে তুমি কি এমন পেয়েছো,—যাতে আবার প্রাণটাকে এমন করে' আঁক্‌ড়ে ধরে' রাখ্‌তে চাইছো?"

মন্দার চোখ দু'টো জ্বল্‌ জ্বল্‌ করে' উঠ্‌লো। কিছুতেই সে সুহাসের কাছে তার চোখের জল লুকোতে পার্‌লে না। সুহাসের আজ আবার বাঁচ্‌তে সাধ হ'লো। পৃথিবী যেন নুতন করে' আবার সৃষ্টি হ'লো। ফুলে-ফলে-ভরা-ধরণী আবার যেন নূতন মোহে বাঁধ্‌তে চাইলে।

মন্দার দিকে চেয়ে সুহাস পুনরায় জিগ্‌গেস্‌ কর্‌লে, "আজ তোমায় বল্‌তেই হ'বে—"

সে স্তব্ধ হ'য়ে বসে আছে দৃষ্টিটুকু অসীমের দিকে ছেড়ে দিয়ে। সে খুব সঙ্কুচিতা হ'য়ে পড়েছে। কান দু'টি তার লাল্‌চে হ'য়ে উঠেছে। সুখে-সলজ্জ-আঁখি-জলে তার স্নিগ্ধ চোখ দু'টো একবার সুহাসের মুখের ওপর তুলে নামিয়ে নিলে। জীবনকে এমন পঙ্গু করে' রাখার চেয়ে একেবারে নিঃশেষে

পড়ে থাকা, এ আর মোটেই সহ্য হয় না। শুয়ে শুয়ে পা দু'টো যেন অবশ হয়ে গেছে। পথে দস্যি ছেলেরা দাপাদাপি করে, সুহাসের হিংসা হয়। মৃত্যুর নিমন্ত্রণ সে সেইদিনই পেয়েছে, যেদিন তার পাঁজরা ক'খানি ভেঙ্গেছে। আশা তার যে নেই, তা' আর নূতন করে' কি শুন্‌বে? কবে শেষ হ'বে তার দিন—আর যে সে পারে না? পৃথিবীকে আর ভালো লাগ্‌ছে না। ঐ যে নীল আকাশের কোলে সাদা মেঘের স্তর, ঐ যে চাঁদ—সবই তো জন্মাবধি দেখে আস্‌ছে। এখন এসব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে যাত্রী হ'তে পার্‌লে সে যেন বাঁচে।

নীল আকাশে ফুটে উঠেছে অসংখ্য তারার ভ্রূকুটি। বাহিরটা সুহাসের মতো এত সৌন্দর্য্যের মাঝে শুয়ে রাত্রি শেষের প্রতীক্ষায় ধুঁক্‌ছে।

ভোর হ'তেই অতনুবাবু এলেন। কোন ভূমিকা না করে' বল্‌লেন, "যতীনের সঙ্গে মন্দার বিয়ে, শুধু তোমার মতের অপেক্ষা।"

সুহাস হতভম্বের ন্যায় জিগ্‌গেস্ কর্‌লে, "এর মানে? মরণ-পথের ধারে এসে দিন গুণ্‌তে বসেছি। আমি কিসের জোরে মন্দাকে চাইবো আমার দুর্ব্বল বুকের ভেতর আঁক্‌ড়ে রাখ্‌তে?"

অতনুবাবু ফিরে গেলেন

খানিকপরে দমকা হাওয়ার ন্যায় মন্দা ঘরে ঢুক্‌লো। ফোঁপাতে ফোঁপাতে সে বল্‌লে, "কি করেছি আমি তোমার যে, তুমি এ বিয়েতে মত দিলে। ভুলের কি প্রায়শ্চিত্ত নেই!"

সুহাসের বল্‌বার কিছুই ছিলো না, তবুও সে তাকে সান্ত্বনা দিলে, "এ দু'দিনের জীবন নিয়ে তোমাকে কি করে চাইবো মন্দা!"

উত্তেজিত হ'য়ে মন্দা বল্‌লে, "কেন চাইবে না? আমি এই দু'দিনের জীবনটাকেই অনেক বড় করে' নেবো।"

সুহাস কোনো উত্তর দিলে না। সে আজো চিন্‌তে পার্‌লে না—এই সৃষ্টিছাড়া নারীটিকে। সে আজো ভেবে পেলে না,—কেন কুহকিনী ও ছলনাময়ী এই নারীটি এতদিন তার স্বপ্নের অগোচরে ছিলো।

মন্দার সঙ্গে যতীনের বিয়ে হ'য়ে গেছে। রোশন-চৌকির সুরটা যেন একটা কান্নার সুরের মতো সুহাসের বুকে এসে বাজ্‌ছিলো। বাড়ীর পাশ দিয়ে যখন শোভাযাত্রা চলে গেলো, তার ঘরের একটাও জান্‌লা তখন খোলা ছিলো না। অন্ধকারের ভেতর শুয়েই তার মনে হ'লো যেন কার্ দু'টি সকরুণ চোখের দৃষ্টি তার এই ঘরের প্রত্যেকটি জান্‌লাতে প্রতিহত হ'য়ে

আজ নিশীথরা চলে যাবে। ক্ষমা এসে সুহাসের বিছানার এককোণে বস্‌লো। চোখদু'টো তার এক গভীর চিন্তার অন্তরালে বসে' গেছে। তা'কে কোন কথা জিগ্‌গেস্‌ কর্‌তে সুহাসের সাহস হ'লো না। নিজের বেদনায় নিজেই অস্থির—অপরের সুখ-দুঃখের হিসাব নিকাশ নেবার সে কে? নিজের বুকের বোঝার অন্ত নেই। এত ভারী হ'য়ে উঠেছে যে, আর বইতে পারা যায় না।

নিশীথ তাড়া দিচ্ছে,—আর দেরী কর্‌লে ট্রেণ পাওয়া যাবে না।

ক্ষমা কপালে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বল্‌লে, "তাহ'লে যাই। আমাদের ওখানে তোমায় যেতে হ'বে কিন্তু সুহাসদা।"

সুহাস কোনো কথা কইলে না।

ক্ষমা বল্‌তে লাগ্‌লো, "চুপ করে' রইলে কেন সুহাসদা?—যাবে না বুঝি?"

আর সে নিজেকে বেঁধে রাখ্‌তে পার্‌লে না। চোখ সজল হ'য়ে উঠ্‌লো। গভীর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বল্‌লে, "এত বড় পৃথিবীতে আমার মতো একটা ভাগ্যহত জীবনের কি দরকার ছিলো, জানি না বোন! কেবল মানুষকে ব্যথা দিয়ে আর ব্যথা পেয়েই চল্‌লাম।"

ক্ষমা ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে থম্‌কে দাঁড়িয়ে কি ভাব্‌লে। তারপর নীচে নেমে গেলো।—

সংবাদিকা

সান্ধ্য-সম্মিলনী

বিগত ৩১শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার সন্ধ্যায় ২৪-ঈ মিডিল রোডস্থিত সদ্গোপ যুবক সঙ্ঘের মাননীয় সভাপতি শ্রীযুক্ত মনোমোহন কুমার মহাশয়ের ভবনে শ্রীযুত ভূতনাথ কোলে কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার নির্ব্বাচিত হওয়ার জন্য এবং শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র কুমার তাঁহার পিতৃদেবের স্মৃতি রক্ষার্থে হাসপাতালে স্থাপনের নিমিত্ত সদ্গোপ যুবক সঙ্ঘের কর্ত্তৃক সান্ধ্য-সম্মিলনীতে সম্বর্দ্ধিত হন। এতদুপলক্ষ্যে শতাধিক স্বজাতির সমাগম হইয়াছিল। তন্মধ্যে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন—এ্যাড্‌ভোকেট শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ এম-এ, বি-এল, শ্রীযুত হৃষিকেশ সুর, শ্রীযুত সতীশচন্দ্র সুর, শ্রীযুত মৃগাঙ্কমোহন শূর, শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ কোলে, শ্রীযুত পঞ্চানন ঘোষ, শ্রীযুত সুবোধচন্দ্র সুর, প্রভৃতি। শ্রীযুত ভূতনাথ কোলে এবং শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র কুমার মহাশয়দ্বয়কে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করিবার পর [illegible]

সভাপতি শ্রীযুত আশুতোষ ঘোষ, বিদ্যাবিনোদ, ভক্তিরত্ন মহাশয় তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করিয়া একটি বক্তৃতা দেন। আরও একজন সভ্য তাঁহাদের বিবিধ গুণের কথা উল্লেখ করিয়া সঙ্ঘের পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

অতঃপর শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতায় বলেন যে, ভূতনাথবাবু এবং পূর্ণবাবু কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী। আজ তাঁহারা উভয়েই স্বজাতির যুবকবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত। কিন্তু এই যুবকগণের মধ্যে অনেকেই বেকার সমস্যায় বিশেষরূপে কষ্ট পাইতেছে। সুতরাং তাঁহারা যদি অনুগ্রহ করিয়া এই যুবকগণকে ব্যবসায়ে সাফল্যলাভ করিবার উপায়গুলি বলিয়া দেন, তাহা হইলে তাহারা বিশেষ উপকৃত হইবে।

ইহাতে পূর্ণবাবু বলেন,—"ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ কর্‌তে হ'লে ব্যবসার প্রতি একনিষ্ঠ ভক্তি ও শ্রদ্ধার দরকার। ব্যবসা যতই সামান্য হোক্ না কেন, তা'তে অত্যন্ত শ্রদ্ধাপূর্ণভাবে যদি না লেগে থাকা যায়, উন্নতি তবে কিছুতেই হ'তে পারে না। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, আজ-কালকার ছেলেদের মধ্যে শ্রদ্ধা ও ভক্তির ভাব অতি অল্প। তারা নিজেদের বেশী বুদ্ধিমান মনে ক'রে পিতামাতার কার্য্যের বিচার করে। ফলে শ্রদ্ধা-ভক্তি তাদের হৃদয়ে অঙ্কুরিত হয় না। শ্রদ্ধা বা ভক্তি কখনো আপনি জাগরিত হয় না। লেখাপড়া বা অন্য জিনিষ শিখ্‌তে গেলে যেমন সাধনার দরকার হয়, শ্রদ্ধা ও ভক্তি জাগাতে সেইরূপ সাধনার আবশ্যক। এই কারণেই আমাদের মধ্যে বাল্যকাল থেকে পিতামাতাকে শ্রদ্ধা করবার প্রথা প্রচলিত আছে। নির্ব্বিচারে যদি কেহ পিতামাতাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করে, তাহ'লে তার এই ভাব মনের মধ্যে এত বৃদ্ধি পায় যে, সে যে কাজই কর্‌তে যায়, সে কাজেই শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারে এবং কর্ম্মে সাফল্য লাভ কর্‌তে পারে। শ্রদ্ধা ও ভক্তির আধ্যাত্মিক মূল্যের কথা এখানে না-ই বা বল্‌লাম ; কিন্তু এর বাস্তবমূল্য এত অধিক যে, এর দ্বারা জগতের সমস্ত কাজ সুসম্পন্ন হ'তে পারে। আমাদের যুবকগণ যদি ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করিতে চায়, তাহ'লে তারা যেন তাদের হৃদয়ের শ্রদ্ধা ব্যবসার প্রতি আরোপিত কর্‌বার জন্যে পিতামাতাকে ও অন্যান্য গুরুজনকে শ্রদ্ধা কর্‌তে অভ্যাস করে।"

ভূতনাথবাবু বলেন—"পূর্ণবাবু যে কথা বলেছেন তার উপর আমি শুধু একটা কথা বল্‌তে চাই ;—যে যুবক ব্যবসায়ী হ'তে চায়, তার কখনো বিলাসী হওয়া উচিত নয়। আমি অনেক যুবককে জানি, যারা ব্যবসায়ে প্রথম প্রথম খুব উদ্যমের সহিত অগ্রসর হ'য়েছিল, কিন্তু ব্যবসায় সামান্য উন্নতি হওয়া মাত্র তাদের কর্ম্ম-শৈথিল্য দেখা দিলো এবং কিঞ্চিৎ বিলাসিতাও তাদের মধ্যে

বিদ্যার আবশ্যক হয় না। সাধারণ বিদ্যা নিয়ে বিলাসিতা ত্যাগ করে কঠোর পরিশ্রম ও ধৈর্য্যের সহিত যে কর্ম্মে অগ্রসর হ'তে পারে—সাফল্য তার সুনিশ্চিত।"

তৎপরে প্রসিদ্ধ যাদুকর শ্রীসতীশচন্দ্র দাস কাঁটা, পেরেক ও ভাঙ্গা কাঁচ ভক্ষণ করিয়া এবং নাইট্রিক, সাল্‌ফিউরিক্ ও কার্ব্বলিক্ এসিড পান করিয়া সকলকে যুগপৎ বিস্মিত ও মুগ্ধ করেন। ইহার পর সভাভঙ্গ হয়। সঙ্ঘের সভাপতি ডাঃ শ্রীযুত মনোমোহন কুমার ও সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুত ললিতমোহন কুমার সমাগত ব্যক্তিবর্গকে আদর অভ্যর্থনা ও জলযোগের দ্বারা পরিতুষ্ট করিতে সর্ব্বদা রত ছিলেন।

সদ্গোপ যুবকসঙ্ঘের নবম বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন

গত ৩১শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার সান্ধ্যসম্মিলনী সুসম্পন্ন হইবার পর সদ্গোপ যুবকসঙ্ঘের নবম বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। ডাঃ শ্রীযুত মনোমোহন কুমার মহাশয় ইহার পৌরহিত্য করেন। সভারম্ভের প্রথমেই শ্রীযুত আশুতোষ ঘোষ বিদ্যাবিনোদ, ভক্তিরত্ন, স্বর্গীয় জ্যোতিষচন্দ্র হাজরা মহাশয়ের আকস্মিক পরলোক গমনে একটি শোকসূচক প্রস্তাব উত্থাপন করিলে তাহা সর্ব্বসম্মতিতে গৃহীত হয় এবং সকলে দণ্ডায়মান হইয়া মৃতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। তৎপরে কার্য্যসূচী অনুযায়ী সঙ্ঘের নবম বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব ও সম্পাদকের আলোচ্যবর্ষের কার্য্যবিবরণী পঠিত ও গৃহীত হয়। ইহার পর নূতন বর্ষের জন্য কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হয়। নব গঠিত কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সভাপতি, সহকারী সভাপতিবৃন্দ, সাধারণ সম্পাদক, সভ্যবৃন্দ প্রভৃতির নাম নিম্নে প্রকাশিত হইল। অতঃপর শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার শীর্ষস্থানাধিকারী প্রতিযোগিগণকে এবং ষষ্ঠ বর্ষের সদ্গোপ পত্রিকার তরুণ শ্রেষ্ঠ লেখক-লেখিকাগণকে পুরস্কার বিতরণ করেন। সেদিন অত্যন্ত বর্ষা হইয়াছিল বলিয়া পুরস্কার লইবার জন্য কেহ কেহ এই সভায় উপস্থিত হইতে সমর্থ হন নাই। তাঁহারা সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুত ললিতমোহন কুমার মহাশয়ের নিকট আবেদন করিলে পুরস্কার পাইবেন। পরিশেষে যাদুকর শ্রীসতীশচন্দ্র দাস নর-রাক্ষসের ক্রীড়া দেখাইবার নিমিত্ত একটি জীবন্ত মুরগী ভক্ষণ করিয়া সকলকে বিস্মিত করেন। অতঃপর মাননীয় সভাপতি মহাশয়কে এবং সমবেত ভদ্র মহোদয়গণকে ধন্যবাদ দানান্তে রাত্রি ৯৷৷০ ঘটিকায় সভার কার্য্য পরিসমাপ্ত হয়।

সদ্গোপ যুবকসঙ্ঘের দশম বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি

সভাপতি—

সহকারী সভাপতিবৃন্দ—

শ্রীযুত হৃষীকেশ সুর
" আশুতোষ ঘোষ বিদ্যাবিনোদ, ভক্তিরত্ন,
শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ কোলে
" বিভূতিকুমার পাল, এম্-এ, বি-এল,
শ্রীযুক্ত মৃগাঙ্কমোহন সুর

সাধারণ সম্পাদক—

শ্রীযুত ললিতমোহন কুমার

সহকারী সাধারণ সম্পাদকবৃন্দ—

শ্রীযুত ফণীভূষণ সুর
" নীলরতন সরকার
শ্রীযুক্ত জীতেন্দ্রনাথ নিয়োগী
" অনাথনাথ হাজরা

কোষাধ্যক্ষ—

শ্রীযুত শঙ্করীপ্রসাদ চৌধুরী, জি-ডি-এ,

হিসাব-পরীক্ষক—

শ্রীযুত পূর্ণাঙ্ক শূর, ইন্‌কর্পোরেটেড একাউন্টেন্ট্ ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র শূর

সদ্গোপ পত্রিকা সম্পাদক—

শ্রীযুত তারকনাথ হাজরা

সভ্যবৃন্দ—

শ্রীযুত ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ, বি-এ, বি-এল
" শশধর মণ্ডল
" শৈলেন্দ্রনাথ সুর
" ইন্দুপ্রকাশ ঘোষ
" সত্যেন্দ্রনাথ নিয়োগী
" রামচন্দ্র সুর
" সমরেন্দ্রনাথ পাল
" সূর্য্যনারায়ণ পাল

শ্রীযুত কানাইলাল মণ্ডল, এম-এস্-সি
" সত্যচরণ ঘোষ
" সুশীলকুমার সুর
" গোপালচন্দ্র বিশ্বাস
" জগন্নাথ কোলে
" জ্যোতিঃপ্রকাশ ঘোষ
" প্রফুল্লকুমার ঘোষ
" কানাইলাল ঘোষ

অবশিষ্ট চারিজন সভ্য কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতিকে উহার প্রথম অধিবেশনে নির্ব্বাচিত করিবার ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে।

পত্রিকা পরিচালক মণ্ডলী—

সদ্গোপ পত্রিকার পরিচালক মণ্ডলীর সভ্য নির্ব্বাচন করিবার ভার কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির উপর অর্পিত হইয়াছে। উহার প্রথম অধিবেশনেই এই কার্য্য সমাধান করিতে হইবে।

দ্রষ্টব্য ঃ—আগামী সংখ্যায় সদ্গোপ যুবক সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদকের নবম বার্ষিক কার্য্য-

আমাদের কথা

ভারতের আদি ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এনামেলের কারখানা 'সুর এনামেল এ্যাণ্ড ষ্ট্যাম্পিং ওয়ার্কস্ লিমিটেড'এর শ্রীযুক্ত মৃগাঙ্কমোহম শূর এম্-এস্‌সি মহাশয় জাপান হইতে সম্প্রতি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। জাপানে তিনি প্রায় পাঁচ মাস ছিলেন। ভারতে এনামেল শিল্প ও ব্যবসায়ের উন্নতিসাধন করাই তাঁহার জাপান ভ্রমণের উদ্দেশ্য ছিল। এই উদ্দেশ্য লইয়া তিনি ইহার পূর্ব্বে কয়েকবার ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ও আমেরিকায় পরিভ্রমণ করেন এবং ভারতে এনামেল কার্য্যের প্রভূত উন্নতিসাধন করিতে সমর্থ হন। আশা করি প্রাচ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্পপ্রধান দেশ জাপান পরিভ্রমণ করিয়া তিনি যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন তদ্দ্বারা তাঁহার সাধু উদ্দেশ্য অধিকতর সাফল্যমণ্ডিত হইবে। তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া স্বদেশের শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করুন ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।

* * * *

সদ্গোপ যুবক সঙ্ঘের প্রতি স্বজাতীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যে কত সহানুভূতিসম্পন্ন তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ সঙ্ঘের গত ৩১শে জ্যৈষ্ঠ তারিখের দুইটী সভাতে পাওয়া গিয়াছে। সেদিন বেলা দ্বিপ্রহর হইতে যেরূপ বৃষ্টিধারা পতিত হইতেছিল, তাহাতে আমাদের অনেকেই আশঙ্কা করিতেছিলেন যে, বোধ হয় সভা দুইটীতে বিশেষ লোক-সমাগম হইবে না। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট সময় হইতে দেখা গেল যে, কেবলমাত্র স্বজাতীয় যুবকগণই নহেন, আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ প্রবীণ ব্যক্তিগণও বৃষ্টি ও কর্দ্দম অগ্রাহ্য করিয়া সভায় শুভাগমন করিতেছেন। ইহা যে আমাদের প্রতি তাঁহাদের প্রগাঢ় স্নেহের পরিচয় তাহা বলাই বাহুল্য। এজন্য তাঁহাদের প্রতি আমরা আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি। আশা করি ভবিষ্যতেও তাঁহারা আমাদের প্রতি এইরূপ স্নেহ প্রদর্শন করিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত, অনুগৃহীত ও বাধিত করিবেন।

* * * *

সদ্গোপ যুবক সঙ্ঘের কার্য্যে প্রীত হইয়া শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত ভূতনাথ কোলে মহাশয় সদ্গোপ যুবক সঙ্ঘকে এক শত টাকা দান করিয়াছেন। এজন্য আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে দাতাকে আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি। শ্রীভগবানের কৃপায় তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া সুখ-শান্তি লাভ করুন—ইহা আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি।

বঙ্গীয় সদ্গোপ সভার সভাপতি শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ পাল, ব্যারিষ্টার শ্রীযুত প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, এটর্ণী শ্রীযুত রাধারমণ সুর, উকীল শ্রীযুত কালীপ্রসাদ নিয়োগী, ডাঃ শ্রীযুত ফণীভূষণ সুর, শ্রীযুত গোপালচন্দ্র বিশ্বাস ও শ্রীযুত পূর্ণাঙ্ক শূর মহাশয়গণ ষষ্ঠ বর্ষের সদ্গোপ পত্রিকার শ্রেষ্ঠ তরুণ লেখক-লেখিকাদিগের পুরস্কারের জন্য প্রত্যেকে একখানি করিয়া রৌপ্য পদক দান করিয়া আমাদিগকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা দাতাদিগকে আমাদের অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

* * * *

এবারে সদ্গোপ যুবক সঙ্ঘের কার্য্যকারী সমিতিতে যে সমস্ত স্বজাতির বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যোগদান করিয়াছেন এবং উহা যেরূপে সুগঠিত হইয়াছে তাহাতে ইহা অনুমান করা বৃথা হইবে না যে, সঙ্ঘের অনেক অভাব-অভিযোগ অচিরে বিদূরিত হইবে এবং সঙ্ঘ স্বজাতির উন্নতিকর কার্য্যে করিতে অধিকতর অগ্রসর হইবে। এই অনুমান যেন স্বজাতির সকলের সহায়তায় বাস্তবে পরিণত হয়—ইহাই আমাদের কামনা।

* * * *

সদ্গোপ যুবক সঙ্ঘের সভ্যগণ ডাঃ শ্রীযুক্ত মনোমোহন কুমার মহাশয়কে সঙ্ঘের সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত ললিতমোহন কুমার মহাশয়কে সাধারণ সম্পাদক নির্ব্বাচন করিয়া যথোপযুক্ত কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহাদের কার্য্যের জন্য তাহাদের নিকট এই সঙ্ঘ চির-ঋণী থাকিবে। তাঁহারা ইহার উন্নতির জন্য ব্যক্তিগত প্রভূত ক্ষতি স্বীকার করিয়া যেরূপ সময় ও সামর্থ্য দান করেন, তাহাতে তাঁহাদিগকে এই সঙ্ঘের প্রাণস্বরূপ বলা যাইতে পারে। বস্তুতঃ, তাঁহারা দুইজনে ছিলেন বলিয়াই আজ এই যুবক সঙ্ঘের অস্তিত্ব এখনও বিদ্যমান। ডাঃ শ্রীযুক্ত মনোমোহন মহাশয় শারীরিক অসুস্থতার জন্য এবং শ্রীযুক্ত ললিতমোহন কুমার মহাশয় ব্যক্তিগত কর্ম্মাতিশয্যের জন্য স্ব স্ব পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু সকলের অনুরোধে তাঁহারা ব্যক্তিগত অসুবিধা ও ক্ষতি স্বীকার করিয়া স্বজাতির কার্য্যে পুনরায় আত্মনিয়োগ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। যুবক সঙ্ঘ তাঁহাদিগকেই কর্ণধাররূপে পাইতে চায়,—তাঁহাদেরই অধিনায়কত্বেই যে ইহার প্রকৃত উন্নতি সাধন হইবে, এই বিশ্বাস সকলে কিরূপে মনোমধ্যে পোষণ করেন তাহা ইহার নবম বার্ষিক সাধারণ সভায় বিশেষরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। আমরা তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল কামনা করি।

* * * *

শ্রীযুক্ত ভূতনাথ কোলে মহাশয় ও শ্রীযুক্তপূর্ণচন্দ্র কুমার মহাশয়কে সান্ধ্য-সম্মিলনীতে সম্বর্দ্ধনা করিবার সময়ে তাঁহারা ব্যবসায়ে সাফল্যলাভ করিবার উপায় সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল। ইহার প্রতি আমরা স্বজাতির সকলের, বিশেষতঃ যুবকগণের দৃষ্টি আকার্ষণ করি। বেকার-সমস্যা আজ দেশে যেরূপ ভীষণাকার পরিগ্রহ করিয়াছে তাহাতে সকলেই বিপর্য্যস্ত। এ সমস্যা সমাধান করিবার নিমিত্ত অভিজ্ঞ ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণও বিশেষ প্রকার চেষ্টা সত্বেও কোন প্রকার সুনির্দ্দিষ্ট পন্থা প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইতেছেন না। অন্নবস্ত্রের সংস্থান করা আজ বাস্তবিকই সাধারণ লোকের পক্ষে অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার।

অধিকন্তু বাঙ্গালদেশের এই অন্ন-সমস্যা নানা কারণে জটিলতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার অন্যতম কারণ, আমাদের মনে মনে হয়, বাঙ্গালার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যুবকগণের মধ্যে অনেকে-নিজেদের জীবনের গুরুত্ব ও দায়িত্ব সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না। চাকরীকে তাঁহারা জীবিকা-নির্ব্বাহের একমাত্র অবলম্বন মনে করেন,—চাকরী ব্যতীত তাঁহাদের জীবন-ধারণের গত্যন্তর নাই। কিন্তু চাকরী পাওয়া বর্ত্তমানে যেরূপ দুর্লভ হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাতে ইহাকে অন্ন-বস্ত্র সংস্থানের একমাত্র উপায় বিবেচনা করিলে যে, একটী কেবল ভ্রান্তিপূর্ণ কার্য্য করা হইবে তাহাই নহে, জীবনেরও অশেষ অকল্যাণ সাধন করা হইবে। এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া স্বজাতি যুবকগণের পরমহিতৈষী শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় চাকরীর প্রতি ধাবমান মনোবৃত্তির গতি পরিবর্ত্তন করিবার নিমিত্ত পূর্ণবাবু ও ভূতনাথবাবুকে ব্যবসার সম্বন্ধে কিছু বলিবার জন্য অনুরোধ করেন।

ইহাতে তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন তাহা যুবকগণের অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। কেহ হয় ত বলিতে পারেন যে, ব্যবসা-ক্ষেত্রেরও বর্ত্তমানে যেরূপ শোচনীয় অবস্থা, তাহাতে লাভের আশা অত্যন্ত অল্প এবং সামান্য মূলধন লইয়া আজকাল ব্যবসায় চলে না ; বিশেষতঃ, কোনও প্রকার লাভজনক ব্যবসায়ের কথা তাঁহারা নির্দ্দেশ করেন নাই। কিন্তু এ বিষয় সকলেরই লক্ষ্য করা উচিত যে, ব্যবসায়ের অবস্থা বর্ত্তমানে যতই মন্দ হউক না কেন, এখনও পর্য্যন্ত মাড়োয়ারী, ভাটিয়া, প্রভৃতি ভিন্ন প্রদেশের লোকেরা অতি অল্প মাত্র মূলধন লইয়া এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে মূলধন না লইয়াই, বাঙ্গালা দেশে আসিয়া ব্যবসায় করিয়া ধনবান হইতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে যদিও অনেকেই অল্প শিক্ষিত এবং তাঁহাদের সম্বন্ধে আমরা যতই বিরুদ্ধ সমালোচনা করি না কেন, তথাপি ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, কয়েকটি গুণ সাধারণ বাঙ্গালী

অপেক্ষা তাঁহাদের মধ্যে অধিক পরিমাণে আছে। তাঁহারা দুঃখ-দারিদ্র্যে নিপীড়িত হইলেও, উদ্যমশীল, কষ্টসহিষ্ণু, হিসাবী, কঠোর-পরিশ্রমী এবং ব্যবসায়ের প্রতি অবিচলিতভাবে শ্রদ্ধাসম্পন্ন। লোকচরিত্র, নিজেদের জীবনের দায়িত্ব ও গুরুত্বকে ভাষার রূপ দিতে না পারিলেও, তাঁহারা তাহা সাধারণ শিক্ষিত বাঙ্গালী অপেক্ষা অধিকতর উপলব্ধি করেন এবং আপন কর্ম্মে প্রতিফলিত করিতে পারেন। সেই জন্য তাঁহারা প্রথমে অতি সামান্য ও তুচ্ছ ব্যবসায় আরম্ভ করিতে কুণ্ঠা বা লজ্জা বোধ করেন না। যে ব্যবসায় করিবার সুবিধা ও সুযোগ পান তাঁহারা তাহাই করিতে অগ্রসর হন এবং তাহাতেই লাভবান ও ধনবান হইয়া শিক্ষিত বাঙ্গালীকে কর্ম্মচারী রাখিতে সমর্থ হন।

সুতরাং বাঙ্গালীকে ব্যবসায়ে উন্নতি লাভ করিতে হইলে এই সমস্ত গুণের অধিকারী হইতে হইবে। তজ্জন্য সাধারণ বিদ্যাশিক্ষার পর অল্প বয়সেই যুবকগণ যাহাতে ব্যবসা ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারেন, তৎপ্রতি প্রত্যেক বাঙ্গালী অভিভাবকের অবহিত হওয়া প্রয়োজন। তাহাতে সুফল ফলিবার সম্ভাবনা অধিক। আমাদের এই কথায় কেহ যেন মনে না করেন যে, আমরা উচ্চ শিক্ষার বিরোধী। এখনও উচ্চ শিক্ষার দেশের মধ্যে, বিশেষতঃ আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে, যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। কিন্তু সাধারণ গৃহস্থের সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন বালক বা যুবকগণকে উচ্চ শিক্ষা দান করিবার নিমিত্ত অর্থ, সামর্থ্য ও সময় ব্যয় করিলে বর্ত্তমানে আর্থিক দিক দিয়া বিশেষ সুবিধা হইবে না—ইহাই আমাদের মত। তবে অবস্থাপন্ন গৃহস্থের সন্তানগণের উচ্চ শিক্ষা লাভের সুযোগ গ্রহণ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

নিয়মাবলী

১। সমস্ত টাকা কড়ি যুবকসঙ্ঘের 'সেক্রেটারী'র নামে ৩৪, ইণ্ডিয়ান মিরার ষ্ট্রীট, কলিকাতা এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

২। রাজনৈতিক কোন প্রবন্ধ পত্রিকাতে আলোচিত হয় না।

৩। লেখক-লেখিকাগণের মতামত পত্রিকা সম্পাদক বা সদ্গোপ যুবকসঙ্ঘের মতামত নহে।

৪। লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।

৫। প্রবন্ধ কাগজের একপৃষ্ঠে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া পত্রিকা-সম্পাদকের নামে ৩৪ নং ইণ্ডিয়ান মিরার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। ডাকমাশুল না পাঠাইলে অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরত দেওয়া হয় না। প্রবন্ধ পাঠাইবার সময় আপত্তি না জানাইলে পত্রিকা পরিচালক মণ্ডলী প্রবন্ধের যে কোন অংশ পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন করিতে পারিবেন।

৬। যুবক-সঙ্ঘ ও তাহার পত্রিকা সম্বন্ধীয় যাবতীয় সংবাদ যুবক-সঙ্ঘ অফিস ৩৪ নং ইণ্ডিয়ান মিরার ষ্ট্রীটে জ্ঞাতব্য। সন্ধ্যা ৮টা হইতে ৯॥০টা পর্য্যন্ত অফিস খোলা থাকে।

৭। বিজ্ঞাপনের হার সাধারণ এক পৃষ্ঠা মাসিক ৮৲, আধ পৃষ্ঠা ৪॥০, সিকি পৃষ্ঠা ২॥০, সূচীর নীম্নে আধ পৃষ্ঠা ৬৲, সিকি পৃষ্ঠা ৩॥০। বিশেষ বিশেষ স্থানে বিজ্ঞাপনের মূল্য প্রকাশকের নিকট জ্ঞাতব্য।

সদ্গোপ পাত্র-পাত্রীর
বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী

(১) সদ্গোপ পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপন বিনামূল্যে প্রকাশ করা হইবে। কেবলমাত্র পত্রিকার গ্রাহক-গ্রাহিকাগণই এই সুবিধা পাইবেন। কিন্তু স্থানাভাব বা অন্য কোন কারণ বশতঃ এই বিষয়ে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশ না করিবার ক্ষমতা সদ্গোপ যুবক সঙ্ঘের কর্ত্তৃত্বাধীন। (২) বিজ্ঞাপনগুলি স্পষ্টাক্ষরে ও সংক্ষিপ্ত হওয়া আবশ্যক। উহা যেন এই পত্রিকার ৩ লাইনের অধিক না হয়। (৩) বিজ্ঞাপনে বিবৃত বিবরণের জন্য আমরা দায়ী নহি। পাত্র-পাত্রীর সম্বন্ধ নির্ণয়কারিগণ সমস্ত বিষয় তাঁহারা নিজেদের দায়িত্বে করিবেন। (৪) যাঁহারা নিজেদের নাম প্রকাশ না করিয়া বক্স নম্বর দিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা যদি আমাদের কার্য্যালয় হইতে পত্রাদি লইয়া না যান, তবে উহা প্রেরণের জন্য তাঁহাদিগকে আমাদের নিকট উপযুক্ত (অন্ততঃ আট আনার) ডাকটিকেট রাখিতে হইবে।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ নিয়োগী কর্ত্তৃক দি নিউ ইণ্ডিয়ান প্রেস—৬, ডাফ ষ্ট্রীট হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সম্পাদক—শ্রীতারকনাথ হাজরা।

বিজ্ঞাপনদাতাগণকে পত্র দিবার সময় অনুগ্রহপূর্ব্বক 'সদ্গোপ পত্রিকার' নাম উল্লেখ করিবেন।

স্বজাতিগণ সদ্গোপ পত্রিকার পাত্র-পাত্রীর জন্য বিজ্ঞাপন দিন। বিজ্ঞাপনের হার অতি সামান্য

সূচী

১।	ছোট গল্প (প্রসঙ্গ)	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ	২৩১
২।	বিসর্জ্জন (গল্প)	কুমারী রমা নিয়োগী	২৩৭
৩।	সদ্গোপ যুবক সঙ্ঘের নবম বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী	শ্রীললিতমোহন কুমার	২৪২
৪।	চতুর্ব্বর্গ (নাটক)	শ্রীশ্রীশচন্দ্র কুমার এম-এ, বি-এল	২৪৭
৫।	স্বর্গীয়া রাজবালা ঘোষ (জীবনী)		২৫৫
৬।	আমাদের সাদর অভিনন্দন		২৫৮
৭।	পল্লী মা (কবিতা)	কুমারী সুলেখা হালদার	২৬১
৮।	সংবাদিকা		২৬২
৯।	আমাদের কথা		২৬৩

সদ্গোপ পাত্র-পাত্রী

পাত্র চাই—একটী চতুর্দ্দশবর্ষীয়া স্বাস্থ্যবতী শ্যামবর্ণা বাঙ্গলা লেখাপড়ায় অভিজ্ঞা গৃহকর্ম্মে নিপুণা পূর্ব্বকুল মৌদ্‌গোল্য গোত্র পাত্রীর জন্য একটী শিক্ষিত ব্যবসায়ী স্বাস্থ্যবান্ পাত্র চাই। যৌতুক ২০০০৲ টাকা। বক্স নং ৩ সদ্গোপ পত্রিকা।

পাত্রী চাই—একটী গ্রাজুয়েট শিলং প্রদেশের ব্যবসায়ী সুদর্শন ভাল্‌কো কুলীন বংশের পাত্রের জন্য একটী ১৭।১৮ বৎসর বয়স্কা সুন্দরী শিক্ষিতা ভাল্‌কো ঘর ব্যতীত পাত্রী চাই। কুলীন না হইলেও চলিবে। যৌতুকাদি কিছুই নাই। বক্স নং ৮ সদ্গোপ পত্রিকা।

পাত্র চাই—ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারীং স্কুলের শেষ পরীক্ষোত্তীর্ণ মেদিনীপুর ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের অধীনস্থ কর্ম্মচারী একটী স্বাস্থ্যবান্ সুদর্শন যুবকের জন্য একটী সুন্দরী গৃহকর্ম্মে নিপুণা পাত্রী আবশ্যক। বক্স নং ১০ সদ্গোপ পত্রিকা।

পাত্রী চাই—একটি স্বাস্থ্যবান্ সুশ্রী শিক্ষিত, বিশিষ্ট ইঞ্জিনীয়ারের পুত্র, রেডিও ব্যবসায়ী ২২।২৩ বৎসরের যুবকের জন্য একটি স্বাস্থ্যবতী সুন্দরী শিক্ষিতা পাত্রী আবশ্যক। বক্স নং ১১ সদ্গোপ পত্রিকা।

পাত্রী চাই—বি-এ ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র, ২০।২১ বৎসরের স্বাস্থ্যবান্ পাত্রের জন্য একটি সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী, শিক্ষিতা, সূচীশিল্পে সুনিপুণা, ধনশালী গৃহের পাত্রী আবশ্যক। পাত্রের পিতা ২৫০৲ বেতনে গভর্ণমেণ্ট চাকরী করেন এবং হুগলী ও মেদিনীপুর জেলায় তাঁহার বিষয়-সম্পত্তি আছে। বক্স নং ১৩ সদ্গোপ পত্রিকা।

পাত্রী চাই—একজন এম্-এ উপাধিধারী উপার্জ্জনক্ষম স্বাস্থ্যবান্ যুবকের জন্য একটী সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী, শিক্ষিতা, গৃহকর্ম্মে নিপুণা পাত্রীর আবশ্যক। পাত্রের বয়স ২৬।২৭। বক্স নং ১৫ সদ্গোপ পত্রিকা।

৭ম বর্ষ] শ্রাবণ ও ভাদ্র, ১৩৪৩ [৯ম ও ১০ম সংখ্যা

ছোট গল্প

[শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ]

বঙ্গ সাহিত্যে ছোটগল্প লেখার অভাব নেই। অথচ ছোটগল্প কা'কে বলে, কি তা'র রূপ, কতখানি তার পরিমাণ—এগুলো অনেকেই জানেন না। জীবনের ইতিহাসের দু'টো সুখ-দুঃখের, হাসি-কান্নার পাতা উল্টে গেলেই যদি ছোটগল্প রচনা করা যেতো, তাহ'লে বাঙ্‌লা সাহিত্যে হাজার দোঁদো, মোঁপাশা, পাউল, হেসি, পুস্কিল, টলষ্টয়, গোর্কি, প্রভৃতি এতদিন সৃষ্টি হ'য়ে যেতো। দুঃখু তো এই জন্যেই, বেদনা কেবল এই কারণেই যে, ছোটগল্পের স্বরূপ না জেনে নিয়ে তা'তে প্রবৃত্ত হওয়া বাঙালী লেখকের একটা মজ্জাগত দোষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ছোটগল্প রচনা করতে গেলে যে সব নিয়মানুবর্তিতা মেনে চল্‌তে হয়, তা' আমরা ভাবের প্রবাহে ভুলে যাই। আমরা ভাষাকে দৌড় করিয়ে দিই প্রথমে—তারপর কথার পিঠে কথা গেঁথে ছোটগল্পের কাঠামো তৈরী করে' নিই। ছোটগল্প লিখ্‌তে গেলে যে, প্লটেরও প্রয়োজন আছে তা' অবশ্য আমরা উপলব্ধি করতে ভুলি না। কিন্তু লেখ্‌বার খোরাক খুঁজ্‌তে আমাদের বিশেষ বেগ পেতে হয় না। নিজেদের অপূর্ণ বাসনা, অভুক্ত কামনা, অপরিণত প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্যে যে সব প্লটের প্রয়োজন হয়, তাই দিয়েই শতকরা নব্বইটি ভরিয়ে দিই।

প্রথমেই ধরা যাক, ছোটগল্প কা'কে বলে? অনেকে অনেক কথাই এখানে ব'ল্‌তে পারেন; কিন্তু আমার মনে হয়—ছোট গল্প ব'লতে বোঝাবে শুধু সেই গল্পকে যার মধ্যে খুঁজে পাইনা কোনো আরম্ভ, কোনো শেষ—থাকবে শুধু যার মাঝখানটা। আরম্ভ করবার পূর্ব্বের ঘটনা বা বিষয়বস্তু

যেখানে পরিসমাপ্তি, ততোদূর পর্য্যন্ত না এগিয়ে গিয়ে এমন যায়গায় থামিয়ে দিতে হ'বে, যেখান থেকে পাঠকের শেষটা ধরে' নিতে একটুও বেগ পেতে হ'বে না। মনে করুন, শরৎবাবুর 'মহেশ', রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুদিত পাষাণ', প্রভাত মুখুর্য্যের 'দেশী ও বিলাতী', বিভূতি বাঁড়ুর্য্যের 'যাত্রাবদল', বনফুলের 'সুলেখার ক্রন্দন', প্রবোধ সান্যালের 'নিশিপদ্ম', এম্নি আরো কতো। এই ধরণের ছোট গল্পের মধ্যে যে সব নায়ক-নায়িকার সন্ধান আমরা পাই, তারা আগে কি ছিলো এবং পরে তাদের কি হ'লো, সে সংবাদ আমরা গল্পের মধ্যে পাবো না,—কেবলমাত্র জান্‌তে পাবো তাদের জীবনের বিশেষ একটি স্মরণীয় ঘটনার কথা। উক্ত ঘটনা প্রসঙ্গে তাদের সম্বন্ধে যতটুকু জানা প্রয়োজন, তার বেশী জান্‌বার আমাদের অধিকার নেই। এই ঘটনার যবনিকা-পাতের সঙ্গে সঙ্গে গল্পেরও যবনিকা-পাত। বাকীটুকু আমরা মনের সঙ্গে যুক্তি করে' গড়ে নিই। এইখানেই উপন্যাসের সঙ্গে ছোট গল্পের আসল তফাৎ। তাই নায়ক-নায়িকারা যে লেখকের কল্পনা প্রসূত তা' আমরা ভাবতেই পারি না। মনে হয় তারা যেন আমাদের অন্তরের সামগ্রী। তাদের জীবন-কাহিনী কাগজের বুকে ধরা না থেকে আমাদের হৃদয়ে এসে বাসা বেঁধে নেয়। এই যে অপরের জন্য অনুভূতি, বেদনার একটুখানি পরশ—যা প্রতিনিয়ত হৃদয়কে করে' দেয় চঞ্চল, অন্তরকে দুলিয়ে দেয় আঘাত-প্রতিঘাতের দোলায়, ভিতরের মানবতাকে জাগিয়ে দেয় জাগরণের সুপ্রভাতে। এগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন কর্‌তে যাওয়া ধৃষ্টতা বৈ আর কিছুই নয়।

পাশ্চত্য দেশে বিশেষতঃ য়ুরোপে পূর্ব্বে ধারণা ছিল "A short story is a short story which is short.'' অর্থাৎ ছোট গল্প প্রথমতঃ ছোট গল্প হওয়া চাই, দ্বিতীয়তঃ ছোট হওয়া চাই। এ ধারণাটা এখন আর নেই। এখনকার ধারণা, এড্‌গার অ্যালান পো'র মতে, "A short story must be capable of being read at one sitting, in order that it may gain the immense force derivable from totality. Moreover, in the whole composition, there should not be one word written of which the tendency direct or indirect, is not to be one pre-established design.'' এইজন্যই 'রামের সুমতি', এমন কি 'বড়দিদি' বা 'রজনী'কেও আমরা ছোট গল্প পর্য্যায়ভুক্ত ক'রে নিয়েছি।

ভবানীবাবু বলেন, "ছোট গল্পের প্রত্যেকটি ঘটনা তার পূর্ব্বের ঘটনা এবং তার পরের ঘটনার সঙ্গে অবিচ্ছেন্তভাবে সংশ্লিষ্ট; তার সমস্ত ঘটনাগুলি একটি বিশেষ লক্ষ্যের অভিমুখে চলতে থাকে—ইংরাজিতে বলে লক্ষ্যের নাম climax; climax এই ছোট গল্পের প্রাণ।

Climax যত কাছে আসে ছোট গল্পের বেগ তত দ্রুত হয়, এবং climaxএর সঙ্গে সঙ্গেই ছোট গল্পের শেষ।" উদাহরণ স্বরূপ শরৎবাবুর 'মহেশ' গল্পটি উল্লেখ করা যেতে পারে। সত্যিই 'মহেশ' গল্পের যে লাইনে শেষ পূর্ণচ্ছেদ পড়েছে, তারপরও অনেক কিছু বলা যেতো। যেমন গফুরকে সহানুভূতি দেখিয়ে অথবা তার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করে' কিম্বা তার মানসিক অবস্থা সম্বন্ধেও কিছু বলা চল্‌তো। কিন্তু শরৎবাবু এর কিছুই করেন নি। কর্‌লে সৌন্দর্য্য নষ্ট হ'তো তা' বলাই বাহুল্য।

ছোট গল্প আমরা তাকেই বলি, যার বর্ণিত ঘটনা-বস্তু একটা নির্দ্দিষ্ট এবং অত্যন্ত স্বল্প পরিমিত সময়ের মধ্যে ঘটে থাকে। ঘটনা কাল যদি অতিশয় দীর্ঘ হ'য়ে পড়ে, ছোট গল্পের technique ব্যর্থ হয়। যথা সম্ভব অল্প সময়ের মধ্যে ঘটনা বস্তুগুলি ঘন সংবদ্ধভাবে সাজাতে পারলেই ছোট গল্প চরম উৎকর্ষতা লাভ করে। 'ঘটনা স্থলের ঐক্য' জিনিষটা ছোট গল্পের একটা অঙ্গ। ছোট গল্পের মধ্যে এক গাদা চরিত্র আনা যায় বটে, কিন্তু তাতে খর্ব্ব হয় লেখকের রচনা কৌশল, সহজ করে' বলবার দক্ষতা। যত কম সংখ্যক চরিত্র সম্পূর্ণরূপে গল্পের মধ্যে বলা যায়, তার দিকে লক্ষ্য থাক্‌লে গল্পের মধ্যে আসে দ্রুত ভঙ্গিমা, একটা ভাসমান সাবলীল ছন্দ। কারণ, ছোট গল্পের পাঠক চিত্তকে ব্যাপকরূপে ডুবিয়ে রাখতে চায় না। সাধারণতঃ পাঠক মাত্রেই এগুলো পাঠ করে—অবসর চিন্তাকে ভুলিয়ে রাখা, হৃদয়ে প্রফুল্লতা ফিরিয়ে আনা, ক্লান্তি ও অবসাদ দূরে সরিয়ে দেবার জন্যেই। দীর্ঘ ঘটনা, সংক্ষিপ্ত কথোপকথন; দ্রুত গতিশীল প্রবাহ, ছোট গল্পের আদর্শকে ক'রে তোলে মহান্। 'ঘটনার সংহতি'ও ছোট গল্পের প্রধান সম্পদ। আরম্ভ যে সুরে হ'বে—শেষ পর্য্যন্ত সেই সুরই বজায় রেখে চল্‌তে হ'বে। নাটকের সঙ্গে ছোট গল্পের প্রভেদ এইখানে। নাটকে একটা করুণ দৃশ্যের পর একটা রঙ্গ-রসিকতার দৃশ্য থাকা চাই-ই, নইলে দর্শকের মনে সেই করুণ দৃশ্যের মূর্চ্ছনাই আধিপত্য স্থাপন করে' বসে। নাটকে দরকার হয় একটা balance,—ছোট গল্পে যা' একান্ত পরিহার্য্য। মনে করুন, গল্পটি আরম্ভ হলো একটি বিয়ে বাড়ীর উৎসবের মধ্যে দিয়ে। কিন্তু যদি সেই কলহাসির রেশ রুদ্ধ হ'য়ে গিয়ে তা'তে অত্যন্ত করুণতার আবির্ভাব হয়,—তাকে গল্প বলা হয় বটে; কিন্তু সজীবতা থাকে না। গল্পের মধ্যে থাকা চাই একটা প্লট, একটা স্বচ্ছ-প্রবাহ—যেগুলো শেষের দিকে আনে বন্যা এবং অকস্মাৎ সমাপ্তি। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, লেখকেরা নিজেদের জাহির কর্‌বার প্রত্যাশায়, নিজেদের বিদ্যা-বুদ্ধি দেখাতে গিয়ে হয় ভাষাকে প্রবল করে' বসেন, না হয় ভাষাকে এতখানি আধিপত্য দিয়ে দেন যে, এদের

মানুষের জীবনের দৈনন্দিন ঘটনা নিয়ে ছোট গল্প লেখাই যুক্তিসঙ্গত। যেহেতু চিরন্তন প্রেমের কাহিনীকে কেন্দ্র ক'রেই সর্ব্বোচ্চ আদর্শের ছোট গল্প লেখা যেতে পারে। কিন্তু তাব'লে আমি এ কথা বল্‌ছি না যে, অজ্ঞাত এবং অবলেহিত জীবনগুলির ওপর সহানুভূতি দেখিয়ে ছোট গল্প রচনা করা অন্যায়। যা জীবনের নিত্য ঘটনা বা সম্ভাবিত এরূপ কোনো কাহিনী নিলে শিল্প সৌন্দর্য্যের হানি হয় না। কিন্তু যে সব ছোট গল্প আমরা মাসিকে ও সাপ্তাহিকে দেখ্‌তে পাই, বেশীর ভাগই হ'চ্ছে বেকার যুবকের জীবনের ব্যর্থতা, কিম্বা কেরাণী জীবনের সাংসারিক অস্বচ্ছলতা; উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমিকের উচ্ছ্বাস, বা যক্ষ্মা রোগীর ডায়েরী, অবৈধ প্রণয়ের লীলা কাহিনী অথবা ট্রেণে বা ষ্টিমারে বা পার্কে বা রেঁস্তোরায় অপরিচিতকে পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতায় বাঁধ্‌বার কৌশল, ইত্যাদিতে ভর্ত্তি। আর এগুলোর বেশীর ভাগ সাহায্য নেয় কল্পনার। যেহেতু "বাংলায় পর্দ্দা প্রথা এবং নীতির পোষাক-পরা অন্যান্য দুর্নীতির চাপে স্বভাবতই তরুণ সাহিত্যিকের মধ্যে Sex-starvation আছে। তার ফলে জীবনে যা অতৃপ্ত থাক্‌ল—তা' তৃপ্ত হয় কল্পনায়। বাস্তবের মাটি থেকে যে কল্পনা জন্মায় নি, তার মধ্যে সত্য থাক্‌তে পারে না। বিকৃত কল্পনা প্রসূত লেখায় স্বভাবতই Morbidity আসে, বাংলা সাহিত্যে গত কয়েক বছরে এই জাতীয় ছোট গল্প বেরিয়েছে বিস্তর। Normal পুরুষ অথবা নারী sensual নয়,—কোনো দেশের normal পুরুষ অথবা নারী মূলত sensual নয়।" প্রশ্ন হ'তে পারে তবে ফ্রান্স্‌ ও নরওয়ে সাহিত্যে এত দেহ নিয়ে চীৎকার কেন? তার উত্তর, যাঁরা ফরাসীকে sensual মনে করেন, তাঁরা জীবনে কখনো আসল ফরাসী দেখেন নি। ফরাসী সাহিত্যে কুরুচি মূলক গল্প বেরোয়—সব সাহিত্যেই বেরোয়। কিন্তু তবুও তাদের মানসিক স্বাস্থ্য যত ভালো, বোধ করি জগতের আর কোনো জাতীয় তরুণদের মানসিক স্বাস্থ্য তার চেয়ে ভালো নয়। অবশ্য এই যে কুরুচিমূলক বা অশ্লীলতা পূর্ণ ছোট গল্পের এত আম্‌দানী এর জন্যে দায়ী সাহিত্যিক নিজে নয়,—দায়ী সাহিত্যিকের সমাজ।

এই জন্যেই বলি, ছোট গল্পের উদ্দেশ্য হওয়া চাই—একটা সার্ব্বজনীন বিষয় বস্তু। যদি গল্পের মধ্যে না পেলুম প্রাণের অনুভূতি, সাবলীল ভাষার ক্ষিপ্রতা, শব্দের সুপ্রয়োগের দক্ষতা, নিখুঁত গঠন প্রণালীর কৌশলতা,—তবে সে গল্প পড়ে শেখা যায় কি? লাভ হয় কতটুকু? খুঁটিয়ে দেখ্‌তে গেলে জগতের নর-নারীর চিরন্তন মনোবেদনা, স্নেহ বা প্রেম সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডীর মধ্যে লুকিয়ে থাকতে পারে না। মানুষের শাশ্বত চিরন্তনতার দাবী একই ভাবে একই

ছোট গল্প সৃষ্টি শিল্পের এক চরম উৎকর্ষ। এতে সৌন্দর্য্য ও জাঁক্‌জমকের অভাব থাক্‌লে চল্‌বে না। ছোট গল্পে শিল্পের প্রধানতঃ দু'টী প্রধান লক্ষণ মেনে চল্‌তে হ'বে—(১) একেন্দ্রিয় ভাব (Concentration) ও (২) ভাবের এবং স্থানের একত্ব (Unity of action and place). মোটের ওপর এইটি আমাদের সব সময়ে মনে রাখ্‌তে হ'বে যে, যেমন সনেটে একটি মাত্র ভাবকেই রূপ দেওয়া হয়, ছোট গল্পেও তেম্নি একটি ভাবকেই বিকশিত করে তোলাই প্রকৃত শিল্পীর কাজ। এমন কথা গল্পের মধ্যে বল্‌তে হ'বে, যার একটা কথা বাদ দিলে গল্প হ'য়ে যাবে পঙ্গু, প্রকাশ পাবে অসঙ্গতি, সম্পূর্ণতার বাধা পাবে প্রতি পদে পদে। গল্পের মূলসূত্র হওয়া চাই এক। একটি বিশিষ্ট ঘটনাকে কেন্দ্র করে' গল্পকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হ'বে। এখানে একটা কথা উঠ্‌তে পারে। কতদূর এগিয়ে নিয়ে যাওয়া চলে? দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে মোঁপাসার মতো পরম সংযমী অপর কোনো শিল্পী আছেন কি না সন্দেহ। তাঁর লেখার প্রত্যেকটা শব্দের অক্ষর যেন গল্পের গায়ে খোদাই করা—তাদের একটাও বাদ দেওয়া শক্ত। এই যে শব্দ ব্যবহার-বোধ, এগুলো এত সুপরিচিত যে, একটা শব্দেরও নিষ্প্রয়োজন ব্যবহার এঁদের সহ্য হয় না। বাঙ্‌লা মাসিকে গল্পের আয়তন সম্বন্ধে সতর্কতা নেই; কারণ এখানে গল্পের আয়তন মেপে দাম দিতে হয় না। (তবে 'প্রবাসী' মাঝে মাঝে বিজ্ঞাপ্তিতে জানিয়ে দেন যে, চার হাজারের কম সংখ্যক শব্দে ছোট গল্প তৈরী হওয়া চাই) কিন্তু ইংরাজী সব কাগজেই গল্পের আয়তন এবং quality হিসাব করে' দাম দিয়ে থাকে। সাধারণ লেখকেরা (সাধারণ লেখক বল্‌তে বাজে লেখক বোঝায় না) হাজার শব্দের জন্যে প্রায় চল্লিশ টাকা পান; একটা তিন পৃষ্ঠা গল্পের দাম প্রায় দশ গিনি পেয়ে থাকেন। এই জন্যেই ছোটগল্প লেখা ডাক্তারী বা ব্যারিষ্টারী করার মতোই একটা উঁচু দরের ব্যবসা। যথেষ্ট পারিশ্রমিক পাওয়া যায়; সুতরাং ভালো গল্প লেখকের অভাব হয় না। আমাদের দেশের ছোটগল্পের লেখকদের সাংসারিক অবস্থা শতকরা ৮০ জনের স্বচ্ছল না হওয়ার দরুণ, পারিশ্রমিকের লোভে আয়তন বাড়াতে গিয়ে গল্পকে হত্যা করে' বসেন অধিকক্ষেত্রে। এই জন্যেই সমালোচকের হৃদয় নিয়ে ছোটগল্প শেষ করবার পর অনেকের অন্তরে প্রশ্ন ওঠে না—তারপর। মনের অন্তরালে যেটুকু অবস্থিত ছিলো, সেটুকু প্রকাশ পাওয়াতে ক্ষতি হ'য়েছে আমাদের সমূহ। ছোটগল্প পাঠের পর যেখানে কোনো দ্বন্দ্ব ওঠে, সেখানেই বুঝ্‌তে হ'বে মূল ধারাটি ঠিক লক্ষ্য পথে চালিত হ'য়েছে। সুতরাং পাশ্চাত্য দেশ থেকে ছোটগল্পের দৈর্ঘ্য নিরূপণ কর্‌লে মোটের ওপর অসঙ্গত হ'বে না।

বিশ্ব সাহিত্যের কয়েকটা সেরা গল্পের দৈর্ঘ্য দেখা যাক্ :—

২। The Monkey's Paw—জেকব্স্—৩,৫০০ শব্দ।

৩। The Insurgent—লুকোভিক্ হালেভি—২,০০০ শব্দ।

৪। On the stairs—আর্থার মরিসন্—১,৬০০ শব্দ।

৫। The Father—বিয়র্ণষ্টৈয়র্ণ্ বিয়র্ণসন্—১,৫০০ শব্দ।

৬। Next to Reading Matter—ওহেনরি—৬,০০০ শব্দ।

৭। The Substitute—ফাঁসোয়া কপেই—৩৫০০ শব্দ।

৮। The Cask of Amontillado—এডগার অ্যালেন্ পো—২,৫০০ শব্দ।

৯। Feunessee's Partus—ব্রেট হার্ট—৪,০০০ শব্দ।

১০। Where Love is, There God is Also—টলষ্টয়—৫,০০০ শব্দ।

১১। Another Gambler—পল্ বুর্জে—৬,০০০ শব্দ।

১২। Mated Falcone—প্রস্পার মেরিমি—৫,৫০০ শব্দ।

১৩। The Great Stone Face—হথর্ণ—৮,৫০০ শব্দ।

১৪। The Man who was—কিপ্লিং—৬,৫০০ শব্দ।

শেকভ্, পুশ্কিন্, হার্ম্যান্, টুর্গেনিভ, আর্ভিন্—এঁদের যে সকল গল্প বিশ্ব সাহিত্যে স্থান পেয়েছে, তারাও এগুলোর মতো। সুতরাং এই থেকে আমরা গল্পের একটা মোটামুটি দৈর্ঘ্য মেপে নিতে পারি এবং সেইটে নেওয়াই যুক্তিসঙ্গত।

ছোটগল্পের উপকারিতা সম্বন্ধে আমার মনে হয় মতভেদ না থাক্বারই কথা। হাল্কা রচনা ও টুক্রো কথা শুনে স্বস্তি ও শান্তি ফিরিয়ে আন্তে বাঙালী পাঠক চিরদিনই অভ্যস্ত। পাঠক সাধারণের জীবন বর্ত্তমান যুগে যেরূপ জটিল ও কর্ম্মময় হ'য়ে উঠেছে, তা'তে দীর্ঘ উপন্যাস পড়্বার ও তার রস উপভোগ কর্বার ধৈর্য্য, সময় ও পরিশ্রমের অভাব প্রত্যেকেই অনুভব করে। এই জন্যেই বলি, ছোটগল্প এমন লেখা চাই, যা হ'বে ছোট এবং যাতে পাওয়া যায় মনের খোরাক।

বিসর্জ্জন

[কুমারী রমা নিয়োগী]

গ্রামে মড়ক এসেছে। সবাইয়েরই উৎকণ্ঠা-উদ্বেগের ছাপ,—গ্রামের ভীরু বুকে স্বস্তি-শান্তি ফিরিয়ে আনবার জন্যে মানৎ করে করে সবাই দেবতার নিকটে নিজেদের এত বেশী ঋণী করে ফেলেছে যে, তা থেকে নিষ্কৃতি আর কারুরই মিলবে না।

ভাদ্রের শেষ, হৈমন্তিক তীব্র রৌদ্রের জ্বালায় ঘর থেকে কেউ বেরুতে পারে না—এমনিতরো অবস্থা, অথচ জলে চারিদিক থৈ থৈ করছে।

দিনের পর দিন গ্রামবাসীদের শঙ্কা আর ব্যাকুলতা বেড়ে যেতে লাগল। প্রতিক্ষণেই ক্রন্দনের রোল বাতাসে বেজে উঠছে। সকলেরই ঘরে হাহাকারের বিলাপ-আর্ত্তনাদের মর্ম্মভেদী চীৎকার।

শিরোমণি মশাই স্বস্তেন করে কালী বাড়ী থেকে ফিরছিলেন অন্তরে অতি দুশ্চিন্তা পুষে, না জানি বাড়ী গিয়ে তিনি সতীকে কি ভাবে দেখবেন।

গাছের ফাঁকে ফাঁকে বৈকালের রৌদ্র ঝক্‌মক্ কর্‌ছে। বিদায়ের ব্যাপকতা যেন এদেরও অন্তরে এসে পুঞ্জীভূত হয়ে জমে উঠেছে। চক্রবর্ত্তী মশাইয়ের রাঙচিতার বেড়া হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে পুকুরের পাড়ে। দেখবে কে? স্বার্থপর হয়ে উঠেছে গ্রামবাসীরা এতদূর যে, নিজেকে নিয়েই সকলে জ্বালাতন; বিব্রত হতে গাঁয়ের জন্যে কেউ আর চায় না। অথচ এই গ্রাম একদিন ব্যথিতের অশ্রুজল মুছাতে এতটা অগ্রণী ছিলো যা সচরাচর আমরা ধারণা করতে পারি না। এইতো সেদিনের কথা—

শিরোমণি মশাই ঠাকুর বাড়ীতে বসে শাস্ত্র চর্চ্চা করছিলেন সশিষ্যে। বেদেদের সেই ছেলেটা ছুটে এসে সিঁড়িতে লুটিয়ে পড়লো—ব্যথায়-ভেজা অপরাজিতার মতো।

শিরোমণি মশাই দৃষ্টি ফিরিয়ে তাকে বল্‌লেন, "আবার কি কর্‌তে এলি মংলু?"

"ঠাকুর মশাই! ডালিয়া, ডালিয়া আর নেই!" প্রখর রৌদ্রে সূর্য্যমুখী যেমন আনত হয়েও সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ওঠে, সূর্য্যের দিকে মুখ বাড়িয়ে তেম্নিভাবে মংলু শিরোমণি মশায়ের দিকে ফ্যাকাশে মুখখানা তুলে ধরে বললে, "কাজে গেসলুম—" সে ধপাস্ করে সিঁড়িতে আছড়ে পড়লো।

শিরোমণি মশাইয়ের চোখ দুটো যেন সবাক হয়ে উঠলো। "চ', কি হয়েছে দেখে আসি। নেশা করে করে তোর মতিভ্রম হয়েছে।"

"ঠাকুর মশাই, মুন্নুয়াকে এনেছিলুম। তার মতো অত বড় ওঝা আমাদের এ গ্রামে আর নেই।"

শিরোমণি মশাই ব্যগ্রতা সহকারে বল্‌লেন, "কি বল্‌লি, তাকে সাপে কামড়েছে? সাপে—সাপে—"

শিষ্যরা বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, "করচেন কি শিরোমণি মশাই। জাতে বেদে অস্পৃশ্য—"

"শ্রীগৌরাঙ্গদেবের মর্য্যাদা তো তাহলে থাকে না ভায়া? এযে তাঁরই দেশ, তাঁরই লীলাতে এর প্রতিটি কণা পর্য্যন্ত পবিত্র।"

শিষ্যদের মধ্যে একটুখানি আন্দোলনের ভাব দেখা দিলো। তিনি গেয়ে উঠলেন,—

"প্রচারিত হেথা প্রেমের ধর্ম্ম মুক্তির পথ পরমা প্রীতি।
অযুত কণ্ঠে অগণিত কবি গাহিয়াছে হেথা প্রেমের গীতি॥
মঙ্গলময়ী বঙ্গজননী স্নেহ উচ্ছলা বরদা বেশ
এযে ভারতীর কমলকুঞ্জ এযে গো শান্তি প্রীতির দেশ॥"

প্রখর সূর্য্য-দীপ্তিতে কখনো পাষাণকে গল্‌তে দেখিনি। সাম্য, মৈত্রী ও বিশ্বজনীন বিশ্বকে আলিঙ্গন কর্‌তে এই প্রথম দেখলুম!

সদল বলে শিরোমণি মশাই মংলুর পেছন পেছন চল্‌লেন।

রাস্তায় যেতে যেতে বর্ষার নাচন সুরু হলো। সবুজ পাতায় জলবিন্দুগুলি যেন সোহাগে ঝরে পড়ছে, চুম্বনের রক্ত রাগ রেখা এঁকে দিয়ে যাচ্ছে এদের ললাটে এদের সীমান্তে।

সেই মাঠ, দিগন্ত প্রসারিত যার বাহু, সেই বন, অনন্ত প্রবাহিত যার করাল ছায়া—অতিক্রম করে তাঁরা সকলে সেই অনাদৃত পল্লীর সেই অনাহুত কুটীরখানির সাম্নে এসে দাঁড়ালেন।

মংলু বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ডাকলে, "ডালিয়া, বোনটি আমার ওঠ। দেখ্ দেখ দুয়ারে আজ দেবতা—দেবতা।"

বৃষ্টির স্তব্ধহারা ভাষা যেন কথা কয়ে' উঠ্‌লো।

শিরোমণিমশাই ডালিয়ার শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া নিরীক্ষণ করবার পর হতাশার সুরে বল্‌লেন, "ডালিয়া ছেড়ে গেছে তোকে মংলু।"

মংলু ব্যাকুল হয়ে ডালিয়ার প্রাণহীন দেহটাকে তার দুই বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরে বল্‌লে, "না—না কিছুতেই দেবো না ডালিয়াকে নিয়ে যেতে।"

এ তো সেদিনের কথা—

তারপর কেটে গেছে তিনটে বছর নির্ব্বিঘ্নে আর সতেজে। প্রকৃতিতে আগমনীর সংবাদ ছড়িয়ে পড়েছে দিকে দিকে। গ্রাম উজাড় হ'তে চল্‌লো। আজ আর শিরোমণি মশাই পাড়া পড়শীর কারুর পানে তাকাতে পারলেন না। ঘরে ঘরে মৃতদেহ সংকার করবার লোকাভাব।

হন্ হন্ করে' শিরোমণি মশাই ঘরে ঢুক্‌লেন। কোনদিকে তাকাবার তাঁর অবসর ছিল না।

সতীকে তিনি নির্জ্জীব অবস্থায় দেখে মার পূজা দিতে গেম্‌লেন। মার অনুগ্রহ থাক্‌লে কেউ কিছু করতে পারবে না। ডাক্তার-বৈদ্য তিনি তাই না দেখিয়ে মা'র চন্নমেত্তরের ওপর নির্ভর করে' সতীকে নীরোগ করাই ছিলো তাঁর ঐকান্তিক বাসনা।

"মা, এই চন্নমেত্তর টুকু খেয়ে ফেলো"—কুণ্ঠিত হয়ে শিরোমণি মশাই বল্‌লেন।

সন্ধ্যের অস্পষ্ট অন্ধকারে তিনি মেয়ের গলায় মা'র প্রসাদী চন্নমেত্তর ঢেলে দিলেন। তারপর অনেকক্ষণ তিনি মেয়ের শিয়রে বসে রইলেন।

রাত্রি ঘনিয়ে এলো। অন্ধকারের অন্তরালে তিনি মুখ ঢেকে বসে থাকতে পারলেন না। প্রদীপ জ্বেলে এনে তিনি কুলুঙ্গিতে রেখে দিলেন।

সতী নিথর হয়ে' শুয়ে আছে।

পুনরায় চন্নমেত্তর দিতে গিয়ে শিরোমণি মশাই একটু শিউরে উঠলেন।

"সতী-মা—"

প্রদীপের ক্ষীণ শিখা কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো।

"মা—কথা কও"—।

সতী চলে গেছে—সতীলোকে। দেনা-পাওনা মিটিয়ে সে সুরু করেছে যাত্রা—দরকার হবে না কারুকে তার সহযাত্রীরূপে।

রাত্রি ঝিমিয়ে পড়েছে, থম্ থম্ করছে চারিদিক। কিছুক্ষণ আগেই এক পশ্‌লা বৃষ্টি নেমে শেষ করে' দিয়েছে তাদের ঝর্ণার গান। রাত্রিতে শিরোমণি মশাই সতীকে কোলে করে' শ্মশানমুখো চল্‌লেন।

অনির্ব্বাণ শিখা জ্বলছে শ্মশানে। কবে যে এর অবসান হ'বে তা' অজ্ঞাত—গ্রামবাসীদের সবাইয়েরই।

চিতায় শুইয়ে দেওয়া হ'লো সতীকে।

ভোরের সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ হয়ে গেলো। ধরিত্রী থেকে শেষ স্মৃতিটুকু চিরতরে মুছিয়ে দিয়ে শিরোমণি মশাই গ্রামের পথে ফিরলেন ভগ্নদেহ ও অবসন্ন অন্তর নিয়ে। সহসা পিছন থেকে কে যেন জোর গলায় ডাকলে—"বাবা।

কেউ নেই—ভোরের বাতাস হু হু করে' দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে গাছের কিশলয়গুলিকে দোলা দিয়ে যাচ্ছিল।

তিনি আনমনে চলছিলেন আর নিরর্থক ব'লে যাচ্ছিলেন, "মা আজ তুমি কোথায়? কেন তুমি চলে গেলে? আমার ওপর অভিমান ক'রে কি অতদূরে চলে যেতে হয়? কখনও যে তোমায় অনাদর করিনি মা। তবু তুমি চলে গেলে; গেলেই যখন এই বুড়ো বাপকে নিয়ে গেলে না কেন? তাকে দেখবে কে? তোমার চোখের দু'ফোঁটা অশ্রুজল আমার জীবন পথের কত বড় অভিশাপ বলে যে মনে হ'তো তা তুমি বুঝবে না; তাই তোমার দু'ফোঁটা চোখের জল কখনও সহ্য করতে পারিনি। তাই—তাই কি মা তুমি চলে গেলে"!......উদভ্রান্তের মতো আরও কত কি মনে মনে বলছিলেন কিন্তু হঠাৎ করুণ আর্ত্তনাদে তাঁর চিন্তার সূত্র ছিন্ন হ'য়ে গেলো। তিনি চেয়ে দেখ্‌লেন, বাগ্দীপাড়ায় বিনু বাগ্দীর ঘরের নিকট হতে কান্নার অবিরাম সুর ভেসে আস্‌ছে। ব্যাথার বাষ্পে তাঁর চক্ষু ঝাপ্‌সা হ'য়ে এলো। মনে মনে বল্‌লেন, "যাই বাগ্দী বৌয়ের অবস্থাটা ভাল ছিল না, দেখে আসি"। গৃহমধ্যে এসে তাঁর সর্ব্বশরীর শিউরে উঠলো। ক্ষণিক তিনি স্তব্ধ হ'য়ে রইলেন। হা ঈশ্বর! একটী দীর্ঘশ্বাস তাঁর হৃদয় বিদীর্ণ করে বের হ'লো, দেখ্‌লেন—বাগ্দীবৌ মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে, তার পাশেই বিনু বাগ্দীর মৃতদেহ। দেখে মনে হয়—যেন সদ্যই চলে গেছে, পায়ের ছাপ এখনও স্পষ্ট। ওদের মধ্যস্থলে দেড় বছরের শিশুটি শায়িত অবস্থায় কাঁদছে। মৃত্যু শীঘ্রই এই সরল শিশুটিকে আপনার নির্ম্মম হস্তে গ্রহণ করতে দ্বিধা বোধ করবে না। সেই করুণ দৃশ্য দেখে শিরোমণি মশাই হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। বন্যা নাম্‌লো তাঁর চক্ষু হ'তে। প্রকৃতির তাণ্ডবলীলা আরম্ভ হ'য়েছে; তাহার সহিত বর্ষার নৃত্য। ঝড় ও বৃষ্টির যেন আজ প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়েছে। দু'জনেই জয়ী হতে চায়, পরাজয় স্বীকার করতে কেউই ইচ্ছুক নয়।.........

অনেক বছর কেটে গেছে। পরিবর্ত্তন অনেক হয়েছে। আজ প্রায় দু'মাস থেকে আশীষ ক্রমাগত ভুগ্‌ছে। বৃদ্ধের মন এক অজানা আশঙ্কায় পূর্ণ। সতী তাঁকে ছেড়ে চলে গেছে', আশীষেরও অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। তবে কি সেও......না-না দেবতা কি এতই নিষ্ঠুর।.. ...

অনেক দিন আগের একটা রাত্রি আবার ফিরে এসেছে। ঝড়ো বাতাস মাতাল হ'য়ে বইছে। সেই শ্মশান থেকে ফেরবার পথ,...শিরোমণি মশাই একলা ফিরছেন।

আজ এই দুর্দ্দিনে অবশ্য কোন ব্রাহ্মণই একটা ব্রাহ্মণের ছেলেকে সংকার করতে

দিয়ে একাই নির্জ্জন পথে তাঁর জীবনের দ্বিতীয় অবলম্বনকে জাহ্নবীর বক্ষে বিসর্জ্জন দিয়ে এসেছিলেন।

গড়িয়ে গেলো একটা মাস্ আস্তে আস্তে। শরৎ এলো, পূজার বাজনা বেজে উঠেছে জমিদার বাড়ীতে।

শিরোমণি মশাই বেঁচে থেকেও বেঁচে নেই। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শোকের ঝড়টা তাঁকে ঘিরে আচ্ছন্ন করে' রেখেছে, মড়কের বছর এখন আর কেউ মনে রাখেনি, বিস্মৃতির অতল তলে তলিয়ে গেছে সমস্ত ব্যথায় ঝরা স্মৃতি। কিন্তু সতী এখনও শিরোমণি মশাইয়ের মন থেকে মুছে যায়নি। আকাশের ঐ ধ্রুবতারার ন্যায় প্রতিনিয়তই সে তাঁর হৃদয় আকাশে জ্বল্ জ্বল্ করে জ্বলে থাকে। তিনি শত চেষ্টা করেও তাঁর প্রদীপ্ত প্রতিমাকে বিসর্জ্জন দিতে পারলেন না।

বিজয়া দশমী। ..

অন্তরে ছাপিয়ে উঠেছে সবাইয়ের আনন্দের ঢেউ, অসারতা সকলের গেছে কেটে। বিকেল হ'তেই সবাই ঘাটে গিয়ে প্রতিমা , বিসর্জ্জন দেখতে ছুটলো। শিরোমণি মশাইও গেলেন।

সবই নিয়মিত ভাবে চলে যাচ্ছে, বিঘ্ন আনছে কেবল শিরোমণি মশাইয়ের চিন্তার ধারা, আজ সতী থাক্‌লে তিনিও তাকে প্রতিমা বিসর্জ্জন দেখিয়ে আনতেন।

ঘাটে জনারণ্য।

শিরোমণি মশাই ঘাটের সিঁড়িতে বসে' মনে মনে কত কি যাজ্ঞা কর্‌চেন, সন্ধ্যের পাৎলা অন্ধকার ঘন হ'য়ে এলো, পরিচিত মুখগুলো অপরিচিতের বেদনায় মুখরিত হ'য়ে উঠ্‌লো, দু'একটী প্রতিমা বিসর্জ্জিত হ'লো। শান্তি বারি মাথায় তুলে নিয়ে অনেকে অভিভাষণের পালা সুরু করে দিলো।

হঠাৎ আলোর ঝল্‌কানি যে মানুষকে এতখানি উতলা, এতখানি মর্ম্মাহত ক'রে দিতে পারে, তা আগে জানা ছিল না। জেনে নিলুম শিরোমণি মশাইকে দেখে। ঘাটের পাশের চিতা দাউ দাউ করে' জ্বলে উঠ্‌লো। মৃত ব্যক্তির কাঁদবার কেউ নেই—পরিচিত কেউ নেই বোধ হয়। তাই শ্মশানের চিরসাথী ডোমটী তার শেষ কাজ সম্পন্ন করে দিয়ে যাচ্ছে। আগুনের শিখার উত্তপ্ত দীপ্তিতে সকলের মুখ ফর্সা হয়ে উঠ্‌লো। চিতার মধ্যে চিরনিদ্রায় শুয়ে সেই বেদেদের ছেলে মংলু।

এত বড় পৃথিবীতে ওর কাঁদবার কেউ নেই। ভীড় হারিয়ে গেলো সময়ের সহযোগে টুক্‌রো টুকরো হ'য়ে চারিধারে। শিরমণি মশাই তখনও বসে আছেন।

চিতার শেষ রশ্মিটুকু মিলিয়ে যাবার আগে বর্ষার নাচন সুরু হ'লো। বিসর্জ্জনের বাজ্‌না বেজে উঠ্‌লো, প্রকৃতির চোখের জলে তার চিতাগ্নি নির্ব্বাপিত হ'লো।

শিরোমণি মশাই বাড়ী ফেরবার পথে কেবল এই কথাটাই ভাবছিলেন। আজ জীবনের এই অকাল সন্ধ্যার ধূসর অন্ধকার আমাকে পূর্ণগ্রাস করতে চারিদিক হ'তে ঘনিয়ে আসবে কবে? হে ভগবান! এ তুচ্ছ জীবনের আদি অন্ত একি নিষ্ফল রহস্যে পরিপূর্ণ।

আকাশে মেঘ গর্জ্জে উঠ্‌লো। শিরোমণি মশাই দুহাতে মুখ ঢেকে চীৎকার করে' বলে উঠ্‌লেন, "হে ভগবান! তোমার বিসর্জ্জনের বাদ্যে আমার হৃদ্‌কম্প হয় না কেন? ইচ্ছে হয়, তোমারই প্রতিধ্বনির সঙ্গে মিশে যাই।"

রাস্তায় তখন বিসর্জ্জনের বাজ্‌না বাজিয়ে জমিদার বাড়ীর ঢুলির দল নেচে নেচে ফির্‌ছিলো।

সদ্গোপ যুবক সঙ্ঘের নবম বার্ষিক কার্য্যবিবরণী

১৯৩৫ সাল

[শ্রীললিত মোহন কুমার]

পরম কারুণিক শ্রীভগবানের কৃপায় সদ্গোপ যুবক সঙ্ঘ আজ নবম বর্ষ অতিক্রম করিয়া দশম বর্ষে পদার্পণ করিতেছে;—এজন্য তাঁহার শ্রীচরণে প্রণাম করিতেছি।

নবম বর্ষ সদ্গোপ যুবক সঙ্ঘের একটি গৌরবমণ্ডিত বৎসর না হইলেও, ইহা বৃথা যায় নাই। এই বৎসরে সংখ্যায় অল্প হইলেও, সঙ্ঘ যে কয়েকটি কার্য্য করিয়াছে তাহা এরূপ সুষ্ঠুভাবে ও সাফল্যের সহিত সুসম্পন্ন করিতে পারিয়াছে যে, তদ্দ্বারা অনেক স্বজাতীয় ভদ্র-মহোদয়গণ সঙ্ঘের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হইয়াছেন এবং সঙ্ঘের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন। ইহা যে কয়েকজন সুদক্ষ কর্ম্মীর ত্যাগ এবং আপ্রাণ চেষ্টার ফল তদ্বিষয়ে কোনও মাত্র সন্দেহ নাই।

আলোচ্য বর্ষে যুবক সঙ্ঘ স্ব-সম্প্রদায়ের কল্যাণ-সাধন-কল্পে আরও অধিক কার্য্য করিতে পারিত, কিন্তু নানা কারণে তাহা সম্পাদন করিতে পারা যায় নাই। তন্মধ্যে প্রধান কারণগুলি

ও (৩) অর্থাভাব। প্রথমোক্ত অভাবটির অপনোদন হইলে, অপর দুইটি অভাবের সম্পূর্ণ নিরাকরণ না হউক, বহুল পরিমাণে লাঘব হইবার সম্ভাবনা আছে। গত বৎসরের কার্য্যবিবরণীতে নূতন কর্ম্মী সংগ্রহের বিষয় যেরূপ আলোচিত হইয়াছিল, তদনুযায়ী কিয়ৎপরিমাণে কার্য্য হওয়াতে আলোচ্যবর্ষে কয়েকজন উদারপ্রাণ যুবক সঙ্ঘের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন এবং তাঁহাদের প্রায় সকলেই স্বজাতির উন্নতি-বিধায়ক কার্য্য করিতে আগ্রহান্বিত। কিন্তু স্থানাভাব বশতঃ, তাঁহাদের সকলকে লইয়া সুশৃঙ্খলে কার্য্য করিতে পারা যাইতেছে না। যদি তাঁহাদিগকে নিয়মিতভাবে কার্য্য করিবার সুযোগ ও সুবিধা প্রদান করা হয়, তাহা হইলে অচিরে কর্ম্মীর সংখ্যা ও তৎসহ কর্ম্মপরিসর বিশেষরূপে বৃদ্ধি পাইয়া সঙ্ঘ আপন মহান্ উদ্দেশ্য সাধন করিতে অধিকতর অগ্রসর হইবে। আর, বর্ত্তমানে স্বজাতির সাধারণে সঙ্ঘের প্রতি ক্রমশঃ যেরূপ সহানুভূতিসম্পন্ন ও সাহচর্য্যদানে আগ্রহশীল হইতেছেন, তাহাতে কিঞ্চিৎ অধিক সংখ্যক কর্ম্মী লইয়া কর্ম্ম করিতে পারিলে অর্থাভাব অনেকাংশে বিদূরিত হইতে পারে আশা করা যায়। এই প্রকার আশা করা নিতান্ত অমূলক কল্পনাপ্রসূত নহে ;—ইহা প্রকৃত সত্য। কারণ, যে সঙ্ঘ কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য স্বতন্ত্র কোন স্থান না পাইয়াই, আপন অস্তিত্ব সগৌরবে বজায় রাখিয়া, আপন কর্ম্মপ্রতিভার প্রকৃষ্ট প্রমাণ স্বজাতির সকলের নিকট প্রদর্শন করিয়াছে, সেই সঙ্ঘ যদি নিজ কর্ম্ম সম্পাদন করিবার জন্য সুবিধাগত একটু স্থান পায়, তাহা হইলে উহা স্বজাতির কল্যাণ সাধনে কতদূর অগ্রসর হইতে পারে, তাহা অধিক বুঝাইয়া বলা নিষ্প্রয়োজন।

স্বজাতির কল্যাণ-সাধন করিতে হইলে, উহার সকল অভাব ও অভিযোগ এবং সকল আশা ও আকাঙ্ক্ষা সমাধান করিতে অগ্রসর হওয়াই কর্ত্তব্য। কিন্তু স্বজাতির বর্ত্তমান অবস্থা যেরূপ শোচনীয়, তাহাতে উহার অভাব-অভিযোগ ও আশা-আকাঙ্ক্ষা অপরিমেয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার কথঞ্চিৎ সমাধান করিতে হইলে প্রভূত অর্থ ও সামর্থ্যের প্রয়োজন। সদ্গোপ যুবক সঙ্ঘের বর্ত্তমানে সেরূপ অর্থ ও সামর্থ্য নাই। শ্রীভগবানের কৃপায় যদি কোনদিন এই সঙ্ঘ সে শক্তির অধিকারী হয়, তাহা হইলে, আশা করি সঙ্ঘ স্বকর্ত্তব্য সাধনে পশ্চাদ্পদ থাকিবে না। বর্ত্তমানে আপন ক্ষুদ্র শক্তি অনুয়ায়ী সঙ্ঘ আলোচ্য বর্ষে যে সকল কার্য্য করিয়াছে ক্রমে ক্রমে তাহার আলোচনা করিতেছি।

কার্য্যনির্ব্বাহক ও বিভাগীয় সমিতিসমূহের অধিবেশন :—

এই বৎসরে বহু কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা, পত্রিকা পরিচালক

প্রতিযোগিতা শাখা সমিতির সভা, নাট্যাভিনয় শাখা সমিতির সভা এবং সঙ্গীত ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতার সভার অধিবেশন হয়। উক্ত অধিবেশনগুলিতে যুবক সঙ্ঘ ও সঙ্ঘের শাখা সমিতিগুলির এবং স্বজাতি উন্নতি বিধায়ক নানা বিষয়ের পরিকল্পনা ও আলোচনা হয় এবং অনেকগুলি প্রস্তাবও গৃহীত হয়।

সদ্গোপ পত্রিকা :—বর্ত্তমান যুগে সমাজ সেবাব্রতে যাঁহারা ব্রতী, তাঁহাদের পক্ষে সামাজিক পত্রিকা প্রকাশ অপরিহার্য্য। এ যুগে দ্রুত যান-বাহনের, মুদ্রাযন্ত্রের এবং ডাক ও তার বিভাগের উপকারিতা গ্রহণ করিয়া বৃহত্তরভাবে সমাজ সংগঠন ও সেবা করিবার মহাসুযোগ সমুপস্থিত হইয়াছে। পত্রিকা প্রকাশের দ্বারা এই সুযোগ গ্রহণ না করিলে, বর্ত্তমান-যুগের পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতে হয়। পত্রিকা প্রকাশের দ্বারা দূর-দূরান্তের দেশ-দেশান্তরের স্বজাতীয় জনসাধারণের মধ্যে ঐক্য স্থাপন সহজ হইয়া পড়ে—বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন প্রকারের অভাব অভিযোগ প্রভৃতির বিষয় সকলে জানিবার সুযোগ পায় এবং সেগুলির সমাধানের নিমিত্ত নানা মত ও পথের আলোচনা ও প্রচার কার্য্য চলিতে পারে ;—অধিকন্তু ইহার দ্বারা লেখক-লেখিকা সৃষ্টি, সামাজিক ইতিহাস সৃষ্টি, সুসাহিত্য ও শিক্ষা প্রচার প্রভৃতি নানা কার্য্যে সহায়তা হইয়া থাকে। এই সকল প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া সদ্গোপ পত্রিকার পরিচালনা ও উন্নতির কার্য্যে আমরা আমাদের শক্তি, অর্থ ও সময়ের অধিকাংশই ব্যয় করিয়াছি। সদ্গোপ পত্রিকা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক উন্নত হইয়াছে,—ইহা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছেন, এমনকি কেহ কেহ অযাচিতভাবে প্রশংসাপত্র পর্য্যন্ত দিয়াছেন। বিশেষতঃ ইহার 'স্বাস্থ্য' ও 'মহিলা' সংখ্যাদ্বয় এরূপ সর্ব্বজন-সমাদৃত হইয়াছে যে, কেবল স্বজাতির নহে, অপর জাতির ভদ্র-মহোদয়গণও পুনরায় কবে ঐ সংখ্যাদ্বয় প্রকাশিত হইবে তাহা জানিবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। তবে, একথা অস্বীকার করি না যে, পত্রিকা প্রকাশ করিতে মধ্যে মধ্যে বিলম্ব ঘটিতেছে। কিন্তু তাহা আমাদের কোন প্রকার বর্ত্তমান কর্ম্মদোষের জন্য হইতেছে না ;—এইরূপ ঘটিবার প্রথম কারণ হইতেছে আমাদের পূর্ব্বোক্ত স্থানাভাব এবং দ্বিতীয় কারণ হইতেছে গ্রাহক ও বিজ্ঞাপনদাতৃগণের সংখ্যাল্পতার জন্য অর্থাভাব। পূর্ব্বে পত্রিকাখানি অনিয়মিতভাবে পরিচালিত হওয়ার জন্য এবং তৎপরে লুপ্ত হওয়ার জন্য এই অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। সুখের বিষয়, আলোচ্য বর্ষে পত্রিকার গুণের পরিচয় পাইয়া বহু ভদ্রমহোদয়গণ ক্রমে ক্রমে ইহার গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতেছেন এবং আশা করা যায়—এইভাবে পত্রিকা আরও

নাট্যাভিনয় ঃ—গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী কলেজ ষ্ট্রীটস্থ 'ওয়াই-এম্-সি-এ'র ওভারটুন হলে সদ্গোপ পত্রিকা ভাণ্ডারে সাহায্যকল্পে সদ্গোপ যুবক সঙ্ঘের নাট্যাভিনয় অনুষ্ঠিত হয়। 'দত্তা' ও 'হিতে-বিপরীত' নামক দুইখানি নাটক অভিনীত হইয়াছিল। অভিনয়ের দিক দিয়া ইহা যে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইবাছিল তাহা দর্শক মণ্ডলীর সকলেই স্বীকার করিয়াছিলেন এবং তখনকার অনেক পত্রিকা ও সংবাদপত্রে ইহার সুখ্যাতিপূর্ণ সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল।

সঙ্গীত ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা ঃ—বিগত ৩রা নভেম্বর এলবার্ট ইনষ্টিটিউট হলে তদানীন্তন বঙ্গ ও আসাম প্রদেশের টেলিগ্রাফ বিভাগের ডিরেক্টর স্বজাতিবৎসল শ্রীযুত হৃষীকেশ সুর মহাশয়ের সভাপতিত্বে সদ্গোপ যুবক সঙ্ঘের পঞ্চম বার্ষিক সঙ্গীত ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতাটী এরূপ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল যে, এলবার্ট হলের সুপ্রশস্ত গৃহটী প্রায় সাত ঘণ্টা কালব্যাপী অনবরত স্বজাতীয় ভদ্রমহোদয়গণ ও ভদ্রমহিলাবৃন্দের দ্বারা জনাকীর্ণ হইয়াছিল। এই প্রতিযোগিতাটী সম্বন্ধে স্বমত প্রকাশ না করিয়া মাননীয় সভাপতি মহাশয়ের অভিমতের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ঃ—

"………শিক্ষার দিক ছাড়া, মধ্যে মধ্যে এই রকম অনুষ্ঠানের দ্বারা সমস্ত স্বজাতি বালক ও যুবকগণের একত্র সম্মিলন সামাজিকতার দিক দিয়ে আরও বেশী মূল্যবান্। একথা জেনে আমার মন গর্ব্ব, আশা ও আনন্দে উৎফুল্ল হ'ল যে, আমাদের যুবকগণ নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা, পরমতসহিষ্ণুতা, বাধ্যতা, শৃঙ্খলারক্ষা, ভ্রান্তি-ত্রুটী উপেক্ষা ক'রে অপরের গুণ গ্রহণ, বৈষম্যের মধ্যে সাম্যকে প্রাধান্য প্রদান, সুসংযত ব্যবহার, আলাপ, দায়িত্ব সম্পাদন, লোকাচার শিক্ষা, প্রভৃতি বিবিধ মনুষ্যোচিত কর্ম্ম ও নীতির সাধনা করবার জন্য স্বজাতির সকলকে একসঙ্গে সম্মিলিত ক'রতে চায় এবং এই উদ্দেশ্য নিয়ে বিভিন্ন রুচির লোকদের আকৃষ্ট করবার জন্য সঙ্গীত ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, পত্রিকা প্রকাশ, ক্রীড়া, নাট্যাভিনয়, শিল্পকলা প্রদর্শন, লোকসেবা, ধর্ম্মশিক্ষা এবং নানাপ্রকার সামাজিক উন্নতিকর কার্য্যের অনুষ্ঠান ক'রতে ব্রতী হয়েছে।"

বিবাহের পাত্র-পাত্রীর সন্ধান ঃ—এই কার্য্যটী আমরা এই বৎসরে নূতন আরম্ভ করিয়াছি ; সুতরাং এই বিষয়ে বলিবার মত বিশেষ সময় এখনও আসে নাই। তবে এই মাত্র বলিতেছি যে, এই নূতন কার্য্যের দ্বারা স্বজাতির অনেক কষ্ট লাঘব হইবে ; কারণ পাত্র-পাত্রী নির্ব্বাচন বিষয়ে প্রায় সকলেই কিছু না কিছু কষ্টে পড়েন ; বিশেষতঃ, স্বজাতির মধ্যে ঘটক সংখ্যা খুবই অল্প।

পরিশেষে আমি যাঁহাদের নিকট হইতে সঙ্ঘের কার্য্য করিবার নিমিত্ত সাহচর্য্য লাভ করিয়াছি তাঁহাদের সকলকেই ধন্যবাদ দান করিতে চাই। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র ঘোষ মহাশয় ও তাঁহার পরিবারবর্গের সকলকেই আমাদের গত নাট্যাভিনয়ের মহলা দিবার জন্য একখানি ঘর ব্যবহার করিতে দেওয়ায় ও তজ্জন্য তাঁহারা নানা অসুবিধা ভোগ করা সত্ত্বেও আমাদের নানারূপ সাহায্য দান করিয়া উৎসাহিত করার জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি। ওয়াই-এম্-সি-এর কর্ত্তৃপক্ষগণ সদ্গোপ পত্রিকার ভাণ্ডারে সাহায্যকল্পে নাট্যাভিনয় করিবার জন্য 'ওভারটুন হল' বিনা ভাড়ায় ছাড়িয়া দিবার জন্য তাঁহাদিদকেও ধন্যবান জ্ঞাপন করিতেছি। পত্রিকা ভাণ্ডারে অর্থ সাহায্য করিবার নিমিত্ত ৺ননীলাল পাল মহাশয়ের পুত্রকে ও শ্রীযুত জ্ঞানরঞ্জন রায় মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। যাঁহারা সঙ্গীত ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় পুরস্কারাদি দান করিয়াছেন তাঁহাদের সকলকেই ধন্যবাদ দিতেছি এবং সঙ্ঘের মাননীয় স্থায়ী সভাপতি মহাশয়কে, সহকারী সভাপতি মহাশয়গণকে ও আমার সকল সহকর্ম্মীদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

নূতন বর্ষে শ্রীভগবানের কৃপায় সঙ্ঘ অধিকতর উন্নতি লাভ করুক ইহাই আমার কামনা। শ্রীভগবানের শ্রীচরণে প্রণাম।

চতুর্ব্বর্গ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

তিন

[শ্রীশ্রীশচন্দ্র কুমার, এম-এ, বি-এল]

চতুরিকার ড্রইং রুম।

[ঘরখানি উগ্র বিলাতী ধরণে সাজানো। ঘরে প্রবেশ করিলেই প্রথমেই সাম্‌নে উপরে দেয়ালে টাঙ্গান রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের অয়েল পেন্টিং চোখে পড়ে। মনে ধাক্কা দেয়,—বিস্মিত মন বলিয়া ওঠে—ঈষ্ট ও ওয়েষ্ট কেমন সুন্দরভাবে মিশিয়াছে।

চতুরিকা একটী ইংরাজী গানের সুর গুন্ গুন্ করিতে করিতে ঘরের জিনিষপত্রগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া রাখিতেছিল ; এমন সময় রেখা প্রবেশ করিল।]

চতুরিকা—

এসো রেখা,

[দুইজনে ঘুরিতে ঘুরিতে নিম্নস্বরে কথা কহিতে লাগিল। তারপর দুইজনে একটী সোফায় বসিল।]

রেখা—

তুরিদি, সে দিন কৃষ্ণাদির বে'তে ত গেছ্‌লে—সবার চেয়ে কোন্ শাড়ীটা আর কোন্ জামাটা আপ-টু-ডেট, ইন্‌টারেষ্টিং বলে মনে হোল বলনা ভাই !

চতুরিকা—

আমার রেখা,—ভাল লেগেছিল কৃষ্ণার লাইট্ ব্লু রঙের শাড়ীখানি। কিন্তু ব্লাউজটা ভাল ম্যাচ্ করেনি। তা-ছাড়া জামাটার হাতাগুলো আরও একটু খাটো হলে ভাল মানাতো। তুই সেই বোসেদের রোগাটে মেয়ের জামাটার ছাঁট কাট দেখেছিলি ? আমার বেশ ভাল লেগেছিল ভাই। বিশেষ করে তার হাত নেই বল্‌লেই হয়, অথচ কেমন সুন্দরভাবে তার হাত দুটীর সাবলীল ভঙ্গীটি বজায় রেখেচে।

রেখা—

না, গলাটা বুকটার কাছে যেন বড্ড বেশী খোলা—বেহায়া বেহায়া মনে হয়। আচ্ছা তুরিদি ও-রকম হাতা না থাকাটা আমার ভাল লাগে না। মেয়ে মানুষের কাছে তা রহস্য হয়ে ওঠে ! আর মেয়েদের সাজ-সজ্জা সে ত পুরুষ ভোলানোর জন্যে—একথা নিশ্চয় মেয়েরা মনে মনে স্বীকার কর্‌বে। আমি বলি তুরিদি, আগেকারের সেই ফুল হাতা কব্জি পর্য্যন্ত জামা আর নানা

রকম লেস্ কোঁচ দেওয়া বডিস্ ইত্যাদি পর্‌লে মেয়েদের মানাবে ভাল। আর এখন এই যে জামার সৃষ্টি হচ্চে, যাতে করে আমাদের দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রত্যেকটী নিখুঁত ভাবে পুরুষদের চোখের সাম্‌নে ধরে দেবার ভীষণ প্রতিযোগিতায় প্রত্যেক ফ্যাসানের পর নূতন ফ্যাসান দর্জ্জিরা বের্ কর্‌চে—আমি তো বলি, এর জন্যে একদিন মেয়ে মহলে নিশ্চয় পস্তাবে।

চতুরিকা—

বারে খুকি, তুই যে ভয়ানক একটা বক্তিমে দিয়ে ফেল্‌লি! পুরুষকে মেয়েরা শরীর দেখিয়ে ভুলোয়—একথা তোমায় কে বল্‌লে! আর তাই ঢেকে একটা লুকোচুরির সৃষ্টি কর্‌লে মেয়েদের ভাল হবে—এ বুদ্ধি তোর মাথায় কেমন কোরে ঢুক্‌লো! তুই না এই স্বাধীন যুগের, একবিংশতি যুগের দূত হোয়ে একথা কেন মেনে নিচ্চিস্ যে, মেয়েদের সবই পুরুষদের জন্যে। আমি তোকে ভেবে দেখ্‌তে বল্‌চি যে, না—তা নয়। মেয়েদের কি নিজের কোন প্রতিভা বা বুদ্ধি নেই, তারা কি পুরুষদের মতো তাই নিয়ে দিনরাত মেতে থাক্‌তে পারে না,—তাদের কি পাব্‌লিকের প্রতি কোন রেস্‌পন্‌সিবিলিটী নেই, তারা কি স্বার্থ-পরের মতো নিজের ঘর-কন্না ছাড়া আর কিছুই বুঝতে পারে না! কখনো না—নিশ্চয় পারে—একশোবার পারে! তাই আমি বলি—মেয়েদের পোষাক পরিচ্ছদ সবই মেয়েদের নিজেদের জন্যে। আগেকারের সব জবড়জঙ্গ পোষাক ছেড়ে দিয়ে সকলখোলা—সকলভোলা পোষাকের পৃষ্ঠপোষক সে হয়েচে নিজেদের সুবিধা ও স্বচ্ছন্দের জন্যে। তা-ছাড়া, এখনকার জামা, কম কাপড়ে তৈয়ারী হয়,—তাতেও লাভ।

রেখা—

তুমি তো এটাতে আপত্তি কর্‌তে পার্‌চ না যে, আমাদের শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গুলিকে পুরুষদের চোখের সাম্‌নে খুব স্পষ্টভাবে ও বেহায়াভাবে ফুটিয়ে তোলাই যখন দর্জ্জির উদ্দেশ্য,—তখন সেটা কি সাধু উদ্দেশ্য! না তাতে মেয়েদেরও এডিং-এ্যাবেটিং করা উচিত—ঐ সব জামার ডিম্যাণ্ড বাড়িয়ে দিয়ে! দেখ মেয়েরা স্বাধীন হোক্—লেখাপড়া শিখুক—ইক্‌নমিক্যালি ইন্‌ডিপেনডেন্ট হোক। কিন্তু সবই কিসের জন্যে—শুধু কি একটী প্রমীলার রাজ্য স্থাপনের জন্যে! কিন্তু ভুলোনা তুরিদি, যে, সেই প্রমীলার রাজ্যেও কবি অর্জ্জুনকে নিয়ে হাজির কোরেছিলেন—তবেই প্রমীলার রাজ্যে আনন্দের সাগর উথ্‌লে উঠেছিলো। সত্যি কিনা বলনা ভাই!

চতুরিকা—

দেখ রেখা, তুমি বাড়াবাড়ি কর্‌চ। পৃথিবীর চারিদিকে চেয়ে মেয়েদের স্বাধীনতার

বন্দুক ঘাড়ে করে প্যারেড্ করচে, এরোপ্লেনে উড়চে, সমুদ্রে সাঁতার কাটচে, ইউনিভারসিটিতে ফার্ষ্ট হচ্চে, অফিসে চাকরী সসম্মানে করচে। দেখ—তারা বিপদে পড়লে ডিভোর্স করচে, আবার নুতন স্বামী নিচ্চে, আবার কেউ বা সারাজীবন অবিবাহিতা থেকে দেশের-দশের কাজ করচে। হিন্দুর মেয়ে মুসলমান স্বামী বিয়ে করচে—মুসলমান শুদ্ধি হয়ে হিন্দু হচ্চে। তা ছাড়া, দেখ না, আজকালের পুরুষরাও ব্যাচিলার থাকচে! তবে মেয়েরা কি যেচে গুঁজে পুরুষদের ঘাড়ে পড়তে যাবে, না পুরুষদের পায়ে ধরে কাঁদবে যে, আমাদের দয়া করে বিয়ে কর—বিয়ে কর, বলে।

[চতুরিকা ক্রোধে কাঁপিতে লাগিল]

তবে ভগবান আমায় রক্ষা করুন—আমার যেন কোন দিন কোন বিবাহ বা পুরুষ-সঙ্গের প্রয়োজন না হয়!

রেখা—

তুমি তুরিদি, অবাক করলে যে! [রেখা বিস্ময় নাটিত করিল] তুমি কোন রকমের বিবাহেই রাজী নও? বিবাহ জিনিষটা বড় সেকেলে, না? মোটেই ফ্যাসানেবল্ নয়, এমন কি, এতে ষ্টাইলের গন্ধও নেই—এই ত বলতে চাও? তোমার মতে কি মেডিক্যাল ইনজেকসন দিয়ে ছেলে করে নিতে চাও?—না তুমি বলবে—ছেলেরই বা দরকার কি? বেশ ভাল কথা! তোমার মত মেনে নিলে এই দাঁড়ায় তুরিদি, যে, সংসারে পুরুষেরা থাকবে সমুদ্রের একপারে আর মেয়েরা থাকবে সমুদ্রের অপর পারে; আর কোন নৌকা, জাহাজ, এরোপ্লেন্ কিছু থাকবে না—এই ত?

[রেখা হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল। পরে একটু গম্ভীর হইয়া বলিল]

তাতেই বা কি লাভ! সেই চতুরিকা, রেখা, কৃষ্ণা, নন্দিনী, ইত্যাদি মিলে সেই ষ্ট্রগল্ ফর্ একজিষ্টেন্স্ এর মারামারি কাটাকাটি হবে। তাতে করে মেয়েরা পুরুষদের মত ভীষণ প্রকৃতির হ'য়ে উঠবে—পৃথিবীটা একটা রাক্ষুসীর দেশ হ'য়ে উঠবে। আচ্ছা, আমার গা ছুঁয়ে সত্যি ক'রে বলত তুরিদি,—ভগবান্ পুরুষদের কেনই বা সৃষ্টি করলেন তবে!

[রেখার চোখে মুখে বিজয়িনীর ভাব ফুটিয়া উঠিল]

[অলকা ও কৃষ্ণা গলা ধরাধরি করিয়া হাসিতে হাসিতে প্রবেশ করিল]

কৃষ্ণা—

চিতুদি, আমি তাই শ্বশুর বাড়ী থেকে কাল ফিরে এসেচি। তাই আজ তোমাদের দেখতে এলুম।

রেখা—

কৃষ্ণা, ভাই তোর মুখখানা বেশ হাসিখুসি, আর চোখ দুটোয় যেন ঘুম উঁকি মার্‌চে! —কিরে তোকে কি তোর বর একদিন ঘুমোতে দেয় নি? তুই বল্ না অলকা ভাই! সত্য যেন কৃষ্ণার মুখটা বেশ একটা আনন্দ-রহস্য-ভরা।

অলকা—

(হাসিতে হাসিতে) রেখা তো দেখচি একটা কবি হ'য়ে পড়েছে, তাই কি তুই কৃষ্ণার প্রেমে পড়বি ?

চতুরিকা—

কৃষ্ণার না কৃষ্ণার বরের ?

অলকা—

কি-রে রেখা,—কৃষ্ণার যেন বধূ-বিরহ হয়েচে—চোখে জলও ঐ হাসির পিছনে উঁকি মার্‌চে আমি তবে গাই—জয়দেবের গীত গোবিন্দ থেকে—

[অলকা গাহিল]

বহতি চ বলিত বিলোচন জলধরমানন-কমলমুদারং।
বিধুমিব বিকট বিধুন্তুদদন্তদলনগলিতামৃতধারং॥
বিলিখতি রহসি কুরঙ্গমদেন ভবন্তমসমশরভূতং।
প্রণমতি মকরমধো বিনিধায় করে চ শরং নবচূতং॥

অলকা—

তোমরা তো দেব-ভাষার বদলে দৈত্য ভাষার পূজারিণী। শোনো, বাংলা কোরেই গেয়ে শুনোই—

[অলকা গাহিল]

বদন কমল পরে আঁখিজল সদা ঝরে
আজি গুরু বিরহের ভরে গো!
বিরহিণী রাধা কাঁদে রাহুর দলনে চাঁদে
সুধা যেন অবিরল ক্ষরে গো॥
মৃগমদ রসে হরি! তব প্রতিকৃতি করি'
গোপনে যতনে আঁকে, যুবতী।
হাতে দিয়ে চূত শর পদতলে তারপর

অলকা -

কি গো, রেখা মিলিয়ে দেখ দেখি—ওর চোখে বিরহের জলটল দেখ্‌তে পাস্ নাকি।

[সকলে হাসিতে লাগিল]

চতুরিকা—

হাঁ বাপু অলকা, আজ রেখার চোখে কৃষ্ণাদের যুগল রূপের একটা ঢেউ মনের টেলিভিসনে এসে পৌছেচে। রেখা সিঙ্গিল ভালবাসে না—ও এখন মিক্সড্ ডবল্‌স্‌এর পক্ষপাতী হোয়ে উঠেচে। To compare great thing with small, রেখা দেশবন্ধুর দেশপ্রিয়ের মত "পুরুষবন্ধু" মহাস্ত্রী হয়েচে!

[হঠাৎ রেখা রাগ করিয়া মুখ ফিরাইয়া ঘুরিয়া বসিল ও বলিল]

রেখা—

I strongly protest.

[অলকা ও কৃষ্ণা আশ্চর্য্যের অভিনয় করিল]

চতুরিকা—

ও কি রাগ কর্‌লি ভাই ?

[রেখা সেইরূপ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, চতুরিকা, কৃষ্ণা ও অলকাকে চুপি চুপি স্বরে পূর্ব্বের কথাবার্ত্তার মর্ম্মটুকু শুনাইয়া দিল, রেখা উঠিয়া দাঁড়াইল]

কৃষ্ণা—

রেখা, কেন রে তুই যা বলেচিস্—আমার ত ঠিক বলেই মনে হয়। মেয়েদের কি দরকার খেটেখুটে মরে, ঘরের বাইরের ধূলা ময়লা নিয়ে নাড়াচাড়া করবার! পুরুষরা Beasts of burden—ওরা খাটুক, এনে দিক, আমরা মেয়েরা বসে বসে খাই। আমরা ঘরের ভিতরেরই মানুষ, আমরা ঘরের রাজত্বটাই চালাবারই training, tradition ও experience নিয়ে, মিছে বাইরের ব্যাঙ্কে, কলেজে, আপিসে চাকরীর বিড়ম্বনা ভোগ করে কি লাভ নিজেরাই বা কর্‌ব! বা তাতে Greatest good of the greatest number কি যে হবে,—তাতে আমার ত যথেষ্ট সন্দেহ—ভয় আছে।

[দাঁড়াইয়া রেখা বসিল]

রেখা—

না ভাই, রাগের কথাই বই কি! আমরা পুরুষদের যা বলেই ঠকাই বা পুরুষদের সামনে তাদের আমল দিতে না চাইলেও

আমার বিশ্বাস—উনি আমায় ঠাট্টা করে বলচেন। তুরিদি, নূতন কিছু সকল মজা দেয় না—যেমন পায়ের বদলে মাথা দিয়ে হাঁটা যায় না।

চতুরিকা—

তুই রেখা নেহাৎ ঠাকুমাদের যুগের,—সেই গরুরগাড়ীর যুগের ছিল আট বছরে গৌরীদান, তখন কুমারীরা করত শিবপূজা—আজকাল তারা ইন্‌ষ্টিউটের রঙ্গমঞ্চে স্বয়ং সাজেন শিব; এখন মানুষ একগাঁয়ে বসে জীবন কাটায় না,—চাকরী, ব্যবসা-বাণিজ্য করতে, বেড়াতে পড়তে, দেশ-বিদেশে কত জাতের মানুষের মধ্যে ঘোরাফেরা করচে—রেলগাড়ীতে, জাহাজে, এরোপ্লেনে চড়ে। তাতে করে পুরুষ মেয়ের মেলামেশার সুবিধা বেড়েচে,—তাই তাদের মনের মেলামেশার ফলে তাদের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি গেচে বদলে; এটা ত স্বাভাবিক; আচ্ছা রেখা! এতেও তোরা রেগে উঠচিস্ কেন?

রেখা—

তুমি কি বলতে চাও—স্পষ্ট করে বল।

চতুরিকা—

এখনকার তরুণীরা আর সেকেলে সতীলক্ষীর মত ঘরের কোণের আঁধারে বসে থাকতে রাজী না। তারা পুরুষদের সঙ্গে সব বিষয়ে সমান অধিকার চায়। তারা আজ কাল মিটিং করে, খবরের কাগজে লেখে যে, বিবাহপ্রথার কোন স্বার্থকতা নেই—ওটা কেবল নারীকে দাসী বানাবার কৌশল মাত্র। তরুণীদের মত,—নারীর প্রেম একজন পুরুষের চারিদিকে ঘুর-পাক খেয়ে পঙ্কিল হয়ে উঠ্‌বে কেন!—ভগীরথের গঙ্গার মত প্রত্যেক তৃষিত অধরে সুধার ধারা সিঞ্চন করবে না কেন?—আমি তো বলি রেখা তরুণরা এসব কথা সুস্থ শরীরে সবল মনে মেনে নেবে। তবে হয়তো বুড়োরা আঁৎকে উঠ্‌তে পারে, তাদের আমরা থোড়াই কেয়ার করি।

[চতুরিকার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠপ্রদর্শন; সে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। রেখা হতভম্ব হইয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। কৃষ্ণা মাথা হেঁট করিল—যেন লজ্জা করিতে লাগিল।]

অলকা—

দেখ চিতুদি, তোমার তরুণীরা টাকাকড়ি, লেখাপড়া, চাকরী-বাকরী, এমন কি বিবাহ-বিচ্ছেদ, ও পুনর্বিবাহ ব্যাপারে তারা যা চায় আমরা মেনে নিচ্চি। কিন্তু দোহাই তোমাদের,—তোমরা দয়া করে বিয়ে কর ও সন্তান প্রসব কর। না হলে পৃথিবী থেকে মানুষের নাম লোপ পেয়ে যাবে।

[অলকা হাসিতে লাগিল।]

চতুরিকা—

অসম্ভব! এ তরুণীরা ননীর পুতুল নয় যে, তোমাদের ঘ্যানঘ্যানানি ও প্যান-প্যানানীতে গলে যাবে। তবে দেখ্ অলকা, তোদের খাতিরে এই পর্য্যন্ত কন্‌সেসন্ করা যায়—"নব্যারা জননী হইতে গর্‌রাজী নহেন—তাঁহাদের আপত্তি গৃহিণিত্ব-ভার গ্রহণ কর্‌তে।"

কৃষ্ণা—

দেখ চিতুদি, প্রগতিশীলা জন কয়েক বিদুষীরা বিদ্রোহ পতাকা উড়ালে, চারিদিকের সমস্ত বাধা-বন্ধন কেটে ফেলে পাগলের মত ছুটোছুটী করে বেড়ালেই, কি সত্যিকারের মুক্তি পাওয়া যাবে! মেয়েরা যেন ক্রমেই তাদের জীবনের ছন্দ হারিয়ে ফেল্‌চে। মেয়েদিগের পুরুষের সহচারিণী হয়ে ঘর বাঁধতেই হবে—ঐখানেই তার প্রতিষ্ঠা—ঐখানেই তার সত্যিকারের স্থিতি। মেয়েরা কখনও বিধাতার সৃষ্টি উল্টোতে পার্‌বে না।"

[রেখা উঠিয়া দাঁড়াইয়া চলিতে আরম্ভ করিল—চলিতে চলিতে রাগ করিয়া বলিল।]

রেখা—

থাক্ তুরিদি! তোমার মত তোমারই থাক। তুমি জীবনে কখনো বিয়ে করোনা। পুরুষের সঙ্গে খেলা করেই, সমিত্ব করেই সুখী হয়ো।

চতুরিকা—

বেশ বাপু! বোঝা গেল যে, তোরা এখনো মডার্ণ হতে পারিস্‌নি।

[রেখা একটীও কথা না বলিয়া, একটীবারও না চাহিয়া চতুরিকাকে cut করিল। রেখার প্রথমে ও পরে অলকার প্রস্থান। কৃষ্ণা হঠাৎ শিহরিয়া উঠিয়া স্বামীর কথা স্মরণ করিল ও দ্রুতপদে চলিয়া গেল। চতুরিকা একা মাথা হেঁট করিয়া এদিক ওদিক পায়চারী করিতে লাগিল।]

চতুরিকা—

সত্যিই, এই পুরুষ-জাতের ওপর আমার এত রাগ কেন? এক এক সময় এর জন্যে নিজের ওপর রাগ হয়। সেই হতভাগা নীলাম্বরকে কি এখনও সত্যিই ভুলতে পারিনি! সে যে আমার চোখে কি সুরমাই লাগিয়ে দিলে,—আমার প্রাণে কি রংয়ের ছাপ লাগালে! —সেই চার বছর আগে (নত বিষণ্ণ চোখে অনেকটা নিজের মনে মনে) যখন সে পঞ্চাশ মাইল স্পীডে মোটর ছুটীয়েছিল সেই রাঁচিতে গোম্‌লার রাস্তা ধরে! সে কোন কথা বলেনি। তার ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুলগুলো উড়ে এসে পড়্‌ছিলো—লাগ্‌ছিল আমার চুলে, আমার গালে। তারপর সেই একবার আমার শাড়ীর আঁচলের কোণটা ঝড়ে উড়ে পড়্‌লো তার ষ্টিয়ারিংএর ওপর—সে তখন আস্তে আস্তে ...

চালাতে দেবে না। তুমি আমায়ও বেঁধেচ এখন দেখ্‌চি মোটরটাকেও বেঁধে-ছেঁদে আমায় খোঁড়া করে দিতে চাও।" আমি বলেছিলুম—"যাও তোমার ওসব বাজে কথায় দরকার নেই" সে তখন বলেছিলো—"ও তুমি বাজে কথা চাও না, তুমি কাজে দেখ্‌তে চাও"—এই বলে সে গাড়ীটা থামিয়ে ফেল্‌লে,—নিজের কপালের চুলগুলো সরিয়ে দিয়ে তার মুখটা রুমাল দিয়ে মুছে নিয়ে আমার মুখের দিকে খানিক্‌ক্ষণ চেয়ে রইলো অপলক দৃষ্টিতে। তারপর আমার মাথাটা তার সুন্দর সেই দুটো হাতের মধ্যে নিয়ে আমার চুলেতে একটা চুমো খেলে, বল্‌লে—এ গন্ধ কি এসেজ্‌ অব্‌ রোজেজ লোসনের ? আমি মাথা নেড়ে জানিয়ে দিলুম—"হাঁ"। তারপর আমি একটু অন্য দিকে চেয়েছিলুম হঠাৎ সে আমার ঠোঁটে চুমো খেলে প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে। উঃ সে কি জোর ! আমি কিছুতেই মুখ ছাড়িয়ে নিতে পারলুম না - তারপর সেই সেবার দেওঘরে বোম্পাস্‌ টাউনের সেই মাড়োয়ারীর বাড়ীর পেছনের খোলা মাঠ পেরিয়ে সেই যে বড় বড় পাথরগুলো পেরিয়ে দুজনে গেছলুম সেই বালির নদীর ধারে—কত কথাই সে বলেছিল, সবই ত আজ মনে আছে !—কিন্তু যাক্‌গে।

[চতুরিকা জোরে জোরে ঘুরিতে লাগিল।]

তারপর শেষ দেখা—সেবার থেকে দুজনে ছাড়াছাড়ি হোল। সে এসেছিলো ঘনিষ্ঠতা কর্‌তে আবার,—কিন্তু আমি তখন শুনেচি ওর ললিতা-নীলিমা-কাহিনী। নীল্‌দা ছেলে বেলার আমাদের পাড়ায় থাক্‌তো, আমার মা-বাবাকে 'মা-বাবা' বল্‌ত, আমাদের খুব স্নেহ যত্ন কর্‌ত। আট-দশ বছর আলাপের পর ইদানী তার সঙ্গে বের কথা মা একটু আধটু আলোচনা সুরু করেছিলেন—সেই সুযোগেই সে পেরেছিলো আমায় এম্‌নি কর্‌তে। যাক্‌গে এই শেষ বারের দেখাতে নিজেকে খুব সাম্‌লে নিয়েছিলুম। সহজভাবে দু'চার্‌টে কথার পর আমি স্পষ্ট বলে দিয়েছিলুম—"নীলদা তুমি আর এসোনা এখানে।" কিন্তু সে যখন আমার মুখের দিকে কাতরভাবে চাইলে—তখন ওর এটা ছলনা জান্‌লেও—আমার চোখ যেন ছল্‌ছলিয়ে উঠেছিলো, আমি দৌড়ে পালিয়ে গেলুম সে ঘর থেকে। তারপর সে চলে গেছ্‌ল আর কখনও আসে নি।

[চতুরিকা সোফায় বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। খানিকক্ষণ পরে একটু শান্ত হয়ে বলিল]

একি ! আমি পাগল নাকি ! তার সুন্দর মুখ—তার সেই নরম চুল—তার সবল দেহ—তার লাখো লাখো টাকা,—মোটর গাড়ী—চুলোয় যাক্‌গে, আমার কি !

[চতুরিকা সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল]

আমি আজ থেকে ভগবানের নামে শপথ্‌ কর্‌চি ও প্রতিজ্ঞা কর্‌চি যে পুরুষ-জাতের ওপর এর রিভেঞ্জ নেব—কেউ রুখ্‌তে পার্‌বে না।

[চতুরিকার ভীষণ মুখের চেহারা]

পটক্ষেপ। (ক্রমশঃ)

স্বর্গীয় রায় সাহেব শ্যামাচরণ ঘোষ

জন্ম—১৬ই সেপ্টেম্বর ১৮৬৩

মৃত্যু—২১শে মার্চ্চ ১৯২৫

স্বর্গীয়া রাজবালা ঘোষ

জন্ম—১৬ই নভেম্বর ১৮৬৯

মৃত্যু—১৪ই মে ১৯৩৬

স্বর্গীয়া রাজবালা ঘোষ

সুপ্রসিদ্ধ ইঞ্জিনিয়ার স্বর্গীয় রায় সাহেব শ্যামাচরণ ঘোষ মহাশয়ের বিধবা পত্নী রাজবালা ঘোষ মহাশয়া গত ৩১শে বৈশাখ কলিকাতার অন্তর্গত ৪৫ নং ক্রীক রো স্থিত স্বগৃহে মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। তিনি নানা গুণে বিভূষিতা ছিলেন। হিন্দু মহিলার কর্ম্মনৈপুণ্যে হিন্দু সংসার সামান্য অবস্থা হইতে কিরূপে ধনজন-সম্মান সমন্বিত হইয়া সমৃদ্ধ হয়, তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমরা এই মহিয়সী মহিলার জীবনী হইতে প্রাপ্ত হই।

তাঁহার পিতার নাম স্বর্গীয় গোপালচন্দ্র পাত্র। কলিকাতার তালতলা পল্লীতে তাঁহার পিতৃগৃহ। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ১৬ই নভেম্বর তারিখে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি অতিশয় বুদ্ধিমতী ও সদাহাস্যময়ী ছিলেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে হাওড়া জেলার বালী নিবাসী স্বর্গীয় নীলমণি ঘোষ মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র শ্যামাচরণ ঘোষের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার সহাস্য মধুর ব্যবহারে শীঘ্রই তিনি শ্বশুরগৃহে সকলের প্রিয় হইয়া উঠেন। তাঁহার শ্বশুরগৃহের অবস্থা তেমন স্বচ্ছল ছিল না। কিন্তু এই নববধূ তাঁহার সহাস্য ব্যবহারের দ্বারা সকলকেই অস্বচ্ছলতার বিষয় ভুলাইয়া দিতেন। অর্থাভাব বশতঃ তাঁহার স্বামী যখন সাধারণ পাঠ সমাপন করিয়া অধিকতর অধ্যয়ন বন্ধ করিতে বাধ্য হন, তখন এই বালিকা বধূ নিজের সমস্ত অলঙ্কার এবং বিবাহের যৌতুক স্বরূপ যত টাকা পাইয়াছিলেন তাহা দিয়া স্বামীকে রুড়কী ইঞ্জিনিয়ারং কলেজে পড়াইবার ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়া সকলকে বিস্মিত ও মুগ্ধ করেন। কেবলমাত্র তাঁহারই এই অসামান্য ত্যাগে তাঁহার স্বামী রুড়কীতে অধ্যয়ন ও তথা হইতে ইঞ্জিনিয়ারিং উপাধি লাভে সমর্থ হন।

শ্যামাচরণ ঘোষ মহাশয়ও অতিশয় উদ্যমশীল, অধ্যবসায়ী, কর্ম্মনিপুণ এবং উদারহৃদয়সম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। রুড়কী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ভারত গভর্ণমেণ্টের অধীনে পাব্লিক ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেণ্টে কর্ম্ম লাভ করেন। তাঁহার কর্ম্মদক্ষতা, বিশেষতঃ, সেতু নির্ম্মাণ-কার্য্যে তাঁহার অসামান্য নৈপুণ্য দর্শনে উচ্চতম রাজকর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। সেই কারণে সারা-সেতু (Hardinge Bridge) নির্ম্মাণ কালে যে এগারজন বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়র নিযুক্ত হন, তন্মধ্যে শ্যামাচরণবাবু অন্যতম ইঞ্জিনিয়র নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্ট এই কার্য্যে তাঁহার কর্ম্মকুশলতার পরিচয় পাইয়া ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ১২ই ডিসেম্বর তাঁহাকে 'রায় সাহেব' উপাধিতে ভূষিত করেন। ইহার কিছুকাল পরে তিনি কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কর্ম্মনিষ্ঠপুরুষ ছিলেন বলিয়া জীবনের অবসর সময়েও নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি একটী ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া ব্যবসায় করিতে আরম্ভ করেন এবং তদ্দ্বারা প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিতে

থাকেন। পরে তাঁহার তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত অরবিন্দু ঘোষ বিলাত হইতে প্রত্যাগমন করিয়া এই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন। শ্যামাচরণবাবু অতিশয় দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার দান কোনরূপ গণ্ডীবদ্ধ ছিল না। জাতি-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে তিনি দুঃস্থ লোকদিগকে অর্থ-সাহায্য করিতেন অথচ তাঁহার এই দানের কথা কেহ কখনও জানিতে পারে নাই। এইরূপে প্রায় ষাট হাজার টাকা তিনি দান করিয়া যান। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে ২৫শে মার্চ্চ তারিখে তিনি পরলোক গমন করেন।

এইরূপ গুণময় স্বামীর সহায়তায় রাজবালা ঘোষ মহাশয়া অতি সামান্য অবস্থা হইতে সংসারকে ধীরে ধীরে উন্নত করিতে লাগিলেন। পুত্রকন্যাদিগের শিক্ষাবিষয়ে তিনি স্বয়ং তত্ত্বাবধান করিতেন। ধর্ম্মবিষয়ে তিনি নিষ্ঠাবতী ছিলেন; কিন্তু তাঁহার মধ্যে কোনও প্রকার গোঁড়ামি ছিল না। পুত্রগণকে পাশ্চত্য দেশে প্রেরণ করিয়া পাশ্চত্য-বিদ্যায় কৃতবিদ্য করিবার নিমিত্ত তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আগ্রহ প্রদর্শন করেন। কন্যাগণকেও তিনি সকল গুণে বিভূষিতা করিতে বিশেষ সচেষ্ট থাকিতেন। তাঁহার সকল কন্যাই সুপাত্রে অর্পিত হইয়াছেন। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি অধিকাংশ সময় পূজা-জপ-তপে কালাতিপাত করিতেন। মৃত্যুর অব্যবহিতপূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি তীর্থ ভ্রমণ করেন,—রামেশ্বর, দ্বারকা, সীতাকুণ্ড প্রভৃতি হিন্দুদিগের বহু তীর্থস্থানে গমন করিয়াছিলেন। স্বামীর ন্যায় তিনিও দারিদ্র্যের দুঃখ অনুভব করিতেন এবং তাহাদের দুঃখ মোচনের চেষ্টা করিতেন। লোক যতই শোকতাপে মুহ্যমান হউক না কেন, তাঁহার দৃষ্টিতে একবার নিপতিত হইলে তিনি তাঁহার স্বভাব-সুলভ সহাস্য ব্যবহারে তাহার শোকতাপ মন্ত্রের ন্যায় ভুলাইয়া দিয়া তাহাকে আনন্দ দান করিতেন। ইহা তাঁহার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি চারি পুত্র, চারি কন্যা এবং বহু আত্মীয় স্বজন রাখিয়া পরলোকে গমন করেন। তাঁহার পুত্রগণের নাম ঃ—

জ্যেষ্ঠপুত্র সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুত কিরণেন্দু ঘোষ, এল্-এম্-এস্, ডি-পি-এইচ, (লণ্ডন) ডি-টি-এম্ এণ্ড এইচ্ (ক্যান্টাব)।

মধ্যম পুত্র—শ্রীঅরবিন্দু ঘোষ, ব্যবসায়ী।

তৃতীয় পুত্র—শ্রীযুত জগবন্ধু ঘোষ; লণ্ডন ইলেক্‌ট্রিক কর্পোরেশনের ইলেক্‌ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার্।

কনিষ্ঠ পুত্র—শ্রীযুত শচীন্দু ঘোষ, ব্যবসায়ী।

স্বর্গীয় রায় সাহেব শ্যামাচরণ ঘোষ মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত বংশ পরিচয়

স্বর্গীয় নীলমণি ঘোষ, (বালী, হাওড়া)

স্বর্গীয় রায় সাহেব শ্যামাচরণ ঘোষ— **১৮৮১ খৃষ্টাব্দে পরিণয়** —স্বর্গীয়া রাজবালা ঘোষ

জন্ম—১৬ই সেপ্টেম্বর ১৮৬৩

মৃত্যু—২১শে মার্চ্চ ১৯২৫

স্বর্গীয় গোপালচন্দ্র পাত্র, (তালতলা, কলিকাতা)

স্বর্গীয়া রাজবালা ঘোষ

জন্ম—১৬ই নভেম্বর ১৮৬৯

মৃত্যু—১৪ই মে ১৯৩৬

পুত্র—১
ডাঃ শ্রীযুক্ত কিরণেন্দু ঘোষ সাবজজ্, স্বর্গীয় রায় বাহাদুর গিরীশচন্দ্র চৌধুরীর পৌত্রীকে বিবাহ করেন।

কন্যা—২
চুঁচড়া নিবাসী সাবজজ স্বর্গীয় অঘোরনাথ ঘোষ মহাশয়ের পুত্র ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব্ পুলিশ স্বর্গীয় সুশীলচন্দ্র ঘোষের সহিত বিবাহিত।

কন্যা—৩ (মৃতা)
কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের কৃতী ছাত্র ডাঃ শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ ঘোষের পুত্র শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ ঘোষের সহিত বিবাহিত।

পুত্র—৪
শ্রীযুক্ত অরবিন্দু ঘোষ স্বর্গীয় ডাঃ বিপিনবিহারী কুমার মহাশয়ের পৌত্রীকে বিবাহ করেন।

পুত্র—৫
শ্রীযুক্ত জগবন্ধু ঘোষ ব্রিটীশ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত লণ্ডনের ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার

কন্যা—৬
নদীয়ার সিভিল সার্জ্জেন ক্যাপ্টেন শ্রীযুক্ত বিনোদ বিহারী হাজরার সহিত বিবাহিত।

কন্যা—৭
পূর্ণিয়ার উকীল শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত কুমারের পুত্র উকীল শ্রীযুক্ত পশুপতি কুমারের সহিত বিবাহিত।

কন্যা—৮
ওয়েষ্ট জামুরিয়া কোলিয়ারীর ম্যানেজার শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র ঘোষ, বি-এস্-সি, কলিকাতা ও (গ্ল্যাসগো) মহাশয়ের সহিত বিবাহিত।

পুত্র—৯
শচীন্দু ঘোষ স্বর্গীয় রামচন্দ্র পাল মহাশয়ের পৌত্রীকে বিবাহ করিয়াছেন।

আমাদের সাদর অভিনন্দন

কুমারী শক্তিময়ী পাল—সাব-জজ স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পাল মহাশয়ের পৌত্রী এবং কলিকাতা হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ এ্যাটর্ণী শ্রীযুক্ত ক্ষিতিশচন্দ্র পাল মহাশয়ের কন্যা, কুমারী শক্তিময়ী পাল এ বৎসর ভিক্টোরিয়া ইনিষ্টিটিউশন হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক ১৫৲ টাকা গভর্ণমেণ্ট বৃত্তি লাভ করিয়াছেন। বিদ্যালয়ের প্রত্যেক পরীক্ষাতেই তিনি শীর্ষস্থান অধিকার করিতেন। তাঁহার এই সাফল্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, অধ্যয়নে তিনি কখনও কাহারও সহায়তা গ্রহণ করেন নাই,—নিজের পাঠ নিজেই অভ্যাস করিতেন। এখন তিনি ভিক্টোরিয়া ইনিষ্টিটিউশনে আই-এ ক্লাসে যোগদান করিয়াছেন। আশা করি ইহাতে তিনি অধিকতর কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিবেন।

কুমারী শক্তিময়ী পাল

শ্রীঅমিয়কৃষ্ণ কুমার—বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের অন্তর্গত জয়পুর থানাস্থিত শ্রীযুত বিভূতিভূষণ কুমার মহাশয়ের পুত্র শ্রীঅমিয়কৃষ্ণ কুমার বাঁকুড়া কলেজ হইতে এ বৎসর আই-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক ২০৲ টাকা বর্দ্ধমান-ডিভিশন স্কলারশিপ লাভ করিয়াছেন। বাঁকুড়া কলেজের মধ্যে প্রথম স্থানাধিকার করায় মাসিক ১০৲ টাকা মিচেল স্কলারশিপও প্রাপ্ত হইয়াছেন। এখন তিনি সংস্কৃতে অনার্স লইয়া বাঁকুড়া কলেজে বি-এ পড়িতেছেন। আমরা তাঁহার অধিকতর সাফল্য কামনা করি।

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বিশ্বাস, বি-এ—কলিকাতা হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ এ্যাটর্ণী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিশ্বাস মহাশরের পুত্র শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বিশ্বাস বি-এ কলিকাতা হাইকোর্টের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এ্যাটর্ণী-এ্যাট্-ল উপাধি লাভ করিয়াছেন। কর্ম্মক্ষেত্রে আমরা তাঁহার কুশল কামনা করি।

শ্রীসন্তোষকুমার পাল, বি-এল—স্বর্গীয় অখিলচন্দ্র পাল মহাশয়ের পুত্র এবং এ্যাটর্ণী শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র পালের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীসন্তোষকুমার পালও কিছুকাল পূর্ব্বে কলিকাতা হাইকোর্টের এ্যাটর্ণী হইয়াছেন। আমরা তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্রে সাফল্য কামনা করি।

আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন

শ্রীঅমরনাথ সুর, বি-এস্-সি—বেঙ্গল পাব্লিক হেলথ্ ডিপার্টমেন্টের এ্যাসিষ্টেন্ট ডিরেক্টর ডাঃ শ্রীযুত শচীন্দ্রনাথ সুর, এম্-বি, ডি-পি-এইচ্, ডি-টি-এম্ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ সুর বি-এস্-সি লণ্ডনের সিটি গিল্ড্স্ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ইঞ্জিনিয়ারিংএ বি-এস্-সি পড়িবার জন্য গত ১২ই আগষ্ট বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। যাত্রাকালে হাওড়া ষ্টেশনে সদ্গোপ যুবক সঙ্ঘের পক্ষ হইতে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করা হয়। তিনি সসম্মানে কৃতকার্য্য হউন—ইহাই আমাদের ঐকান্তিক বাসনা।

শ্রীঅমরনাথ সুর, বি-এস্-সি

শ্রীঅমলেন্দু ঘোষ, এম্-এস্-সি—স্বর্গীয় বিপিন বিহারী ঘোষ মহাশয়ের পুত্র কলিকাতার ৩৮।২ নং দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীট নিবাসী শ্রীঅমলেন্দু ঘোষ, এম্-এস্-সি রসায়ন শাস্ত্রে উচ্চতর গবেষণা করিয়া পি-এইচ্-ডি উপাধি লাভ করিবার উদ্দেশ্যে গত ৯ই সেপ্টেম্বর জার্ম্মাণির অন্তর্গত মিউনিকে গমন করিয়াছেন। গমনকালে হাওড়া ষ্টেশনে সদ্গোপ যুবকসঙ্ঘের পক্ষ হইতে তাঁহাকে পুষ্পমাল্যে শোভিত ও তাঁহার প্রতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হয়। আমরা তাঁহার উদ্দেশ্যের সাফল্য কামনা করি।

শ্রীঅমলেন্দু ঘোষ, এম-এস্-সি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ, বি-এ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ, বি-এ—কলিকাতা হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের একমাত্র পুত্র শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ, বি-এ, গত ১০ই সেপ্টেম্বর ব্যারিষ্টারী পরীক্ষা দিবার নিমিত্ত বিলাত গমন করিয়াছেন। যাত্রাকালে সদ্গোপ যুবকসঙ্ঘের পক্ষ হইতে তাঁহাকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করা হয় এবং তাঁহার প্রতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হয়। তাঁহার উদ্দ্যম ও উদ্দেশ্য সফল হউক—ইহাই আমাদের ঐকান্তিক কামনা।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র নিয়োগী, বি-এস্-সি—বঙ্গীয় সদ্গোপ সভার সহকারী সম্পাদক শ্রীপূর্ণচন্দ্র নিয়োগী বি-এস্-সি, রসায়নশাস্ত্রে উচ্চতর গবেষণা করিয়া লণ্ডনের বি-এস্-সি ও পি-এইচডি উপাধি লাভ করিবার উদ্দেশ্যে, গত ৮ই সেপ্টেম্বর বিলাত গমন করিয়াছেন। আমাদের বিশেষ অনুরোধ সত্ত্বেও, বোধ হয়, কর্ম্মাতিশয্যবশতঃ তিনি আমাদিগকে তাঁহার বিলাত গমনের তারিখ জানাইতে পারেন নাই। সেই কারণে যাত্রাকালে আমরা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমাদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতে পারি নাই বলিয়া দুঃখিত। শ্রীভগবানের নিকট আমরা তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল প্রার্থনা করি। তাঁহার উদ্যমে আমরা আনন্দিত। তাঁহার উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত হউক—ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।

জ্ঞান গরিমা শিখবো বলে কেউ বা যাব জার্ম্মাণি
সবার আগেই চলবো মোরা—আর কি কভু হার মানি!
—গোলাম মোস্তাফা।

পল্লী মা

[কুমারী সুলেখা হালদার]

বহুদিন পরে আসিনু ফিরিয়া আজিকে আপন গাঁয়ে,
লভিতে শান্তি পল্লীমায়ের বুকভরা স্নেহ-ছায়ে।
কত ঘুরিলাম মনোহর ধাম কত নব নব দেশ,
না পেনু শান্তি হৃদয়ে আমার, তাই এনু অবশেষ ;
মম বাল্যের ক্রীড়া-ভূমি মাঝে নাহি যার তুলনা—
জ্যোৎস্না ভরা স্নেহে উছলা আমার পল্লী মা।

ওই দেখা যায় শিবমন্দির ওই যে অশথতলা
ওরই মূলে মোরা বালককালেতে খেলেছি কত খেলা,
রাখাল বালক হোথায় বসিয়া বাজায়েছে কত বাঁশী,
জন-প্রাণীহীন মুক্ত মাঠের ঘোর নীরতা নাশি'।
সন্ধ্যা নামিলে সকলে তখন ফিরিয়া গিয়াছি গাঁ
ডেকেছে যখন আদর করিয়া—আমার পল্লী মা।

মোদের গাঁয়ের ক্ষুদ্র নদীটি ওই যে বহিছে ধীরে
কত যে প্রভাত কাটিয়া গিয়াছে উহার শ্যামল তীরে!
ভোরবেলা থেকে বিছানা ছাড়িয়া দলবল সবে জুটি
বালুময় তীরে হল্লা করিয়া খেলিয়াছি ছোটাছুটি।
ভাসায়ে দিয়াছি উহার জলেতে কত কাগজের না'
কত স্নেহমাঝে রেখেছিল ঘিরে—আমার পল্লী মা।

ভুলি নাই কিছু সবি মনে আছে, তাইতো এসেছি ফিরে
রূপে মনোরমা—গুণে অনুপমা আমার জননী ক্রোড়ে,
দোয়েল, পাপিয়া, শ্যামা কোকিলের কাকলির মাঝখানে—
তাপিত কঠিন হিয়া—এই গ্রাম সরস করিয়া আনে।
বালক-কালের বিগত দিনটি ফিরিয়া পাইব না ?
জ্যোৎস্না-ভরা স্নেহে উছলা—আমার পল্লী মা।

সংবাদিকা

সদ্গোপ যুবক সঙ্ঘের নূতন কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির প্রথম অধিবেশন।

বিগত ১২ই জুলাই তারিখে ১নং ব্লাকোয়ার স্কোয়ারস্থিত সদ্গোপ যুবক সঙ্ঘের অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ, বিদ্যাবিনোদ, ভক্তিরত্ন মহাশয়ের গৃহে সদ্গোপ যুবক সঙ্ঘের নব গঠিত কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অধিবেশনে নানা বিষয়ের আলোচনা ও কয়েকটী প্রস্তাব গৃহীত হয়। গত সাধারণ সভার নির্দ্দেশ অনুযায়ী কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির অবশিষ্ট চারিজন সভ্যের নির্ব্বাচন এবং পত্রিকা-পরিচালক-মণ্ডলী-গঠন করা হয়। নিম্নে তাহা প্রকাশিত হইল।

কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির চারিজন সভ্য।

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, এম-এ, বি-এল	শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনারায়ণ পাল
„ সরোজনাথ বিশ্বাস, বি-এ	„ কানাইচন্দ্র বিশ্বাস

নববর্ষের পত্রিকা পরিচালক মণ্ডলীর।

ডাঃ শ্রীযুক্ত মনোমোহন কুমার, এম-বি	শ্রীযুক্ত ললিতমোহন কুমার
„ আশুতোষ ঘোষ, বিদ্যাবিনোদ, ভক্তিরত্ন,	„ ফণীন্দ্রনাথ বিশ্বাস
„ সত্যেন্দ্রনাথ নিয়োগী	„ ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ, বি-এল্
„ গোপালচন্দ্র বিশ্বাস	„ সত্যচরণ ঘোষ
„ জিতেন্দ্রনাথ নিয়োগী (মুদ্রাকর)	„ তারকনাথ হাজরা (সম্পাদক)

দ্রষ্টব্য ঃ—অনিবার্য্য কারণবশতঃ আগামী সংখ্যায় "চতুর্ব্বর্গ" নাটক প্রকাশিত হইবে না।

সদ্গোপ জাতির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জীবনী, প্রতিকৃতি ও বংশ-পরিচয় প্রকাশ করিতে আমরা সর্ব্বদা প্রস্তুত আছি। এই বিষয়ে, বিস্তৃত বিবরণের জন্য আমাদের কার্য্যালয়ে (৩৪নং ইণ্ডিয়ান মিরার ষ্ট্রীট, কলিকাতা) অনুসন্ধান করুন।

আমাদের কথা

আমাদের আশা ও ভরসার স্থল, ভবিষ্যতের বল ও গৌরব—স্বজাতির ছাত্র-ছাত্রীগণ জ্ঞানানুসন্ধিৎসায় যেরূপ আগ্রহ, উদ্যম ও তাহা লাভ করিতে কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিতেছেন, তাহাতে হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, বা অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের আদর-যত্ন পরিত্যাগ করিয়া, তাহারা আজ অপরিচিত এবং অপরিজ্ঞাত পরদেশ হইতে জ্ঞান গরিমা অর্জ্জন করিবার জন্য উদ্যমশীল! কিন্তু আমরা আরও অধিক সংখ্যায় স্বজাতির ছাত্র-ছাত্রীগণকে জ্ঞান লাভের জন্য অধিকতর আগ্রহশীল ও অধিকতর কৃতী দেখিতে চাই। যে সকল ছাত্র বিদেশ গমন করিয়াছেন, তাঁহারা যেন সুস্থ্য-দেহে, শান্ত-চিত্তে বিদ্যানুশীলন করিয়া নিজ নিজ উদ্দেশ্যে সাফল্য লাভ করেন, শ্রীভগবানের নিকট ইহাই আমরা আন্তরিকতার সহিত প্রার্থনা করি।

*　　*　　*　　*　　*

সাহিত্য জাতীর শিক্ষা, সভ্যতা ও সৃষ্টির প্রতিকৃতি ও তাহার চিরন্তন প্রতিবাহক। একটী জাতি কি পরিমাণে উন্নত, তাহা তাহার সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারা যায়। এই দিক দিয়া বিচার করিলে, সমষ্টিগতভাবে এবং ব্যষ্টিগতভাবে সাহিত্য-চর্চ্চা মানুষের অপরিহার্য্য বিষয় হয়। সেই জন্য জগতের প্রত্যেক সভ্য জাতির মধ্যে সাহিত্য-চর্চ্চা চিরকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। বিজ্ঞানের সাহচর্য্যে বর্ত্তমানে সাহিত্য-চর্চ্চা সর্ব্বসাধারণের মধ্যে যেরূপ প্রবলভাবে সম্প্রসারিত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিলে প্রকৃতই মানুষকে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। সভ্য জগতে সর্ব্বপ্রকার মত ও পথের অবলম্বনকারিগণ দলগতভাবেই হউক, বা ব্যক্তিগতভাবেই হউক, সাহিত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিজেদের মতকে ও পথকে ভাষার রূপ প্রদানে অগ্রসর। সেই জন্য আজ এত গ্রন্থ, পত্রিকা, সংবাদপত্র জগৎময় পরিপ্লাবিত।

সদ্গোপ যুবক সঙ্ঘ এই বিষয় অন্তরের সহিত উপলব্ধি করিয়া আজ নিজেদের সম্প্রদায়গত শিক্ষা, সভ্যতা ও কৃষ্টির প্রতিকৃতি ও তাহার প্রতিবাহক সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত, সাহিত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া এই পত্রিকা প্রকাশে আগ্রহান্বিত। আমাদের সম্প্রদায়-

গতভাবে এতদিন সাহিত্যচর্চ্চা হয় নাই বলিয়া আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তিকলাপ,—দেশকে গৌরবান্বিত করিবার জন্য তাঁহাদের বিরাট দান, প্রচেষ্টা, প্রভৃতির স্মৃতি আজ বিস্মৃতির অতল সলিলে নিমজ্জিত হইতে বসিয়াছে। শ্রীশ্রীসতীমাতা ঠাকুরাণী, শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ ঠাকুর, রামশরণ পাল, দুলালচাঁদ, রামধন নিয়োগী, রাজা রণজিৎ রায়, প্রভৃতি দেশবরেণ্য স্বজাতির মহাপুরুষগণের কথা তাঁহাদের বংশধরগণ আজ ভুলিয়া যাইতে বসিয়াছে। এমন কি, সেদিনের কথা,—ভারতে বিজ্ঞান-সাধনার সর্ব্বপ্রধান প্রবর্ত্তক বিজ্ঞানাচার্য্য মহেন্দ্রলাল সরকারে সুবিস্তৃত জীবনী আমাদের নিকট অজ্ঞাত। সদ্গোপ যুবকসঙ্ঘ এরূপ আর ঘটিতে দিতে চাহে না। তাহারা তাহাদের গৌরবকে সাহিত্যের সহায়তায় চির-সঞ্জীবিত করিয়া রাখিতে চাহে। এই জন্য তাহাদের উদ্যম ও অধ্যবসায় কত প্রবল, তাহা সদ্গোপ যুবক সঙ্ঘের নবম বার্ষিক কার্য্য বিবরণীতে সবিশেষ উল্লিখিত হইয়াছে। যুবক সঙ্ঘের এই উদ্দেশ্যে স্বজাতির সাধারণেরও একটা কর্ত্তব্য আছে। তাঁহারা এই সাধু উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য, যেন ইহার গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়া এবং অপরকেও গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করিয়া স্বজাতীয় যুবকগণকে সাহিত্য চর্চ্চা করিবার অবসর দিয়া উৎসাহিত, অনুগৃহীত ও বাধিত করেন।

নিয়মাবলী

১। সমস্ত টাকা কড়ি যুবকসঙ্ঘের 'সেক্রেটারী'র নামে ৩৪, ইণ্ডিয়ান মিরার ষ্ট্রীট, কলিকাতা এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

২। রাজনৈতিক কোন প্রবন্ধ পত্রিকাতে আলোচিত হয় না।

৩। লেখক-লেখিকাগণের মতামত পত্রিকা সম্পাদক বা সদ্গোপ যুবকসঙ্ঘের মতামত নহে।

৪। লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।

৫। প্রবন্ধ কাগজের একপৃষ্ঠে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া পত্রিকা-সম্পাদকের নামে ৩৪ নং ইণ্ডিয়ান মিরার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। ডাকমাশুল না পাঠাইলে অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরত দেওয়া হয় না। প্রবন্ধ পাঠাইবার সময় আপত্তি না জানাইলে পত্রিকা পরিচালক মণ্ডলী প্রবন্ধের যে কোন অংশ পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন করিতে পারিবেন।

৬। যুবক-সঙ্ঘ ও তাহার পত্রিকা সম্বন্ধীয় যাবতীয় সংবাদ যুবক-সঙ্ঘ অফিস ৩৪ নং ইণ্ডিয়ান মিরার ষ্ট্রীটে জ্ঞাতব্য। সন্ধ্যা ৮টা হইতে ৯॥০টা পর্য্যন্ত অফিস খোলা থাকে।

৭। বিজ্ঞাপনের হার সাধারণ এক পৃষ্ঠা মাসিক ৮৲, আধ পৃষ্ঠা ৪॥০, সিকি পৃষ্ঠা ২॥০, সূচীর নীম্নে আধ পৃষ্ঠা ৬৲, সিকি পৃষ্ঠা ৩॥০। বিশেষ বিশেষ স্থানে বিজ্ঞাপনের মূল্য প্রকাশকের নিকট জ্ঞাতব্য।

সদ্গোপ পাত্র-পাত্রীর
বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী

(১) সদ্গোপ পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপন বিনামূল্যে প্রকাশ করা হইবে। কেবলমাত্র পত্রিকার গ্রাহক-গ্রাহিকাগণই এই সুবিধা পাইবেন। কিন্তু স্থানাভাব বা অন্য কোন কারণ বশতঃ এই বিষয়ে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশ না করিবার ক্ষমতা সদ্গোপ যুবক সঙ্ঘের কর্ত্তৃত্বাধীন। (২) বিজ্ঞাপন-গুলি স্পষ্টাক্ষরে ও সংক্ষিপ্ত হওয়া আবশ্যক। উহা যেন এই পত্রিকার ৩ লাইনের অধিক না হয়। (৩) বিজ্ঞাপনে বিবৃত বিবরণের জন্য আমরা দায়ী নহি। পাত্র-পাত্রীর সম্বন্ধ নির্ণয়কারিগণ সমস্ত বিষয় তাঁহারা নিজেদের দায়িত্বে করিবেন। (৪) যাঁহারা নিজেদের নাম প্রকাশ না করিয়া বক্স নম্বর দিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা যদি আমাদের কার্য্যালয় হইতে পত্রাদি লইয়া না যান, তবে উহা প্রেরণের জন্য তাঁহাদিগকে আমাদের নিকট উপযুক্ত (অন্ততঃ আট আনার) ডাকটিকেট রাখিতে হইবে।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ নিয়োগী কর্ত্তৃক দি নিউ হাওয়ান প্রেস—৬, ডাক ষ্ট্রীট হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শারদীয়া সংখ্যা

সম্পাদক—শ্রীতারকনাথ হাজরা।

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

আমরা আমাদের গ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতা, পাঠক, স্বজাতি শুভানুধ্যায়ী প্রভৃতি সকলকেই শ্রীশ্রী৺পূজার অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহাদের নিকট হইতে যে সহযোগিতা ও অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ্য আমরা পাইয়াছি তজ্জন্য তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞচিত্তে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

পঞ্চমী—৩রা কার্ত্তিক, ১৩৪৩।

সূচী

১।	হৈমবতী উমা (প্রবন্ধ)	...	শ্রীতারকনাথ হাজরা	২৬৫
২।	বৌদিদি (গল্প)	...	কুমারী সুলেখা হালদার	২৬৮
৩।	নালন্দায় (ভ্রমণ)	...	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ	২৭৫
৪।	আগমনী (কবিতা)	...	শ্রীরমেন্দ্রনাথ ঘোষ	২৮১
৫।	সঙ্গীত (প্রবন্ধ)	...	শ্রীসতীশচন্দ্র সুর	২৮৩
৬।	চলতি পথের শেষে (কবিতা)	...	শ্রীমতী অপরাজিতা ঘোষ	২৮৯
৭।	সংবাদিকা	...		২৯১
৮।	আমাদের কথা	...		২৯৩

সন্দেশ পত্রিকা—

শ্রীশ্রীদুর্গা।

সর্ব্বমঙ্গল-মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ-সাধিকে।

শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্তুতে॥

৭ম বর্ষ] আশ্বিন, ১৩৪৩ [১১শ সংখ্যা

হৈমবতী উমা

[শ্রীতারকনাথ হাজরা]

বিশ্বরূপা জগজ্জননী শ্রীদুর্গাই হৈমবতী উমা। কেমন ক'রে হৈমবতী উমা প্রথমে দেবতাদের সম্মুখে দেখা দেন,—কেমন ক'রে তাঁদের অহমিকা ঘুচিয়ে দিয়ে, তাঁদেরকে ব্রহ্মের স্বরূপ জানিয়ে দেন, সে সম্বন্ধে আজ—তাঁর অসুরবিনাশিনীরূপে জগতে আবির্ভাবের উৎসবের দিনে, আলোচনা করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

হৈমবতীর উমার কথা আমরা কেন উপনিষদে পাই। সেই উপনিষদের কথাই এখানে ব'লবো।—

দেবতা আর অসুরের মধ্যে যখন যুদ্ধ হয়, তখন বিশ্বনিয়ন্তা পরম ব্রহ্মেরই বিধানে দেবতাদের জয় হ'লো, আর অসুরগণ পরাজিত হ'লো। জয়ের ফল দেবতারা পেলেন। তাঁরা নিজেদেরকে খুব মহিমান্বিত ব'লে মনে ক'র্লেন। ভাব্তে লাগ্লেন—অসুরকে ত' আমরাই পরাজিত ক'রেচি—মহিমা আমাদের নিজেদেরই।

ব্রহ্ম এ বিষয় জান্‌তে পারলেন। তিনি তাঁদের সম্মুখে সমুপস্থিত হ'লেন। কিন্তু দেবতারা তখন তাঁকে চিন্‌তে পারলেন না। তবে বুঝতে পারলেন যে, তিনি যে-সে কেউ নন—তিনি মহিমান্বিত, সকলেরই পূজ্য।

তখন তাঁরা পরামর্শ ক'রে অগ্নিকে বল্লেন—"আপনি ত' সর্ব্বজ্ঞ, আপনি জেনে আসুন—এই পূজনীয় স্বরূপ কে"। অগ্নি রাজী হ'য়ে তাঁর নিকট গেলেন।

কিন্তু তাঁর নিকট যেতে, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—"তুমি কে?"

অগ্নি উত্তর দিলেন—"আমি অগ্নি, আমি জাতবেদা।" (অর্থাৎ যিনি স্বভাবতঃই সর্ব্বজ্ঞ।)

ব্রহ্ম বললেন—"বেশ ত', তোমার নাম! বেশ ত' তোমার গুণ! আচ্ছা, তোমার কি শক্তি আছে?"

—"পৃথিবীতে যা-কিছু আছে, তা' সব আমি দহন ক'রতে পারি।"

—"তবে এইটে দগ্ধ কর"—বলেই একটা তৃণ তাঁকে দিলেন।

অগ্নি তখন তৃণটাকে পুড়াবার জন্যে তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করলেন। কিন্তু সব রকম চেষ্টা ক'রেও তিনি কিছুই ক'রতে পারলেন না। তখন তিনি বাধ্য হ'য়ে ফিরে গিয়ে দেবতাদের ব'ললেন—"আমি তাঁকে জানতে পারলুম না।" তখন দেবতারা বায়ুর নিকটে গিয়ে বল্লেন,—"আপনিই জেনে আসুন—এই পূজনীয় স্বরূপ কে।" বায়ু—"তাই হোক্", —ব'লে ব্রহ্মের নিকট গেলেন।

যেতেই ব্রহ্ম তাঁকে প্রশ্ন ক'রলেন—"তুমি কে?"

—"আমি বায়ু—আমি মাতরিশ্বা।" (অর্থাৎ আকাশে যাঁর নিশ্বাস-প্রশ্বাস—গমনাগমন।)

—"বাঃ! বেশ ত' তোমার নাম,—তোমার গুণও ত' দেখছি সুন্দর! আচ্ছা, তোমার শক্তি কি?"

—"আমি পৃথিবীর সব কিছু গ্রহণ ক'রতে পারি।"

—"পার?—বেশ! তবে এইটে গ্রহণ কর"—বলেই ব্রহ্ম তাঁকে একটি তৃণ এগিয়ে দিলেন।

বায়ু তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়ে যখন সেই তৃণটাকে নিতে পারলেন না, তখন ফিরে এসে দেবতাদের ব'ললেন—"আমি তাঁকে জানতে পারলুম না।"

দেবতারা অগত্যা ইন্দ্রের নিকট উপস্থিত হ'য়ে ব'ললেন—"অগ্নি ও বায়ু ত' পূজনীয় স্বরূপ যে, কে—তা' জানতে পারলেন না। আপনিই জেনে আসুন—তিনি কে।" ইন্দ্র তাতে রাজী হ'য়ে ব্রহ্মের নিকটবর্ত্তী হ'লেন। কিন্তু ব্রহ্ম তখন তাঁর সমুখ থেকে তিরোহিত হ'লেন। ইন্দ্র ত' অবাক! কিন্তু সেই সময়ে আকাশে তিনি এক অতি সৌন্দর্য্যশালিনী অপরূপ রূপবতী

স্ত্রীরূপ আবির্ভূত দেখ্‌তে পেলেন। তিনি আর কেউ নন্—তিনিই হৈমবতী উমা। ইন্দ্র তাঁর নিকটে গিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রলেন—"যে পূজনীয় স্বরূপ আমার নিকট হ'তে তিরোহিত হ'লেন তিনি কে,—আপনি কি বল্‌তে পারেন ?"

তখন হৈমবতী উমা তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন যে,—তিনি স্বয়ং ব্রহ্ম, অসুরদের পরাজিত ক'রেছিলেন তিনিই—দেবতারা নয়। তাঁরই প্রদত্ত মহিমাতে দেবতারাও মহিমান্বিত।

হৈমবতী উমার নিকট হ'তে ইন্দ্র এই রকমে সর্ব্বপ্রথমে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ ক'রলেন বলেই, তিনি দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন পেলেন।

ব্রহ্মজ্ঞান, মানুষের পক্ষে ত' দূরের কথা—দেবতাদের পক্ষেও অতিশয় দুর্ল্লভ। ব্রহ্ম হ'তেই উদ্ভূত মহাশক্তি হৈমবতী উমার অথবা শ্রীদুর্গার কৃপা না হ'লে, তাঁর সম্বন্ধে অণুর অণু পরিমাণ জ্ঞান লাভ করবার অন্য কোনও উপায় নেই। তিনি যদি এসে আমাদের নানা দোষ স্খলন ক'রে শুদ্ধ না করেন,—জ্ঞানচক্ষু খুলে দিয়ে বুদ্ধ না করেন, তাহ'লে আমাদের সুগভীর পাণ্ডিত্য থাক্‌লেও, ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে সমস্তই অজানা থেকে যায়। কিন্তু এই মহাশক্তির কৃপা হ'লে জগতের কোন-কিছুর জ্ঞান আর দরকার হয় না,—বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সমস্তই জানা হ'য়ে যায়। আমাদের অহমিকা, কাম, ক্রোধ, প্রভৃতি অসংখ্য অসুররূপী দোষকে বিনাশ ক'রে দিব্য-জ্ঞান দেবার জন্যেই, সেই ব্রহ্মশক্তি হৈমবতী উমা আমাদের মধ্যে কৃপা ক'রে অসুরবিনাশিনী দুর্গারূপে অবতীর্ণ হ'য়েচেন। আজ তাঁরই জাগতিক পূজার উৎসব।

অসতো মা সদ্‌গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়।

বৌদিদি

[কুমারী সুলেখা হালদার]

"বৌদিমণি !"

"কে সুদীপ !"

"কি দেবেন বলুন তো এবার ?"

"পাশের খবর বেরিয়েছে বুঝি ?"

"তা এখন বলছি না, আগে কি দেবেন বলুন।"

"খবরটাই বল, তবে দেব।"

"আমি সেকেণ্ড হয়েছি,—এবার দিন কি দেবেন।"

"ফার্ষ্ট তো হতে পারলে না,—কিছু না দেওয়াই উচিত। যাক্ এবারকার মত দয়া করে দিলাম"—বলিতে বলিতে দীপ্তি একটি সুদৃশ্য আংটী সুদীপের অঙ্গুলীতে পরাইয়া দিলেন।

সুদীপ ব্যস্ত হইয়া বলিল—"ওকি করছেন ! না না আমি নেব না। আপনার জিনিষ......"

"তা হোক, আমি দিচ্ছি তোমায় সেকেণ্ড হবার পুরস্কারস্বরূপ।"

সুদীপ বলিল—"আপনার স্নেহ যে পেয়েছে, তার আর কোন পুরস্কারের দরকার হয় না বৌদিমণি ! তা' থেকে তো কোনদিন বঞ্চিত হব না !"

দীপ্তি হাসিতে হাসিতে বলিল—"যদি বঞ্চিত হও ?"

"না বৌদিমণি, আপনি তা পারবেন না।"

"যদি মরে যাই তখন........."

সুদীপের মুখ গম্ভীর হইয়া গেল।

দীপ্তি বলিল—"কি হল মুখটা হঠাৎ 'তোলোহাঁড়ি' কেন ? কি খাবে বল ?"

"যান যান—অত আদরে দরকার নেই। ঐ 'মরা' কথাটা আমি একটুও ভালবাসি না—না একটুও না।" সুদীপের চক্ষু দুইটি ছলছল করিয়া উঠিল।

"ওঃ, এতেই এত গম্ভীর ! আচ্ছা পাগলা তো—আমি চিরদিনই থাকব নাকি ?"

"নিশ্চয়ই থাকবেন, অন্ততঃ, আমার কাছে থাকতেই হবে।"

"আই-এস্‌সি পাশ করলে তবু তোমার ছেলেমানুষি এখনও গেল না। যাক্ কি

"সে তো আপনিই ভাল জানেন। তবে শৈলেনরা খাওয়াবার জন্য বড় ধ'রেছে।"

"বেশ তো, তাদের নিমন্ত্রণ ক'রে এস।"

"তাহলে এখনই বলে আসি বৌদিমণি"—বলিয়া সুদীপ চলিয়া গেল।

মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় আহার্য্যের দ্রব্য দেখিয়া সুদীপ বলিয়া উঠিল—"এত সব কি করেছেন বৌদিমণি। ওবেলায় একবার হাঙ্গামা তো হবে, আবার এবেলা কেন?"

দীপ্তি বলিল—"তারা নিমন্ত্রিত, সেই রকম ভাবে তাদের খাওয়াতে হবে, কিন্তু তুমি যা ভালবাস, তাতো আর তাদের দেওয়া যায় না। তুমি যে মোচার ঘণ্ট ভালবাস, তাব'লে কি তা' তাদের দেওয়া চলে?

"তাহ'লেও, এ আপনার ভয়ানক অন্যায়! কেবল খাটুনি বৈ ত নয়! আপনি তো দিনরাতই খাটছেন,—এতটুকু বিশ্রাম নেই। হ্যাঁ বৌদিমণি, আপনি কি সত্যই আই-এ পাশ করেছিলেন?"

"সন্দেহ কেন, বলতো?"

"আপনার খাটুনি দেখে। পাশ করা মেয়ে কি এত কাজ করতে পারে?"

"ঐখানেই তোমাদের ভুল সুদীপ। তোমরা ভাব—লেখাপড়া শিখলে মেয়েরা কাজ করে না; দিনরাত নভেল পড়ে সাজগোজ আর বেশভূষা নিয়েই দিন কাটায়। কিন্তু তা নয়। শিক্ষা মানুষকে উন্নত করে—অবনত করে না। ২।৪টে মেয়েকে যদি তুমি বিলাসপরায়ণা দেখ, তবে কি মনে করবে—সকলেই ঐ একরকম। বড় কম আদরে আমি মানুষ হইনি। কলেজে গেছি রোজ মোটরে করে। বাবা আমায় ছেড়ে থাকতে পারতেন না। প্রতিদিন নিজে কলেজে গিয়ে আমায় নিয়ে আসতেন। তারপর যেদিন পরীক্ষার ফল বেরোল,—আমার পাশের খবরের সঙ্গে সঙ্গেই বাবা খবর পেলেন ব্যাঙ্ক ফেল হয়েছে। সেই যে বাবার মুখ বিষণ্ণ হয়ে গেল, আর হাসি এল না;—কথাবার্ত্তা বন্ধ করে দিলেন। কেবল আমার বিয়ের দিনে বলেছিলেন—চিরদিনই আদরে মানুষ হয়েছিস্, দুঃখের কঠিন রূপ দেখতে পাসনি; তোর শিক্ষা যেন ব্যর্থ হয় না মা! দুঃখের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিল, দেখবি সুখ না এলেও শান্তি নিশ্চয়ই আসবে। বাবার সেই কথা কটী আমার কাছে আশীর্ব্বচনের মত কাজ করেছে।

সুদীপের দাদা প্রদীপ অফিস হইতে আসিয়া রন্ধনের প্রাচুর্য্য দেখিয়া বলিলেন—"কি দীপ্তি, আমায় ফতুর করবার মতলব নাকি? ব্যাপার কি?"

প্রদীপ বলিল—"শুনবো না কেন? তা ছাড়া ও তো জানাই আছে। যা বৌদিদির পাল্লায় পড়েছে, তাতে আর সেকেণ্ড না হ'য়ে রক্ষা আছে। আর কিছু আন্‌তে হবে নাকি?"

"না সব আনিয়ে নিয়েছি।"

"অনেক ভাগ্যে তোমায় পেয়েছিলাম দীপ্তি। আমাদের সংসারে এসে পর্য্যন্ত আমরা কিসে সুখী হব—এই নিয়েই ব্যস্ত আছ। একটা ঝি পর্য্যন্ত রাখতে দাওনি। কিন্তু তোমায় কিই বা এর প্রতিদানে দিতে পারলাম! না একখানা গয়না, না একখানা ভাল কাপড়। -

দীপ্তি রুষ্ট হইয়া বলিল—"তুমি কি মনে কর আমি প্রতিদানের আশা নিয়ে কাজ করি? গহনা কাপড় ও সব বাজে জিনিসের উপর আমার বিন্দুমাত্র লোভ নেই।"

প্রদীপ অপ্রতিভ হইয়া বলিল—"তোমার লোভ নেই জানি, কিন্তু আমার তো দেওয়া উচিত!"

দীপ্তি বলিল—"আচ্ছা এখন হাত মুখ তো ধুয়ে নাও। দুঃখটা পরে করলেও চলবে।"

—২—

কয়েক দিন হইতে দীপ্তির সামান্য জ্বর হইয়াছে। কিন্তু সে তাহা গ্রাহ্য না করিয়াই সকল কাজই নিয়মিতরূপে করিতে লাগিল। উপরন্তু সেদিন বৃষ্টিতে ভিজিয়া বিছানাপত্র পরিষ্কার করিবার পর জ্বর বাড়িয়া গেল। ক্রমে ক্রমে সেই জ্বর প্রবলভাব ধারণ করিল এবং টাইফয়েডের লক্ষণ দেখা দিল। সুদীপ প্রাণপণে শুশ্রূষা করিতে লাগিল। কিন্তু রোগ ভালর দিকে না গিয়া ক্রমশঃই মন্দভাব ধারণ করিল। ডাক্তার নিরাশ হইলেন। সেদিন বৈকালের দিকে দীপ্তির একটু চৈতন্য হইল। সে বলিল—দীপু আর আমি বাঁচবনা না?

সুদীপ অতি কষ্টে অশ্রু সম্বরণ করিয়া বলিল—"ওকি কথা! ডাক্তার বলেছেন আপনি শীঘ্রই ভাল হয়ে যাবেন।"

দীপ্তি বলিল—"বৃথা কেন আশা দিচ্ছ ভাই? আমি বেশ বুঝতে পারছি—আমার বিদায়ক্ষণ এগিয়ে আসছে! একটা কথা আমার রেখ দীপু। লেখাপড়া ছেড়োনা যেন; বি-এস্‌সি পাশ ভালভাবেই করা চাই। আমি থাকবো না বলে—পড়ায় ফাঁকি দিও না যেন! মানুষ হয়ো!"

কথা কয়টি বলিয়া দীপ্তি আবার অচৈতন্য হইয়া পড়িল। প্রলাপ বকিতে লাগিল। সূর্য্য অস্তমিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই দীপ্তিরও জীবন সূর্য্য নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। সুদীপ

দীপুকে কার কাছে রেখে গেলেন।" প্রদীপের চক্ষু দিয়াও কয়েক ফোঁটা অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। দীপ্তি—তাহার যৌবনের বিকশিত পুষ্প দীপ্তি—বড় অকালেই ঝরিয়া পড়িল। প্রদীপ প্রথমে সে আঘাত সামলাইয়া উঠিতে না পারিয়া নিঃশব্দে রহিল। সুদীপ দীপ্তির মৃত্যুর দিন হইতেই সেই যে গৃহকোণে আশ্রয় করিয়াছিল, এখনও পর্য্যন্ত তাহা পরিত্যাগ করে নাই। আহার করিতে বসিত নাম মাত্র, মুখে দিয়াই উঠিয়া পড়িত। প্রদীপও বুঝিয়াছিল সুদীপের হৃদয়ে এই আঘাত কি ভীষণভাবেই বিদ্ধ হইয়াছে। সেইজন্য সে এই স্নেহময়ী বৌদিহারা ভাইটিকে শান্ত করিবার মত সান্ত্বনার বাণীই খুঁজিয়া পাইতেছিল না। বৃদ্ধা পিসীমা এই সময়ে আসিয়াছিলেন—ভ্রাতুষ্পুত্র দুইটীর তদারক করিতে; কিন্তু তাহাদের এই রকম দেখিয়া তিনি বলিতেন—"তোদের আবার বড় বাড়াবাড়ি বাপু! বৌও অনেক লোকের মরে, বৌদিও অনেকের যায়! কিন্তু তোদের মত কেউ অন্নজল ত্যাগ করে না। এই ভ্রাতার নীরব বেদনা তাহাদের পরস্পর ভিন্ন কেহই বুঝিত না।

দিনের পর দিন যায়। দীপ্তির স্মৃতিও ক্রমশঃ ম্লান হইয়া আসে। জগতের নিয়মই এই। অতি বড় আঘাতও মানুষের কালক্রমে সহিয়া যায়। প্রদীপ আবার পূর্ব্বেকার মত কাজ করে; কিন্তু দীপ্তিকে ভুলিতে পারে নাই একজন, দীপ্তির স্মৃতি তাহার কাছে আজিও তেমনি উজ্জ্বল আছে—এতটুকু নিষ্প্রভ হয় নাই,—সে সুদীপ। সে যদিও গৃহকোণ পরিত্যাগ করিয়াছে, খেলাধূলাও করে, কিন্তু পূর্ব্বের মত অন্তরের সহিত সে তাহাতে যোগ দিতে পারে না।

সংসার আর কতদিন শূন্য রহিবে? প্রদীপ পুনরায় একটি বিবাহ করিয়া বসিল। অবশ্য ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। একজন চলিয়া যায় আবার একজন আসে। শূন্য স্থান পূর্ণ করিতে পুরাতনের স্থানে নূতন আসিবেই।

সুদীপ কিন্তু প্রদীপের এই বিবাহে সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। তাহার দেবীর মত বৌদির স্থানে দাঁড়াইবার আর কাহারও যোগ্যতা নাই। সুদীপ হতভম্ব হইয়া পড়িল। এই তাহার দাদা! ইহাকেই সে এতদিন কত ভক্তি করিয়া আসিয়াছে! তাহার ধারণা ছিল দাদা বৌদিকে খুব ভালবাসে। কিন্তু না এ ধারণা ভুল—সর্ব্বৈব মিথ্যা। এত শীঘ্র যাহার কাছে অমন গুণবতী স্ত্রীর স্মৃতি মলিন হইয়া যায়—হউক সে ভাই, তবু সুদীপ তাহাকে কোনদিনই ক্ষমা করিতে পারিবে না।

বধূ রমলা বিবাহের সময় যখন আসিয়াছিল তখন তাহাকে বেশ ভাল বলিয়াই মনে হইয়াছিল; কিন্তু এইবার যখন আসিল তখন তাহার আসল রূপ প্রকাশ হইয়া পড়িল। তাহার বাক্যবাণে জর্জ্জরিত হইয়া বড় আঘাত পাইয়াই বৃদ্ধা পিসীমা চলিয়া যাইলেন। আজ দীপ্তির

অভাব তাঁহাকেও ব্যথিত করিল। এই বধূ আর দীপ্তি—আকাশ পাতাল ব্যবধান! পূর্ব্বে যখন তিনি আসিতেন তখন দীপ্তি তাঁহার কি সেবাটাই না করিত—তাঁহাকে থাকিবার জন্য কত সাধ্যসাধনা করিত। আর রমলা? থাকিতে তো বলিলই না, বরং চলিয়া যাইবার সোজা পথটাই বলিয়া দিল। সেদিন তিনি বুঝিলেন—দীপ্তির মৃত্যুতে কেন দুই ভাই অমন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। তাই তিনি যাইবার সময় সুদীপকে বলিয়াছিলেন—"ওরে দীপু, আজ বুঝলুম কেন বৌমার অভাবে তুই এমন হ'য়ে গেছিস্। সে দুটো পাশ ক'রেছিল, বড়লোকের মেয়ে ছিল, তবুও তার কিছু অহঙ্কার ছিলনা। নূতন বৌমা আমার সঙ্গে অত ঝগড়া করল, তবু প্রদীপ কিছু বললে না। একবার বললে না যে, পিসীমা যেওনা।" সুদীপ সেদিন পিসীমার কথার উত্তরে কিছু বলিতে পারে নাই; কেবল তাহার চক্ষু দুইটি অশ্রুতে ভরিয়া গিয়াছিল।

রমলাকে গৃহে আনায় সুদীপ যে সুখী হয় নাই—তাহার ও প্রদীপের সহিত সে কখনও প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি কথা বলেনা, ইহা লক্ষ্য করিয়া প্রদীপ মনে মনে ক্ষুব্ধ হইলেও, সুদীপের নিকট সে ভাব প্রকাশ করিল না।

প্রদীপের মাহিনা খুব বেশী নয়। কলিকাতায় বাসা করিয়া থাকায় খরচও পড়ে বেশী। তাহার উপর সুদীপকে পড়ান—এই সবের জন্য উদ্বৃত্ত কিছু থাকিবার কথা নহে। কিন্তু দীপ্তি এমন হিসাব করিয়া নিপুণতার সহিত সংসার চালাইত যে, সংসার তো স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইতই, উপরন্তু সে তাহা হইতে কিছু সঞ্চয়ও করিত। পাছে অনটন পড়ে—এই ভয়ে সে ঝি পর্য্যন্ত রাখিতে দেয় নাই। সুদীপ ট্যুশানি করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু দীপ্তি তাহা করিতে দেয় নাই। সে বলিয়াছিল—"ট্যুশানি ক'রে সময় নষ্ট করতে হবে না—সেই সময় ভাল করে পড়ো।"

সুদীপের সব সময়েই এই সব কথা মনে পড়িত। মনে পড়িবার কারণও যথেষ্ট ছিল। কারণ, এ বাড়ীর অনেক জিনিষই দীপ্তির নিজ হস্তে প্রস্তুত। প্রত্যেক জিনিষটার সঙ্গেই দীপ্তির মমতা জড়ান। দীপ্তির একটি ছোট্ট কবিতার খাতা ছিল। সেটা সে অতি যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিয়াছিল। মন খারাপ হইলে এইটা পড়িয়া সে শান্ত হইত; কারণ ইহাতে দীপ্তির অনেক প্রাণের কথা ছন্দাকারে সজ্জিত আছে।

চতুরা রমলা এ গৃহে পদার্পণ করিয়াই বুঝিয়াছিল—দীপ্তির স্মৃতিতে ইহাদের গৃহ ও মন দুইই পূর্ণ। দীপ্তির প্রস্তুত জিনিষ সে সিন্দুকে বন্ধ করিয়া রাখিল,—তৎস্থানে নিজের প্রস্তুত ও কেনা জিনিষ রাখিয়া দিল। প্রদীপের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে তাহাকে বিশেষ [illegible] চেষ্টা করিয়াও সে সুদীপের মন হইতে দীপ্তির স্মৃতি মুছিয়া

ফেলিতে পারে নাই। সে লক্ষ্য করিয়া দেখিল—অনেক সময় সুদীপ কি একটা খাতা লইয়া পড়ে। পড়িতে পড়িতে তন্ময় হইয়া যায়—চক্ষু হইতে দুই এক ফোঁটা অশ্রুও পড়ে। সেই দিন সুদীপ কলেজ যাইবার পর, সে বালিশের তলা হইতে চাবি লইয়া ট্রাঙ্ক খুলিল এবং খাতাখানি বাহির করিয়া পুড়াইয়া ফেলিল। পরদিন খাতাখানি সুদীপ পাইল না। তন্ন তন্ন করিয়া প্রত্যেক স্থানই সে খুঁজিল। কিন্তু কি করিয়া পাইবে? তাহার বিষণ্ণ মুখ ও ব্যস্ত-সমস্ত ভাব দেখিয়া রমলা হাসি চাপিতে পারিতেছিল না, এমন সময় সুদীপ সেই স্থানে আসিয়া বলিল—'বৌদির কবিতার খাতাটা কোথায়?" মুখটা যথাসম্ভব গম্ভীর করিয়া রমলা বলিল—"তা আমি কি জানি! আমি কেন পরের ঘরে ঢুকতে যাব?"

সুদীপ চটিয়া গিয়াছিল। একটু ক্রুদ্ধভাবেই বলিল—"অত আমি জানি না, খাতা আমার এক্ষুনি চাই। আপনি নিশ্চয়ই খাতাটা নিয়েছেন।"

রমা বলিল—"আমি না হয় গরীবেরই মেয়ে; তা বলে এত চোর নই যে, কবিতার খাতা চুরি করব! এও আমায় শুনতে হ'ল! মাগো! এমন ঘরে আমায় দিয়েছিলে!" বলিয় এমনি ভাবে সে ক্রন্দন জুড়িয়া দিল যে, সুদীপ স্তম্ভিত হইয়া গেল। ঠিক সেই সময়েই প্রদীপ অফিস হইতে ফিরিল। তাহাকে দেখিয়া রমলার ক্রন্দন পঞ্চম হইতে সপ্তমে চড়িয়া গেল। সেদিন অফিসে সাহেবের কাছে দুই চারিটা গরম কথা শুনিয়া প্রদীপের মনটা খারাপ ছিল। ইহার উপর গৃহে প্রবেশ করিয়াই ক্রন্দন শুনিয়া সে ক্রুদ্ধ হইয়া গেল, বলিল—"ব্যাপার কি? ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছ কেন?"

"ঐ যে তোমার গুণধর ভাই দাঁড়িয়ে রয়েছেন, জিজ্ঞাসা কর না। আমায় বলে কিনা চোর! কবিতার খাতা চুরি করেছিস্। তোমার সংসারে সব সুখই তো পেয়েছি, এটুকুই বা বাকী থাকে কেন?

প্রদীপ বলিল—"কবিতার খাতা কি?"

সুদীপ বলিল—"বৌদিমণির কবিতার খাতাটা পাচ্ছি না।"

প্রদীপ বলিল—"তুই কি ওকে নিতে দেখেছিস্?"

সুদীপ নতমুখে উত্তর দিল—'না' —"তবে উনি ছাড়া আর কে নেবেন?"

"শোন গো শোন, উনি ছাড়া আর কে নেবেন! মিথ্যে মিথ্যে কেমন বদ্‌নাম দেওয়া।"

প্রদীপ শান্তভাবে বলিল—"সন্দেহের বশে কাউকে দোষ দেওয়া উচিত নয় দীপু! তুমি যখন ওকে নিতে দেখনি, তখন চোর বলা অন্যায় হয়েছে। তাছাড়া সে যখন চলেই গেছে তখন তার খাতাটা রেখেই বা কি ফল?"

অতি কষ্টে উদ্গত প্রায় দীর্ঘশ্বাসকে দমন করিয়া সুদীপ বলিল—"বৌদিমণি আপনার কাছে এত তুচ্ছ হয়ে গেছেন, ভাবতেও পারিনি। আমি ওঁকে চোর বলিনি।" ধীরে ধীরে সুদীপ চলিয়া গেল।

সেদিন কোন কারণে কলেজ তাড়াতাড়ি বন্ধ হইয়া যাওয়ায় সুদীপ শীঘ্র বাড়ী ফিরিল। রমলা তখন সুদীপের গৃহ হইতে দীপ্তির প্রস্তুত ছবিগুলি খুলিয়া ফেলিবার উদ্যোগ করিতেছিল। সুদীপ বলিল—"আপনি দয়া করে এ ঘরের কোন জিনিষ সরাবেন না।" তাহার দৃঢ়তাব্যঞ্জক গম্ভীর বদনের দিকে চাহিয়া রমলা আর কিছু সরাইতে সাহস করে নাই।

রমলা ঝি রাখিল। সে হিসাবীও নহে; ইহা ব্যতীত সে বেশ বিলাসপরায়ণা। লেখাপড়া সামান্য জানে। সুতরাং অভাব পড়িল। এখন রমলা দেখিল সুদীপের বি, এ পড়ার জন্য অনেকগুলি টাকা নষ্ট হইতেছে। একদিন প্রদীপকে একথা বলিলে, সে বলিয়াছিল—"এতদিন তো ওতেই চলে আসছিল, তখন ওর পড়ার খরচ পর্য্যন্ত ছিল। এখন তো সে সব খরচ স্কলারশিপের টাকা থেকে হচ্ছে। ওর খাওয়াটাই কি এত বেশী খরচের! তার বড় সাধ ছিল..................."

বাধা দিয়া রমলা বলিল—"কিন্তু এই টাকায় আমি চালাতে পারবো না। অত বড় বুড়োধাড়ী ছেলের খাওয়া পড়ায় কম টাকাটা লাগে নাকি? এক পয়সা রোজকার করবার ক্ষমতা নেই! দরদ তো কত। দেমাকে একটা কথা পর্য্যন্ত বলে না। অথচ আগেকার বৌদি তো একেবারে প্রাণের চেয়ে প্রিয় ছিল!"

প্রদীপ অসহিষ্ণু হইয়া বলিল—"তুমি বড় বাড়িয়ে তুলছো রমলা। সুদীপের সম্বন্ধে যা ভাববার সে আমিই ভাবব। তুমি বুঝতে পারবে না—সুদীপ দীপ্তির কতখানি স্নেহ পেয়েছিল।"

নিজের গৃহে যাইবার সময় সুদীপ তাহার নাম উচ্চারিত হইতে শুনিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া সকল কথা শুনিল। সে বুঝিল এখানে তাহার আর থাকা হইবে না।

পরদিনই প্রদীপ অফিস চলিয়া যাইবার পর রমলা সুদীপকে কয়েকটি বেশ কড়া কথা শুনাইয়া দিল এবং বলিয়া দিল যদি তাহার একান্ত পড়িবার ইচ্ছা থাকে, তবে যেন নিজে উপার্জ্জন করিয়া পড়ে।

একথার উত্তরে সুদীপের মুখে কয়েকটি কঠিন কথা আসিয়া পড়িলেও, সে তাহা সামলাইয়া লইল। হ্যাঁ, যেমন করিয়াই হউক বি, এস্‌সি পাশ সে ভালরূপে করিবেই। ইহা যে তাহার মাতৃসমা বৌদিদির আদেশ।

সুদীপ চুপি চুপি দীপ্তির একটা ফটো ও তাহার বইগুলি লইয়া বাহির হইল। তাহার মমতাময়ী বৌদিদির সহস্র স্মৃতি বিজড়িত এই বাড়ীটি ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছা হইতেছিল না! কিন্তু তবু যাইতেই হইবে। দীপ্তির ন্যায় বৌদিদিকে যে পাইয়াছে, সে রমলাকে সহ্য করিতে পারিবে না। শেষবারের মত আর একবার বাড়ীটার দিকে চাহিয়া স্নেহকাঙ্গাল হতভাগ্য সুদীপ কোঁচার খুঁটে চক্ষু মুছিতে মুছিতে অদৃশ্য হইয়া গেল।

নালন্দায়

[শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ]

ট্রেণখানা যখন নালন্দা ষ্টেশনে এসে থাম্‌লো তখন মন উৎফুল্লে ভরে উঠ্‌লো। কতদিন ইতিহাসে পড়েচি যার কথা, যার কীর্ত্তি-কাহিনী শুনে হৃদয় গর্ব্বে নেচে উঠেছিলো, আমার সেই কল্পনার সামগ্রীটিকে আজ নিজের চোখে দেখ্‌বো, অনুভূতি দিয়ে দরদীর ন্যায় দু'ফোঁটা অশ্রু বিসর্জ্জন ক'রে—নিজেকে তৈরী কর্‌বো সমব্যথী।

ষ্টেশন থেকে মাইল তিনেকের পথ—পায়ে চলা ছাড়া অন্য কোন প্রকার যাতায়াতের ব্যবস্থা নেই। কালে ভদ্রে কেউ কখনো আসেন, তার জন্যে যান-বাহনাদির ব্যবস্থা না থাকাই স্বাভাবিক। কুলীর মাথায় এক রাত্তিরের উপযোগী বেডিং ও অতি আবশ্যকীয় দ্রব্যে-ভরা সুটকেশটি চাপিয়ে রাস্তায় এসে পড়লুম। ষ্টেশনের পাশেই রাস্তা। অস্তাগত সূর্য্যের ম্লান রশ্মির বিদায় নেবার অবসর এসেচে। আমরা পৌছে এলুম বলে'। ক' মাইল রাস্তাই মাঠের মাঝখান দিয়ে সোজা চলেচে। মাঝে মাঝে গ্রামও পড়ে—অতি নগণ্য, অতি সুন্দর। অধিবাসীরা বের হ'য়ে আসে চৌকাঠ পার হ'য়ে জুতোর শব্দে আর অহেতুক কলরবে। রাস্তার বাঁ দিকে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় আর দক্ষিণ দিকে মিউজিয়াম্—শুধু চল্‌তে চল্‌তে বাহিরের আবরণ যতটা চোখে পড়ে—দেখে নিলুম। মনের সঙ্গে হিসেব ক'রে ঠিক কর্‌লুম, কাল ভোরে ধীরে-সুস্থেই সব দেখ্‌বো। এখন আপাততঃ রাতের আস্তানার খোঁজে যেতে হ'বে। যদিও এ ব্যবস্থাটা আমাদেরই এক জয়পুরী বন্ধু পূর্ব্ব হ'তেই ঠিক ক'রে রেখেছিলেন।

বিশ্ব-বিদ্যালয়কে দু' ফার্লঙ পেছনে ফেলে একটী ধর্ম্মশালা পড়ে। এইটিতেই সকলে এসে ক্ষণিকের সংসার বাঁধেন। আমাদের যদিও এটাতে থাক্‌তে হয়নি, তবুও দেখ্‌বার সৌভাগ্য হ'তে বঞ্চিত হইনি। রাজগৃহের ছাঁচে এটাও তৈরী। তারতম্য বিশেষ কিছুই নেই, তাই বাহুল্যতার ভয়ে ছেড়ে দিলুম। তবে এর সংলগ্ন বাগানকে মধুপুর, জেসিডির নার্শারীর সঙ্গে তুলনা করা চলে।

সন্ধ্যেটা তাঁবুতে না কাটিয়ে দিয়ে পল্লী শ্রী দেখ্‌বার আশায় বেরিয়ে পড়লুম ভৈরীলাল বাবুকে সঙ্গে নিয়ে। (এঁকে আমাদের বন্ধু রূপে পেয়ে নালন্দার স্বরূপ দেখ্‌বার সুযোগ ঘটেচে।) যে রাস্তাটা সোজা এসেচে এতখানি পথ, সেইটেই গাঁয়ের মাঝখান দিয়ে চলে গেছে। গাঁ বল্‌তে প্রকাণ্ড একটা দিঘীর চার পাড়ের খানিকটা সমভূমি। কৃষিজীবীই গাঁয়ের ভরসা। এই দিঘীর পাড়ে বছরে একটি করে' মেলা বসে ও-দেশের বিখ্যাত পর্ব্ব 'ছট্‌ পূজার' কালে। তখন নানাদেশ থেকে লোক আমদানী হয়।

মনেতে রয়েচে একটা নূতন জিনিষ দেখ্‌বার আগ্রহ, ভোরেই ঘুম ভেঙ্গে গেলো। অনেক রাত পর্য্যন্ত তাস খেলার দরুণ ভৈরীলাল বাবুর উঠ্‌তে একটু বেলা হ'য়ে গিস্‌লো। কাজেই নবোদিত সূর্য্যের আলোকপাতে ঘুমন্ত গাঁ খানা রাঙিয়ে দেবার পর মূহূর্ত্তেই আমরা রওনা হলুম,— রাহুল সাংকৃত্যায়নের ভাষায় বল্‌তে গেলে বল্‌তে হয়—'নালন্দার চিতা দর্শনে।'

ভৈরীলাল বাবু, (পথ-চল্‌তে কুড়িয়ে-পাওয়া বন্ধু) বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, (আমার আবাল্যের বন্ধু), আমি ও রামু সেই শিশির ভেজা গাঁয়ের পথ ধ'রে আকাঙ্ক্ষিত বন্ধুটিকে দেখ্‌তে বেরুলাম। মনে ও বাইরে যখন থাকে না-কো কোনো না-পাওয়ার আবিলতা, তখন সব খুইয়েই আনন্দ। এই কারণেই আজকের এই দিনটিকে জীবনের ইতিহাসে এমন ভাবে রাঙিয়ে রেখে যেতে চাই, যাতে না কোনোদিন মলিন হ'য়ে যায় এর ঔজ্জ্বল্য। যতই নিকটবর্ত্তী হ'তে লাগ্‌লুম, ততোই অজানা আবেগ প্রকাশ পেতে লাগ্‌লো।

রোদ তখনো গাছের মাথা থেকে রাস্তায় নেমে আসেনি। দু' আনা দিয়ে টিকিট কেটে প্রত্যেকে ভেতরে ঢুক্‌লুম—সে এক পেল্লায় ব্যাপার কল্পনাতীত। প্রথম ঢুকেই বৌদ্ধ স্তূপটি নজরে পড়ে। সবই আজ চলে গেছে ভাষার অতীত তীরে। এখন যেটা পড়ে আছে, সেটাকে ভারমুক্ত একটা স্মৃতি বৈ আর কিছুই বলা যেতে পারে না। এর সিঁড়ির ধাপগুলো দেখ্‌লে এখনো চোখে বিস্ময়ের সীমা থাকে না। চারিপাশে বজ্রপাণি, পদ্মযোনি, অবলোকিতেশ্বর, কাংস্য মূর্ত্তি ব্যতীত তথাগতের অসংখ্য মূর্ত্তি। ছাত্রদের লম্বা হলটি এখনো বেশ পরিষ্কার ভাবে দেখা যায়। খুব্‌রী খুব্‌রী ঘর, প্রত্যেকটীতে একটি করে' বই রাখ্‌বার সেলফ—

সমস্তই এখন অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া যাচ্ছে। যেখানে দাঁড়িয়ে অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকবৃন্দ ছাত্রদের উপদেশ এবং জ্ঞান ও বিদ্যা শিক্ষা দিতেন—সে সমস্তই এখনো সময়কে ভুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গ্রীষ্মের সময়ে যাতে কোনরূপ কষ্ট না হয়, সেইজন্যে পাতালপুরীতে গৃহ নির্ম্মাণ করা হ'য়েছিলো। জানালা ও দরজায় যেখানে যেখানে কাঠ ছিলো, এখন সেখানে কাঠ-কয়লা পাওয়া যাচ্চে। এই থেকে অনেকেই অনুমান করেন যে, এই বিশ্ববিশ্রুত বিশ্ব-বিদ্যালয়কে কোন স্বেচ্ছাচারী নরপতি পুড়িয়ে দিয়েছিলো হয়তো, কোন না কোন সময়ে। এ ছাড়াও কলসী কলসী চাল পাওয়া গেছে, সেগুলো পোড়া। যদিও পাথরের প্রচলন এ দেশে তখন খুবই ছিল, কিন্তু এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্তই প্রায় তৈরী হয়েছিল ইটের ও কাঠের দ্বারা। ছাদগুলো অবশ্য পাথরের চাঙড় বসিয়ে বসিয়ে নির্ম্মাণ হ'য়েছিলো। দু'তলা, তিনতলা বাড়ীর প্রমাণ পাওয়া যায় কিন্তু ছাদ কোনটিতেই নেই। সিঁড়িগুলো এরূপ কৌশলে হ'য়েছিলো যা, এখনো বিস্ময়ের উদ্রেক করে। সূক্ষ্মদৃষ্টি নিয়ে দেখ্‌লে তিনটি স্তর বেশ সুন্দর ভাবে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। যেন একটির পর অপরটির নির্ম্মাণ কার্য্য হ'য়েছিলো। নতুবা এরূপ স্তর বৈষম্য সম্ভব হ'তো না। এ সব বিষয়ে গবেষণা কর্‌বার মাল মস্‌লার একান্ত অভাব এখন ক্ষুণ্ণ করে আমাদের প্রতিনিয়ত। নতুবা এর অস্তিত্বের আভাস আমরা বিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বে পাইনি কেন ? মিউজিয়ামে অসংখ্য বুদ্ধদেবের বহুপ্রকার ধাতুর নির্ম্মিত মূর্ত্তি বিকৃত ও অবিকৃত অবস্থায় সাজানো আছে। এ ছাড়া ভাঙা বাসন-কোসন্‌, বর্ম্ম, নানাবিধ পোষাক পরিচ্ছদ, অলঙ্কার, অস্ত্র-শস্ত্র, মুদ্রা, তাম্রলিপি, অনুশাসন পত্র, ইত্যাদিতে মিউজিয়াম ভর্ত্তি।

কালের নিষ্ঠুর গতিতে সবেরই পরিবর্ত্তন হয়। এখন বিশ্ববিদ্যালয় বল্‌তে আমরা সাধারণতঃ বিদ্যার কেন্দ্রকেই বুঝি। কিন্তু পূর্ব্বে বিশ্ববিদ্যালয় বল্‌তে মোটেই তা বোঝাত'না। প্রাচীন-কালে ব্রাহ্মণেরা বা বৌদ্ধ ভিক্ষুরাই বিদ্যাদান কর্‌তেন। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা মঠ স্থাপনা করে' বিদ্যার্থীদের শিক্ষা দিতেন। শিক্ষা যে কেবল ধর্ম্ম বিষয়েই দেওয়া হ'তো, তা নয়—সকল রকমেরই দেওয়া হ'তো। এই প্রকার একটা বিশ্ববিদ্যালয় নালন্দায় গঠিত হ'য়েছিলো।

হুয়েন সাঙ্‌ যখন নালান্দাতে পড়্‌তে আসেন, তখন তিনি অনেক জনরব শুনেছিলেন। সেগুলি তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিপিবদ্ধ আছে। তিনি বলেন, "নালন্দা মঠটী একটি আম্রকুঞ্জে অবস্থিত ছিলো। এই কুঞ্জের পুকুরে নাকি একটি নাগ বাস কর্‌তো। সেই নাগের নাম থেকেই আম্রকুঞ্জের নাম হয় নালন্দা। আবার কেহ বলেন,—ভগবান পূর্ব্বজন্মে এখানে তপস্যা কর্‌তেন। জীবনের দুঃখ কষ্টে তাঁর হৃদয়ে বেদনার একটা সুস্পষ্ট ছাপ দিয়েছিলো, ব্যথার একটা পরশ বুলিয়ে দিয়েছিলো তাঁর অন্তরে, তাই তিনি ...

বিলিয়ে দিয়েছিলেন। সেইজন্যে তাঁর নাম হয় 'না-আলম্‌দা' অর্থাৎ নালন্দা, মানে যার সর্ব্বস্ব বিলিয়েও তৃপ্তি হয় না। (Watter's Yuan Chwang. Vol. II. P. 165).

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কবে হ'য়েছিলো, তার কোন স্থিরতা নেই। সম্ভবতঃ, গুপ্ত যুগেই এর প্রাদুর্ভাব হয়। চতুর্থ শতকেতে যখন ফাহিয়ান্ এদেশে আসেন, তখন মগধ ভ্রমণকালে তিনি নালন্দার উল্লেখ করেননি। কিন্তু সপ্তম শতকে হুয়েন সাঙ্ যখন আসেন, তখন নালন্দার উন্নতির যুগ, এই কারণে মনে হয় ফাহিয়ানের আগমনের পরে এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হ'য়েছিলো।

প্রাচীন ভারতে আমরা তক্ষশিলা, নালন্দা ও বিক্রমশীলার বিশ্ববিদ্যালয়ের উল্লেখ পাই। এই তিনটীর মধ্যে যেখানে বিদেশী ছাত্র এসে সেখানকার দৈনন্দিক জীবনের বর্ণনা রেখে গেছেন, সেইখানেরই আমরা একটি উজ্জ্বল, একটি জীবন্ত ছবি পেয়েচি। সেই হিসাবে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় খুব ভাগ্যবান কারণ, এখানে এর সম্বন্ধে আমরা দু'জন প্রসিদ্ধ চীন পর্য্যটকের বর্ণনা পাই। এই দু'জনের বর্ণনা একত্র করে' আমরা নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটী সম্পূর্ণ চিত্র মনের মধ্যে এঁকে নিতে পারি।

মঠের মধ্যে যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ, যিনি বিদ্যায়, জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ,—তিনি অধ্যক্ষের পদ পেতেন। এখন আমরা তাঁকে 'চান্‌সেলার্' ব'লে থাকি। কারণ সকল বিষয়ে তাঁর মতই শ্রেষ্ঠ বলে' বিবেচিত হ'তো। হুয়েন সাঙ্ যখন নালন্দায় পড়তে আসেন, তখন শীলভদ্র সর্ব্বাধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি সমতটের রাজকুমার। বাল্য হতেই লেখাপড়ায় তাঁর খুব ঝোঁক ছিল। ত্রিশ বছর বয়সে তিনি অন্যান্য ছাত্রদের ন্যায় এখানে পড়্‌তে আসেন। তখন বোধিসত্ত্ব 'ধর্ম্মপাল' বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তা ছিলেন। শীলভদ্র তাঁর কাছেই শিক্ষা পান। শোনা যায় যে, একবার নাকি এক মহাপণ্ডিত ধর্ম্মপালের সঙ্গে তর্ক কর্‌তে রাজসভায় আসেন। শীলভদ্র গুরুকে না যেতে দিয়ে, নিজে তর্কে গিয়ে সেই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে পরাস্ত করেন। সেই ঘটনা থেকে শীলভদ্রের পাণ্ডিত্যের কথা দেশ বিদেশে রাষ্ট্র হ'য়ে পড়ে। (মহামহোপাধ্যায় ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের অভিভাষণে দ্রষ্টব্য।) তারপরই তিনি নালন্দায় সর্ব্বাধ্যক্ষের পদ পান। এখানে আর যে সব পণ্ডিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে চন্দ্রপাল, স্থিরমতি, গুণমতি, প্রভামিত্র, জিনমিত্র, পদ্মসম্ভব—এই কয়জনের নাম উল্লেখযোগ্য।

বাঙ্‌লার পাল রাজারা যখন মগধ জয় করেন, তখন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁদের অধীনে আসে। রাজা দেবপাল তাঁর সময়ে বীরদেবকে মঠের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেছিলেন। (গৌড়

এখানে অধ্যয়ন কর্‌তে আস্‌তো। ভারতের সকল প্রদেশ থেকে, এমন কি সুদূর গান্ধার, তিব্বত, চীন থেকেও ছাত্র আস্‌তো। সপ্তম শতকে হুয়েন সাঙ্‌ যখন এখানে সংস্কৃত শিখ্‌ছিলেন, তখন ছাত্র ও ভিক্ষু নিয়ে সর্ব্বসমেত দশ হাজার লোক ছিল। (Beel's—Life of Hiuen Tsiang. P. 110) যে সকল ছাত্র এখানে পড়তে আস্‌তো, তাদের জন্যে পৃথক পৃথক বাসগৃহ দেওয়া হ'তো। নালন্দা খনন করে' এখন আবিষ্কৃত হ'য়েচে যে, একটি ঘর ১২ ফিট দীর্ঘ ও ৮ ফিট প্রস্থ ছিল।

প্রাচীন ভারতের আদর্শ ছিল বিদ্যা দান করা—বিদ্যা বিক্রয় করা ভারতের আদর্শের বিরুদ্ধে। এখানে ছাত্রদের নিকট কোনরূপ বেতন নেওয়া হ'তো না। নালন্দায় সর্ব্বব্যয় নির্ব্বাহ কর্‌বার জন্যে রাজন্যবর্গের নানাপ্রকার দান ছিল। ইৎ সিং বলেন যে, তাঁর সময়ে নালন্দা মঠের সম্পত্তি ২০০ গ্রাম ছিল। (শ্রীফণীন্দ্রনাথ বসুর 'নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয়' দ্রষ্টব্য)

প্রত্যেক ছাত্রের বোধ হয়, আহারের পৃথক বন্দোবস্ত ছিলো। হুয়েন সাঙ্‌ বলেন, তাঁর জন্যে ১২০টি জম্বীর, ২০টি জায়ফল, ২০টি খেজুর, ২৷৷০ তোলা কর্পূর, এক পোয়া মহাশালী ধান্যের চাল, কিছু মাখন, আর মাসেতে তিন রাশি তৈল দেওয়া হ'তো।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় প্রধানতঃ একটি বৌদ্ধ মঠ হ'লেও, কখনও কার্য্যের মধ্যে একটুও শিথিলতা ছিলো না। সকল কার্য্যই ঠিকমত নিষ্পন্ন হ'তো। প্রতিদিন প্রাতে ঘণ্টাধ্বনি হ'লে ভিক্ষুরা ও ছাত্রেরা দল বেঁধে পুকুরে স্নানে যেতেন। তাঁদের হাতে স্নানের বস্ত্রাদি থাক্‌তো। অধ্যয়নের সময় নানাস্থানে অধ্যাপকগণ ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন। সন্ধ্যার সময় ভিক্ষুরা এক গৃহ থেকে অন্য গৃহে সান্ধ্যগীত গেয়ে বেড়াতেন।

নালন্দাতে সর্ব্বসমেত ৬টি মহাবিদ্যালয় বা কলেজ ছিল। নানাদেশের রাজারাই অর্থ দিয়ে এই সব কলেজ স্থাপন করেছিলেন। ১ম মহাবিদ্যালয়টি—শক্রদিত্য নামে রাজা নির্ম্মাণ করে' দিয়েছিলেন। ২য়টি—রাজা বুধ গুপ্তের অর্থ সাহায্যে নির্ম্মিত হ'য়েছিলো। ৩য়টির জন্যে তথাগত রাজা টাকা দিয়েছিলেন। ৪র্থ টি—বাণাদিত্য নির্ম্মাণ করিয়ে দিয়েছিলেন। ৫মটি—বজ্রনামে এক রাজার সাহায্যে প্রস্তুত হ'য়েছিলো। ৬ষ্ঠটি স্থাপিত করেছিলেন মধ্যভারতের একটী রাজা। এই রকম নানা দেশের রাজারা যাঁরা এখানে এসে এখানকার কার্য্যকলাপ নিজের চোখে দেখে গেছেন, তাঁরাই টাকা দিয়ে এগুলি স্থাপন করে' গেছেন। সকল দেশের ইতিহাসে এরকম বড় একটা দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। (Ancient Geography—Cunningham দ্রষ্টব্য)

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষত্ব এই ছিলো যে, যদিও এটি বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান, তবুও এখানে অধ্যাপনা কেবল বৌদ্ধ শাস্ত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো না। যাতে মানুষের জ্ঞানের বিকাশ পূর্ণমাত্রায় হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের সকল প্রচেষ্টা, সকল যত্ন একই উদ্দেশ্যেই নিয়োজিত হ'তো। মানুষের জ্ঞান যত কিছু বিদ্যা আবিষ্কার করতে পেরেচে, সেই সকল বিদ্যার শিক্ষা এই মঠে দেওয়া হ'তো। সেইজন্যে হেতু বিদ্যা, শব্দ বিদ্যা, চিকিৎসা বিদ্যা, ব্যতীত বৌদ্ধ দর্শন, ত্রিপিটক, জাতক ও বাস্তু শাস্ত্রেরও অধ্যাপনার ব্যবস্থা ছিলো। ভিক্ষুরা ব্রাহ্মণদের অবহেলার চোখে কখনো দেখ্‌তেন না। সেইজন্যে হিন্দুর শাস্ত্র, সাংখ্য, বেদান্ত ও অন্যান্য দর্শনের আলোচনাও এখানে যথেষ্ট হ'তো। প্রথমে এখানে ছাত্রদের কোনরূপ উপাধি দেওয়া হ'তো না। না থাকার দরুণ অনেক ছাত্র, নালন্দার ছাত্র ব'লে পরিচয় দিয়ে সাধারণের নিকট হ'তে সম্মান নিতো। এই কুপ্রথা দূর করবার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ উপাধি বিতরণের প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন। উপাধিতে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের শীলমোহর থাক্‌তো। সেই শীলমোহরে লেখা থাক্‌তো, "শ্রী নালন্দা মহাবিহারী আর্য্য—ভিক্ষু সংঘস্য।" ঐতে একটা ধর্ম্মচক্র আঁকা থাক্‌তো, তা'র দু' পাশে দু'টো হরিণ ওপরের দিকে মুখ করে' থাক্‌তো। (Archeological Reports, Eastern Circle দ্রষ্টব্য) আজকাল এই রকম শীলমোহর পাওয়া যাচ্চে বিস্তর।

বেলা দু'টো হ'বে—শরীরের অবসন্নতা আর অন্তরের বেদনা নিয়ে বেরিয়ে এলুম। আজই সন্ধ্যের পূর্ব্বে আমাদের রওনা হ'তে হ'বে। বাসায় গিয়ে কোনো কাজে তেমন মন বসাতে পারলুম না। আজ ভাব্‌চি,—ওটা ভবিষ্যতের জন্যে তুলে রেখে দিলেই ছিলো ভালো। তবু একটা না-দেখার বেদনার উপচার নিয়ে বর্ত্তমানের পূজারী হ'য়েও, ভবিষ্যতের দিকে উঁকি মারবারও সুযোগ পাওয়া যেতো।

— শেষ —

আগমনী

[শ্রীরমেন্দ্রনাথ ঘোষ]

আবার আজি মায়ের আগমন,
কোথায় ওরে, প্রবাসী তুই,—
কর্‌রে ঘরে ফেরার আয়োজন।
বাজ্‌চে সানাই পূজা-আঙিনায়
দেশের ছেলে আয়রে ছুটে সব,
ছড়িয়ে পড়ুক তোদের কলরব—
জগৎ পারে অসীম নীলিমায়।
মেঘগুলি তার পাল তুলে যায়,
আপন মনে হেসে হেসে—
ধরার বুকে জাগিয়ে শিহরণ।

মা-হারা ওরে, ছোট ছেলে-মেয়ে
আজ্‌কে তোদের মা এসেচে ঘরে,
আয়রে ছুটে আগমনী গেয়ে।
থাক্‌রে পড়ে তোদের খেলাঘর,
আজি মায়ের মুখের পানে চেয়ে,
সকল ব্যথা ভুলে, আগমনী গেয়ে,
আয়রে ছুটে, ভুলে আপন-পর।
ভুবন গেছে আলোর রথে ছেয়ে
থাকিস্ কেন বিরস মুখে তবে
ঝঞ্ঝা বেগে চল না তোরা ধেয়ে।

থাক্‌রে পড়ে হাতের যত কাজ,
আস্‌বি তোরা নিজের ঘরে—
এতে তোদের আছে কিবা লাজ !
সাগর জলে কমল বালাধারে—
মায়ের হাসি ফুটে ওঠে আজ।
মা-হারা আজ মা পেয়েছে ঘরে,
আনন্দে তাই ডাক্‌চে সবারে।
মায়ের হাসি দেখ্‌তে ওরে,
ঘরের ছেলে আয়রে ঘরে—
মায়ের কোলে আপন জন মাঝ।

প্রবাসী কর্‌ ফেরার আয়োজন ;
প্রবাসে কেন রইবি এখন,—
সবাই চলে নিজের নিকেতন।
পাখীরা মেতেছে মা'র আবাহনে ;
সুপ্ত যারা—তারাও জেগেচে,
মাঠে-ঘাটে আজ শরৎ এসেচে,—
সাজ পড়ে গেছে বিশ্ব কাননে।
গরীব মা'র গরীব ছেলে,
কুড়িয়ে নিয়ে যেখানে যা আছে
সাজিয়ে দেরে ও রাঙা চরণ

"সঙ্গীত"

[শ্রীসতীশচন্দ্র সুর]

"গীতং বাদ্যং তথা নৃত্যং ত্রয়ং সঙ্গীতম্ উচ্যতে"

(সঙ্গীত রত্নাকর ২১ শ্লোক)

গীত, বাদ্য ও নৃত্য এই তিনটীকে সঙ্গীত কহে। তিনটীর মধ্যে গীতই প্রধান। বস্তুতঃ সঙ্গীত সকলের মধ্যেই আছে, ইহা অন্তরের পদার্থ, আপনা হইতেই উদ্ভব হয়, ইহা প্রাণের জিনিষ। ইহা কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া মনপ্রাণ মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ করিয়া দেয়। ইহা মানুষকে আমোদিত করে এবং ভগবৎপ্রেম মনুষ্য-হৃদয়ে সঞ্চার করে। রামপ্রসাদ, কবির, চৈতন্যদেব গানের ভিতর দিয়াই ভগবানকে আরাধনা করিতেন। গানে দেবতারা পর্য্যন্তও প্রীত হন,—অপরের কথা বলা বাহুল্য। কোকিলের কুহুস্বরে. পাপিয়ার মধুর রবে, বিহঙ্গমের কলকণ্ঠে সঙ্গীত ধ্বনিত হয়। বস্তুতঃ জগৎময় সঙ্গীত ধ্বনিত হইতেছে, এমন কি, নভোমণ্ডলে চন্দ্র, তারকা, গ্রহসকল একপ্রকার গান করিতেছে। আমাদের সে প্রকার কাণ থাকিলে, শুনিতে পাইতাম।

সঙ্গীতের মাধুর্য্যে সকলেই মুগ্ধ হয়, এমন কি আত্মহারা হয়। সঙ্গীত মন্ত্রৌষধি। কীর্ত্তন গানে কেহ কেহ কাঁদিয়া থাকেন এবং মোহপ্রাপ্ত হন। বন্য পশুরাও গানে মুগ্ধ হয়। দেখা যায় হরিণ, সর্প, বাঁশীর তানে মুগ্ধ হইয়া কিয়ৎক্ষণের জন্য খল-স্বভাব ভুলিয়া যায়। ইহা মনুষ্যহৃদয়ে সান্ত্বনা দিতে পারে। যুদ্ধের সময়ে যখন সকল দিকে কেবল মৃত্যুর করাল ছায়া, ধ্বংস ও নৃসংশ ব্যাপার দেখিয়া সৈন্যসকল বিষণ্ণ ও উৎসাহশূন্য হয়, তখন কেবল সামরিক সঙ্গীত (Fife & Drum) তাহাদিগকে উত্তেজিত করে এবং যুদ্ধ করিতে উদ্যত হয়। কথায় বলে "Music is higher science than medicine, because it paves one's way to salvation quickly whereas medicine gives bodily and worldly' relief only''.

অসভ্যতম আফ্রিকাবাসী এবং সুসভ্য অন্যান্য জাতি সকলেরই ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বাদ্য ও সঙ্গীত আছে।

পণ্ডিতগণ বলেন সুর ব্রহ্ম। সুতরাং দেবগণের পূজা ও আরাধনা করিবার একমাত্র উপায় সুর, তাল, লয়বিশিষ্ট সঙ্গীত। তাই, রামপ্রসাদ, চৈতন্যদেব, কবির, নানক, তুলসীদাস ভজন ও সংকীর্ত্তন প্রথা প্রবর্ত্তন করেন।

সঙ্গীতের আলোচনা—সঙ্গীতের ন্যায় চিত্তবিনোদন করিবার ক্ষমতা পৃথিবীতে অন্য কোন ললিতকলার নাই, সেই জন্য সঙ্গীত সাধনা করা বড় দুরূহ জিনিষ। প্রথম স্বর-সাধনা, তাহার পর সুর-জ্ঞান, ঝঙ্কার ও মূর্চ্ছনা জ্ঞান, পরে লয়-তাল-জ্ঞান। তাহার পর নৃত্যকলা শিখিতে হইলে শরীরের বিশেষ চর্চ্চা করিতে হয়। কারণ নাচিতে হইলে শরীরের অনেক স্থল, যথা—হাত, পা, নিতম্ব, মস্তক, গ্রীবা প্রভৃতি সঞ্চালন করিতে হয়, তাহাতে শরীরের শক্তি আবশ্যক হয়।

সপ্তস্বর—সাতটী ধ্বনি সঙ্গীতে ব্যবহার হয়,—ইহাই সপ্তস্বর বা সাতটী সুর। এই সাতটী সুরের পৃথক পৃথক নাম যথা—ষড়ঙ্গ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ। এই সপ্তসুরের আদি অক্ষর দ্বারা সপ্তস্বরের প্রত্যেকটী নির্দ্দেশিত হয়, এবং ষড়জ, বৃষভ, প্রভৃতির পরিবর্ত্তে সা, রে, গা, মা, পা ধা নি, এই সাঙ্কেতিক সংজ্ঞা ব্যবহার করা হয়। ইংরাজীতে A, B, C, D, E, F, G, নামে অভিহিত হইয়াছে। আমাদের কণ্ঠে উদারা, মুদারা, তারা, এই তিন সপ্তক সুরের বিকাশ হয়। এই কয়টী অক্ষর দ্বারা সুর ও তাল যথার্থরূপে লিখিয়া প্রকাশ করাকে স্বরলিখন বা স্বরলিপি বলে।

সপ্তস্বর—স্বরের অতি সূক্ষ্ম মাত্রাকে শ্রুতি বলে। সাতটী স্বরের ভিতর দিয়া আমরা ২২টী শ্রুতি দেখিতে পাই। ষড়জ, মধ্যম ও পঞ্চম = ৪ শ্রুতি প্রত্যেক ঋষভ ও ধৈবত = ৩ শ্রুতি, গান্ধার ও নিষাদ = ২ শ্রুতি প্রত্যেক। সাতটী স্বরের ভিতর পাঁচটী স্বর সময় সময় বিকৃতি ভাবাপন্ন হয় যথা কোমল ঋ, গা, ধা, নি প কোড়ি মধ্যম ॥

রাগ ও রাগিণী আলাপ—বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত এই তিন রূপ লয় লইয়া রাগের আলাপ করা হয়। রাগ আবার ৪ ভাগে বিভক্ত যথা, বাদী, সম্বাদী, অনুবাদী ও বিবাদী। রাগের যে সুরটী প্রাণস্বরূপ হইয়া সুরের ভিতর খেলা করে তাহাকে বাদী অংশ বলা হিন্দি ভাষায় "জান" বলে। বাদীর সহগামী যে সুর, তাহাকে সম্বাদী বা ইহার প্রায় নিকটে থাকে। অপর সুরগুলিকে অনুবাদী বলা হয়। আর যে সুরের দ্বারা রাগের অঙ্গহানি হয়—তাহাকে বিবাদী বলে।

মাত্রা—মাত্রা প্রকরণ সম্বন্ধে কিছু জানা আবশ্যক। স্বরের এক একটী উচ্চারণ সময়কে এক একটী মাত্রা বলা হয়। মাত্রা চারি ভাগে বিভক্ত। হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত ও ব্যঞ্জন। হ্রস্ব এক

সময় লাগে তাহাকে দীর্ঘ দ্বিমাত্র কাল কহে। ত্রিমাত্রার নাম প্লুত যেমন অ অ অ। অৰ্দ্ধ মাত্রাকে ব্যঞ্জন বলে। কেবল এই চারি মাত্রার দ্বারা সঙ্গীতের সূক্ষ্মকাল বিভক্ত করা যাইতে পারে না; সেইজন্য অৰ্দ্ধ প্রভৃতি আরও সূক্ষ্ম বিভাগের বিশেষ আবশ্যক দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত মাত্রার সহযোগেই তান, মূৰ্চ্ছনা, আলাপ হইতে গান বাহির হয়। বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত এই তিন রূপ লয় লইয়া রাগের আলাপ হয়।

সঙ্গীত ইতিহাস—সঙ্গীতের জন্ম কি ভাবে কোথা হইতে হইল, তাহা বিশেষ জানা নাই। বোধ হয় মানুষের হৃদয়ের আবেগে যে অস্পষ্ট শব্দ উচ্চারণ হয়, তাহা হইতেই গীতের ক্রমবিকাশ হইয়াছে। আনন্দ প্রকাশ করিতে গিয়া আমরা অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা বা চলিবার ভঙ্গীর দ্বারা তাহা প্রকাশ করিয়া থাকি। এই অঙ্গভঙ্গী, চলিবার গতি বা লম্ফ-ঝম্ফ একটা সুশৃঙ্খল ভাবে চালিত হইলেই নৃত্য হয়, এবং এই সুশৃঙ্খল নিয়মটাই তাল বা ছন্দ। আমাদের অতি পুরাতন শাস্ত্র হইতে জানা যায় যে, বেদের উৎপত্তির সময় হইতেই হিন্দু সঙ্গীতের উৎপত্তি। সাম-বেদ সুর করিয়া পড়িতে হয়। সঙ্গীত গ্রন্থে লেখা আছে যে, দেবাদিদেব মহাদেবই সঙ্গীতের জন্মদাতা। মহাদেব ব্রহ্মাকে গান শেখান। পরে নারদ, ভরত, রম্ভা, তম্বরু ও হুহু সঙ্গীত শিক্ষা করেন। ভরত মুনির দ্বারা ভারতে সঙ্গীত প্রচার হয়।

ধ্রুপদ ও পাখোয়াজ—মহাভারতে জানা যায় যে পঞ্চ পাণ্ডব যখন বভ্রুবাহনের রাজ্যে ছিলেন, তখন অৰ্জ্জুন মহারাজার কন্যাকে সঙ্গীত শিক্ষা দিতেন। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, তৎসময়ে স্ত্রীলোকেরাও সঙ্গীত শিক্ষা করিতেন। অতি প্রাচীনকালে ভগবানের নাম কীৰ্ত্তনের জন্য সঙ্গীত হইত। ধ্রুপদই আরাধনার উপযোগী, কাজেই তখন ধ্রুপদই ছিল একমাত্র কণ্ঠ সঙ্গীত। মৃদঙ্গ বা পাখোয়াজ দিয়াই গীতে সঙ্গত করা হইত। মৃদঙ্গের উৎপত্তি সম্বন্ধে গ্রন্থে লিখিত আছে যে, মহাদেব ব্রহ্মাকে সঙ্গীত শিক্ষা দিবার সময়, ব্রহ্মার তাল জ্ঞান জন্মাইবার জন্য মহাদেব মাটি দিয়া এই বাদ্য যন্ত্র তৈয়ারী করেন। মাটি হইতে তৈয়ার হইয়াছে বলিয়াই ইহার নাম মৃদঙ্গ (মৃৎ + অঙ্গ) হইয়াছে। মৃদঙ্গ পরে কাঠ দিয়া তৈয়ারী হইতে আরম্ভ হয়, তখন ইহার নাম হয় পাখোয়াজ (পাকা + আওয়াজ)। পাখোয়াজের আওয়াজ গুরু-গম্ভীর। কীৰ্ত্তন গানে যে খোল ব্যবহার করা হয় তাহা পাখোয়াজের অনুকরণ। আকবরের রাজত্বকালে তানসেন, বাজু বাওরা, ধ্রুপদ গানের উন্নতি করেন।

মুসলমান রাজত্বকালে সঙ্গীত—মুসলমান রাজত্বের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ধ্রুপদগানই প্রচলিত ছিল। ইহাদের সময় হইতে সঙ্গীত [illegible]

বাঁয়া-তবলার সৃষ্টি, টপ্পার সৃষ্টি, ও ঠুংরির সৃষ্টি। ১২৯৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৩৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সঙ্গীত বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। কথিত আছে আলাউদ্দিন খিলজী অত্যন্ত সঙ্গীত অনুরাগী ছিলেন। তাঁহার দরবারে অনেক সঙ্গীতজ্ঞ সঙ্গীত চর্চ্চা করিতেন। তাহার মধ্যে নায়ক গোপাললাল ও নায়ক আমীর খসরুই প্রধান। আমীর খসরু তেলানা ও খেয়াল গীতের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। তিনি পারস্য দেশীয় কতকগুলি সুর ভারতবর্ষের সঙ্গীতে মিশ্রণ করিয়াছিলেন।

তবলা ও বাঁয়ার সৃষ্টি—খেয়াল গীতের হাল্কা গতি হওয়াতে পাখোয়াজের সঙ্গতে তাহা শ্রুতিমধুর হয় না। সেই কারণে পাখোয়াজ ভাঙ্গিয়া আমীর খসরু বাঁয়া-তবলার সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন।

টপ্পার সৃষ্টি—মহম্মদ শার রাজত্বকালে গোলাম নবী নামে একজন সঙ্গীত-পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম শোরী মিয়া। তাঁহারা দুইজনেই গান রচনা করিয়াছিলেন। কথিত আছে, গোলাম নবী তাঁহার স্ত্রীকে বিদেশে রাখিয়া বিরহ ব্যথা স্বয়ং অনুভব করিয়া, বিরহের গান রচনা করিতেন। শোরী মিয়াও অনেক প্রেমের গান রচনা করিয়াছেন। এই সকল গান শোরীর টপ্পা নামে পরিচিত।

ঠুংরীর সৃষ্টি—লক্ষ্ণৌর নবাব ওয়াজাদ আলী শাহ প্রথম ঠুংরী গানের সৃষ্টি করেন। সনদ ও কদর নামে দুই সঙ্গীতজ্ঞ ইহাকে নানাভাবে বিস্তৃত করেন। এই সময়ে নৃত্যও খুব উন্নতি লাভ করে।

বিদ্যালয়ে সঙ্গীত প্রবর্ত্তন—অনেকদিন পূর্ব্বে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল যে, সঙ্গীত বিদ্যালয়ে (Music in Secondry Schools) প্রবর্ত্তন হওয়া উচিত। এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন মত প্রকাশ হয়। কেহ কেহ মত দেন উচ্চ হিন্দুস্থানী সঙ্গীত (Classical Music) অনুসারে শিক্ষা দেওয়া উচিত; কেহ কেহ বলিলেন—Modern Music শেখান উচিত, কারণ ছাত্রেরা Cassical Music শীঘ্র শিখিতে পারিবে না। সাধারণ লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গীত শেখা এবং সঙ্গীত বিদ্যালয়ে কেবল সঙ্গীত শেখা—এ দুইটার মধ্যে অনেক প্রভেদ আছে। আমার মতে, Music কে একটা Optional Subject না করিয়া, Compulsery Subjects পড়ার সঙ্গে সঙ্গীত শিখাইবার জন্য প্রতি সপ্তাহে তিন periods শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। সঙ্গীত শিক্ষার্থীর

পারিলেই যথেষ্ট হইল। পরে বয়োঃবৃদ্ধি অনুসারে সঙ্গীতের উচ্চাঙ্গ যথা—তাল, রূপ, ঢং (style) গিট্‌কিরী, বাট্‌, প্রভৃতি শিখিতে পারে।

ছোট ছেলে-মেয়েদের গান শেখানর উদ্দেশ্য,—তাহাদের মনে শৈশব অবস্থায় সঙ্গীত বিষয়ে অনুরাগ (Taste) জন্মান, পরে বড় হইলে style শিখিবে। যেমন ইংরাজী শিখিতে হইলে প্রথমে English Grammar পড়া চাই, পরে Rhetoric, Style & Diction শিখিতে হয়। প্রথমেই যে বড় হিন্দুস্থানী কলাবতের (Great Artist) নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করিতে হইবে,—এমন বিশেষ আবশ্যকতা নাই। যেমন উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে ইংরাজী পড়াইবার জন্য যদি আবদার ধরা হয় যে, European শিক্ষক রাখা হউক, কারণ বাঙ্গালী শিক্ষক ইংরাজীর Pronunciation and Intonatious ঠিক হয় না। এটাও যেমন অযুক্তিকর, সেইরূপ প্রথম সঙ্গীত শেখাবার জন্য হিন্দী কলাবত আমদানী করা প্রয়োজন, নতুবা গান বাজনা শিক্ষা হইবে না—ইহাও অযুক্তিকর। আসল কথা সুকুমার মতি বালক বালিকাদিগকে একটু লেখা পড়ার সঙ্গে সঙ্গীত বিদ্যা শিখান উচিত। ছেলে বয়সে যতটুকু আয়ত্ত করিতে পারে, ততটা শিখুক। ওস্তাদ মণ্ডলীর কাছে গান শিখিতে গেলেই ত উপদেশ পাওয়া যায় যে—"দশ বৎসর সা, রে, গা, মা সাধ—তারপর গান গেও।"

আধুনিক গান—আজকাল কলিকাতায় গানের একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। ছেলেমেয়ের দল অধিকাংশই হয় গানে, না হয় বাজনায় মন দিয়াছে। সকাল সন্ধ্যায় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় এবং ধনীলোকের বাটীতে রেডিওতে গান বাজনা শুনিবার জন্য ছেলেমেয়ে জড় হয়। কলের (Gramophone) বাজনার তো কথায় নাই! বড় বড় আসরে উৎকৃষ্ট সঙ্গীত শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সাধারণতঃ কলিকাতায় যে গান রেডিওতে, থিয়েটারে, গ্রামোফনে, বৈঠকখানায় শুনা যায়, তাহাতে অতি অল্পই উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত শুনিতে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের' অতুলপ্রসাদ সেনের, দিলীপকুমারের, কাজী নজ্‌রুলের রচিত সঙ্গীত, এই সকল স্থানে বিশেষ চলে। এই সকল গানের কথা ও রচনা ভাল হইলেও, তাহা জংলা করিয়া গাওয়া হয়। জংলা অর্থে সুরের ও লয়ের প্রকৃত মর্য্যাদা রক্ষা না করিয়া চলা। অর্থাৎ তাল, কর্ত্তব, স্থিতি, মূর্চ্ছনা সব আলাদা—ঠিক্ শাস্ত্রোক্ত বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। সুতরাং গায়কের স্বাধীনতা বজায় রাখিতে গিয়া সঙ্গীতগুলি হালকা হইয়া পড়ে। সুরের সংমিশ্রণে আপত্তি নাই, কিন্তু যেন তাহাতে তাল ও লয় ঠিক্ থাকে। অর্থাৎ একটী নিয়ম-কানুন থাকা চাই। Heredityটির দিকে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

বাংলা গান—আমাদের বাঙ্গালা দেশে নানাপ্রকার গানের প্রচলন আছে—যাহা আমাদের দেশের বিশেষত্ব যথা—কীর্ত্তন, বাউল, রামপ্রসাদী, ভাটিয়ালী, নিধুবাবুর টপ্পা, মধুবানের তুক সুর, ভজন প্রভৃতি। অধুনা রবীন্দ্রনাথের নানা রাগ-রাগিণীর বিষয়ক গান, দ্বিজেন্দ্রনাথের বাংলা খেয়াল, অতুল প্রসাদের বাংলা ঠুংরি, কাজী নজ্‌রুল ইসলামের বাংলা গজল বিশেষ প্রচলিত। ইহাদের কতকগুলি গান যথার্থই অতি সুন্দর ও মর্ম্মন্তুদ। বিশেষতঃ দ্বিজেন্দ্রবাবুর জাতীয় সঙ্গীতগুলি। এই সকল গান মিশ্রিত সুরে গাওয়া হয়, সেইজন্য ওস্তাদরা কিঞ্চিৎ বিরক্ত হন। এখন বুঝিতে পারা যায়, বাংলা গান তার নিজের একটা বৈশিষ্ট্য সৃজন করিতেছে। এইটা নিজের বৈচিত্র্য রচনা ও আবিষ্কার। ইহা ক্রমে ক্রমে Provincialism হইবে। অনেক বৎসর পূর্ব্বে একতান বাদন (Concert) যদিও প্রচলিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহা এক্ষণে সম্পূর্ণ পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে। আজকাল Orchestra সহিত যে সকল গান হয়, তাহা যথার্থই চিত্ত বিমোহিত করে।

বাদ্য যন্ত্র—ভারতবর্ষে পুরাকাল হইতে তারের যন্ত্র বিশেষ প্রচলিত ছিল। যেমন—সেতার, এসরাজ, সুরবাহার, তাম্বুরা, স্বরদ, বীণা, কানণ, রবাব, দিলবাহার, সারেঙ্গী প্রভৃতি। আধুনিক সময়ে বিবিধ বিলাতী বাদ্য যন্ত্র আমাদের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছে। যেমন—Cornet, Clarionet, Picloo, Banjo, Guitar, Bagpipe, Mandolin, Violin, জলতরঙ্গ ঐক্যতান বাদন, অতিশয় সুন্দর এবং সম্পূর্ণ নূতন। বিদেশী গানেরও তাল লয় আছে। কিন্তু আমাদের লয় যেরূপ সূক্ষ্ম, সেইরূপ লয়, তান, কর্ত্তব, মাড়, বিদেশী গানে পাওয়া যায় না। এই হিসাবে ভারতীয় সঙ্গীত অতিশয় বৈজ্ঞানিক এবং কঠিন সাধনার ফল।

সঙ্গীতের উদ্দেশ্য ও মহত্ত্ব—সঙ্গীতের সহিত ধর্ম্মভাবের অতি নিগূঢ় সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধ চিরন্তন। যুগে যুগে যে দিন হইতে মানুষ আপনাকে শিক্ষা ও সংস্কার মধ্যে টানিয়া আনিল, সেইদিন হইতেই—ধর্ম্মের সহিত ঈশ্বরের আরাধনার সহিত সঙ্গীতের প্রভাব ফুটিয়া উঠিল। অতি প্রাচীনকালের কথা দূরে থাকুক ; বর্ত্তমান যুগের শ্রীচৈতন্য দেব, হরিদাস, মীরাবাই, তুলসীদাস, সাধক রামপ্রসাদ, পরমহংস রামকৃষ্ণ দেব, স্বামী বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ কেশব সেন, মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ, সকলেই সঙ্গীতের আনন্দের মধ্যে চিরানন্দময়ের সন্ধান পাইয়াছিলেন। পশুদেরও সঙ্গীত অনুরাগের বিষয় অনেক কথা শুনা যায়। গ্রীক সঙ্গীত বিশারদ আরকিঘস (Archighos) যখন বীণা যন্ত্রে গান করিতেন, তখন বনের জীব জন্তু তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া নৃত্য করিত। বনের

কুরঙ্গকুল ব্যাধের সঙ্গীতে আকৃষ্ট হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করে। জলের জীব পর্য্যন্ত সঙ্গীতের আহ্বানে জলের উপর ভাসিয়া ছুটাছুটী করে,—ইহা এক অদ্ভুত ব্যাপার। প্লুটার্ক (Plutarch) বলেন, বিশ্বনিয়ন্তা এই জগৎকে ঠিক সঙ্গীতের প্রণালীতে সৃষ্টি করিয়াছেন। সঙ্গীত একাধারে আনন্দ, আমোদ, বিশ্বাস ও ভগবানের আরাধনা। এমন প্রাণারাম বিদ্যাকে কাহারও অবহেলা করা উচিত নয়।

সেক্সপিয়ার লিখিয়াছেন—"The man, that hath no music in himself, nor **is moved with concord of sweet sounds,** let no such man be trusted, he is fit for torsion" বস্তুতঃ অনেকের সঙ্গীত কলাবিদ্যা ভালরকম শিখিবার জন্মগত বুদ্ধি নাই, তথাপি তাঁহারা যদ্যপি সঙ্গীতচর্চ্চা করেন, তাহা হইলে অন্ততঃ গানের সমজদার হইতে পারেন এবং সঙ্গীতের চিত্তবিনোদন শক্তি অনুভূতি করিতে পারেন। যাঁহারা কণ্ঠসঙ্গীতে চেষ্টা করিয়া বিফলমনোরথ হইয়াছেন, তাঁহাদের কর্ত্তব্য, যন্ত্রাদিতে কিঞ্চিৎ সঙ্গীত চর্চ্চা করা।

উপসংহারে এই সার কথা বলিতে চাই যে, প্রকৃত ও সাধু উদ্দেশ্য লইয়া সঙ্গীত অভ্যাস ও চর্চ্চা করিলে মানুষ দেবতুল্য ও সর্ব্বলোকপ্রিয় হয় আর হীন উদ্দেশ্য লইয়া সঙ্গীতবিদ্যা অর্জ্জন করিলে মানুষ হীন হইতে হীনতর হয়। এরূপ আশা করা যায় না যে, সকলেই ওস্তাদ ও কেলোয়াত হইবে, কিন্তু চেষ্টা করিলে অনেকেই সামান্য প্রকারের সঙ্গীত শিক্ষা করিয়া অবসর সময় বিশুদ্ধ আমোদে ও ভগবানের আরাধনায় কাটাইতে পারেন।

চল্‌তি-পথের-শেষে

[শ্রীমতী অপরাজিতা ঘোষ]

আজি অবেলায় শুনালো কে মোরে বিদায় বাঁশীর তান?
শেষ হয় নাই ঋণশোধ করা—বাঁধা হয় নাই গান।
বীণা মোর আছে বেসুরো হইয়ে, পথ কিনারার ধারে;—
মনে ছিল আশা কুড়ায়ে লইব, যেদিন চলিব পারে।

আজি অসময়ে কেন ডাক দিলে জীবন-দেবতা অয়ি?
ফুরায়ে কি গেল মোর খেলা করা ওগো মঙ্গলময়ী।
সারা হয় নাই, খেলাঘরখানি নূতন করিয়া গড়া—
নব জীবনের ইতিহাসখানি ...

বন কুসুমের মালা গাঁথা নাই—শূণ্য রয়েছে ডালা।
কেমনে আজিকে শেষ করি' দিব—চল্‌তি-পথের পালা !
দাঁড়াও, দাঁড়াও, ক্ষণেক দাঁড়াও—বন্ধ করো না সুর,
সব কাজ মম সারিতে দাও গো, চলিব যে অতি দূর।

প্রদীপ এখনো হয় নাই জ্বালা—তোমার আরতি তরে !
আসন এখনো হয় নাই পাতা—আমার পূজার ঘরে।
সান্ধ্য-প্রদীপ জ্বলেনি এখনো—তুলসী মঞ্চতলে,—
মম পরিচিত পথ-প্রবাসীরা আসে নাই কুতূহলে।

জননী আমার পথ চেয়ে আছে বসিয়া সাগর-তীরে।
পথের শেষেতে দেখা দিয়ে আসি - এখুনি আসিব ফিরে।
ততোখ'ন তুমি মম দেবালয়ে বন্দী রহ গো দেবী,
বিফল কামনা সফল হইবে বারেকের তরে সেবি'।

দান বিনিময়ে কি দিব তোমায়, নাই মম আজ কিছু।
অতীতের কোলে ফেলিয়া দিয়াছি, চাহিব না আর পিছু।
না ডাকিতে তুমি আসিয়াছ দেবী, আমার আঙিনা দ্বারে,
তব কৃপা স্মরি' শির আজি তাই নত করি বারে বারে।

সোদর আমার রয়েছে পড়িয়া ঘাসের ফুলের 'পরে।
কুড়ায়ে লইয়া ফেলিব তাহারে ওপারের বালুচরে।
বন্ধন কিছু রাখিব না আমি, আমার বিদায় সাথে,
ভাঙিয়া ফেলিব যা কিছু গড়েছি—নিষ্ঠুর মম হাতে।

বেচা-কেনা মোর সাঙ্গ করেছি, যেতে হ'বে খেয়া ঘাটে।
সোণার তরণী ভিড়াবো না আর—নূতন নূতন হাটে।
একটানা স্রোতে যেতে হ'বে ভেসে পরিচিত দেশ ছাড়ি'।

বোঝা-পড়া তবে হোক্ অবসান আজিকে সবার সাথে।
বাহিরিব আমি চুপিসারে মাতা, গহীন্ নিঝুম রাতে।
পিছন পথেতে ডাকিও না যেন, হইয়া নিমেষ হারা—
আমারি লাগিয়া ঢালিও না যেন, চোখের জলের ধারা।

সব দোষ ভুলি' ক্ষমিয়ো আমারে—ঘুম থেকে উঠে প্রাতে।
ভাবিও না যেন—কেমনে চলিব এক্‌লা আঁধার রাতে।
সাথী আছে মোর সারা পথখানি—মম অন্তর্য্যামী ;
বিদায়,—বিদায়, জননী আমার আজিকে চলিনু আমি।]

সংবাদিকা

আমরা অতিশয় আনন্দচিত্তে জ্ঞাপন করিতেছি যে, বেঙ্গল পাব্‌লিক হেল্‌থ ডিপার্টমেন্টের স্থায়ী ডিরেক্টার মিঃ এ, সি, চ্যাটার্জ্জি, আই-এম-এস্, মহোদয় ছুটি লওয়ায়, তাঁহার স্থলে উক্ত ডিপার্টমেন্টের এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ডিরেক্টার, আমাদের স্বজাতির অন্যতম সুসন্তান ডাক্তার শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র নাথ শূর, এম্-বি, ডি-টি-এম্, ডি-পি-এইচ্, মহাশয় সম্প্রতি অস্থায়ীভাবে ডিরেক্টার হইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি আরও একবার উক্ত পদে অস্থায়ীভাবে কার্য্য করেন। অস্থায়ী হইলেও আমরা তাঁহার এই পদোন্নতিতে আনন্দ প্রকাশ করিতেছি। তিনি যেরূপ সদালাপী, লোকপ্রিয় এবং কর্ম্মনিপুণ, তাহাতে তিনি যেন উক্ত পদে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হন—ইহাই আমাদের কামনা।

* * * *

মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত কান্দীর লব্ধপ্রতিষ্ঠ, স্বজাতিবৎসল মোক্তার শ্রীযুত গঙ্গানারায়ণ রায় মহাশয় এবারে কান্দী লোক্যালবোর্ডে ভরতপুর থানা হইতে সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তিনি কান্দী মহকুমায় গত কয়েক বৎসর যাবৎ মোক্তারী করিতেছেন এবং অত্যল্পকাল মধ্যে আইন ব্যবসায়ে পারদর্শিতা প্রদর্শন করায় মুর্শিদাবাদ জিলাবোর্ডের এবং কান্দী মিউনিসিপ্যালিটির মোক্তার নিযুক্ত হইয়াছেন।

সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট আছেন। অতি সামান্য অবস্থা হইতে স্বাবলম্বনবলে বলীয়ান হইয়া তিনি যেরূপ জনপ্রিয় এবং সম্মানিত হইতেছেন তাহাতে আমরা আনন্দিত। আমরা তাঁহার উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

* * * *

আমরা শোক-সন্তপ্ত-চিত্তে জ্ঞাপন করিতেছি যে, বগুড়া জেলার অন্তর্গত জয়পুরহাটের প্রসিদ্ধ জমিদার এবং ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত প্রদোৎকুমার ঘোষ মহাশয়ের মাতা ও স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার ঘোষ মহাশয়ের পত্নী গত ৯ই ভাদ্র স্বগৃহে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ধর্ম্মে অতি নিষ্ঠাবতী এবং সকলের সম্মানিতা ছিলেন। দরিদ্রনারায়ণের সেবায় তিনি মুক্তহস্তে দান করিতেন। মৃত্যুকালে তিনি দুই পুত্র এবং পাঁচ কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। মাতৃশ্রাদ্ধে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত প্রদোৎকুমার ঘোষ মহাশয় তাঁহার স্বর্গগতা মাতার আদেশ অনুসারে পাঁচ সহস্র দরিদ্রকে ভূরিভোজনে পরিতৃপ্ত করেন। আমার তাঁহার আত্মার শান্তি কামনা করি।

* * * *

অত্যন্ত কর্ম্মাতিশয্যের জন্য গত দুই একটী সংখ্যায় মুদ্রণে ভ্রম রহিয়া গিয়াছে—এজন্য আমরা দুঃখিত। তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দোষকর দুইটী ভ্রম হইয়া গিয়াছে,—গত জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় সংখ্যায় সদ্গোপ যুবক সঙ্ঘের সহকারী সাধারণ সম্পাদক 'শ্রীযুত ফণীন্দ্রনাথ বিশ্বাসের' স্থলে 'শ্রীযুত ফণিভূষণ সুর' হইয়াছে। এবং 'আমাদের কথা'য় একস্থলে মাননীয় সভাপতি মহাশয়ের নামের শেষে তাঁহার পদবী মুদ্রিত হয় নাই। এজন্য আমরা দুঃখের সহিত ত্রুটী স্বীকার করিতেছি। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটীর জন্য আশা করি, তাঁহারা কিছু মনে করিবেন না।

* * * *

ডাঃ শ্রীযুত কিরণেন্দু ঘোষ এল্-এম্-এস্, ডি-টি-এম্, বিগত জ্যৈষ্ঠ মাসে তাঁহার স্বর্গগতা মাতার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে আমাদের পত্রিকা ভাণ্ডারে ১০৲ টাকা দান করিয়াছেন। আমরা তাঁহার মাতার আত্মার শান্তি কামনা করি।

রায় সাহেব শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ মণ্ডল মহাশয় তাঁহার কন্যার শুভবিবাহ উপলক্ষে সদ্গোপ পত্রিকা ভাণ্ডারে ১০৲ টাকা দান করিয়াছেন। আমরা নবদম্পতির সর্ব্বাঙ্গীন কুশল কামনা করি।

পত্রিকা যথানিয়মে প্রকাশিত হয় নাই বলিয়া উপযুক্ত সময়ে ও উপযুক্ত সংখ্যায় আমরা এই প্রাপ্তি স্বীকার করিতে পারি নাই। এজন্য তাঁহারা যেন আমাদের কোন দোষ গ্রহণ না করেন। আমরা দাতাগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

আমাদের কথা

জাগৃহি—জননী জাগৃহি! শিবশক্তি, মহামায়া, পার্ব্বতি, পরমেশ্বরি! জাগো—মা, জাগো! সন্তানের মোহ-অন্ধকার বিদূরিত করিয়া তোমার দিব্য জ্যোৎস্না-সম্পাতে তাহার হৃদয় আলোকিত কর মা!

জানি মা, তুমি চির জাগ্রতা,—মোহঘোরে আমরাই নিদ্রিত। জীবের পরিত্রাণের নিমিত্ত, কোন এক অজ্ঞাত প্রাচীনযুগেই অসুর-সংহার করিতে কেবলমাত্র আবির্ভূত হও নাই। তুমি আমাদের অজ্ঞাত সুগভীর অন্তঃস্থলে বসিয়া, যুগ-যুগান্তর ধরিয়া, প্রতিনিয়ত—অবিরাম, আমাদের অসংখ্য অসুর দলনে রত। যাহা দৈব নহে—যাহা অসুর, তাহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ হইতে আমাদিগকে মুক্ত করিয়া,—আমাদিগকে শুদ্ধ, বুদ্ধ, ঋদ্ধ করিতে, আমরা তোমাকে না ডাকিলেও—অযাচিতভাবেই আমাদের মধ্যে তোমার মাতৃকার্য্য করিয়া যাইতেছ। কিন্তু আমরা মা, তোমার এই অতি গোপন অশরীরী কার্য্য কিছুই বুঝিতে বা দেখিতে পাই না।

—বুঝিব বা দেখিব কেমন করিয়া! আমাদের দৃষ্টি ও বুদ্ধি এই দেহ পর্য্যন্তই সীমাবদ্ধ! এ দেহের পূর্ব্বে আমাদের অবস্থা, আমরা বিস্মৃত—দেহের পরের অবস্থাও আমাদের অজ্ঞাত। তাহা জানিবার বা বুঝিবার,—জন্ম-মৃত্যুর আবরণভেদী দূরদৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টি আমাদের নাই। তাই, আমাদের মধ্যে তোমার যে অশরীরী মাতৃলীলা প্রতিক্ষণই সংঘটিত হইতেছে, তাহা দর্শন করা, ক্ষুদ্রদৃষ্টি মানুষ আমরা—আমাদের সাধ্যাতীত। আমরা স্থূল, রূপবিশিষ্ট, সীমাবদ্ধ;—সূক্ষ্মকে, অরূপকে, অসীমকে আমরা দেখিতে পাই না। স্থূলে, সরূপে, সসীমে পরিণত করিয়া আমরা সব কিছু দেখি—মনের মধ্যে ধারণ করি। সেইজন্য তোমাকে কিছুমাত্র বুঝিবার জন্য তোমাকে সরূপে দেখিতে চাই! ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ দান করিবার জন্য, অজ্ঞাতভাবে অতি গোপনে আমাদের যে দানবপ্রবৃত্তি—দুর্গতি বিনাশ করিতেছ, তাহা বুঝাইবার জন্য ষড়ানন-গজানন-লক্ষ্মী-সরস্বতী সঙ্গে করিয়া সিংহবাহিনী দনুজদলিনী হ'য়ে সরূপে জাগ্রত হও! সন্তান যে আপন মাতাকে জানে না—চিনে না। তুমি মা,

দলে, তার ত' আর অন্য কোন উপায় নাই ! হে গোপনচারিণী, অরূপিণী মা আমাদের, সন্তানের প্রতি কৃপা করিয়া সাকারে সম্মুখে প্রকাশিত হও ! জাগৃহি, জননি—জাগৃহি !
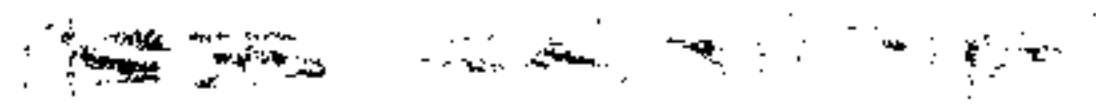
লক্ষ্মি লজ্জে মহাবিদ্যে শ্রদ্ধে পুষ্টি স্বধে ধ্রুবে ।
মহারাত্রি মহাবিদ্যে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥
মেধে সরস্বতি বরে ভূতি বাভ্রবি তামসি ।
নিয়তে ত্বং প্রসীদেশে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥
সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বেশে সর্ব্বশক্তি সমন্বিতে ।
ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি দুর্গে দেবি নমোঽস্তুতে ॥

নিয়মাবলী

১। সমস্ত টাকা কড়ি যুবকসঙ্ঘের 'সেক্রেটারী'র নামে ৩৪, ইণ্ডিয়ান মিরার ষ্ট্রীট, কলিকাতা এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

২। রাজনৈতিক কোন প্রবন্ধ পত্রিকাতে আলোচিত হয় না।

৩। লেখক-লেখিকাগণের মতামত পত্রিকা সম্পাদক বা সদ্গোপ যুবকসঙ্ঘের মতামত নহে।

৪। লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।

৫। প্রবন্ধ কাগজের একপৃষ্ঠে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া পত্রিকা-সম্পাদকের নামে ৩৪ নং ইণ্ডিয়ান মিরার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। ডাকমাশুল না পাঠাইলে অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরত দেওয়া হয় না। প্রবন্ধ পাঠাইবার সময় আপত্তি না জানাইলে পত্রিকা পরিচালক মণ্ডলী প্রবন্ধের যে কোন অংশ পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন করিতে পারিবেন।

৬। যুবক-সঙ্ঘ ও তাহার পত্রিকা সম্বন্ধীয় যাবতীয় সংবাদ যুবক-সঙ্ঘ অফিস ৩৪ নং ইণ্ডিয়ান মিরার ষ্ট্রীটে জ্ঞাতব্য। সন্ধ্যা ৮টা হইতে ৯॥০টা পর্য্যন্ত অফিস খোলা থাকে।

৭। বিজ্ঞাপনের হার সাধারণ এক পৃষ্ঠা মাসিক ৮৲, আধ পৃষ্ঠা ৪॥০, সিকি পৃষ্ঠা ২॥০, সূচীর নীম্নে আধ পৃষ্ঠা ৬৲, সিকি পৃষ্ঠা ৩॥০। বিশেষ বিশেষ স্থানে বিজ্ঞাপনের মূল্য প্রকাশকের নিকট জ্ঞাতব্য।

সদ্গোপ পাত্র-পাত্রীর
বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী

(১) সদ্গোপ পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপন বিনামূল্যে প্রকাশ করা হইবে। কেবলমাত্র পত্রিকার গ্রাহক-গ্রাহিকাগণই এই সুবিধা পাইবেন। কিন্তু স্থানাভাব বা অন্য কোন কারণ বশতঃ এই বিষয়ে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশ না করিবার ক্ষমতা সদ্গোপ যুবক সঙ্ঘের কর্ত্তৃত্বাধীন। (২) বিজ্ঞাপন-গুলি স্পষ্টাক্ষরে ও সংক্ষিপ্ত হওয়া আবশ্যক। উহা যেন এই পত্রিকার ৩ লাইনের অধিক না হয়। (৩) বিজ্ঞাপনে বিবৃত বিবরণের জন্য আমরা দায়ী নহি। পাত্র-পাত্রীর সম্বন্ধ নির্ণয়কারিগণ সমস্ত বিষয় তাঁহারা নিজেদের দায়িত্বে করিবেন। (৪) যাঁহারা নিজেদের নাম প্রকাশ না করিয়া বক্স নম্বর দিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা যদি আমাদের কার্য্যালয় হইতে পত্রাদি লইয়া না যান, তবে উহা প্রেরণের জন্য তাঁহাদিগকে আমাদের নিকট উপযুক্ত (অন্ততঃ আট আনার) ডাকটিকেট রাখিতে হইবে।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ নিয়োগী কর্ত্তৃক দি নিউ ইণ্ডিয়ান প্রেস—৬, ডাফ ষ্ট্রীট হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

THE

BARRACKPORE GOVT. SCHOOL MAGAZINE.

(*QUARTERLY*)

Our School

To get unnerved at a mere failure in examination is to forfeit one's claims to manhood.

Vol.—XI, No. 4
November, 1934.

Edited & Published by—**P. Debchoudhury.**
Student Editors—**Ajoy Goswami** (IX).
Krishna Ghosh (IX).

Annual Subscription—Re. 1.
Single Copy—As. 4.

Barrackpore Govt. School Magazine.

CONTENTS.

1.	আবাহন	এ, এফ, এম্ খলিলর রহমান।	1
2.	কোন্ পথে ?	শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র নন্দী।	2
3.	শান্ত	শ্রীসুবোধ চন্দ্র দে।	3
4.	মূর্খ লক্ষণানি	শ্রীসুধীর কুমার ঘোষ।	4
5.	আমাদের খেলার সাথী কায়জারের মৃত্যুতে—	সেখ মোকসেদ আলী।	5
6.	নিরুদ্দেশ	শ্রীশিবনাথ দাস।	6
7.	বঙ্গদেশ	শ্রীপাঁচুগোপাল বন্দোপাধ্যায়।	10
8.	হরিদ্বার ভ্রমণ	শ্রীভোলানাথ মুখার্জ্জি।	11
9.	প্রভাত	শ্রীশরৎ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।	14
10.	ছবি ও কবি	আহম্মদ নওয়াজ বি-এ, বি-টি।	15
11.	বিজ্ঞানাচার্য্য ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার	শ্রীআশুতোষ ঘোষ।	16
12.	উচ্ছ্বাসে	—দরদি—	23
13.	Do we live for ourselves ?	Md. Abdul Wahed.	24
14.	A day's Journey	Abdur Rouf.	29
15.	Greatest Living Begalis	Sailendranath Jash	33
16.	How to Prevent Dental Decay	Dr. Nirmal Chandra Deb Choudhury	38
17.	Tit-Bits	Sarat Chandra Banerjee	42
18.	Ourselves		44
19.	Sporting-Notes		50
20.	Notes and News		54
21.	Prospectus of Barrackpore Govt. School.		61

বিনয় সম্ভাষণ পূর্ব্বক নিবেদন

আপনাদের স্কুল হইতে প্রকাশিত দুই সংখ্যা ত্রৈমাসিক পত্রিকা পাইয়া আনন্দিত হইলাম। আপনাদের ছাত্রেরা এই পত্রিকা অবলম্বন করিয়া সাহিত্যচর্চ্চার পথে অগ্রসর হইবে ইহাই আমি কামনা করি। ইতি ২৩ শ্রাবণ ১৩৩০

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

'Service is our badge.'

Vol. XI. } November, 1934. } No. 4.

আবাহন

আকাশ পথে,
মেঘের রথে,
কে যাও তুমি সোণার বরণ।
সকাল সাঁঝে,
মনের মাঝে,
করতে থাকি তোমায় স্মরণ।

কেগো আজি,
নিদয় মাঝি,
পবন পথে ছোটাও ভেলা।
বাজিয়ে বাঁশী,
হাওয়ায় ভাসি,
ক'রছো তুমি কতই খেলা।

দিনেক তরে,

দীনের ঘরে,

পড়বে কি ও পায়ের ধূলি।

কোন্ সে দিনে,

হাসির সনে,

শুনবো তোমার মধুর বুলি।

দীনের ঘরে,

আসলে পরে,

পূজবো তোমায় পূত মনে।

ওগো দানী,

হৃদয় খানি,

বিলিয়ে দেব তারই সনে।

এ, এফ্, এম, খলিলর রহমান,
চতুর্থ শ্রেণী।

কোন্ পথে ?

লক্ষ্য মোদের ঊর্দ্ধগামী

"তুচ্ছ" মোদের নয়;

তুচ্ছকে যে দলতে হবে,

করতে হবে জয়।

বিরাট মোদের উদার হৃদি,

'দুঃখ' মোদের নয়,

দুঃখকে যে বাধতে হবে,

ভাঙ্গাতে হবে ভয়।

শান্তি মোদের প্রধান কাম্য,

'বন্ধ' মোদের নয়;

বন্ধকে যে ছিঁড়তে হবে

ক'রতে হবে ক্ষয়।

জীবন মোদের বিশাল বহ্নি,

জ্বালিয়ে চলো সদা,

যাবার পথে যাক্‌রে ঘুচে,

মনের কালো কাদা।

শান্ত

ছোট একটি ছেলে, নাম শান্ত, সে যখন ১০ বৎসরের তখন তাহার এক সাথী জুটিল। তাহার নাম রমণ। সে বাঁশী বাজাইতে খুব ভালবাসিত। একদিন সে যখন শান্তকে লইয়া নদীর ধারে বসিয়া বাঁশী বাজাইতেছিল তখন সে দেখিল একটি ছোট্ট নৌকা তাহাদের নিকট থামিল। রমণ শান্তকে বলিল, দেখ ভাই কি সুন্দর ছোট্ট নৌকা। নৌকার মাঝি উহা শুনিয়া তাহাদের ডাকিয়া নৌকায় চড়িতে বলিল। তাহারা বলিল 'না'। সেই সময় সেই স্থান দিয়া কতকগুলি দুষ্ট বালক যাইতেছিল। তাহারা মাঝির কথা শুনিয়া নৌকায় আসিয়া বসিল। নৌকা ছাড়িল। বালকগুলি দুষ্ট; কাজে কাজেই তাহাদের মাথায় দুষ্টামি বুদ্ধি ঢুকিল। তাহারা জল লইয়া খেলা করিতে লাগিল। মাঝি তাহাদিগকে জল লইয়া খেলিতে বারণ করিল। কিন্তু তাহারা তাহার কথায় কাণ দিল না বরং তাহাকে নানারকমের কথা বলিয়া ঠাট্টা করিতে লাগিল। মাঝি আর কিছু বলিল না। কিছুক্ষণ পরে একটি বালক নৌকা হইতে জলে পড়িয়া গেল। তখন সকলে চীৎকার করিয়া উঠিল। মাঝি তাড়াতাড়ি জলে ঝাঁপ দিয়া বালকটিকে ধরিল এবং নৌকায় তাহাকে তুলিয়া নৌকা তীরের দিকে আনিল। এতক্ষণ রমণ ও শান্ত ঘাটে বসিয়াছিল। বালকগুলি নামিলে রমণ তাহাদিগকে বলিল, "ভাই পরের নৌকায় চড়িয়া তাহাকেই গালি দিলে?" ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহারা রমণকে যা' তা' গালি দিল এবং তাহাদের মধ্যেই কেহ একটি ঢিল ছুড়িল। ঢিলটি শান্তর মাথায় আসিয়া লাগিল। দর দর বেগে রক্ত পড়িতে লাগিল। এই অবস্থা দেখিয়া রমণ

তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাকিতে গেল। যে বালকটি ঢিল ছুড়িয়াছিল সেই বালকটি নিজের দোষ বুঝিতে পারিয়া তাহার নিকট ছুটিয়া আসিল এবং কাঁদিয়া ফেলিল। তখন শান্ত তাহার চোখে জল দেখিয়া বলিল, "ভাই উহাতে আমার তেমন কিছু হয় নাই। তুমি আর কাঁদিও না।" অন্যান্য বালকগুলি চলিয়া গেল কিন্তু ডাক্তার না আসা পর্য্যন্ত সে শান্তর দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল।

শ্রীসুবোধচন্দ্র দে—৫ম শ্রেণী।

মূর্খ লক্ষণানি

নোপ করোতি ভ্রান্ত্যাপি নিন্দতি চ পরান্ সদা।
ন শৃণোতি গুরোর্ব্বাক্যম্ এতদ্ হি মূর্খ লক্ষণম্॥ ১

কুচিন্তা:কুবচো:যস্য জাগর্ত্তি হৃদয়ে সদা।
হেলয়া নাশয়েৎ কর্ম্ম স মূর্খ ইতি কথ্যতে॥ ২

অর্থার্থমভিবাঞ্ছেদ্ যো দিবানিশং স্বপিতি চ।
আলস্যাদ্ যাপয়েৎ কালং স হি মূর্খঃ প্রকথ্যতে॥ ৩

আত্মীয়ান্ পীড়য়িত্বাঽপি ধনমাচ্ছিদ্য যচ্ছতি।
পরেভ্যো যো যশোলোভী স মূর্খ ইতি কথ্যতে॥ ৪

ক্ষণিকং ধনমাসাদ্য চরন্তি গর্ব্বিতাঃ সদা।
নরান্ তৃণায় মন্যন্তে তে পরং কুধিয়ঃ স্মৃতাঃ॥ ৫

মহাত্মনো মহাভাগান্ দৃষ্ট্বা ক্রুহ্যতি যঃ সদা।
নিন্দতি চ পরোক্ষে তান্ সোঽপি মূর্খঃ প্রকথ্যতে॥ ৬

সুবচাংসি পরেষাং যং দহন্তি হৃদয়ে ভৃশম্।
ভাষতে চ মুধা নিত্যং স মূর্খ ইতি কথ্যতে॥ ৭

যেষু জনেষু তিষ্ঠেয়ু রিমাণি লক্ষণানি তান্।
হিতকামী জনো নিত্যং যত্নতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ॥ ৮

শ্রীসুধীরকুমার ঘোষ— তৃতীয় শ্রেণী।

আমাদের খেলার সাথী

কায়জারের মৃত্যুতে

এইখানে তোর মাতার কবর কদলী গাছের তলে,
আজ বুক ফেটে মোর কান্না আসি ভিজায় চোখের জলে;
একদিন আমি কোদালের সাথে কাটিয়া মাটির তল,
রাখিয়া দিয়াছি তোমার বহিনে, চিহ্ন আছে দুটি মল;
এইখানে তোর চাচাজী ঘুমায়ে, এইখানে তোর চাচী,
কাঁদিছে মরিয়ম, আর কেঁদে যায় ময়না বুলবুলি,
গাছের পাতা সেই বেদনায় এখন পড়িছে ঝরি'
ফাল্গুনি হাওয়া কাঁদিয়া বেড়ায় শূন্য মাঠ ভরি।
পথ দিয়া যায় গেঁয়ো পথিকেরা মুছিয়া আপন চোখ,
চরণে তাদের বাজিয়া উঠিছে গাছের পাতার শোক।
খোকন আমার, যাদুরে আমার, লক্ষ্মী আমার ওরে—
কত ব্যথা মোর শূন্য হৃদয়ে রেখেছি পোষণ করে।

পরাণের ব্যথা নিভেনি এখনো জ্বলে উঠে ক্ষণে ক্ষণে,
নূতন বেশে, নূতন সাথী, আজ জুটল তাঁদের সনে।
কায়জার আসি শুয়েছে আজিকে এই কবরের ধারে
নূতন কাঁকনে, নূতন সাজেতে, সাজায়ে দিয়াছি তারে।
আয় যাদু করি মোনাজাত "আয় খোদা রহমান"
ভেস্ত নাজেল করিও সকল মৃত্যু ব্যথিত প্রাণ॥

সেখ মোকসেদ আলি,—তৃতীয় শ্রেণী।

নিরুদ্দেশ

কোন দেশে এক জমিদার ছিলেন, তাহার দুই পুত্র—ইত্যাদি শুনিলেই সাধারণতঃ উহা একটী নিছক রচিত গল্প বলিয়া এই আধুনিক যুগে লোকে মনে করে। কিন্তু অনেক স্থলে এই ভুল ধারণা বশতঃ তাঁহারা সত্য ঘটনাও মিথ্যা বলিয়া অগ্রাহ্য করেন। আজও আমি এইরূপ একটি কাহিনীরই অবতারণা করিতেছি। আশা করি ইহা আপনারা মিথ্যা মনে করিবেন না। এ ঘটনাটী প্রকট সত্য।

দিল্লীর নিকটবর্ত্তী কোন এক স্থানে একজন অবস্থাপন্ন জমিদার ছিলেন। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ, নাম শ্রীযুক্ত বাবু রাজ্যেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। জমিদারী ব্যতীত তাঁহার অন্যান্য ব্যবসাও ছিল। তাঁহার মাসিক আয় ১৪০০৲ টাকার অধিক ছিল। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে আধুনিক কোন কোন ব্রাহ্মণ যেরূপ নিজের স্বার্থটী একটু বেশী বুঝেন, তিনি এই প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তাঁহার অধিকাংশ অর্থই সদ্ব্যয়ে ব্যয়িত হইত।

যাহা হউক রাজ্যেশ্বর বাবু বহুকাল পর্য্যন্ত অপুত্রক ছিলেন। ইতিপূর্ব্বে তাহার সাতটী কন্যারত্ন জন্মগ্রহণ করিয়াছিল সত্য কিন্তু তিনি ইহাতে সম্পূর্ণ সুখী হইতে পারিলেন না। অপুত্রক অবস্থায় জীবনযাপন করা তাঁহার নিকট মহাপাতকীর কাজ বলিয়া বিবেচিত হইতে লাগিল। পুত্র লাভ হেতু তিনি প্রত্যহ ইষ্টদেবের নিকট কঠোর প্রার্থনা করিতেন। কিছুকাল অতিবাহিত হইলে পর তাঁহার প্রার্থনা সফল হইল। সাত কন্যার পর দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। তখন রাজ্যেশ্বর বাবুর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি উভয় পুত্রের জন্মোৎসবের জন্য বহু টাকা ব্যয় করিলেন। কত প্রচ্ছন্ন সুদূর আশায় তাহার হৃদয়-গগন আচ্ছন্ন করিল। এই পুত্রই ভবিষ্যতে তাঁহার মুখোজ্জ্বল করিবে এবং নরক হইতে (পুতাৎ) ত্রাণ করিবে। হায় কি ভ্রম ধারণা !

এদিকে কন্যাগণও ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইতে লাগিল দেখিয়া রাজ্যেশ্বর বাবু পাত্র সন্ধান করিতে লাগিলেন। তাহার একটী গুণ ছিল এই যে, তিনি ভাগ্যের উপর অধিক নির্ভর করিতেন। সেই নিমিত্ত কন্যাগণের জন্য ধনী পাত্রের সন্ধান করিলেন না। তিনি একটীর পর একটী করিয়া ছয় কন্যাকেই দরিদ্র এবং মাতৃপিতৃহীন পাত্রে অর্পণ করিলেন। তিনি প্রত্যেক জামাতাকে স্বগৃহে রাখিলেন। সপ্তম কন্যাটী অল্প বয়স্ক থাকায় তাঁহার বিবাহ দিতে পারিলেন না। এখন তাঁহার পুত্রদ্বয়ের বয়স ৭ ও ৯। বিদ্যাশিক্ষার জন্য তিনি তাহাদিগকে নিকটবর্ত্তী একটী বিদ্যালয়ে পাঠাইতে লাগিলেন। কিন্তু সহসা একদিন কনিষ্ঠ পুত্রের ভীষণ জ্বর হইল। ডাক্তারগণও ঔষধপত্রের ব্যবস্থা করিলেন, ইহাতে জ্বরের উপশম হইল বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ নির্দোষ হইল না। ক্রমে জ্বর পুরাতন হইয়া উঠিল। তখন ডাক্তারগণ সাবধানে বায়ু পরিবর্ত্তনের পরামর্শ দিলেন। তদনুসারে রাজ্যেশ্বর বাবু বারাণসী যাওয়াই স্থির করিলেন। কিন্তু বারাণসী যাইয়াও বিশেষ কোন সুবিধা

হইল না। এ স্থানে আসিয়া কয়েকদিন পরেই বালক মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইল। কত আরাধনার ধন, প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র পিতামাতাকে কাঁদাইয়া কোন অজানা পথের যাত্রী হইল। পুত্রশোকে শোকাতুর পিতামাতাও অবশিষ্ট কয় বৎসর কাশীতেই কাটাইতে সঙ্কল্প করিলেন এবং "শেষের সে দিনের" জন্য দিন গণিতে লাগিলেন। রাজ্যেশ্বর বাবু পুত্রের এই দারুণ শোক সহ্য করিতে না পারিয়া অত্যল্পকাল পরেই ধরাধাম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পুত্রের সহিত চিরমিলনের জন্য অমরধামে যাত্রা করিলেন।

রাজ্যেশ্বর বাবুর মৃত্যুর নয় দিন পরে কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়া তাহার স্ত্রী মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। এই সংবাদ শ্রবণে জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিসাধন সত্বর কাশীতে গমন করেন এবং তথায় দুঃখপূর্ণ হৃদয়ে পিতা মাতার শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিয়া পুনরায় স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। অবশ্য এই স্থানে বলিয়া রাখা দরকার যে হরিসাধন এখন ষোড়শবর্ষীয় যুবক। রাজ্যেশ্বর বাবু মৃত্যুর পূর্ব্বে কিছুই বলিয়া যাইতে পারেন নাই; তবে যখন দিল্লীতে ছিলেন কতকটা বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। ছোট মেয়ের বিবাহের জন্য তিনি ৫০০০৲ টাকা রাখিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক কন্যার জন্য একটী করিয়া বাড়ী নির্দ্ধারিত ছিল। যাহা হউক তাহার মৃত্যুর পর বিচক্ষণ বৃদ্ধ সরকারই সংসারের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে লাগিলেন। কারণ হরিসাধন সংসার বিষয় সংক্রান্ত কর্ম্মাদি বুঝিতেন না। এই সময় বৃদ্ধ সরকার বিশেষ বিবেচনা করিয়া হরিসাধন ও তাহার কনিষ্ঠ ভগ্নীর বিবাহ কার্য্য মহাসমারোহে সপন্ন করিলেন। ভাগ্যবান রাজ্যেশ্বর বাবুর কনিষ্ঠ কন্যার বিবাহ এক অতি সম্ভ্রান্ত জমিদার পুত্রের সহিত সম্পন্ন হইল।

বিবাহের পর বৎসর হইতে হরিসাধন তাহার বন্ধুগণের পরামর্শে, জমিদারীর ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। জমিদারীর প্রধান কর্ম্মচারিগণকে অপসৃত করিয়া প্রিয় সুহৃদগণকে সেই কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। এই সময় হইতেই

হরিসাধনের কুবুদ্ধি প্রবল হইয়া উঠিল এবং পৈতৃক ধনসম্পত্তি অসৎ-কার্য্যে ব্যয় করিতে লাগিলেন। এইরূপে ৫ ও ৭ বৎসরের মধ্যে অশন ব্যসনে তাঁহার পিতৃসম্পত্তি নিঃশেষিত হইয়া গেল। পরে বাড়ীখানি পর্য্যন্ত রহিল না। এখন বন্ধুগণের সংখ্যা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল। তখন তিনি মিত্রগণের কপটতা বুঝিতে পারিয়া তাহাদিগের সাহায্যের আশা ত্যাগ করিলেন এবং ভগ্নীগণের নিকট তাহার দুরবস্থার কথা জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু তাহার চরিত্র দোষের জন্য কেহই তাহাকে স্থান দিতে সম্মত হইল না। কিন্তু কনিষ্ঠ ভগ্নী সহোদরের এই অবস্থা জ্ঞাত হইয়া, তাহাকে আশ্রয় দিতে স্বীকার করিল এবং হরিসাধন ইহাতে আশ্বস্ত হইয়া স্ত্রী পুত্রসহ সেই স্থানে বসবাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু কালের স্বধর্ম্ম যাইবে কোথায়; এ কালে যে যাহার উপকার করে, সেই প্রত্যুপকারের পরিবর্ত্তে তাহারই সর্ব্বনাশের পথ অনুসন্ধান করে। কিছুকাল সেই স্থানে অবস্থানের পর, যাহাতে ভগ্নীর বিষয় আত্মসাৎ করিতে পারেন হরিসাধন তাহারই ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। ভাগ্যক্রমে তাহার ভগ্নীপতি ইহা অবগত হন এবং তিরস্কারপূর্ব্বক বহিস্কৃত করিয়া দেন।

স্ত্রী পুত্রের হস্ত ধরিয়া হরিসাধন তখন পথের ভিখারী হইলেন। সমগ্র দেশে তাহার দুষ্কর্ম্মের বৃত্তান্ত রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। সকলেই তাহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে লাগিল, এমন কি এক মুষ্টি ভিক্ষা করিয়া উদরান্নের সংস্থান করিবেন, সে আশাও দুরাশা হইল। এ দিকে স্ত্রী ও সন্তানগণের শুষ্ক মুখ ও ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শ্রবণে তাহার দুঃখের সীমা রহিল না। হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। নিজে দুই চার দিন উপবাস করিয়াও থাকিতে পারা যায়। কিন্তু আদরের দুলাল সন্তান দুইটীকে কেমনে সম্মুখে মরিতে দেখিবেন। কিন্তু কি করিবেন নিরুপায়, তখন তিনি স্থির করিলেন একমাত্র মৃত্যুই শ্রেয়।

তখন পূর্ব্বকৃত দুষ্কর্ম্মের জন্য তাহার অনুশোচনা হইতে লাগিল। এবং তাহার প্রায়শ্চিত্তের জন্য একাগ্রচিত্তে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাহার জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হইল। জীবন সম্বন্ধে তিনি সচেতন হইয়া উঠিলেন—"না আর না" এইরূপে মায়ায় আবদ্ধ থাকিলে চলিবে না। এখনই সমস্ত দুঃখের অবসান হইবে।

* * * *

শেষ রাত্রিতে সন্তান দুইটী কাঁদিয়া উঠিল। ক্ষুধার জ্বালা আর সহ্য করিতে না পারিয়া ডাকিয়া উঠিল "বাবা, বাবা, বাবা।" কিন্তু বাবা কোথায় ?

পুত্রের এই করুণ ক্রন্দন শ্রবণে মাতা জাগিলেন, অবস্থা বুঝিলেন ও পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। সে মূর্চ্ছা আর ভাঙ্গিল না।

শ্রীশিবনাথ দাস—২য় শ্রেণী।

বঙ্গদেশ

বঙ্গ আমার, ধাত্রী আমার ভারতের তুমি তীর্থক্ষেত্র।
তোমারি স্পর্শে ভারত ধন্য, তোমারি কারণ হয় পবিত্র ॥
হেথায় ভারত স্নিগ্ধ শ্যামলা, নহে সে উষর ধূসর মরু !
বন উপবনে চিক্কণ ঘন পল্লবে ঢাকা লতিকা তরু ॥
হিমালয় তার বাহু প্রসারিয়া রক্ষা করিছে সোনার দেশ।

হেথা সরোবরে প্রভাত কিরণে ফুটে উঠে যত কমল দল।
কল কল স্বরে বহে নদীকূল ঢাকিয়া তাহার অবনী তল॥
প্রচারিতে হেথা প্রেমের পথ সুচির পথ পরমা প্রীতি।
অযুত ছন্দে অগণিত কবি গাহিয়াছে হেথা প্রেমের গীতি॥
এই দেশেতে জন্মেছিল কতই কবি কতই বীর।
প্রতাপাদিত্য ছড়িয়েছিল কীর্তি কলাপ বাঙ্গালীর॥
তাঁদের গরিমা স্মৃতির বর্ম্মে চ'লে যাবে শির করিয়া উচ্চ।
তাঁদের গরিমা রহিবে অটুট কখনও হবে না, হবে না তুচ্ছ॥
ভারত-পালিনি বঙ্গ-জননী স্নেহ উচ্ছলা বরদা বেশ।
হেথা বাঙ্গালীর তীর্থক্ষেত্র এযে গো শান্তি প্রীতির দেশ॥
মহিমার যে গো জন্মভূমি, ভারতের সে তীর্থক্ষেত্র।
নহ কি মা সে বঙ্গভূমি নহি কি আমরা তাঁদের গোত্র?
আমরাও তবে হব বরণীয় করিব তাঁদের ইচ্ছা শেষ।
বঙ্গ আমার বঙ্গ আমার তুমিই মোদের সোণার দেশ॥

শ্রীপাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃতীয় শ্রেণী।

হরিদ্বার ভ্রমণ

আমি গতবারে আমার পিতার সহিত ২২শে মে তারিখে হরিদ্বারে গিয়াছিলাম। আমরা প্রথম বারাকপুর হইতে ২॥০টার সময় গোয়ালন্দ একস্প্রেসে উঠিলাম এবং কলিকাতায় ৩টার সময় নামিলাম। কলিকাতা

হইতে হাওড়ায় গিয়া আমরা বেলা ৪টার সময় বেনারস একস্প্রেসে উঠিলাম। খানিক পরে গাড়ী ছাড়িল। গাড়ী বৰ্দ্ধমানে আসিল। আমরা ঐ স্থান হইতে কিছু খাবার কিনিয়া খাইলাম। গাড়ী ৩টার সময় বৰ্দ্ধমান ছাড়িল। আমি গাড়ীর জানালা দিয়া বাহিরের চারিদিকের দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। খানিক পরে রাত্রি হইল। আমি প্রায় রাত্রি ৯টার সময় বিছানা করিয়া শুইয়া পড়িলাম। কয়েক ঘণ্টা শুইবার পর আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। আমি উঠিয়া বসিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পর একটী সেতু আসিল। রাত্রির অন্ধকারে সেতুটী ভাল করিয়া দেখিতে পারিলাম না। কিছুক্ষণ পরে সকাল হইল। গাড়ী ৬টার সময় কাশীতে আসিল। আমরা ঠিক করিলাম যে আমরা একদিন কাশীতে থাকিয়া তার পরদিন যাইব। আমরা 'ব্রেক জারনি' করিয়া কাশীতে নামিলাম এবং একদিন রহিলাম। তার পরদিন আমরা ষ্টেশনে আসিলাম। গাড়ী ঠিক সময় আসিল। লোকের ভিড় বেশী ছিল বটে, কিন্তু আমি ছোট্ট ছেলে এই মোটা সব ও দেশবাসী যাত্রীদের মধ্যেই গলিয়ে গলিয়ে একটা কামরায় এসে উঠলুম। যাদের সঙ্গে আমি ছিলুম এবারে তাঁরা আমার অনুসরণ করিল।

গাড়ী ছাড়িল। কাশীর পর হইতে গরম ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। ৬টার সময় গাড়ী প্রসিদ্ধ লক্নৌ নামক ষ্টেশনে আসিয়া দাঁড়াইল। ষ্টেশনটী খুব বড়। ঐখান হইতে N. W. Ry. এর একটী রেল বাহির হইয়াছে। আমরা কিছু খাবার কিনিয়া খাইলাম। গাড়ী ছাড়িলে রাত্রি হইল। খানিক পরে আমরা শুইয়া রহিলাম। গাড়ী ফের ভোর ৫॥০টার সময় হরিদ্বারে আসিল। আমরা নামিলাম এবং একটী গাড়ী ভাড়া করিয়া ভোলানাথ গীরির ধৰ্ম্মশালায় উঠিলাম। ধৰ্ম্মশালার ম্যানেজার আমাদের নাম লিখিয়া লইয়া একটী ঘর দিলেন। আমরা আমাদের জিনিষ পত্র রাখিলাম এবং ঘরে চাবি দিয়া গঙ্গার ঘাটে আসিলাম। সেখানে গঙ্গার জল অত্যন্ত

ঠাণ্ডা এবং খরস্রোতা। বৈকাল বেলায় বেড়াইতে বাহির হইলাম। যাহা যাহা দেখিলাম তাহা আমার প্রাণ ভরিয়া লিখিতে ইচ্ছা হয় কিন্তু যেন ভাষা খুঁজিয়া পাই না। মোটের উপর অতিশয় আনন্দ বোধ করিলাম। ঐতিহাসিক কত কিছু দেখিলাম এবং প্রত্যেকটী বিষয়ে আমাদের প্রদর্শক একটা না একটা নজির হাজির করিল। বুঝিলাম ইতিহাসের অনেক খানি যেন ঐ কয়েক ঘটায় পড়া হইয়া গেল। যে ইতিহাসের নামে বারাকপুরে আমি বই লুকিয়ে রাখতুম বছরখানেক আগে সেই ইতিহাস আজ যেন খুব ভাল লাগিল। দেখিতে দেখিতে আমরা একটী জায়গায় আসিলাম গঙ্গার ধারে, যেখানে কুস ও প্রদীপ কিনিয়া লোকে গঙ্গায় ভাসাইয়া দেয়। আমরা সেখানে রোজ আসিতাম। সেখানে খুব ভীড় হইত। সন্ধ্যার আগমনে দীপ্ত ভেলাগুলি গঙ্গার বুকে কি সুন্দরই দেখাইত! কাছেই একটি পাহাড় আছে। পাহাড়ের নাম বলিল মনস্থা। নামটা ভাল বুঝিলাম না। আমরা একদিন সেই পাহাড়টীতে উঠিলাম এবং দেখিলাম একটী ঠাকুর রহিয়াছেন। সেখানে একটী খুব বৃদ্ধ সন্ন্যাসী রহিয়াছেন। আমরা ঠাকুরকে পয়সা দিলাম; সন্ন্যাসী বাবাজী আমাদের প্রসাদ দিলেন। আমরা শ্রদ্ধা সহকারে তাহা গ্রহণ করিলাম। ছোট বেলায়, সন্ন্যাসী বলতে যে আতঙ্ক হইত এখন ছোট থাকিলেও এই সন্ন্যাসী ঠাকুরকে দেখিয়া কিন্তু ভয় হইল না। কিছুকাল অবস্থানের পর আমরা একদিন লচমোনঝোলা যাত্রা করিলাম। ক্রমাগত কয়েক দিন যাইতে যাইতে আমরা পাহাড়ে উঠিলাম। এখানকার দৃশ্য গঙ্গার মত একটানা শান্ত না হইলেও শান্ত গম্ভীর বলা যাইতে পারে। আমরা দুই চার দিন দেখিয়া মনের আনন্দে ফিরিয়া আসিলাম। সেখানের খাবার খুব হজম হইত। আমাদের অতিশয় ক্ষুধা হইত। আমরা কিছুদিন থাকিয়া ৩০শে মে তারিখে স্বদেশে অর্থাৎ বাঙ্গালা অভিমুখে যাত্রা করিলাম। পথে খালি এই ভাবিতে লাগিলাম যে ঘরের

কোণে কোণ-ঠেসা হ'য়ে থেকে থেকে আমাদের জীবন কেন প্রাণহীন হ'য়ে পড়ে। প্রতি বৎসর কোন স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে পারিলে আমার বিশ্বাস আমাদের মত ছেলেদের পড়াশুনাতে মন ভাল বসে। যাহাদের অবস্থা তেমন ভাল নয় তাহাদের জন্য কে এই ব্যবস্থা করিবে?

শ্রীভোলানাথ মুখার্জ্জি —৬ষ্ঠ শ্রেণী।

প্রভাত

ফুর ফুর ফুর বইছে হওয়া
শীতল করে প্রাণ,
মেলিয়ে দিয়ে সবুজ পাখা
করছে পাখী গান।
ঝুর ঝুর ঝুর ঝরছে বকুল
শিশির ধোয়া ঘাসে,
রাঙ্গা রবি পূব দিকেতে।
উঠ্‌ছে হেসে হেসে।
লাল টুক টুক সোণার মুকুল
কানন শোভা করে,
ভোম্‌রা গুলো তাই না দেখে
সপ্তমে সুর ধরে।
ভাল ছেলে ঘুম না ভেঙ্গে
উঠি, হাসি মুখে,
পড়ছে কেমন নূতন পড়া
কতই মনের সুখে।
সৃজিত হ'য়েছে এ মোহন উষা
যাঁহার প্রসাদ ভরে,
এস মোরা আজি জুড়ি দুই কর
বন্দনা করি তারে।

শ্রীশরৎ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—নবম শ্রেণী।

ছবি ও কবি *

ছবিতে জাগিয়ে তোলে
কবির মনে ভাবের ধারা ;
কবি যা' দেখে চোখে
ফুটায় তা' কালির দ্বারা।
কে বলে ছবি মরা
নাহিক জীবন তাহার,
নীরবে গাথিতে চায়
ছবিতে কথার হার।
ছবিকে ছোট করে
মরা মনের মরা চোখে,
ছবিতে প্রাণ খুঁজে পায়
কবি তাহার কল্পলোকে।

ছবি কি চিত্রকরের
হাতের শুধুই রঙ্গিন রেখা,
ছবিতে পায় যে ভাবুক
শত সজীব ভাবের দেখা।
ছবিতে নীরস মনেও
সুরস ধারার জোয়ার আনে,
ছবির কি বলার আছে
শুধাও চেয়ে ছবির পানে।
ছবিকে চিনবে যখন
তখন আর নয় সে ছবি,
ছবিকে চিনেছে যে
সে শুধু ছবির কবি।

শ্রীরামপুর, ২৫।১১।৩৩

আহমদ নওয়াজ, বি-এ, বি-টি,
ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক, বারাকপুর গবর্ণমেণ্ট স্কুল

* The boy who wished to Fly এবং 'The Reply' নামক আমার যে দুইটী কবিতা আপনাদের যে দুইটী School Magazine এ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাদের কোন একটীতে শ্রীমান অজয় গোস্বামীর অঙ্কিত একটী ছবি দেখিয়াছি। ছবিখানি বাস্তবিকই আমার নিকট বড় সুন্দর বোধ হইয়াছিল। ছবিটী দেখিয়া সেই দিনই বারাকপুর হইতে শ্রীরামপুরে গিয়া 'ছবি ও কবি' নামক এই কবিতাটী লিখিয়াছিলাম। সময়াভাবে যথাসময়ে আপনাদের magazine এ প্রকাশের জন্য পাঠান হয় নাই।
— লিখক —

বিজ্ঞানাচার্য্য ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার।

Science is the sole foundation of skill.
Above the skilled doers, we must have the skilled thinkers.

Russel.

দেশকে যাঁহারা আমাদের যুগে বড় করিয়াছেন ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয় তাঁহাদের মধ্যে অতি প্রধান একজন। তিনি তাঁহার কর্ম্মবহুল জীবনে অসংখ্য কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, যাহার একটিমাত্র কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে বহু লোকের জীবন ধন্য হইয়া যায়। তাঁহার বহুমুখী প্রতিভায় বাংলার মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে। এই মহাপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের সমসাময়িক ছিলেন।

বিজ্ঞানের সঙ্গে জাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কতঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ তাহা তাঁহার প্রখর প্রতিভা স্পষ্ট করিয়া ধরিয়াছিল। বিজ্ঞানের সাধনার দ্বারা ভারতবর্ষ জগৎবরেণ্য হইবে, ইহা তাঁহার অন্তরের অন্তরতম বাসনা ছিল। ভারতবাসীর বিজ্ঞান শিক্ষার পথ প্রশস্ত করিবার জন্য তিনি প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তিনি কিরূপ অধ্যবসায় সহকারে বিজ্ঞান-সভা স্থাপন করেন, কত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তাঁহার অদ্বিতীয় কীর্ত্তিস্তম্ভ, বাঙ্গালীর গৌরবস্থল, বিজ্ঞান-সভা প্রতিষ্ঠা করেন তাহা সর্ব্বজনবিদিত। এদেশে বিজ্ঞান-চর্চ্চার সর্ব্বপ্রধান পথ-প্রদর্শক ডাক্তার মহেন্দ্রলাল। ভারতীয় বিজ্ঞানমন্দির তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি। মহেন্দ্রলাল হোমিওপ্যাথি প্রচারে অগ্রণী বলিয়া আমাদের নমস্য নহেন, তিনিই আমাদের দেশে বিজ্ঞান-চর্চ্চার সর্ব্বপ্রধান প্রবর্ত্তক ও উদ্যোক্তা বলিয়া চিরকাল আমাদের পূজ্য ও বরণীয়। আজ যে আমরা বিজ্ঞান সাধনায় এত অগ্রসর হইতেছি, এবং আমাদের দেশে আচার্য্য স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়, স্যার সি. ভি. রামন, ডাঃ মেঘনাথ

সাহা, ডাঃ নীলরতন ধরের ন্যায় সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকের আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছে। তাহার মূলে রহিয়াছে মহেন্দ্রলালের সাধনা ও তপস্যা। মহাত্মা রামমোহন রায়ের অব্যবহিত পরে বাঙ্গালা দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া এই মনীষি যে ভাবে দেশের সেবা করিয়া গিয়াছেন, এ যুগে তাহা বিরল।

হোমিওপ্যাথির স্বপক্ষে প্রচারের জন্য ডাঃ সরকার ১৮৬৮ সালের জানুয়ারি মাস হইতে "Calcutta Journal of Medicine" নামে একখানি মাসিক পত্র প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। এই পত্রের শীর্ষ শ্লোক ছিল চরকসংহিতার নিম্নলিখিত শ্লোকটি :—

"তদেব যুক্তং ভৈষজ্যং যদারোগ্যায় কল্পতে।
সচৈব ভিষজাং শ্রেষ্ঠ রোগেভ্যো যঃ প্রমোচয়েৎ ॥"

এই পত্রিকা উত্তরকালে আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। এবং এই পত্রে প্রচারিত মতবাদ ইউরোপ ও আমেরিকায় বিশেষ সম্মানের সহিত গৃহীত হইত।

১৮৬৯ সালের আগষ্ট মাসের "Calcutta Journal of Medicine" পত্রে ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভা স্থাপনের উদ্দেশ্যে (On the desirability of cultivation of the sciences by the Natives of India) এক অনুষ্ঠান পত্র প্রচার হয়। সেই সময়ে প্রচারিত সমস্ত সংবাদ পত্র ডাঃ সরকারকে এই বিষয়ে উৎসাহ দেন। তন্মধ্যে 'হিন্দু পেট্রিয়টের' নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর, জ্যাষ্টিস্ দ্বারকানাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত জ্যোতীন্দ্র মোহন ঠাকুর, শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ঠাকুর, রেভারেণ্ড ফাদার লাফোঁ, শ্রীযুক্ত কৃষ্টদাস পাল, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল মিত্র, শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ভদ্র মহোদয়গণ প্রথমাবধি ডাক্তার সরকারকে এ বিষয়ে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেছিলেন। বাঙ্গালার

বাহির হইতেও এই প্রতিষ্ঠানের জন্য সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল। ভিজিয়ানা গ্রামের মহারাজা চল্লিশ সহস্র মুদ্রা দান করেন। ঐ টাকা হইতে 'ভিজিয়ানা গ্রাম ল্যাবরেটরী' নামে বিজ্ঞান মন্দিরের শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর প্রয়োগশালা নির্ম্মিত হয়।

ডাঃ সরকারকে এই বিজ্ঞান মন্দির স্থাপনের জন্য ৬।৭ বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে হয়। অবশেষে শ্রীভগবানের কৃপায় তাঁহার শ্রম সফল হয় এবং ১৮৭৬ সালে কলিকাতা মহানগরীর বহুবাজার অঞ্চলে ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান মন্দির স্থাপিত হয়।

বঙ্গের তদানিন্তন ছোট লাট উদার হৃদয় Sir Richard Temple মহোদয় ডাক্তার সরকারকে এবিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। ডাঃ সরকার ১৮৭৬ হইতে তাঁহার মৃত্যুকাল ১৯০৪ সাল পর্য্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানের Founder Secretary ছিলেন। তাহার পর তাঁহার একমাত্র পুত্র ডাক্তার অমৃতলাল সরকার মহাশয় সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন। এই সময় শ্রীযুক্ত (অধুনা স্যার চন্দ্রশেখর) রামন এই সভায় যোগদান করেন। তিনি এই বিজ্ঞান সভাকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার গবেষণাকার্য্য পরিচালনা করেন এবং অবশিষ্ট Nobel prize প্রাপ্ত হইয়া ভারতবাসীর মুখোজ্জ্বল করেন এবং ডাঃ মহেন্দ্রলালের জীবন-স্বপ্ন সফল করেন।

যে সকল পদ বা সম্মানের জন্য আমাদিগের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই লালায়িত, তিনি সে সকল অযাচিত ভাবে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি ৪ বৎসরকাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Faculty of Arts এর প্রেসিডেণ্টের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং উপর্য্যুপরি দশ বৎসর সিণ্ডিকেটের সদস্য মনোনীত হইয়াছিলেন। ১৮৭৭ সালে তিনি কলিকাতার অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন এবং ১৮৮৩ সালে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে C.I.E. উপাধি দ্বারা ভূষিত করেন। ১৮৮৭ সালে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক

সভার সভ্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং ঐ বৎসরেই তাঁহাকে কলিকাতার সেরিফের পদ প্রদান করা হইয়াছিল। তিনি এসিয়াটিক সোসাইটির কাউন্সিলের সভ্য এবং মিউজিয়ামের ট্রাষ্টী ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৮৯৮ সালে তিনি D L. উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি অনেক বৈদেশিক বৈজ্ঞানিক সভার সভ্য ছিলেন।

তাঁহার হৃদয় বড় কোমল ছিল। তিনি বহু দরিদ্র ছাত্রকে নিয়মিত ভাবে সাহায্য দান করিতেন। তাঁহার শাখারিটোলাস্থ বাসভবনে প্রত্যহ প্রাতে বহু রোগীকে তিনি বিনামূল্যে ঔষধ দান করিতেন। বৈদ্যনাথ দেওঘরে তাঁহার পত্নির নামে রাজকুমারী কুষ্ঠাশ্রম স্থাপনের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিনি বহু দরিদ্র রোগীকে বিনা পারিশ্রমিকে চিকিৎসা করিয়াছেন। আর্ত্তের সেবাই যেন তাঁহার ধর্ম্ম ছিল।

তিনি সুস্থ, সবল, ও বিচারসঙ্গত মনোবৃত্তির অধিকারী ছিলেন। আজীবন তিনি পড়াশুনার পক্ষপাতী ছিলেন ; এমন কি শেষ বয়সে রোগশয্যায় পীড়িত অবস্থায়ও তিনি খুব পড়াশুনা করিতেন এবং গুন গুন রবে বিষ্ণুগুণ গান করিতেন। দেশ বিদেশ হইতে প্রতি সপ্তাহে তাঁহার জন্য পুস্তক আসিত। শুধু বিজ্ঞান নয়, সকল বিষয়ের পুস্তকই তাঁহার পড়ার বিষয় ছিল। তিনি ছিলেন চিরদিন ছাত্র।

প্রতীচ্য শিক্ষা দীক্ষার প্রভাব তাঁহাকে অভিভূত বা বিচলিত করিতে পারে নাই ; তিনি সাদাসিধা বাঙ্গালীর জাতীয় পোষাকের পক্ষপাতী ছিলেন; সাদা থান ধুতি, চাদর ও সামনে বুকের উপর দুইটি পকেট যুক্ত পিরান তিনি পরিধান করিতেন ; ভিতরে ফতুয়া সময়ে সময়ে গেঞ্জিও ব্যবহার করিতেন, পায়ে সাদা ফুল মোজা ও তালতলার চটী ; সোনার চেনযুক্ত ঘড়ি বুক পকেটে থাকিত ; তাহাতে একটি পেন্সিল সংলগ্ন ছিল। তাঁহার সম্বন্ধে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার "Men I have seen" পুস্তকে লিখিয়াছেন :—

"His very talk was elevating. He raised his listeners to a high level of intellectuality. I liked him for his simple and unostentatious ways of living. He wore Taltala slippers always, whether visiting his patients or attending public meetings. The Calcutta public do not remember having seen him with boots or shoes."

শাস্ত্রীমহাশয় তাঁহার উক্ত পুস্তকের অন্য একস্থানে লিখিয়াছেন—"Dr, Sircar was extremely simple. He more resembled an old poor Brahmin in these respects than a successful Medical Practitioner of the town. In food and drink he was moderate, temperate and even abstemious, spending all the money that he could save, thereby in purchasing books."

এই অজ্ঞাত নামহীন লেখকের সহিত তিনি আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। আমি যেন এখনও তাঁহার সেই সৌম্যমূর্ত্তি ও প্রতিভাদীপ্ত মুখমণ্ডল আমার চক্ষের সম্মুখে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। বারাকপুর গভর্ণমেন্ট স্কুল হইতে ১৮৮৭ সালে প্রবেশিকা (Entrance) পরীক্ষায় উত্তির্ণ হইয়া আমরা কলিকাতায় General Assembl's Institution (তখন Scottish Churches College হয় নাই) পড়িতে যাই। আমরা সেই সময় Indian Science Association এ সন্ধ্যাকালে পড়িতে যাইতাম, এবং ডাঃ মহেন্দ্রলালের ও Father Lafont এর Physics এ lecture শুনিবার অসামান্য সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছিল। সে বহু দিন পূর্ব্বের কথা।

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার অসাধারণ অধ্যবসায়, অমানুষিক প্রতিভা ও অটল বিশ্বাসের বলে বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। পরম পিতা পরমেশ্বরে তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল।

এই মহাপুরুষের ১৯০৪ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী প্রাতঃকালে এ নশ্বর দেহত্যাগ করিয়া সাধনোচিত-ধামে গমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ উদ্দেশ্যে ইংরাজ পরিচালিত "Capital" পত্রে যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

"When Dr. Mahendralal Sircar, at the age of seventy-one passed into the school of immortals last Tuesday morning to pursue with undeemed spiritual vision the quest after Truth he had learned to love so well while here, joy at his promotion was mingled with the not unnatural sorrow that which his work and influence of his high character would remain, his kindly beneficient presence was gone. While born in Bengal, he was in reality one of the Sons of Humanity, which is an Order of Merit higher than any of those with which a Birth-day Honours' List makes us only too familiar.

He kept his mind at all times open to the inflow of truth from whatever quarter it came (and he believed it all came from God) and was imperiously loyal to his convictions. He was full of the milk of human kindness and his high professional skill in the healing act was ever at the service of the poor and needy, Dr. Mahendralal Sircar believed that his highest obligation to his country was to be a good man. Young Bengal will be the rising hope of their race when their lives are penetrated by the same high ideal." Mass—The Capital, 24th. Feb. 1904.

১৩৩৩ সালের ২রা নভেম্বর তারিখে তাঁহার গুণমুগ্ধ দেশবাসী এক-শত বার্ষিকী জন্মতিথি স্মৃতি পূজার আয়োজন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতি-

ষ্ঠিত ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভা মন্দিরে আচার্য্য স্যার প্রফুল্ল চন্দ্র রায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক মহতী জন-সভা হয়।

সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে :--

বিদ্বান্ বৈজ্ঞানিক এবং স্বদেশপ্রেমিক ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের স্মৃতির প্রতি এই সভায় সমবেত কলিকাতার পৌরবাসিগণ তাহাদের সশ্রদ্ধ ভক্তি অর্ঘ্য প্রদান করিতেছে। তিনি একশত বৎসর পূর্ব্বে এমনই দিনে বঙ্গজননীর ক্রোড়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি, স্বদেশহিতৈষণা এবং জনসেবায় অনুপ্রেরণাই ভারতীয় বিজ্ঞান অনুশীলন প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠান বাঙ্গালা তথা সমগ্র ভারতের মধ্যে বিজ্ঞান চর্চ্চার প্রথম জাতীয় প্রতিষ্ঠান। দেশের যুবকবৃন্দ ভারতে বিজ্ঞান চর্চ্চার সুযোগ ও সুবিধা লাভ করিয়া ভারত-জননীকে পৃথিবীর জাতি সমূহের মধ্যে বিজ্ঞানে সম্মানজনক আসনে সমাসীন করুক, ইহাই এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার চিকিৎসক এবং বিশেষভাবে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় অগ্রণী, সেনেটের সভ্য হিসাবে এবং জাতীয় জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে যে অক্লান্ত দেশসেবা করিয়াছেন, তজ্জন্য এই সভা তাঁহার স্মৃতির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছে।"

সভার কার্য্য অতি সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল। সভায় ডাক্তার সরকারের পুষ্পমাল্য বিভূষিত প্রস্তরমূর্ত্তি শোভা পাইতেছিল। ওঁ শান্তি!

শ্রীআশুতোষ ঘোষ,
Ex-student.

উচ্ছ্বাসে

বিরহের ব্যথা এত সতত সহিয়া
কেমনে কাটাব দিন পাষাণ হইয়া।
কেমনে লভিব শান্তি এ মম হিয়ায়,
কে মোরে বলিয়া দিবে, শুধাইব কায় ?
রহ শত দূরে তুমি অনন্তের পারে
তবুও কভু না আমি ভুলিব তোমারে।
তোমার আমার মাঝে শত ব্যবধান
অবশ্যই একদিন হবে তিরোধান।
একদিন হবে তুমি একান্ত আমার,
মোদের এ বাঁধন ছিঁড়ে সাধ্য কাহার ?
মনের গোপন কোণে তোমার মুরতি
অঙ্কিত রয়েছে সদা মনোহর অতি।
কি এক মোহের ঘোরে হাঁসিয়া কাঁদিয়া
পরাণে সতত তা' যে রেখেছি বাঁধিয়া।
স্বপনের সাধ তুমি সারা জীবনের
এস প্রাণে, যাক সব বেদনা মনের।
কতদিন হেন আর বহিবে অধীন ?
তোমার বিহনে আর কাটে না যে দিন।

'দরদি' প্রথম শ্রেণী।

Do we live for ourselves ?

The untired philanthropic zeal of the Scientists is responsible for the most advantageous applicabilities, the civilization and the dazzling splendour of the modern world. Sir Humphry Davy, one among such benefactors, who was the first person to produce the electric arc light, discovered the bleeching properties of the chlorine, determined the nature and use of iodine, and the inventor of miner's safety lamp, was urged by one of his friends to patent the safety lamp, and thus procure for himself a hoard of wealth. "No my good friend," Davy replied, "my sole object in making it was to serve the cause of humanity, and if I am succeeded I am amply rewarded." If, on the contrary, he endeavoured:to pluck up the most luxurious branches of knowledge to satiate his own greed, and would get them, the long and short of it would live in oblivion, and his discovery would remain with only a few.

Davy lived not for himself. Without caring for his life he experimented on himself—inhaled gases which, before him, was thought to be poisonous. Life to him was a secondary thing. Even he was seized with such great in toxicating frenzy to ameliorate the then existing scientific condition of the world that he almost lost his life in the endeavour and it was with great difficulty that he was brought

to life. If we search into the cause of his such burning passion for self-renunciation, we shall find that it is simply to uplift the cause of humanity.

Caesar's parody of statecraft and his incipient vanity:

"—In the number I do know but one
That unassailable holds on his rank,
Unshak'd of Motion: and that I am he,—"

kindled into a blaze the smouldering embers of discontents of the citizens, and before he could finish the last sentence of his life he was launched into eternity, and all his mighty conquests, glorious truimphs, spoils, shrunk into a lifeless mass of flesh—bleeding profusely. Davy had neither riches, nor power, nor brith,—Caesar had everything, yet the former will be remembered as a Phoenix and the latter as a Mephistopheles in history.

Whatever we see around us, save the creations of God and Nature, those are the acts of renunciation on the part of some body or other. Whenever we hear of a great man we presume that the foundamental virtue, self-renunciation, is inherent in him; because without it no body is great. Noticing the sorrowful picture of suffering humanity, the blood of the great ferments and bubbles; overflowing vitality seeks to extend its sphere; the eyes grow brighter and survey others; heart is thrown open to human affection and becomes capable of attachment. Our India does not lack in such great men. Rammohan, Vidyasagar, Syed Ahmed, Guroodas, Gokhale, Chittaranjan, Gandhi and

ciation of these magnanimous Indians were invaluable. They
touched Mother India with the magic wand of their crea-
tive will in order to secure meridian splendour of prosperity
for their fellow brethren. Zaglul, Sau-yat-Sen, Lenin Kemal,
Mussolini outside India were and are the stars of the
first magnitude in the political atmosphere of our world
for their wonderful self-sacrifice. Who can recount the
good they have done? Were they not greater than Napoleon,
one of the most conspicuous personalities of the world—
"The most selfish and ambitious of man"—who sacrificed
million and million innocent human lives to satiate his own
aggrandising and selfish greed?

A few hundred lives were sacrificed at the command
of Leonidas, in the pass of Thermophylæ to nip in the bud
aggravating invasion of the Persian king Xerxes. But
that was with the idea to wear away the terrors from the
bosom of the Athenians and to retain the freedom of
Greece unmolested, from the immense hoard of the aliens.
History records that an outburst of prowess is the coro-
llary of self-sacrifice. This was proved by the Greeks while
saving themselves from the formidable clutches of their
mighty enemies Xerxes and Darius. A few hundred perished
but thousands and thousands were redeemed. But Cato
must wear the same crown of Laurel with Leonidas of his
peculiar diatribes each ending with the words "Delenda est Carth-
ago," to sap the foundation of Carthage, the most magni-
ficient, flourishing and happy city of the ancient world and

We hear so much of kings Nero and Herod ; Hun, Attila and Taimurlane. But when we go through the lives of these persons our heart is filled with great consternation and disgust ; slaughter and massacre, arson and looting, sacrilege and iconoclast were the everyday business of these degraded, degenerated and derogated persons. Each of them led a life, no doubt, but those lives are so many black spots on the pages of history.

We exist also for the state and the government and they exist for us. We are the bricks and metrials with which the structure of the state and the government is built up. That is called "each individual owes allegiance to his state." If it was not so chaos and anarchism would destroy the peace and tranquility of the state and life would be miserable.

Every life that God has created is precious and it is worthy when we remember that we are responsible to the world for every action of ours. To a Macbeth only.

"Life is but an walking shadow, a poor player
That starts and frets his hour upon the stage,
And then is heard no more: it is a tale.
Told by an idiot, full of sound and fury
Signifying nothing... ... ..."

But to a Longfellow "Life is real, life is earnest ! And grave is not its goal." To quote Lamennius: "Human society is based upon mutual giving, or upon sacrifice of man for man, or of each man for all other men ; and sacrifice is the very essence of all true society." It is

our duty to soothe the aching heart, to succour the hungry, to comfort the seek and the painstricken, to shelter an orphan and to share the misery of others. These are not burdensome or impossible tasks—these are most glorious tasks. But how many of us apprehend and endeavour to perform these? Those persons who think of these are above the rank of ordinary folk. Their act of renunciation cannot be amply rewarded, but their life would be like a luminious beacon light, which shall 'irreisitibly break through the clouds of idleness, jealousy and vanity and 'usher in the dawn of a day which shall shine forth most distinguishably' for the welfare of the human race.

'In the worlds broad field of battle, in the bivouac of life, let us not be like dumb driven cattle." "Love thy neighbour as thyself"—let this be our motto. We do not live only for ourselves.

"What's all the gaudy glitters of a crown ?
The way to bliss lies not on beds of down.
How long we live, not years, but action tell ;
That man live twice who lives the first life well."

Md. Abdul Wahed,
Matriculation Class.

A day's journey.

On the 25th April came Mohurrum, the mournful day of the Mohammadans. It appeared in our minds that on the day of the great festival of the Shiah sect we shall go to Hooghly Imam Bara to visit the festival. Our intention was, that we shall go by boat. In the evening the sky became very cloudy and after a while the wind began to blow and the rain to shower. We thought that our desire would not be fulfilled, but fortunately after a heavy shower, the rain ceased and the sky became clear. We started from Barrackpore Krishnanath Mukherjee's ghat at about 8 P. M.

Our boat was driven across the surface of the Ganges, through the deep darkness of the night. The sky became clear, a gentle breeze was playing with the ripples of the river, We were engaged in talking about Mohurrum and the great departed souls. After a while the time of prayer (Namaz) came and I was ready to do it. Among the passengers one was a Maulovi, a head teacher of a U. P. Maktab. He explained to us the good of performing Namaz, and requested many of us to perform it. I pleaded for him and together with Maulavi Sahib requested all my friends who accompanied us to perform prayer. At first most of them hesitated but as we requested them again and again they co[illegible]

but comply with our request and agreed to our proposal, and stood up to pray. Then all of us stood up on the boat to pray to the Almighty and express the unity of Islam. We finished our prayer under the clear sky and on the flowing river. I said in my prayer to the Almighty to bless my friends that their hearts might be enlightened by the glory and purity of Islam and they might perform Namaz regularly.

At about eleven o'clock we reached Hooghly ghat and went to visit the festival in Imam-Bara, but we were deeply pained to see that there was no sign at all of Islam in the great mosque. It is the mournful festival of Mohurrum, and it is held in memory of the great departed soul Hossain who sacrificed his life after fasting for ten days, the story is really touching and no one can help shedding tears over the sad and pathetic passing of the noble soul. Therefore the duty of the Moslems is to pray for the peace of the great souls Hassan and Hossain and their descendants and give alms to the poor and the needy and also to feed them to their hearts' content that they may also pray for the great souls. Our duty is to spend the month of Mohurrum in this way in prayer and in charity. But we saw in the Imam Bara the home of Islam that it was a day of merry making, pleasure and amusement. In front of the Imam Bara building a mela (fair) as it were, was held and the customers and buyers were most of them Hindu women and men. The Hindu women gave pice offerings on the artificial graves and prayed for their own good and for that of others. It is nothing but a

the ignorant illiterate or educated people come and encourage them by showing their respect to this farce. We are greatly sorry that in this way the Moslems are gradually going astray from the right path of Islam.

We also saw the people of Shiah sect expressing their grief by beating their chests, and crying "Hassan and Hossain." Among the people of the Shiah sect mock-fights with lathis and torches were going all along the street. A bamboo frame work, otherwise known a Tazia, in the shape of a Mausoleum was erected. It was nicely decorated and beautifully illuminated in the night. This frame work represents the tomb of Hossain. They were following the procession dancing and chanting verses. Drums and other instruments excited the players on the mock fights. They passed the whole night in that way. As if it was a day of amusement and not a day of sorrow and prayer.

At the sight of that festival which is a curse on the Moslem community in the eyes of the Sunni sect, and as we belong to the Sunni sect, we left the place and went to the boat to pass the night under the pure clear sky. It is a matter of regret that even the illiterate ignorant persons of Sunni sect join in the mock fiights and other activities of the festival like the Shias and do not pay heed to the advice of the learned people. We request the Alems and Olamas of both the sects for turning their kind notice toward this evil of Islam and try to remove it with their utmost care.

In the morning on the 26th April, we went to

namely :— the Hoogly college, Madrasa, Imam Bara Hospital etc. We walked inside the town and found many things. One of my friends is a student of the Hoogly Madrasa, who guided us into the town. The inhabitants of this town are mostly educated Bengali Hindus. They are rather new fangled and enlightened by the western civilisation. The women of this town do not have the parda system. Almost every time of the day they go to bathe in the Ganges group by group. It seems to me that they walk in the street and other places of the town more freely than in Calcutta.

At noon we went to have the river bath in the Ganges. We were ignorant of the force of the current. We swam across a long distance, it seemed very easy. My other friends except two did not venture to follow us, and three of us went fairly far. Suddenly it flashed across our minds that we might be caught by the crocodile. As soon as this occured in our mind, we changed our course and tried to return to the bank, but were unable to fight against the strong curernt. We could not imagine that this misfortune would happen to us when we started. We were carrying on till we became hopeless about our lives. Fortunately we found a boat advancing towords us at a short distance. And by crying and waving our hands we were able to attract the notice of the boatmen. When the boat came to us, we caught hold of it and got up. In this way we saved our lives, by the supreme glory of the almighty God to be sure.

In the after-noon we went to Chandan Nagar, a town

In the after-noon the wind began to blow and the river was greatly agitated by it. High waves were rising and falling and our boat was violently tossed. As we were not accustomed to journey by boat, we were much afraid and were impatient to reach our destination quickly. We arrived at Barrackpore at about 10. p. m. Thus our day's journey was finished through danger and amusement. But we could very well realise the meaning of the proverb, 'Rapture lies in the struggle not in the prize'.

Abdur Rouf—Class X.

Greatest Living Bengalis.

Dr. Rabindranath Tagore easily heads any list of the greatest living Bengalis. His literary career extending over half a century, has been marked with wonderful originality, variety, depth, sweetness and charm. He has been unique among the greatest living artists of the world as regards the many-sidedness of his genius. In literature, he is almost unapproached and unapproachable among the greatest living writers. In drama of the general type, essay and criticism he is no less reputed as a writer of distinction. In the creation of lyrical dramas, he goes hand in hand with Shelley and his

a great teacher of mankind. As a composer of Bengali songs, his influence is far-reaching Rabindranath has created a new type, which is believed to dominate Indian songs. He has given an impetus to the revival of a refined type of dancing among high class Bengali ladies The latest discovery of the unique originality and variety of Robindranath's genius is that he is also a great painter.

Sir Jagadishchandra Bose is, perhaps, still recognised as the greatest Indian scientist or it may be, shares the honour with Sir C. V. Raman. Sir Jagadish first made a name for himself in the world of science by some valuable contributions he made to Physics Near about the close of the last century, he was considering in his mind an original idea of far-reaching influence. It struck him that the plant-world throbs with life as surely as does the animal-world. On expressing his views with some strong reasons in their support the physicist was at first poo-poohed by eminent botanists, who advised him to stick to Physics and not tread the dreadful region of Botany. In 30 years, Sir Jagadish has slowly but surely built up the structure on which the new theory stands unassilable and can support itself. He has now been able to demonstrate its truth by actual experiments.

The genius of **Sir Aurobinda Ghose** has displayed itself in manifold activities. In the years 1905-07 he was hailed as the most potent leader, and the ablest exponent in the 'Swadeshi Movement' in Bengal. He was tried before a court of Justice for preaching sedition but was acquitted

His prison-life altogether changed the course of his career. The spiritual element in his nature now pre-dominated, and engrossed his life. He has since been a 'Yogi', a spiritual master and a recluse. He is now truly what Romain Rolland has termed him 'the last of the Rishis'. He is a great philosopher, and a brilliant scholar.

Sir. P. C. Roy is known abroad as a great scientist. His original researches in chemistry are many; he is also the author of a great book on Hindu Chemistry. Sir P. C. Roy has achieved reputation also as the leader of a body of brilliant scientists, who have spread the great name of their 'Guru' elsewhere in India. Sir Profulla Chandra is no less distinguished in our country as a public man, whose generosity, sincerity and love for his countrymen are unquestioned and great. The tradition of Vidyasagar,—a rough exterior with an extremely sweet interior —is continued to this day in Sir P. C. Roy.

Dr. Brojendranath Seal is a scholar of vast erudition, and a philosopher of great brilliance. As regards his great scholarship, it may be said that he is the only Indian to whom the epithet of 'a walking encyclopædia' fits quite appropriately. As a philosopher he has made his mark. He has freed the fragments of thought occasionally from their cells in the brain; they have been wafted by soft breeze, so to speak, till they have found repose in thoughtful minds. He has exerted an influence or rather been a force in current Indian Philosophy.

Sj. Saratchandra Chatterjee is a great Bengali novelist. His works have been finding, slowly, but surely their way to recognition in the literary circles of Europe. We should be justly proud of Saratchandra, and his works reveal a wonderful power of expressing the deepest emotions and passions in the homely and narrow circle of Bengali life In this respect, he is hardly surpassed by any master of fiction in any literature. Both Robindranath and Saratchandra among the living writers, have brought to our literature a prestige and a dignity only less than that of the very greatest.

Dr. Abanindranath Tagore who belongs to the family of the great Poet, is a great painter, and has acquired the distinction of starting a new school in painting, which has found the missing link of the tradition of Indian Art, and has rejuvenated it with remarkable artistic creations. Dr. Abanindranath Tagore's name, for this reason, is sure to find a prominent place in the history of Indian Art.

Sj. Ramananda Chatterjee is one of the leading Indian journalists. His "Modern Review" is, perhaps, the best Indian periodical, and has acquired a distinction abroad not equalled by any other Indian journal, in public life.

Sj. **Udaysankar Mukerjee** is the latest great figure among those who have glorified the name of Bengal. As a great exponent of the art of dancing in the East, he has few equals, if any, in the world of to-day. The traditional mode of the ancient Hindu art, revealed in numerous works in sculpture and paintings—the beautiful poses and expressions

of surpassing grandeur and of infinite mystery, have re-appeared partially in the paintings of Dr. Abanindranath Tagore and his disciples and in full in the dancing of Udaysankar.

Dr. Megnath Saha, a young scientist, has already achieved for himself a name of which veteran men of science of the day may well be jealous. He is a Physicist, and his original researches on Acoustics account most for his receiving the proud distinction of being an F. R. S. He is the fourth Indian to receive the honour, the other three being the late Mr. Ramanujam, Sir J. C. Bose and Sir C. V. Raman.

Sj. Nandalal Bose belongs to the school of Dr. Abanindranath Tagore, and is the greatest among Abanindranath's disciples. He possesses a talent which is great enough to have his paintings classed with those of his master, for their artistic excellence.

Sailendranath Jash—Ex-student.

How to Prevent Dental Decay.

(By Dr. Nirmalchandra Deb Choudhury.)

Now-a-days it has been admitted by all leading physicians and surgeons that the pathological conditions of the teeth and gums are responsible for the cause of great many diseases. It is a great pity that though a large percentage of us suffer off and on from tooth trouble, still we are not sensible enough to take care of it. The most notable fact about an unhygienic tooth is that, it is an invitation to oral infection which plays a very important part in the etiological factor of several grave diseases. Thus from the infection of a mere tooth, our whole system is infected and we fall an easy prey to such pernicious illness which some times endangers our life.

Teeth do not serve for bodily adornment only but they help us in the process of digestion too. We masticate the food by the teeth, mix it thoroughly with the saliva containing Ptyalin—an enzyme that partly digests carbohydrate food. The more we chew our food, the more saliva secretes and this ensures better digestion of carbohydrate foods. If a person has bad teeth, mastication will necessarily be hindered and the food will reach the stomach imperfectly prepared. Well-masticated foods give little trouble to the stomach and intestines. We take our meal in such a hurry

fact we do not chew our food properly. This negligence invariably makes us pay the penalty, and this is why Dyspepsia is so very common to us. There runs a proverb in English "Chew as many times as you have teeth." The late Mr Gladstone followed this principle very strictly and never swallowed one morsal of his food unless he chewed it for thirty two times.

Dental caries is by far the most common trouble children suffer from in Bengal, but Pyorrhoea Alveolaris resulting from the excessive accumulation of tartar at the roots of the teeth is not uncommon. This Pyorrhoea is characterised by inflammatory condition of the margins of the gums, accompanied by purulent discharge from pockets along the roots of the teeth. They set up oral infection and the constant swallowing of these bacteria with their toxins seriously tells upon the mucous-membrane of the stomach and intestines. Consequently the gastric secretion is deprived of its antiseptic properties and thus, a chronic gastritis, or gastric and duodenal ulcer may follow. Hunter regards that the inflammation of appendix, gallbladder, pleura and gastric mucous membrane is largely due to infection from the mouth. In dealing with Oral Sepsis Osler observed: 'There is no question of the importance of the subject, and we should insist upon scrupulous cleanliness of the mouth and teeth, particularly clearing away the tartar and the pockets of puss.' Neuralgia of the 5th nerve is sometimes due to reflex irritation from a carious tooth. Some form of pernicious ane-

mia is always associated with Pyorrhoea Alveolaris. From dental caries the bacteria may find their way into the pulp cavity and form the very painful alveoar abscess. Inflammations of the lining membranes of the heart, air-passages and other neurotic conditions may also be seen.

From the statistical evidence it appears, that dental caries is increasing among children of *school* age. The medical veterans of the west are of opinion that the impaired physical condition of school children are due largely to unsound teeth. In the course of an address to the British Dental Association Dr. Edmund Wallis remarked, 'The mental and physical development of the children attending the public elementary schools is much hindered by the wholesale neglect from which their are suffering; their susceptibility to diseased conditions is much higher than it would be if their mouths were kept healthy." In short, the prospect of a child deriving the full benefit of the instruction provided in an elementary school is much impaired by the prevailing condition of the teeth; and when the children enter upon wage-earning careers, they do so in a great number of cases, with impaired constitutions and with a physique unable to cope with the present day struggle for existence. Such pathological conditions of the teeth must have a serious influence upon man's health.

Dental caries may result from the action of some acid-forming bacteria on the enamel covering the teeth. From the fomented carbohydrate food particles, these bacteria produce acids which slowly dissolve the salts contained in

the enamel. The efficient methods of preventing tooth decay therefore lie in destroying these bacteria and in neutralising the acids formed by them. This can be accomplished by regular application of an antiseptic, alkaline dentifrice which kills the germs as well as supplements the action of alkaline saliva in neutralising the acids of microbic origin. Gritty powders or pastes must never be used as they hasten dental decay. The enamel of the teeth is apt to wear away as a result of injudicious use of too hard tooth brushes with side to side motion. The real movement should be up and down so as to clear the spaces in between the teeth. The use of a small stiff brush is advocated. It should not be very soft, nor too hard and must be rejected as soon as the bristles become flabby. Generally we brush our teeth once in the morning. But it is advisable to make the toilet of the mouth after each meal, and at least once before going to bed. Remnants of food mixing with the secretions of the gums form what is known as the *tartar* of the teeth. This tartar is a very favourable agent for the growth of bacteria and is the root cause of Pyorrhoea Alveolaris. So when once the tartar is formed, it must be cleared in no time by scraping. The erosion of the teeth is greatly accelerated if the soft dentine is exposed as a result of biting hard substances or due to the imperfect development of the enamel. The teeth of our children are badly neglected. The child's mouth must be cleaned thoroughly, after he

non-cleansing foods. It is an erroneous idea to think that taking care of the milk teeth is not important as they shed away and are replaced by permanent set. If the milk teeth are not taken care of in childhood, the dentition of the permanent set must be imperfect and the adult will suffer from subsequent dental troubles. Whenever any dental disease arises, no time should be lost in seeking the proper advice of a Dentist. Dental clinics ought to be introduced in the school curricullum so that boys and girls may know how to preserve their teeth. The responsibility for tooth preservation rests upon ourselves and if we want really to see our boys make their mark in life, we should look upon tooth-toilet as a very important habit to be cultivatet by our children. Here as in many other respects Home as well as School should combine and steadily pursue a system recommended by experts in the line.

TIT-BITS.

Yearly grant to the Royal family :–

Their Majestys' Privy Purse	=£ 110,000
Salaries in the House hold	=£ 125,000
Expenses of House hold	=£ 193,000
Works	=£ 20,000
Royal Bounty	=£ 13,200
Unappropriated	=£ 8,000
Duke of York	=£ 25,000
Duchess of Argyll	=£ 6,000
Duke of Connaught	=£ 25,000

The total cost of the Royal family is about 3d. per head of the population of the United Kingdom.

Pay of Parliamentary Members :—

England = £ 400 Per annum
France = 27,000 Francs ,,
Germany = 12,000 Marks ,,
Italy = 15,000 Lire ,,
Sweden = 35,000 Krona ,,
United States = 10,000 Dollars

Languages in India—

In the whole Indian Empire then on 222 languages. The principal languages are given below—

Language	Number of speakers.		Percentage of increase or decrease.
	1911	1921	
Western Hindi	96,041000	96,714000	+1
Bengali	48,368000	49,294000	+2
Telugu	23,543000	23,601000	+2
Marathi	19,807000	18,798000	−5
Tamil	18,128000	18,780000	+4
Oria	10,162000	10,143000	−·2

Saratchandra Banerjee—Class IX.

Ourselves.

Our very popular S. D. O., Mr R. L. Dutch, having gone on leave, Mr. R. S. T. John, Asstt. Magistrate of Jalpaiguri, has come over here as our Sub-Divisional Officer. Like his predecessor in office (Mr. Worth), Mr. Dutch took particular interest in this government school. Whenever we approached him for any business of the school, we were kindly received, and Mr. Dutch did for us all that he could. In the sub-division he was equally popular. We find Mr. John is a gentleman of genial temperament too and is a very smart officer sparing no pains to help those who seek his advice. We know of no school in India which can claim to have the Governor of a Province to be its patron. This School has that privilege and, therefore, H. E. the Governor of Bengal is pleased to invite the boys of this school to His Excellency's residence in the Governor's Park once a year on the prize-day. In this very important function of this school the S. D. O's wise counsel and active help have always been of the greatest value. We have so far proved ourselves worthy of his wise guidance. Now it is up to us to prove to our new President of the Managing Committee of the school that we deserve his kind patronage as well.

* * * * *

Sj. Sarat Chandra Banerjee, B A., B. T. has just quitted the Headmastership of this school and joined his post at Hooghly, which being his native district this transfer very likely is welcome to him. But what perhaps he so much longed for, is a great loss to us. The very word 'Headmaster' generally strikes terror into the mind of the ignorant pupils, which puts a screen of mistrust between the Headmaster and the students, thereby half reducing the chances of the Headmaster's success as a teacher and an administrator. Sj. Banerjee was not a dread in the school in this sense. Boys even of the lowest form had great confidence in him whom they held in great esteem. They came forward to give a bit of their mind to the Headmaster whenever he desired it. Sarat Babu had a heart of gold overflowing with the milk of human kindness and knowing, that he did, every student and his home, he had the rare advantage of treating each case on its own merits. This saved us from many painful scenes which certain Headmasters of the old type hold before a house hushed by the terror of the cane flourishing over a dumb-founded friend of theirs. Extremely sympathetic Sarat Babu had not that sneaking affection for boys which warps one's judgment. So his sympathy for them hardly lapsed into indulgence. Full of sorrow for the departure of our reverend Headmaster, we pray to God that Sj. Sarat Chandra Banerjee may enjoy the best of life in his new environment and not deny us his blessings, when out of sight.

* * * * *

'If Winter comes can Spring be far behind?' sang the English poet and in the same strain we may aptly say: if the departure of Sj. Sarat Chandra Banerjee from our midst augured Winter in the life of this institution, well, the transfer of Mr. Jyotirmoy Lahiri, M. A., B. T., Dip. Ed. (Lond), M.R.S.T. (Lond.), the Asstt. Headmaster of Ballygunj Govt. Demonstration school here as Headmaster, has marked the dawn of Spring in this school. Rich in the graces of person, ripe in experience, robust in optimism and broad in outlook, Mr. Lahiri has earned a name in the Department. As a matter of fact from what we have seen of Mr. Lahiri even during this short period that he has been here, we have no doubt but that he will make an excellent Headmaster. With such a man at the helm of affairs we foresee a very bright future for the Governor's school.

* * * * *

It is a matter of great satisfaction that our continued efforts to make Barrackpore a centre for Matriculation examination have at last borne fruit. More than 100 students are going to appear from this centre this year, and we hope in a few years' time many more will join and will thus be saved from the strain of going up to Calcutta in the grilling heat of March.

* * * * *

Sj. Charu Chandra Das Gupta, the Asstt. Headmaster of our school is due to retire in January and is now on leave prior to retirement. So we are soon going to miss one who combined in himself the wisdom of a seer, the affection of a

parent and the erudition of a scholar. A man of grit and good moral principles and unflinching devotion to the cause of learning Charu Babu never stooped to colowing. Four square in the principal school subjects of the day he was an asset to the institution he was called upon to serve. It will take long before the gap caused by his retirement from office, can be adequately filled up. Maybe we will not meet him for years to come, but we assure our revered teacher that 'time or clime' will not wear out the very happy associations we were privileged to form with our very dear Asstt. Headmaster. We pray to God that he may continue to the maintain the vigour of his health which makes retirement so enjoyable.

* * * * *

Moulavi Azhar Ali Khan B. A., B. T, an Asstt. Master of the Jessore Zilla School has come here as Asstt. Headmaster in place of Charu Babu. We heard of him being a veteran in the line and now being in touch with the Khan Sahib for the two months that he has been here, we have come to feel that Khan Sahib is no unworthy substitute of our late Asstt. Headmaster. We hope we shall find in him as able a guide as we did in Charu Babu.

* * * * *

The Calcutta Gazette of 30th. September, 1934. gave us the welcome news that Masters Haridas Bhattacheryya and Golakpati Bhakat of last year's Class X secured University scholarships—the formar of Rs 15/- and the latter of Rs 10/-. As ill luck would have it, Master Indu Bhushan Das, the third boy, was down with Influenza and could not

do well in the examination. He lost a scholarship by the bare margin of a few marks which, however small in itself, was enough to put him down. But for this, perhaps, another ten-rupee scholarship would have come to our school. A review of the results of the past four years, shows that we have been able to maintain the fair name of our school. In 1931 one of our boys was a fifteen-rupees scholar; in 1932, though none could get a scholarship, the percentage of passes was high. In 1933 one boy stood fifth in the University, got the highest mark in English and won medals, scholarships and prizes. In the same year another boy got a scholarship of Rs 15/-. This year two boys have got scholarships and out of 17 students 8 have passed in the first, 5 in the second and two in the third division. The percentage of passes of the number of boys taught (and not of the number of boys sent up for the Matriculation Examination) in 1933 and 1934 was 87·5 and 83·3 respectively. This is no mean achievement. The teachers and students of this school look to the prize-day as a day of real reckoning when H. E. the Governor of the province takes stock of the year's progress. So in all their work, inside and outside the class-rooms, the students as well as the teachers are dominated and inspired by this idea that every performance of theirs should be such that His Excellency would be glad to hear of. Therefore no pains are spared by anybody to shape things to the satisfaction of His Excellency. The cumulative effect of this continued application on the part of the students and teachers under the guidance of the

very able Headmasters that are more often than not put in charge of this Governor's school, is responsible for this high standard of efficiency. So these are all but links of a long chain, each and every clasp of which contributes to its glorious span and is, therefore, equally necessary to make a tradition and maintain it. As for example, unless we are uniformly regular and industrious, no amount of endeavour on the part of our teachers would make us scrape through our examinations with credit. We should remember this and put in more zest to our work so that next year's record may compare favourably with those of the previous years. Our eyes are turned to this year's Class X and if its performance in sports be a measure of its performance in scholarships, we have nothing to worry about. Let us hope that this year's batch will not belie our fond expectation. God bless our senior friends who have just passed the first University Examination. This school will always cherish their association and we hope they too would do the same.

*   *   *   *

Our school joined the sub-divisional swimming competition held at Kamarhatti Sagore Dutt H. E. School tank on the 27th September, 1934. It was a contested competition and our school acquitted itself well. Master Naren Mitra (viii) won a medal for having stood first in 'side stroke' swimming, Naranaryan (vii) and Naren stood second in 'any stroke' swimming. We have here under our control no tank where the boys can have practice. Sagore Dutt has one of its own, so it is but fit that Sagore Dutt should score best of all. Our boys

deserve well of us that even without practice they could make so fine a display. We wonder what arrangement we may possibly make to give them practice so that next year a better performance may be assured.

Sporting Notes.

In our last issue we exhorted our footballers to make a fine record and we are glad to note that they were able to show themselves off. This year's foot-ball record was particularly eventful. Besides the two Cup competition matches of our school (the M. M. and P. B. Cups) which, of course we joined, we played at Ichhapur, Khardah, Syamnagar, Serampur and Hooghly and also had our chance in the sub-divisional Cup. The noteworthy feature about the school Cups was our tussle with Khardah and Panihati schools. Both the teams were in good form and although Khardah could be defeated on the second round, Panihati could not be so worsted. Two days the play was undecided. On the third day too, but for a goal netted in the last minute, the game would have ended in a draw. It was a perfect tug of war and although Panihati could not annex the P. B. Cup, it must be acknowledged that

Cup competition, the Jubilee School of Calcutta having been scratched, we retained the Cup. At Shyamnagor we were in the final and played with the school team. It is much to be regretted that the game was very badly managed and the refereeing was utterly disappointing. To say the best of it, it was not playing the game. In Serampore we tied with strong Serampore Union on the first day. The game was a treat to the people and the management struck a bargain in having it played the next time on ticket. It were good if we could make a good score on the second day, but the game ended 2 to 1. That meant our exit from the competition, but that was a glorious exit for the whole of Serampore enjoyed the game, which the people remarked was marvellous. When the play was over it was difficult to make our way through the enthusiastic on-lookers. At Ichhapur and Khardah our junior team went up to the semi-final but could not win a trophy. The S. D. O. Cup was rather late in coming. The Second Terminal Examination was knocking at the door when the last round was played. Our school made a brilliant show in the second round and defeated the local D. P. H. E. school B team. In the last round we met the A team of the school, but because of the illness of our very able goal keeper, the game could not be played and we lost it. We were not sorry, however, to admit defeat to this pick of school teams. But is not there something grand to be able to annex a trophy by which many good schools in this part of the province set great store ? Well, that trophy was

won and won by the Barrackpore Govt. School, and how you will find below.

* * * * *

It was a real feat on the part of the Barrackpore Govt. School to have been able to annex the Sakti Cup of the Hooghly Branch School. Barrackpore was trying year after year to woo the fame of a victory in this much-contested competition but without success. In the first year we went up to the second round, in the second and third to the semi-final and here in the fourth year, we fought in the final and fought it out with Shome Academy which, according to the Hooghly public, is the strongest team a school in the district had ever produced. The Academy had beat down as many as four teams one of which let them carry several raids into their goal lines having been defeated by 11 to 3 ! So the rumour was in the air that Barrackpore Govt. School in the final game would kiss the dust raised by Shome Academy, and we took the warning. It was a seven-a- side game and our seven stalwarts were carefully selected. A fully equipped regiment armed with an iron will to do or die and with a rank and file of a troop of friends, set out for the great conquest. Most of our teachers including the Sports Secretaries, were with us to correct any defect that might be noticed in our operations then and there. Mr. Zakariah, the Principal of the Hooghly Govt. College was chosen President for the occasion and the game piqued the curiosity of so many people that long before the kick-off, spectators from the farthest ends of the big town

flocked to the ground of Hooghly Branch school. As it so often happens the public was in favour of the local team and they could be heard talking in superlatives of the excellence of the team. All around the ground, it was 'Oh Shome Academy— the invincible !' 'An easy work for them !' 'Barrackpore is no match !' and so on and so forth. They seemed to be cock sure that the scorer of eleven goals must win the Sakti Cup. We, boys, felt a bit nervous : nevertheless we believed that our players would be able to show themselves off and carry the day. Punctually at 5—15 P.M. the game started. There were yells all about encouraging the local team. Barrackpore paid no heed to these but was meanwhile pursuing a slow and steady attack directed against the vulnerable points. In the first fifteen minutes our attempts were abortive. The shots grazed through the posts but would not get in ! In the second half of the game the play was full of zest. Barrackpore soon turned the tide in her favour— a goal was netted. This had a magic effect. The next few minutes were a period of great thrill and surprise. The ball was now here and now there, extorting applause from the by-standers. It was simply driven from one end of the field to the other, to the great amazement of the people who did not expect such a finished performance from the Barrackpore team. One minute more and the game would come to a close, but the tense moments would not expire. All of a sudden, however, the whistle shrieked. The Shome Accadamy could not score a goal and 'Hurrah for Barrack-

pore !' rang the air. Mr. Zakariah in congratulating us, amidst deafeaning cheers, said that the very fact that we had striven hard for the Cup for the last three years and instead of giving up had pushed on, gave him great satisfaction, for the quality of tenacity he added, was greatly lacking in the East. With laurels of victory decorating our Captain and the six members, the team returned home and next day the lovely cup was taken round the classes to be received with lusty cheers. So here is an example what *esprit de corps* can achieve and how that spirit can be cultivated. We owe it to the management of the Sakti Cup to record that in our every visit to Hooghly, we have been warmly received and every difficulty of ours, whenever reported, has been attended to.

Notes and News.

So Australia is making merry that she could wrest the laurels from England's cricketers. Hurrah to Australia and to Woodfall's team which exhibited all-round superiority in their performances. That England would lose this season was a foregone conclusion, for, the English Eleven was not really England's pick of players. Besides, the whole series of Test matches were played in an atmosphere

of doubt and distrust due to a confused conception of body line bowling which, ever since the last year's Test matches in Australia, has been a veritable bone of contention between English and Australian cricketers. The players themselves had no clear notion as to what bowling was legitimate and what not. Any way the 'ashes' have forsaken fair England and will continue to receive warmth of care from the ardent Australians till England can claim and prove her claims on her. By the bye, our friends, perhaps, do not know what this 'ashes' means. To explain this I have to take you back to the early eighties of the last century and you have to listen with some patience.

On 29 th. August, 1882, the English cricket team was defeated by the Australian team at the Oval (the Surrey county cricket ground). This was what England did not apprehend and naturally Englishmen were sorry, very sorry. As a mark of sorrow an English newspaper—The Sporting Times of England—in half sorrow and half sarcasm blazed abroad this defeat in the following epitaph—

In affectionate remembrance
of
English cricket.
Which died at the Oval on
29th. August, 1882.
Deeply lamented by a large circle of
Sorrowing friends and
Acquaintances
R. I. P.

N. B.—The body will be cremated and the ashes taken to Australia.

Now later on in the same year Hon. Ivor Bligh (later on Lord Darnley) took out an English team to play in Australia. It was, then, said that Hon. Ivor Bligh was going to Australia to get back the "ashes" which according to the Sporting Times epitaph were taken to Australia. As they fully deserved it, this team of Bligh gained the rubber. A number of ladies were so much agitated over this happy victory of the English team that they took it into their heads to pursue the story of the epitaph by giving over to Hon. Ivor Bligh's team some ashes obtained from some material used in the test matches. The burning of stumps came easy and some stumps used in those very games were set fire to, the ashes scraped up and put in a nice urn and handed over to Hon. Ivor Bligh. Now to talk in terms of the Sporting Times epitaph, the 'ashes' for which it was reported that Hon. Ivor had gone to Australia, were thus obtained. The Urn was brought home with great pomp and put in a bigger case in the house of the Captain. Later on he willed it to Marylebone Cricket Club and the Urn with the historic 'ashes is still preserved with reverence by the M. C. C. Thus the 'ashes' never left England and can not, since it is a gift spontaneously made by a group of admirers. Yet "to bring back the ashes" has come to mean since then, 'to wipe out defeat.' Fancy how freaks make a history ! Could the admiring ladies who burnt the stumps, to complete the metaphor, even imagine that what was done as a matter of sportive fancy, would

come to stay and be so much recognized as to find a place in the dictionary of their language in the form of an idiom. This is all about 'ashes'.

* * * * *

We have the melancholy duty of recording the death of Sir C. C. Ghosh and Dr. Mrigendralal Mitra, M. D., F. R. C. S, M. Sc. two of Calcutta's remarkable personalities. There are not many compeers of Sir C. C. Ghosh in Bengal and the medical profession distinctly poorer today by the demise of its most eminent surgeon. Death has snatched away these worthy sons of Bengal but they will live in the memory of men for many years to come, for, apart from what they did as members of their respective professions, each was a first class man rendering help to innumerable persons irrespective of caste, colour or creed. May their souls rest in peace !

* * * *

The great air race about which we wrote in our last issue has now been over. This epic race has excited the wonder of the world establishing, as it did, a record of fast flying almost unthinkable till the 22nd. day of October 1934, but an accomplished fact since then. The news of the achievements of Messrs C. W. A. Scott and T. Campbell Black, the joint winners of Mac Robertson's trophy—a cup of gold and a purse of £ 10,000/— have blazed abroad being the performers of the most hazardous feat. A distance of about 11300 miles has been run during 71 hours with an average speed of 160 miles per hour. Much sympathy is

felt for Mr. and Mrs. Mollisons who having led the race a fairly long way, was put out of running for some trouble in their engine. Half way through the plucky pair was compelled to give up. Three other remarkable aeronauts viz., Sir Charles Kingsford Smith, Colonel Fitzmaurice and Willey Post not having joined the race people thought the Mollisons would surely win, but ill luck dogged these determined racers and months' labour did not bear the desired fruit. Though not quite close on the heels of Scott and Campbell, the Dutch airmen finished second and received the second prize of £ 1500/-. Colonel Fitzmaurice is now thinking of covering the same distance by an independent flight to Melbourne. By the time this reaches our readers maybe the brave colonel will have set up a brilliant record. Permentier and Moll, the Dutch airmen have won the handicap race.

* * * * *

There is an impression lurking in many of us that India is no match for world athlets in various feats. That this is much under-rating our abilities, will be proved from the table below prepared by the Indian Olympic Association which-ever since its origin about 10 years ago, has been straining every nerve to raise the standard of Indian athlets. It will be admitted on all hands that many years athletic activities were not given the place they deserve in the scheme of education. The angle of vision has now changed. In Bengal the Director of Physical Education has given a fillip to physical culture. Elaborate plans have been made and are being steadily pursued. Each Government

School now knows its physical possibilities. This knowledge about its own physical fitness works as a very effective incentive among boys to improve their standard. Outside the school wall, too, public opinion is gathering weight in favour of physical culture and we find to-day different bodies directing their activities to develop the physique of their countrymen. Poor that we are, we do not claim to become as efficient as athlets of other countries in the West. There are many families in Bengal which can not provide minimum nutrition to her children and it would be scarcely fair to saddle an under nourished system with the inevitable strain that athletic excercises entail. Taking cognizance of this fact it must be acknowledged that the place of Indian athlets indicated in the table is not too low.

Events.	India (1934)	British A. A. A. (1934)
100 Yards	9-7/10 sec.	1. Hungarian 9-9/10 sec. 2. Englishman ...
220 Yards.	22-3/10 sec.	... ... 21-1/10 sec
440 Yards.	30-4/10 sec.	... ... 49-6/10 sec
880 Yards	1m. 59-2/10sec	... ... 1 m. 56-4/10 sec
One Mile.	4m. 32-4/5 sec	1. New Zealander 4 m. 26-3/5 sec. 2. Englishman ...
Three Miles	15 m. 22-3/5	... ... 14 m. 13-3/5 sec
Six Miles.	32 m. 33½ sec.	1. Pole 30 m43-4/5 sec. 2. Englishman ...
120 Hurdles.	15-2/10 sec.	... ... 14-4/55 sec.
400 Hurdles	[illegible]	[illegible]

Events	India (1934)	British A. A. A. (1934)		
Discus throw	116′-3¾″	1.	Irishman	135′-4″
		2.	Englishman	133′-9½″
Hammer throw	127′-7″	1.	Free Statesman	169′-8½″
		2.	Englishman	149′-5¼″
Javelin throw	170′-11½″		... ...	169′-9¼″
Shot Putt.	38′-10⅝″	1.	Pole	48′-14¼″
		2.	Englishman	44′-4½″
Pole Vault.	11′-5¼″		... ...	12′-3″
Long Jump.	22′-10½″	1.	Frenchman	23′-9″
		2.	Englishman	22′-11½″
High Jump.	5′-10½″	1.	Hungarian	6′-3″
		2.	Englishman	6′-2″
Hop, step&jump	46′-4″	1.	New Zealander	47′-8¾″
		2.	Englishman	43′-4″

In the words of the Secretary of the Association,—

A comparison of the above results shows that in 1934 Indian athletes were better than English athletes in three events, while closely approaching the latter in the 220 and 440 yards races and in long jump.

"It might also be added that the results of 1934 Indian championships do not by any means represent the best Indian records made during 1924 to 1934."

Barrackpore Govt. High School.

Estd. 1837.

PROSPECTUS.

1935.

BARRACKPORE GOVT. HIGH SCHOOL.

TEACHING STAFF.

1. J. Lahiri Esqr, M. A., B. T., Dip-Ed. (London),
M. R. S. T. (London) Headmaster.
2. Babu Charuchandra Das Gupta, B. A., Asstt. Headmaster.
Moulvi Azahar Ali Khan, B. A., B. T., Offg. Asstt. Headmaster.
3. Babu Monmohan Roy Choudhury, M. A , B. T., Asstt. Master.
4. Babu Probodhchandra Deb Choudhury, M. T., Asstt, Master.
5. Babu Sureshchandra Neogi, B. A., B. T., Asstt. Master.
6. Moulavi Shaik M. Habibur Rahman L. T., Shahityaratna,
Asstt. Master.
7. Moulavi Md. Yusoff Ali, A. T. Asstt. Master.
8. Pandit Hrishikesh Bhattacharya, M. A., Kabyatirthya.
Head Pandit.
9. Pandit Tarapada Vidyabhusan, Kabya-Vayakarantirthya.
Second Pandit & Scout Master.
10. Moulavi Md. Gholam Akbar F. M. & Matric, Head Moulavi.
11. Babu Dhirendranath Sinha, Physical Instructor & Cub Master.
12. Babu Asit Mohan Das Gupta, Art Final, Drawing Master.
13. Moulavi Ziaur Rahman, Clerk.

Barrackpore Govt. High School.

Prospectus.

History :—

The Barrackpore Govt. High school, popularly known as 'Governor's Park School', was founded so far back as in 1837 by His Excellency Lord Auckland, the then Governor-General of India. Ever since its establishment the school has enjoyed an unbroken continuity of patronage from Viceroys and Governors. It now steps into the 99th year of its existence with its glorious traditions and associations from such high quarters.

Situation :—

The school is situated amidst healthful surroundings in the Governor's Park. The main building (the original Auckland Hall with two other Halls superadded to it viz., the Northbrook Hall and the Ripon Hall) is a church-like structure, provided with turrets at intervals, which lend the whole a peculiar charm and suggestiveness.

Subjects taught :—

The school provides teaching in the usual school subjects including Geography but excluding Mechanics in which, however, it will seek affiliation as soon as funds are available. There are the usual 8 classes from class III

Admission of students :—

The school has always scored uniformly brilliant results in the Matriculation Examination. The results of the last two years are given below—

Year	Number sent up.	Number passed. 1st.	2nd.	3rd.	Total.
1932	22	8	11	2	21

A boy stood 5th in the University Examination and got a 1st grade scholarship of Rs 20 a month, and 1 obtained a scholarship of Rs 10 a month.

Year	Number sent up.	1st.	2nd.	3rd.	Total.
1933.	17	8	5	3	16

1 boy got a 2nd grade scholarship of Rs. 15 a month and another boy obtained a scholarship of Rs. 10 a month.

Admission begins in January. The probable number of vacancies in each class is usually posted on the school Notice Board as soon as promotions are declared by the 16th of December every year. Generally speaking, no pupil can be admitted into the school later than the 15th February of the year.

Applications for admission are received by the Headmaster up to the 5th January every year. Admissions are registered on the results of a written admission test not later than 7th January, unless otherwise notified. No boy who has not attained the age of 5, is admitted. Students over 20 years of age are not allowed to remain in the school.

Fees :—

Boys seeking admission into the various classes have to pay—

(a) an admission fee equivalent to the tuition fee

(b) a tuition fee from the beginning of the session at a monthly rate detailed below :—

Rs 3-8 for classes X & IX.
Rs 3 ,, ,, VIII & VII.
Rs 2 ,, ,, VI & V.
Rs 1-8 ,, ,, III & IV.

N. B. If the pupil has already paid his tuition fees in the former school, he will not be required to pay it again at the time of admission.

(c) a Magazine fee of Re 1 down to class VI,

(d) a Common Room Fee of Re 1 (collected in two instalments of As. 8 each in January and July).

(e) An athletic subscription of Re 1-2 (collected in two instalments in January and July).

(f) An ink fee of As 6, collected in three instalments (January, May and September.)

N. B. The imposition of a Tiffin Fee of As. 4. per month from February to provide wholesome tiffin during the mid-day recess to those boys who cannot make their own arrangements from home, is in contemplation of the school authorities.

Rules regarding payment of fees :—

Tuition fees are payable on the 15th of the month after which a fine of one anna is levied for each day of default, If the first 15 days of any month fall within a vacation, the dues for the month must be paid along with those for the previous month.

Fines for delay in the payment of tuition fees are not levied for holidays and vacation immediately preceding the date of payment of the dues.

If the dues for a month including fines, if any, for absence, late attendance, and late payment, be not paid

on or before the first working day of the next month, the pupil's name is removed from the Register on that day.

Leave :—

Formal leave will be granted by the Headmaster on receipt of a satisfactory written letter of excuse, duly signed or conutersigned by the father or guardian of a boy. Leave may, at the Headmaster's discretion, be granted with retrospective effect if application be made within 7 days of the commencement of the absence.

Applications submitted late are liable to be rejected. If a pupil absents himself without leave for 15 days consecutively, the Headmaster may strike his name off the roll at the end of the calendar month after due notice given to his parent.

Fine for absence is one anna per day but for absence in continuation of holidays and vacations (before or after) it will be doubled.

Athletics :—

There is an extensive playground both inside the school compound and out in the Governor's Park in which all varieties of games both indoor and out-door, are played under the supervision of the Physi[illegible] Instructor aided by 2 other teachers. Attendance in physical exercises and games is compulsory for 2 days each week. Indigenous games also receive their due share of attention.

Extra-curricular activities :—

The organisation of extra-curricular activities constitutes a special feature of the school. There are a Troop of Scouts

and a Pack of Cubs under the supervision of a Scoutmaster and a Cubmaster respectively. The inauguration of a Junior branch of the Indian Red Cross Society under a Counsellor is contemplated early in January this year with the object of inculcating in children the ideal of peace, the promotion of health and the practice of service. The school has a journal of its own to encourage literary activities among its students.

Under the auspices of the Students' Associations, debates are held once a week to give an impetus to speaking *extempore.* The Satyamoy Memorial Prize for the best debater acts as an incentive to young debaters. Lantern lectures on Saturday evenings form a valuable supplement to class-teaching. Besides these, educational excursions are often organised under the supervision of teachers with a view to broaden the outlook and enrich the experience of youngsters. The nucleus of a School Museum containing the best products of boys, turned out under actual class-room conditions, has already been formed.

The activities of the school are not confined to the class-rooms alone. Besides regular work in the classes, boys take to the study of newspapers and periodicals subscribed for the Common-Room.

Discipline :—

A high standard of discipline is maintained. No opportunity is lost in inculcating upon the minds of youngsters the habits of punctuality, truthfulness, benevolence, obedience to law and order etc and in holding out before them

noble ideals from the lives of great men during class-lessons and also on the occasion of general addresses to the whole school by the Headmaster in the School Hall every Monday when a two minutes' silent prayer is offered before the school assembly to give a religious tone to what would otherwise remain a purely secular education. On other working days the prayer is offered in the class-rooms in the first period. The introduction of the House System under which the whole school population will be divided into four Houses named after four great educationists of Bengal, is in contemplation.

Special Prizes :—

The school has got quite a number of endowments for the award of prizes, notably the following :—

1. Lord Lansdowne Silver and Bronze Medals.
2. Lord Ronaldshay Prize.
3. Lord Lytton Prize to the best athlete.
4. Lady Lytton Prize to the best boy of the lowest class of the school.
5. The Bibhuti Memorial Prize.
6. The Satyamoy Prize.
7. The Siddheswari Prize
8. Dr. B. N. Bose Prize.

A special feature of the school is that every year His Excellency the Governor of Bengal presides over the prize-giving ceremony and entertains the boys with sweets.

THE END.

BARRACKPORE GOVT. HIGH SCHOOL.

TEACHING STAFF.

———:(o):———

1. J. Lahiri Esqr., M.A., B.T., Dip-Ed., (London), M. R. S. T. (London)—Headmaster.
2. Babu Charuchandra Das Gupta, B.A.,—Asstt. Headmaster.
   Moulvi Azahar Ali Khan, B.A., B.T.,— Offg. Asstt. Headmaster.
3. Babu Monmohan Roy Choudhury, M.A. B.T.,— Asstt. Master.
4. Babu Probodhchandra Deb Choudhury, M.T.,— Asstt. Master.
5. Babu Sureshchandra Neogi, B.A., B.T.,—Asstt. Master.
6. Moulavi Shaik M. Habibur Rahman L.T., Shahityaratna— Asstt. Master.
7. Moulavi Md. Yusoff Ali, A.T.—Asstt. Master.
8. Pandit Hrishikesh Bhattacharya, M.A., Kabyatirthya— Head Pandit.
9. Pandit Tarapada Vidyabhusan, Kabya-Vayakarantirtha— Second Pandit & Scout Master.
10. Moulavi Md. Gholam Akbar F. M. & Matric—Head Moulavi.
11. Babu Dhirendra Nath Sinha—Physical Instructor & Cub Master.
12. Babu Asit Mohan Das Gupta, Art Final—Drawing Master.
13. Moulavi Ziaur Rahman—Clerk.